উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা

গবেষক

নরেন্দ্রনাথ রায়

প্রভাষিক, বাংলা বিভাগ
পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া

NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY

তত্ত্বাবধায়ক

ডঃ মঞ্জুলা বেরা

রীডার, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি. (বাংলা)
উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০০৬

Ref
84.5
নারে/উনি

202021
14 FEB 2008

STOCK TAKING - 2011

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
প্রাক্ কথন	
প্রথম অধ্যায়	
প্রাক্ উনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনা ও স্বদেশ ভাবনা	১-১৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা	১৬-৬৮
তৃতীয় অধ্যায়	
উনিশ শতকের নক্‌সা ও নক্‌সা জাতীয় সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা	৬৯-৯৫
চতুর্থ অধ্যায়	
উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা	৯৬-১৬২
পঞ্চম অধ্যায়	
উনিশ শতকের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যে স্বদেশ ভাবনা	১৬৩-২০৫
ষষ্ঠ অধ্যায়	
উনিশ শতকের গীতিকাব্যে স্বদেশ ভাবনা	২০৬-২৭৭
সপ্তম অধ্যায়	
উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে (উপন্যাস ও ছোটগল্প) স্বদেশ ভাবনা	২৭৮-৩৪১
অষ্টম অধ্যায়	
উনিশ শতকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা	৩৪২-৪০২
উপসংহার	৪০৩-৪০৭
গ্রন্থপঞ্জী	৪০৮-৪১৬

প্রাক্ কথন

কাগজে কলমে বাংলা সাহিত্যের বয়স হাজার বছরেরও বেশী। এই হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর আত্মপরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্যে সেই যুগ পরিপ্রেক্ষিতে প্রাচীন বাঙালীর আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় পরিচয় রয়েছে। মধ্যযুগীয় আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালীর ধর্ম, রাষ্ট্র ও সংস্কৃতির পরিচয় রয়েছে এবং আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর চিন্তা-চেতনার উৎকর্ষতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় আছে। ইতিহাসের তিন যুগ বিভাগের পরেও বাঙালীর ইতিহাসে উনিশ শতকের পৃথক একটি আবেদন রয়েছে। এই উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মতো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বজায় রাখার যোগ্যতা রাখে। প্রথম বিশ্বের নাগরিক ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয়গণ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশের মানুষ ক্রমশ আত্মসচেতন হয়। উনিশ শতকের শেষে বাঙালী ধর্ম, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানে পূর্ণ সচেতন হয়ে ওঠে। শুধু সচেতনতাই নয় — প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালী পৃথিবীর ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে স্বীকৃতি পায়। বাঙালীর এই চরম উন্নতি প্রসঙ্গে গোপালকৃষ্ণ গোখলের — 'What Bengal thinks today, India thinks tomorrow'— বক্তব্যে বাঙালীর চিন্তা জগতে দূরদর্শিতার কথা স্বীকৃত। এই দূরদর্শিতা সম্ভব হয়েছে যুগ চিন্তানায়কগণের উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনার প্রভাবে। বাঙালী কী করে সুখী ও সমৃদ্ধ হয় — এই বিষয়টি ছিল যুগ চিন্তানায়কগণের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সফল করতে দেশীয় ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সুশৃঙ্খল ও সমৃদ্ধ করার বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। কী করে জাতীয় জীবনের মানোন্নয়ন করা যায় সেই ভাবনা সবসময় যুগ চিন্তানাকগণের মনে বিরাজ করত। তাই এখানে স্বদেশ ভাবনা বলতে স্বদেশের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে উত্তরণের উদ্যোগকে নির্দেশ করা হয়েছে। এই স্বদেশ ভাবনার বিশেষ উপস্থিতির জন্যই উনিশ শতককে আলাদা করে আলোচনা করা যায়। সেকারণে উনিশ শতক বাঙালীর ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বাংলা সাহিত্য যথেষ্ট সমৃদ্ধ হয়। এই শতকের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি আমার গবেষণার আলোচ্য বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

স্নাতকোত্তরে পড়ার সময় বাঙালীর এরকম গৌরবময় শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হই। পরে বিভাগীয় অধ্যাপিকা ড: মঞ্জুলা বেরার সঙ্গে কথা বললে তিনি আমাকে এবিষয়ে উৎসাহিত করেন এবং এই কর্মপাগল অধ্যাপিকা তাঁর নিরলস তত্ত্বাবধানে আমার এই গবেষণার কাজ সম্পন্ন হয়।

এ কাজের জন্য উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার এবং পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার থেকে আমার গবেষণার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই গবেষণার কাজকে সফল করতে আমার বাবা সজনীকান্ত রায়, মা জ্যোৎস্না রায়, স্ত্রী মনোলীনা রায় (মায়া), ভাই দিলীপ, বোন শিবানী ও হিমানী আমাকে সবসময় উৎসাহ দিয়েছে। পরিশেষে যেসব বিশিষ্ট গুণীজনের পরামর্শ আমার কাজের পথকে সুগম করেছে, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।

বাঁকুড়া

২১ নভেম্বর ২০০৬ — নরেন্দ্রনাথ রায়

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্ উনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনা ও স্বদেশ ভাবনা

জাতির গৌরবময় ইতিহাস না থাকাকে বঙ্কিমচন্দ্র কলঙ্ক মনে করতেন। একথা ঠিক উনিশ শতকে পদার্পণের মুহূর্তে চৈতন্যদেব বা রঘুনন্দন মতো দু'একজনের ইতিহাস ব্যতীত বাঙালীর নিকট গৌরবের ইতিহাস ছিল না। বাঙালী সমাজে ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি, দর্শন, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম অবনতি দেখা গিয়েছিল। অথচ উনিশ শতকে এই বাঙালী ধর্ম, দর্শন, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করে। উনিশ শতকের শেষে দেশে এমনকি আন্তর্জাতিক স্তরে বাঙালী নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে। আমরা লক্ষ করব—স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৯৩) শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে দেশীয় হিন্দু ধর্মের গৌরব স্বীকৃতি আদায় করেন, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু উনিশ শতকেই বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা বঙ্গমায়ের গৌরব বৃদ্ধি করেন। এছাড়া উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ দেশের রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এই শতকেই বাংলা সাহিত্যও নব নব রূপ, রীতি ও রসে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। বলা যায়—রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্ম ভাবনামূলক কাব্যের দ্বারা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পান, উনিশ শতকে 'নৈবেদ্য' (রচনাকাল ১৩০৪ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যে তার সূত্রপাত। অতএব উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ তার সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে পৃথিবীর পটভূমিতে যোগ্যতা প্রমাণ করতে তৎপর হয়েছে। এই অধ্যায়ে দু'টি বিষয়কে স্পষ্ট করা হবে,যথা — উনিশ শতকে গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টির পূর্বে বাঙালীর কিরূপ অবস্থা ছিল ও প্রাক্ উনিশ শতকের সংকীর্ণ সমাজ চেতনার সঙ্গে উনিশ শতকের উদার সমাজ চেতনার পরম্পরার সূত্রটি স্পষ্ট করা।

আমরা প্রথমে প্রাক্ উনিশ শতকের সমাজ ভাবনার বিষয়ে আলোচনা করব। অর্থাৎ প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালী সমাজের প্রকৃত চিত্র কেমন ছিল তার স্বরূপ উদ্ঘাটন করা হচ্ছে। প্রশ্ন হতে পারে,সমাজ কি? পরস্পরের সহযোগিতায় বসবাসকারী সংঘকে সমাজ বলা যেতে পারে। মানব সমাজ বলতে মানুষের সংঘকে বোঝায়। অন্যের সঙ্গে ভালো ব্যবহার, বিপদগ্রস্তকে সাহায্য করার মতো নানা রীতি-নীতি সমাজে প্রচলিত আছে। এই রীতি-নীতিগুলিকে সমাজে বসবাসকারী প্রতিটি সদস্যকে মেনে চলতে হয়। কেননা, সমাজে একে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া চলতে পারে না। সে কারণেই মানুষ সমাজ গড়েছে। সমাজে ভালোভাবে বসবাস করার জন্য সমাজপতিদের ভাবনার অন্ত নেই। সেজন্য মানব সমাজ প্রচলিত রীতি-নীতিকে কঠোরভাবে পালন করে। কেননা এই সব রীতি-নীতি মানব সমাজ থেকে হারিয়ে গেলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, কঠোরভাবে প্রচলিত সামাজিক রীতি-নীতিকে পালন করতে গিয়ে অনেক

সময় সংকীর্ণতার পরিচয় পাওয়া যায়। নিরপেক্ষভাবে দেখলে মনে হয়, এই সংকীর্ণতাই সমাজের উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। প্রাক্ উনিশ শতকে সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতির অধিকাংশই ছিল সংকীর্ণ। যার মূল উদ্দেশ্য ছিল তুলনায় বলবান ও বুদ্ধিমান শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা। দেশীয় সমাজের উন্নতির প্রধান প্রতিবন্ধক এই সংকীর্ণ মানসিকতা। এই সময় ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-সংস্কৃতি বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এসেছে অবক্ষয়। উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের উদার শিক্ষালাভ করে রাজা রামমোহন রায়-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ জাতীয় জীবনের দুরবস্থা দূরীকরণে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতের মতো প্রাচীন সভ্য দেশে কি কারণে অধঃপতন নেমে এলো 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধে তার একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ব্যাখ্যা করেন। তিনি মনে করেন এদেশে সভ্যতা বিনাশের মূলে রয়েছে 'প্রকৃতি' ও এদেশেরই অতিউন্নত দর্শন। বঙ্কিমচন্দ্র দর্শন প্রসঙ্গে লিখেছিলেন;—

> "ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তালোচনায় সন্তোষ সম্বন্ধে অনেকগুলিন বিচিত্র তত্ত্ব পাওয়া যায়। ঐহিক সুখে নিস্পৃহতা, হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম উভয়কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত। কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরনীয়।" (১)

এদেশে ঐহিক সুখ নিন্দনীয় হওয়ায় মানুষ ঐহিক সুখ লাভে বিরত হয়। তাতে দেশের অধঃপতন ত্বরান্বিত হয়েছে। অতএব ভারতের দুরবস্থার মূলে দেশের প্রকৃতি ও উন্নত দর্শন উভয়ই সমান দায়ী। স্বদেশের সভ্যতার চরম উন্নতির পরেই যে অধঃপতন শুরু হয়েছিল, প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালীর অধঃপতন তার চূড়ান্ত রূপ।

আমাদের সমাজ ধর্মকেন্দ্রিক। এদেশ এক সময় ধর্ম বিষয়ে চরম উন্নতি প্রাপ্ত হয়েছিল। অথচ এই দেশে ধর্মের অপব্যাখ্যার দ্বারা মানুষ বেশী প্রভাবিত হল। প্রাক্ উনিশ শতকে এদেশে যা চূড়ান্ত আকার পেল। এই ধর্মীয় অপব্যাখ্যায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল নিম্নবর্ণের মানুষগুলি ও নারী সমাজ। মূল ধর্মের অনুশাসনের পরিবর্তে এদেশের উচ্চবর্ণ সম্প্রদায় নিম্নবর্ণ ও নারী সমাজের জন্য নতুন অনুশাসন প্রবর্তন করল। অশিক্ষিত নিম্নবর্ণ ও নারী সমাজ ধর্ম বা পূণ্য লাভের উদ্দেশ্যে উচ্চ বর্ণ নির্দেশিত আচার-আচরণ পালনে যত্নবান হয়। প্রাক্ উনিশ শতকে অধিকাংশ বাঙালী ধর্ম বলতে জাতপাত, পূজা-পার্বন, আচার-আচরণকেই মনে করত। ঐতিহাসিক ডঃ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এদেশের বারো মাসে তেরো পার্বণের একটি তালিকা দিয়েছেন। যথা;—

> "বৈশাখ—প্রাতঃ স্নান, ব্রাহ্মণকে জলঘটদান, মসূরসহ নিম্বপত্র ভক্ষণ, বিষ্ণুকে শীতলজলে স্নান করান।
>
> জ্যৈষ্ঠ—অরণ্যষষ্ঠী, সাবিত্রীব্রত ও দশহরা।
>
> আষাঢ়—চাতুর্মাস্য ব্রত।

শ্রাবণ—মনসাপূজা।

ভাদ্র—জন্মাষ্টমীব্রত ও অনন্তব্রত।

আশ্বিন—দুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা।

কার্তিক—প্রাতঃস্নান, দীপান্বিতায় দিনে উপবাস ও পার্বণশ্রাদ্ধ, সন্ধ্যায় পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে উল্কাদান প্রভৃতি; দ্যূতপ্রতিপদ, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

অগ্রহায়ণ—নবান্নশ্রাদ্ধ।

পৌষ—এই মাসে উল্লেখযোগ্য কোন অনুষ্ঠানের বিধান নাই।

মাঘ—রটন্তীচতুর্দশী, শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, মাঘী সপ্তমীতে প্রাতঃস্নান ও সূর্যোপাসনা, বিধানসপ্তমীব্রত, আরোগ্যসপ্তমীব্রত, ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মপূজা।

ফাল্গুন—শিবরাত্রিব্রত।

চৈত্র—শীতলাপূজা, বারুণীস্নান, অশোকাষ্টমী, রামনবমীব্রত, মদনত্রয়োদশী ও মদনচতুর্দশী তিথিতে পুত্রপৌত্রাদির সৌভাগ্য কামনায় এবং সমস্ত বিপথ হইতে ত্রাণলাভের আকাঙ্ক্ষায় মদনদেবের পূজা কর্তব্য। রঘুনন্দনের মতে, এই পূজায় মদনদেবের প্রীত্যর্থে অশ্লীল ভাষার প্রয়োগ বিধেয়।" [২]

প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ এইসব আচার-আচরণ, পূজা-পার্বণকে নিষ্ঠার সঙ্গে মেনে চলত। ধর্মপ্রাণ বাঙালীজাতি মনে করত এই সবই হল পূণ্য বা ধর্ম লাভের পথ। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ছিল ধর্মান্ধ। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্মান্ধতার বিষয়ে বলা হয়েছে;—

"দুইটি বিষয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। প্রথমতঃ, এই দুই সংস্কৃতিই ধর্মকেন্দ্রিক এবং দুইয়ের মধ্যেই ধর্মান্ধতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। উভয় সমাজেই প্রচলিত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানই ধর্মের স্থান অধিকার করিত—কোনরূপ যুক্তি-তর্ক বা ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বড় একটা ছিল না। হিন্দু সমাজে সতীদাহ, গঙ্গায় শিশুসন্তান বিসর্জন, চড়ক প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা এবং বিধবা-বিবাহ নিষেধ ও কৌলিন্যপ্রথার বিষময় ফল লোকে ধর্মের অঙ্গ বলিয়া বিনা বিচারে মানিয়া লইয়াছে, স্ত্রীলোকের অক্ষর পরিচয় হইলেই তাহাদের বৈধব্যদশা ঘটিবে ইহা বিশ্বাস করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই ভদ্রঘরের স্ত্রীলোকের কঠোর পর্দার ব্যবস্থা নির্বিচারে অনুসৃত হইয়াছে। হিন্দুদিগের প্রধান ধর্মোৎসব দুর্গাপূজা ধনীর গৃহে জাঁক-জমক, নৃত্য-গীত ও পান-ভোজনের উপলক্ষ মাত্রে পর্যবসিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই শিক্ষা ও জ্ঞানের গণ্ডী প্রায় ধর্ম বিষয়েই সীমাবদ্ধ ছিল।"[২]

উন্নত ও সমৃদ্ধ জীবনাচরণের জন্য প্রয়োজন নিরপেক্ষ মনোভাব, যুক্তি নির্ভরতা ও বিজ্ঞান মনস্কতার মতো ইতিবাচক গুণ। প্রাক্ উনিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজই যা থেকে অনেক দূরে থাকতো। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের মতো মুসলমান সম্প্রদায়ও অবনতির চরম সীমায় পৌঁছে যায়। ধর্মান্ধতার কারণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি ভেদাভেদ তৈরী হয়। উন্নত দেশ বা জাতি গঠনের পক্ষে যা মোটেই অনুকূল নয়।

প্রাক্ উনিশ শতকের হিন্দু বাঙালী সমাজ পূজা-পার্বণ, ব্রত উপাসনাকেই ধর্ম বলে মনে করত। এই আচার-আচরণ সর্বস্ব সমাজে নিরপেক্ষ, যুক্তিনির্ভর ও উদার চিন্তাচেতনার অস্তিত্ব ছিল না। উনিশ শতকেও হিন্দু ধর্মের মূল আদর্শ পরব্রহ্মের উপাসনা, সর্বভূতে দয়া, মহৎ ত্যাগ, নিষ্কাম কর্মের প্রতি উৎসাহ প্রভৃতি মহৎ নীতি ও উপদেশের চেয়ে আচার আচরণ রীতি-নীতি, পূজা-পার্বণই ধর্ম বলে পরিচিত ছিল। সে কারণেই রাজা রামমোহন রায় দেশের মানুষের ধর্মান্ধতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্ত সার' প্রভৃতি অনুবাদ করে বাঙালী সমাজে প্রথম ধর্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রচার করেন। আমরা লক্ষ করব — রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ প্রমুখ স্বদেশবাসীর ধর্ম বিষয়ে অজ্ঞতা দূর করার চেষ্টা করেন। বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত একটি চিঠিতে বলেন;—

> "এখনকার হিঁদুর ধর্ম বিচারমার্গেও নয়, জ্ঞানমার্গেও নয়— ছুঁৎমার্গে; আমায় ছুঁয়ো না, আমায় ছুঁয়ো না, বস। এই ঘোর বামাচার ছুঁৎমার্গে পড়ে প্রাণ খুইও না। 'আত্মবৎ সর্বভূতেষু' কি কেবল পুঁথিতে থাকিবে না কি?" (৪)

বিবেকানন্দ উনিশ শতকের শেষার্ধে বাংলার সমাজ চিত্রের কথা বলেছেন। মনে রাখতে হবে, এই সমাজকে রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখ সঠিক পথে চালিত করার চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ যুগচিন্তা নায়কের আবির্ভাবের পরেও আপামর বাঙালী সমাজ প্রকৃত ধর্মকে বুঝতে পারে নি। প্রাক্ উনিশ শতকে তাহলে আরো কত অজ্ঞতা ছিল—তা আজকে ভাবতে গেলে বিস্মিত হতে হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে — আমাদের সমাজ ধর্ম-কেন্দ্রিক। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের থেকে ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয় বেশী। এদেশে চরম অধঃপতন নেমে আসতে পারে ধর্মীয় আচরণে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলে। তবে ধর্মীয় জীবনাচরণ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। কিন্তু ধর্মীয় দর্শনের অপব্যাখ্যা সমাজে প্রচলিত হয়। এদেশের সাধারণ মানুষ শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যাকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছে। এখানে অবশ্যই প্রশ্ন হতে পারে, ধর্মকেন্দ্রিক দেশের মানুষগুলি শাস্ত্রীয় অপব্যাখ্যা নির্বিচারে গ্রহণ করল কেন? বলা যায়, কোন উপায় ছিল না। আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। যে শাস্ত্র পাঠ করে অর্থ গ্রহণ করে এমন ক্ষমতা সাধারণ মানুষের ছিল না। সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা ও সরলতার সুযোগ নিয়ে উচ্চবর্ণের পণ্ডিতকুল স্বেচ্ছাচারী হয়। অর্থাৎ

প্রাক্ উনিশ শতকে শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ বেড়ে যায়। ভেদাভেদ বা বৈষম্য ছিল উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে এবং পুরুষ ও নারীতে। মানুষের অধিকারের ক্ষেত্রে বৈষম্য প্রাক্ উনিশ শতকে প্রকট হয়ে ওঠে। বর্ণবৈষম্যের বিষয়ে 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে বলা হয়েছে;—"হিন্দুসমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। এই চারিবর্ণের জন্যই বঙ্গীয় স্মৃতিনিবন্ধসমূহে বিধিনিষেধ লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই যে, জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্য স্থাপনের প্রয়াস স্মৃতিনিবন্ধগুলির পাতায় পাতায় রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ উচ্চতম বর্ণ।" (৫) প্রাক্ উনিশ শতকে এই বর্ণবৈষম্য প্রথা নির্বিরোধে মেনে চলা হত। অথচ প্রাচীনকালে এই বর্ণবৈষম্য বা জাতিভেদ প্রথা ছিল না। রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থে 'মনুসংহিতা'র শ্লোক উদ্ধার করে লিখেছেন;—

"শূদ্রো ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতিশূদ্রতাং।
ক্ষত্রিয়াজ্জাতমেবনন্তু বিদ্যাৎবৈশ্যাত্তথৈবচ।।" (৬)

অর্থাৎ শূদ্রও ব্রাহ্মণ হয় এবং ব্রাহ্মণও শূদ্র হয়, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম। অতএব প্রাচীন ভারতে উচ্চ বর্ণের সন্তান কর্মগুণের অভাবে শূদ্র হত এবং শূদ্র সন্তানও কর্মগুণে ব্রাহ্মণ হতে পারত। সমাজে উচ্চবর্ণের পদ লাভ করার জন্য একটি প্রতিযোগিতা ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। বলা যায়, ভারতবর্ষের অবনতির অন্যতম একটি কারণ এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এই প্রতিযোগিতার অভাবে প্রাক্ উনিশ শতকে এদেশ চরম অধঃপতন দশা প্রাপ্ত হয়।

নারী পুরুষের তুলনায় দুর্বল। অতএব নিম্নবর্ণের মতো নারীও তুলনায় বলবান ও বুদ্ধিমান পুরুষ সমাজের দ্বারা নির্যাতিত হয়। বুদ্ধিমান পুরুষ সমাজ ধীরে ধীরে নারীর সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নেয়। এবিষয়েও 'বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাক্ উনিশ শতকের নারীর স্থান বিষয়ে লিখেছেন —

> "বৈদিক যুগে শাস্ত্রাদির চর্চা এবং ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি কিছুতেই নারীর অধিকার পুরুষের তুলনায় কম ছিল বলিয়া মনে হয় না। বেদে বহু ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী-ঋষির নাম ও তাঁহাদের নামাঙ্কিত সূক্তাদি পাওয়া যায়। উপনিষদেও বিদুষী মহিলাগণ পুরুষগণের সঙ্গে শাস্ত্রীয় বিচারাদিতে অংশ গ্রহণ করিতেন বলিয়া জানা যায়। পরবর্তীকালে কিন্তু এই সকল ব্যাপারে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'মনুসংহিতা'তেই বলা হইয়াছে যে, নারীর পৃথক্‌ভাবে করণীয় কোন যাগযজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই; একমাত্র পতিসেবাই তাঁহার পরম ধর্ম এবং পতি ভিন্ন তাঁহার যেন কোন সত্তাই নাই।" (৭)

সমগ্র মধ্যযুগ ধরে মনুসংহিতার নির্দেশিত পথে পুরুষ নারীকে দাসীতে রূপান্তরিত করেছিল। প্রাক্ উনিশ শতকে এই প্রথা অপরিবর্তিত থাকায়— নারী চরম নির্যাতিত হয়েছিল। শুধু তাই নয়—পুরুষের বহুবিবাহ

প্রথা, নারীর বাল্যবিবাহ প্রথা, সতীদাহ প্রথা প্রভৃতি ভয়ঙ্কর ও বর্বর প্রথার দ্বারা নারী অত্যাচারিত হত। সে জন্যই উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন।

সমাজে ধর্ম বিষয়ে, জাতিভেদ বিষয়ে, নারী বিষয়ে যে প্রথা প্রচলিত হয়েছিল— সেগুলি প্রাক্ উনিশ শতকে কঠোরভাবে পালন করা হত। যে সমাজ ধর্ম বিষয়ে, বর্ণভেদ বিষয়ে বা নারী বিষয়ে সংকীর্ণ প্রথা প্রচলন করে, সেই সমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প বিষয়ে ভাবার অবকাশ পায় নি। সমাজে যারা শ্রমোপজীবী তারা অক্লান্ত কায়িক শ্রমের দ্বারা কোনরকমে জীবনধারণ করত। এবং যারা উচ্চবিত্ত, তারা ভোগবিলাসে মগ্ন হত। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি চর্চার মতো মহৎ কর্মে আত্মনিয়োগ করলে যে মানসিক পরিশ্রমের প্রয়োজন, তা এদের ছিল না। ফলে প্রাক্ উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে অনিবার্যভাবে ঘোর অন্ধকার নেমে আসে।

এখন প্রশ্ন, উনিশ শতকের গোড়া থেকে স্বদেশের ধর্ম, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যাঁরা আত্ম-উন্মোচনের প্রয়াস করেছিলেন, উনিশ শতকে তাঁদের আবির্ভাব কিভাবে সম্ভব হয়েছে। অন্যভাবে বলা যায় প্রাক্ উনিশ শতকের ধারাবাহিক ধর্মান্ধতার মধ্যে উনিশ শতকে আকস্মিকভাবে উদার ও নিরপেক্ষ চিন্তা চেতনার প্রকাশ কি ভাবে সম্ভব হল।

এদেশের অধিকাংশ মানুষই অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত — যারা রাজনীতি ও অন্যান্য মানসিক পরিশ্রম বিষয়ক সূক্ষ্ম চিন্তাশীল বিষয় থেকে দূরে থাকত। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' নামক প্রবন্ধে দেখিয়েছেন, এর ফলে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অবনতি এসেছে। মধ্যযুগের অন্তিমেও বাংলা দেশের সাধারণ প্রজাদের এই চেতনাহীনতা ও দুর্বলতার সুযোগে দেশীয় অভিজাত ও রাজপুরুষেরা স্বেচ্ছাচারী এবং ভোগলিপ্সু হয়ে উঠে। যা সহজলভ্য তাকে পাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করা বৃথা। বলা যায় এদেশের প্রজাদের সরলতার জন্যই দেশীয় রাজপুরুষ ও অভিজাত সমাজ স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক কারণে তারা অনায়াসেই ভোগ, লিপ্সা, অপশাসন ও অবক্ষয়ের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে যায়। 'বাংলা দেশের ইতিহাস' গ্রন্থে বলা হয়েছে;—

> "পলাশির যুদ্ধের সময় মুসলমান নবাবদের রাজ্যশাসন প্রথা এবং দরবারের সামাজিক ও ব্যক্তিগত দুর্নীতি অবনতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছিল। রাজকর্মচারীরা প্রায় সকলেই অযোগ্য ও অসৎ এবং রাজ পরিবারের অধিকাংশের অবস্থাও প্রায় তদ্রূপই ছিল। ...বিলাস ব্যসন ও ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই নবাব ও তাহাদের অনুচরদের একমাত্র কাম্য ছিল — নারী ও সুরাই ছিল তাহাদের নিয়ত সঙ্গী। সিরাজউদ্দৌল্লা, মীরণ প্রভৃতির প্রকৃতি এমন ছিল যে রাজ্যের সম্ভ্রান্ত লোকেরাও সর্বদাই ভয়ে তটস্থ

থাকিত। ফলে সৈন্যরা ছিল অপদার্থ ও অকর্মণ্য এবং নবাবের বিরুদ্ধে অহরহ ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহ লাগিয়াই ছিল।...নবাব দরবারের এই কলুষতা যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজকেই কতকটা দূষিত করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" [৮]

অষ্টাদশ শতকের গোড়ায় (১৭০৭) ভারবর্ষের শেষ শক্তিশালী বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতা ক্রমশ প্রকাশ পায়। সাম্রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই দেখা দেয় অরাজকতা, অসন্তোষ ও বিদ্রোহ। অষ্টাদশ শতকে এরকম রাজনৈতিক সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে ইউরোপীয় বণিক জাতি জমিয়ে বাণিজ্য করে চলছিল। কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন স্বার্থান্বেষী ইউরোপীয় বণিক অচিরেই বুঝতে পারে — এদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করা খুব কঠিন নয়। দেশীয় সমাজের এই কলুষতা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ জাতি ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম বড় কারণ।

অবশ্য ভারতের মত একদা ইউরোপেও মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা ছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে নবজাগরণের ফলে অনেক দিন আগেই ইউরোপ অচল প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনার গুটি কেটে বেরিয়ে প্রগতিশীল ভাবনাকে স্বাগত জানিয়েছিল। আর তাই অনেকেই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি চর্চা করেছিলেন। কেউবা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের নেশায়, আবার কেউ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য উপনিবেশ সৃষ্টি করে পৃথিবীতে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যায়, ইউরোপে রেনেসাঁর অনেক আগে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ৩২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ভারত অভিযান করেন। তারপর বিভিন্ন কারণে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের স্থলপথে সরাসরি যোগাযোগ ছিন্ন হয়। কিন্তু নবজাগরণের নতুন উদ্যোমে নাবিক ভাস্কো-দা-গামার চেষ্টায় জলপথেও ভারত আবিষ্কৃত (১৪৯৮) হয়। নবজাগরণের ফলে সমগ্র ইউরোপের বিভিন্ন জাতির মনে বাণিজ্যের দ্বারা অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সহজতম কৌশলটি পেয়ে বসে। ফলে পোর্তুগীজদের পর একে একে ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মতো ভারতেও আসে। এইসব ইউরোপীয়রা বুঝেছিল, পৃথিবীর অন্যতম সার্বভৌম শক্তি হল—অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এই সার্বভৌম শক্তিকে অর্জন করতে ইংরেজ ও ফরাসী জাতির মনোমালিন্য চোখে পড়ার মতো। কিন্তু বিভিন্ন কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে ফরাসীরা পিছিয়ে পড়লে পৃথিবীর অন্যান্য প্রান্তের মতো এদেশেও ইংরেজ জাতি প্রতাপশালী হয়ে উঠে। এবং সেই সঙ্গে বাংলা তথা ভারতের দীর্ঘদিনের সংকীর্ণতায় পরিপূর্ণ নবাব-বাদশার শাসনের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার একটি পথ তৈরী হয়।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে—এদেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে মাথা ঘামাতো না। দেশের অন্যান্য অংশের মত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের রাজকীয়কার্যে ও রাজনীতিতে খুব সামান্য কয়েক জন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছিল। এই সময়ে তরুণ নবাব সিরাজদ্দৌলার প্রতি অনেকেই

অসন্তুষ্ট হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলা বয়সে নবীন, চরিত্র ছিল অনেকটা ভোগলিপ্সু বিলাসী ও দাম্ভিক প্রকৃতির। সিরাজের আত্মীয় পরিজন অনেকেই তাঁর রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভে ঈর্ষান্বিত ও অনিষ্ট কামনায় মত্ত। সিরাজদ্দৌলা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন —

> "কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদের মাতামহের কাছে থাকিতেন। তাঁহার জন্মের পরেই আলীবর্দী বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সুতরাং এই নবজাত শিশুকেই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল কারণ মনে করিয়া তিনি ইহাকে অত্যধিক স্নেহ করিতেন। তাঁহার আদরের ফলে সিরাজের লেখাপড়া কিছুই হইল না, এবং বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দুর্দান্ত, স্বেচ্ছাচারী, কামাসক্ত, উদ্ধত, দুর্বিনীত ও নিষ্ঠুর যুবকে পরিণত হইলেন। কিন্তু তথাপি আলীবর্দী সিরাজকেই নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিলেন। ...ঘসেটি বেগম ও শওকৎজঙ্গ উভয়েই সিরাজের সিংহাসনে আরোহণের বিরুদ্ধে ছিলেন।" (৯)

সিরাজের সিংহাসন লাভকে আত্মীয়-পরিজন মেনে নিতে পারে নি। এরকম একটি বিপদসঙ্কুল পরিবেশে সিরাজদ্দৌলার অহং-ভোগলিপ্সু-বিলাসী চরিত্র তার চারপাশে একটি বিরোধী মঞ্চ গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। যা এদেশে পাশ্চাত্য শাসনের গোড়াপত্তনে একটি কারণ বলে বিবেচিত হতে পারে।

এই বিরোধী মঞ্চে আর একটি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সে সমাজ হল দেশীয় হিন্দু অভিজাত বা মধ্যবিত্ত সমাজ। এই সমাজ দেখল মুসলিম অভিজাত সমাজ অপেক্ষা এমনকি নবাব অপেক্ষা বিদেশী বণিকদের বৈভব ও প্রতিপত্তি অনেক বেশী। সামান্য বণিক হয়েও এরা অনেক বেশী সুশৃঙ্খল। এরা বিভীষিকাময় বর্গী আক্রমণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। এমনকি নবাবের অদেশকে বিনা বিবেচনায় মেনে নেয় না, প্রয়োজনে অমান্য করার সাহস দেখায়। এইসব নানা কারণে ইংরেজ বণিকদের প্রতি মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজ ক্রমশ আকৃষ্ট হতে থাকে। নবাবের বিকল্প শাসক হিসাবে বণিকদের গ্রহণ করতে এদের অনেকের দ্বিধা হয় নি। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেন —

> "বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। ...এইরূপ মনোভাব কেবল মুষ্টিমেয় হিন্দু নেতা ও অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। হিন্দু বাঙ্গালী জনসাধারণও উনিশ শতকে এই মতই দৃঢ়ভাবে পোষণ করিত।" (১০)

এর একটি সুদূরপ্রসারী কারণ রয়েছে। অধিকাংশ বাদশাহদের নিজস্ব সংস্কৃতিতে গভীর আস্থা ছিল। পাশাপাশি ভিন্ন সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষভাব থাকায় হিন্দু সম্প্রদায় দীর্ঘদিন ধরেই অসন্তুষ্ট ছিল। বৃটিশ রাজত্বে সন্তুষ্ট প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর মনে করতেন;— "হিন্দুদের সর্ববিধ দুঃখ দুর্দশা ও অবনতির মূল কারণ মুসলমান রাজ্যশাসন

নীতি।"[১১] এজাতীয় মনোভাব শুধু দ্বারকানাথ ঠাকুর নামক একজন ব্যক্তির নয়, উনিশ শতকের অনেক সচেতন ব্যক্তি এজাতীয় মনোভাব ব্যক্ত করতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর বা রামমোহন রায় উনিশ শতকের প্রথমার্ধের মানুষ। ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অর্ধশত বৎসরের মধ্যে এঁদের জন্ম। ইংরেজ রাজত্বের অর্ধশত বছরের পরেও এঁরা মধ্য যুগের শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তাহলে প্রত্যক্ষভাবে যারা মধ্যযুগের মুসলিম শাসনে ছিলেন, মধ্যযুগীয় সংকীর্ণ শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের মনোভাবের খুব একটা প্রভেদ হবে বলে মনে হয় না। অতএব অষ্টাদশ শতকের সচেতন মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী নবাব-বাদশার শাসনের অবসান চাইবেন—এটা অস্বাভাবিক নয়।

বলা যায়, এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মূলে নবাব সিরাজদ্দৌলা যেমন দায়ী তেমনি তাঁর আত্মীয়-পরিজন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত অধিকাংশ রাজকর্মচারীর ষড়যন্ত্র ও বিদেশী বণিকদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে মুগ্ধ একটি হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সমর্থন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব থেকে উক্ত হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার যে অধ্যায় সূচিত হয়েছিল, রাজত্ব প্রাপ্তির পর সেই সহযোগিতা আরো পূর্ণ উদ্যোমে চলতে লাগল। এবার কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকায় মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় ইংরেজ বণিক রাজাদের স্বাগত জানিয়ে বাণিজ্য, রাজস্ব ও শাসন ব্যবস্থার অন্যান্য ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। এবং এরা হয়ে উঠল বৃটিশরাজ সমর্থন পুষ্ট নাগরিক সমাজ। পাশাপাশি মুসলিম মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় প্রথম দিকে বণিক রাজাদের আন্তরিকভাবে মেনে নিতে না পারায় পাশ্চাত্য শিক্ষা, সংস্কৃতি, বাণিজ্য সর্বোপরি আধুনিক জীবনকে বয়কট করে পিছিয়ে পড়তে লাগল। অর্থাৎ উনিশ শতকের পূর্বেই হিন্দু সমাজের একটি অংশ ও বণিক রাজার পারস্পরিক সহযোগিতার ফলে হিন্দু সম্প্রদায় থেকে বুর্জোয়া শ্রেণী, জমিদার শ্রেণী এবং শিক্ষিত ও সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়। ডঃ অতুল সুর এবিষয়ে লিখেছেন;—

> "সেদিন ইংরেজ একদিকে যেমন বাঙলার গ্রামগুলিকে হীন ও দীন করে তুলেছিল অপরদিকে তেমনই নগরে এবং তার আশেপাশে গড়ে তুলেছিল এক নূতন সমাজ। সে সমাজের অঙ্গ ছিল দেওয়ান, বেনিয়ান, ব্যবসাদার, ঠিকাদার,দালাল, মহাজন, দোকানদার, মুনসী, কেরানী প্রভৃতি শ্রেণী। বস্তুত অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙলার সমাজজীবনে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। শহরে গড়ে ওঠে এক নতুন সমাজ, যার নাম হয় মধ্যবিত্ত সমাজ। কলকাতা শহরই এই সমাজের কেন্দ্রমণি হয়ে দাঁড়ায়। শহরটা এই রূপান্তরিত সমাজেরই যাদুঘরে পরিণত হয়। এই সমাজের শীর্ষে আবির্ভূত হয় মুষ্টিমেয় ধনী, যাদের 'বাবুসমাজ' বল হত, যারা রাত্রে নিজ গৃহে থাকাটা মর্যাদার হানিকর মনে করত ও রাত্রিটা বারবনিতার ঘরে কাটাত, আর নীচের দিকে ছিল সাধারণ লোক—সাহেবরা যাদের বলত "ভদ্দর লোক"। এই সমাজের শীর্ষে বিলাসিতা ও জাঁকজমকে মত্ত হয়ে থাকল ধনীরা, আর সাধারণ লোক

> মুদ্রাযন্ত্রের প্রসার ও শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে শহরে এক শিক্ষিত শ্রেণী হয়ে দাঁড়াল। এই শিক্ষিত শ্রেণীই প্রতিবাদ জানাল সামাজিক বিকৃতি, ধর্মীয় কুসংস্কার ও অন্ধ মূঢ়তার বিরুদ্ধে। সহমরণ বন্ধ হয়ে গেল (১৮২৯), বিধবাবিবাহ পেল আইনের স্বীকৃতি (১৮৫৬), সাগরমেলায় শিশুবলি দেওয়া রুদ্ধ হয়ে গেল (১৮৩০), দাসদাসীর হাট উঠে গেল (১৮৪৩), ও নানারূপ সামাজিক সংস্কার ও উন্নতি সাধনের ফলে সমাজ মুক্ত হল নানারূপ অপপ্রথা ও কুসংস্কারের নাগপাশ থেকে।" [১২]

এখানে জানা গেল, ইংরেজ বণিক রাজাদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় থেকে 'বাবুসমাজ' ও 'ভদ্দরলোক' নামে নতুন একটি নাগরিক সমাজ সৃষ্টি হয়েছিল। এদের মধ্যে ভদ্রলোক নামে নাগরিক সমাজটি আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে স্বদেশের অধঃপতিত, স্থবির ও স্তব্ধ জীবনকে উন্নত ও গতিদান করতে এগিয়ে এলো। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে এঁরা ধর্ম, সমাজ, দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে সুপথে চালিত করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন, বাঙালীর স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি কি পাশ্চাত্য শিক্ষালাভের ফল? প্রাক্ উনিশ শতকে কি স্বদেশ ভাবনার অস্তিত্ব ছিল না? আমরা বলব, বাঙালীর স্বদেশ ভাবনার রূপ দু'টি। যথা;—প্রাক্ উনিশ শতকীয় স্বদেশভাবনা বা আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনা ও উনিশ শতকীয় স্বদেশ ভাবনা বা বাঙালীর আত্ম-জাগরণ প্রভাবিত স্বদেশ ভাবনা। জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করতে বা স্বদেশে মানবসম্পদ বৃদ্ধি করতে শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালীর যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা, তাকে উনিশ শতকীয় স্বদেশ ভাবনা বলা চলে। দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে অষ্টম অধ্যায় পর্যন্ত এই বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। অতএব এখানে শুধুমাত্র প্রাক্ উনিশ শতকীয় স্বদেশ ভাবনা বা বাঙালীর আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে। বাঙালীর আত্মরক্ষা মূলক স্বদেশ ভাবনা প্রাক্ উনিশ শতকেরই ভাবনা। এখন প্রশ্ন, প্রাক্ উনিশ শতক বলতে কোন সময়কাল ধরা হয়েছে? প্রাক্ উনিশ শতক বলতে যদি প্রাচীন যুগ ও সমগ্র মধ্যযুগকে নির্দেশ করি, তাহলে বাঙালীর আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনাটি আরো স্পষ্ট হবে।

নরেন্দ্র শশাঙ্কের (খ্রীষ্টিয় ৬০৬—৬৩৭) মৃত্যুর পরে প্রাচীন বাঙালী সমাজে রাজনৈতিক ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। সেই সুযোগে দেখা দেয় অরাজকতা। কিন্তু এভাবে একটি রাজ্য বেশীদিন চলতে পারে না। প্রজা সাধারণ নিজেরা শান্তিতে বসবাস করার জন্য গোপালকে শাসক হিসাবে নির্বাচন করে। এবিষয়ে ডঃ অতুল সুর লিখেছেন;—"প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক নির্বাচিত গোপাল (৭৫০—৭৭০)।" [১৩] নির্বাচিত শাসকের সুশাসনে সে যাত্রায় বাঙালী সমাজ রক্ষা পায়। প্রসঙ্গত অতুল সুরের লেখা 'বাঙলার রাষ্ট্রীয় ইতিহাস' রচনাটির কথা মনে পড়ে। তাঁর ভাষায়;—

"অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায়ের হাত থেকে বাঙলাদেশকে রক্ষা করেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপালের সময় থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে মদনপালের সময় পর্যন্ত পালবংশই বাঙলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল। একই রাজবংশের ক্রমান্বয়ে চারশ বছর রাজত্ব করা ভারতের ইতিহাসে এক অসাধারণ ঘটনা।" [১৪]

অতএব জনসাধারণের দ্বারা গোপালের নির্বাচনকে আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনা বললে অতিশয়োক্তি হবে না। এদিকে মধ্যযুগেও তুর্কি আক্রমণের পরে বাংলায় অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। তুর্কি আক্রমণের ফলে এদেশ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল, সে বিষয়ে অতুল সুর লিখেছেন;—

"সেনবংশের লক্ষ্মণসেনের আমলেই বাঙলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হয়। তারই সঙ্গে আরম্ভ হয় বাঙলায় বিপর্যয়ের যুগ। মূর্তি ও মঠ-মন্দির ভাঙা হয়। হিন্দুদের ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হয়। আর শুরু হয় ব্যাপকভাবে নারীধর্ষণ। এটাই ছিল ধর্মান্তর-করণের প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে আর হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হত না। হিন্দুসমাজ এ সময় প্রায় অবলুপ্তির পথেই চলেছিল।" [১৫]

সে দিন স্বদেশ হিতৈষীগণ ভাবলেন কি উপায়ে দেশ ও দেশীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করা যায়। এই ভাবনার শীর্ষব্যক্তি শ্রীচৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩)। তিনি আবির্ভূত হয়ে মানবতার বাণী প্রচার করে দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করলেন। 'শ্রীচৈতন্য ও সামাজিক বিস্ফোরণ' প্রবন্ধে অতুল সুর বলেন —

"তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল বাঙালীর সমাজজীবনের এক অতি সঙ্কটময়কালে। ...তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, হিন্দুসমাজকে এই অত্যাচার ও অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য চাই হিন্দুর মনে আত্মপ্রত্যয়ের সঞ্চার। উপলব্ধি করেছিলেন এই আত্মপ্রত্যয় সঞ্চারের একমাত্র উপায় এক বৈষ্ণবগোষ্ঠী গঠিত করে হরি সংকীর্তন দ্বারা জনসাধারণের মনে ঈশ্বর প্রেমের উন্মাদনা সৃষ্টি করা। সেজন্য তিনি গঠিত করেছিলেন এক ঈশ্বরপ্রেমী বৈষ্ণবগোষ্ঠী। ...সাম্যবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত চৈতন্যের ধর্মে জাতিভেদ ছিল না। জাতিভেদ প্রথাই হিন্দুসমাজকে অবক্ষয় ও বিচ্ছিন্নতার পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। ...চৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মই বাঙালী জাতির প্রথম জাগরণ। বাঙালীর চিন্তাধারাকে চৈতন্যের ধর্মই প্রথম আধুনিকতার দিকে প্রবাহিত করেছিল।" [১৬]

বলাবাহুল্য, মানবতার বাণী প্রচারের দ্বারা দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করা চৈতন্যদেবের মহৎ ও বৃহৎ স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

বাঙালী সমাজের আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনার আরো একাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। ঔপনিবেশিক নীতির অন্যতম বিষময় ফল অর্থনৈতিক শোষণ। পলাশির যুদ্ধের (১৭৫৭) পর বাংলার নবাবের হাত থেকে

ক্ষমতালাভ করে ইংরেজ বণিক রাজারা অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে শোষণ ব্যবস্থা কায়েম করে। প্রথমেই এরা দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা (১৭৬৫) প্রবর্তন করে শোষণের মাত্রাকে শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। এদের প্রবর্তিত শাসন ব্যবস্থায় গ্রামকেন্দ্রিক বা গ্রাম্য সমাজের আত্মনির্ভরতা ধ্বংস হয়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশীয় কৃষক ও শিল্পী সমাজ। বক্তব্যের সমর্থনে অতুল সুরের 'বিদেশী বণিক ও বাঙালীর সমাজ' প্রবন্ধের রচনাংশ উল্লেখ করা যায় —

> "দেওয়ানী পাবার পর ইংরেজরা বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে বাঙলার শিল্পসমূহকে ধ্বংস করে এদেশকে কাঁচামালের আড়তে পরিণত করতে। দেওয়ানী পাবার মাত্র চার বছর পরে ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ মার্চ তারিখে কোম্পানির বিলাতে অবস্থিত ডিরেকটররা এখানকার কাউনসিলকে আদেশ দেয়—'বাঙলার রেশম-বয়ন শিল্পকে নিরুৎসাহ করে মাত্র রেশম তৈরির ব্যবসায়কে উৎসাহিত করা হোক।' শীঘ্রই অনুরূপ নীতি তুলাজাত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা হয়। ইংরেজ এখান থেকে কাঁচামাল কিনে বিলাতে পাঠাতে লাগে। আর সেই কাঁচামাল থেকে প্রস্তুত দ্রব্য বাঙলায় এনে বেচতে লাগে। বাঙলা ক্রমশ গরীব হয়ে পড়ে।
>
> কৃষিনির্ভর হয়ে পড়ায় বাঙলার জনগণের জীবন দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়ায়। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি ও বন্যা তো এখানে লেগেই আছে, সুতরাং যে বৎসর ভাল শস্য উৎপাদন হত না, সে বৎসর লোককে হয় অনশন, আর তা নয় তো দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হতে হত।" (১৭)

বিদেশী শাসকের এ জাতীয় দায়িত্ব জ্ঞানহীন শোষণ ও শাসনের ফলে সম্পদ পাহাড়ী নদীর মতো এদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডে যেতে লাগল।

অতএব বণিক রাজপুরুষদের শাসন ব্যবস্থা প্রথম থেকেই কলঙ্কমুক্ত ছিল না। তারই ফলে বৃটিশ রাজত্বের প্রথম দিকে অষ্টাদশ শতকে মাঝে মাঝে অশান্তি দেখা গিয়েছিল। এদেশে বণিক রাজত্বের প্রথম থেকে কিছু দেশীয় হিন্দু বাঙালী যারা ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিল, পরবর্তীকালে তারা এবং শাসন কার্য পরিচালনায় অংশগ্রহণকারী আধো ইংরেজী জানা দেশীয় হিন্দু বাঙালী অতি সম্পদশালী হওয়ায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া [কোম্প]ানীর রাজত্বের বিরোধিতা করে নি। এরা বণিক রাজাদের সুদিনে-দুর্দিনে পাশে ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এইসব দেশীয় মধ্যবিত্ত সমাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের বিরোধিতা না করলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অগণিত কৃষক ও শ্রমিক শোষক বৃটিশ রাজপুরুষের বিরোধিতা করেছিল। অর্থাৎ উনিশ [শ]তকের আগেই শিক্ষিত ও সচেতন সমাজের সমর্থন ও সহযোগিতা ছাড়াই শোষিত কৃষক ও শিল্পী সমাজ আত্মরক্ষার তাগিদে বিদ্রোহী হয়েছিল।

বৃটিশ বণিকরাজের কল্যাণে যখন একদিকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে একটি নতুন নাগরিক মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি হয়, ঠিক এমন সময় বণিক রাজপুরুষদের শোষণে কুটীর-শিল্পী ও আপামর কৃষকের দেওয়ালে

পিঠ ঠেকে। ১১৭৬—এর দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক তৃতীয়াংশ মানুষের মৃত্যু হয়। এটা আর কিছু নয়— সম্পূর্ণ বৃটিশ বণিক রাজের অমানবিক শোষণের ফল। এই মন্বন্তরের পটভূমিতে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩—১৮০০) ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। যারা গ্রামের স্বয়ং-সম্পূর্ণ অর্থনীতিতে এতদিন বসবাস করত, তারাও পেটের দায়ে সন্ন্যাসীর দলে যোগ দিয়ে বিদ্রোহের মাত্রাকে শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। প্রাক্ উনিশ শতকেই বাংলায় আরো অনেক জায়গায় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অথবা তার কর্মচারী কিংবা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিযুক্ত জমিদার প্রভৃতির শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয়। যেমন;—চাক্‌মা বিদ্রোহ (১৭৭৬—১৭৭৭) কার্পাস কর দেবার প্রতিবাদে সংঘটিত হয়। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণার কৃষকরা সংঘবদ্ধ হয়ে স্থানীয় শাসক নির্বাচন করে। এই শাসক অনেক জনহিতকর কাজ করেছিল। এছাড়া মেদিনীপুরের ঘরুই বিদ্রোহ (১৭৭৩), গারো হাজরাদের হাতিখেদা বিদ্রোহ (১৭৯৯), অষ্টাদশ শতকের শেষে নদীয়ায় তাঁতীদের উপর ইংরেজ বণিকের অত্যাচার ও শোষণের ফলে তন্তুবায় বিদ্রোহ (১৭৭৮) প্রভৃতি। অতএব অষ্টাদশ শতকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজপুরুষদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অমানবিক শোষণ-শাসনে অত্যাচারিত কৃষক ও শিল্পী সমাজই প্রতিবাদ জানিয়েছিল, আত্মরক্ষার তাগিদে। সুতরাং বলা যায়, অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের প্রথম দিকে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মধ্য থেকে আত্মরক্ষামূলক স্বদেশ ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়।

অতএব বলা যায় প্রাক্ উনিশ শতকে বাঙালী সমাজ ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সমাজে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, নারী-পুরুষে ভেদাভেদ, ধর্ম আচার-আচরণ সর্বস্ব ও শাসকের ভোগবিলাস, অমানবিক শোষণ এবং নিপীড়ন, জ্ঞান-বিজ্ঞান চেতনাহীন এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাঙালী কোনরকমে বেঁচে ছিল। ঠিক এমন সময় উনিশ শতকের মধ্যভাগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ ইংরেজ জাতি এদেশের ভাগ্যনিয়ন্তা (১৭৫৭) হয়। সঙ্গে সঙ্গে এদেশের হিন্দু সমাজের মধ্য থেকে কেউ কেউ পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান জেনে স্বদেশের অধঃপতন রোধের পরিকল্পনা করেন। এই সংকীর্ণ সমাজে একে একে আবির্ভূত হন রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ প্রমুখ যুগচিন্তা নায়কগণ। এঁদের আবির্ভাবে রচিত হয় নতুন যুগে বাঙালীর নতুন ইতিহাস।

আমরা বলব এই সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি পটপরিবর্তনের ফলে এদেশের চিরাচরিত সংকীর্ণতা মোচনের একটা সম্ভাবনা তৈরী হয়। এই সম্ভাবনার অমর সাক্ষী উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য। বাংলা সাহিত্য তার মহৎ ও বৃহৎ কর্তব্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে রস, রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে এক বড় পরিবর্তন পায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে মূলত পয়ার-ত্রিপদীধর্মী ছন্দের শৃঙ্খলে কাব্য সাহিত্য চর্চা ও ধর্ম নির্ভর কাব্য সাহিত্য চর্চার স্থানে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, নাটক, সাহিত্যিক মহাকাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প আধুনিক সাহিত্যের নানা প্রকরণ ও ক্রমশ

মানবকথায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। উনিশ শতকে উল্লিখিত প্রত্যেক সাহিত্য প্রকরণে বাঙালী জীবনের মানোন্নয়নের একটি উদ্যোগ চোখে পড়ে। জাতীয় জীবনের মানোন্নয়নের এই উদ্যোগকে আমরা 'উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' বলতে চেয়েছি। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার অনুসন্ধান করা হবে।

উল্লেখপঞ্জী

১। বঙ্গদেশের কৃষক, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড,সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ— দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৬২।

২। ধর্ম ও সমাজ, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২৪২-২৪৩।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫

৪। স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত পত্র, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ), প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন, ১৪০৪, নবপত্র প্রকাশন, পৃ: ৮৫৮।

৫। ধর্ম ও সমাজ, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২৪৬-২৪৭।

৬। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ৪২৯।

৭। ধর্ম ও সমাজ, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২৪৮।

৮। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিকযুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮৮, (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, পৃ: ১১২।

৯। নবাবী আমল, বাংলা দেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক — শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১৫৯।

১০। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিকযুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮৮, (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, পৃ: ৪৯৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯৯।

১২। বিদেশী বণিক ও বাঙালীর সমাজ, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত), ডঃ অতুল সুর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক, পৃ: ২৮২।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

১৫। গৌড়চন্দ্রিকা, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত), ডঃ অতুল সুর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক, পৃ: ১২।

১৬। শ্রীচৈতন্য ও সামাজিক বিস্ফোরণ, বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, ডঃ অতুল সুর, First Published : ১৯৯০, B. S. ১৩৯৭, Reprinted : ১৯৯১, B. S. ১৩৯৮, জ্যোৎস্নালোক, পৃ: ৭১-৭৫।

১৭। বিদেশী বণিক ও বাঙালীর সমাজ, বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত), ডঃ অতুল সুর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক, পৃ: ২৮১-২৮২।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/১৭৭৪—১৮৩৩), মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭—১৯০৫), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১), অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০—১৮৮৬) প্রমুখ বাঙালীর নিকট অবিস্মরণীয় নাম। বাঙালীর জাতীয় জীবন গঠনে এঁদের ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই অধ্যায়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের বাংলা সাহিত্যে বাঙালীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে কতটা ভূমিকা পালন করেছে তা আলোচনা করা হবে। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ বলতে ঠিক কোন্ সময়কে বোঝান হয়েছে, তা স্পষ্ট করা উচিত। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জীবিত কালসীমা অষ্টাদশ শতকের শেষসীমা (১৭৭২/১৭৭৪) থেকে উনিশ শতকের শেষসীমা (১৮৯১) পর্যন্ত। এভাবে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের জীবিত কালসীমাকে না ধরে বরং জাতির প্রয়োজনে এঁদের কর্মময় জীবনকেই গ্রহণ করা উচিত। এই পথে সামান্য ব্যতিক্রম থাকলেও উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ছয়ের দশক পর্যন্ত কালসীমাকে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এই সময়ে বাংলা সাহিত্য চর্চায় যাঁরা আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁদের রচনা বাঙালীর আত্মবিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এই কর্মময় সময়ে বাংলা সাহিত্যকে অস্ত্র করে জাতীয় জীবনের উন্নতিতে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। অবশ্য এই অধ্যায়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বর গুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা করা হবে না। কেননা, তৃতীয় অধ্যায়ে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে কবি ঈশ্বরগুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।

বণিক ইংরেজ জাতি পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭) নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাজিত করে বাংলার কর্ণধার হয়। বিদেশী বণিকের এই সাফল্যে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ প্রমুখের সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধেও এদেশের যুগচিন্তা নায়কগণ ইংরেজ শাসনের প্রবল সমর্থক ছিলেন। এর দু'টি কারণ নির্ণয় করা যায়। যথা,—নাগরিক জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, যা নবাব আমলে অনিশ্চয়তায় ভরা ছিল এবং বাঙালীর জাতীয় জীবনে উন্নতির সম্ভাবনা। পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ব্যতীত ভয়ঙ্কর পঙ্কে নিমজ্জিত বাঙালীর মুক্তির উপায় নেই। যদি পাশ্চাত্য জাতির সহাবস্থানে থাকা যায়, তাহলে বাঙালীর দীর্ঘদিনের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ থাকে। প্রসঙ্গত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথা বলা যায়। তিনি লিখেছেন;—

"বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায়

প্রসিদ্ধ নেতা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ উদার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইংরেজদিগকে ভারতে পাঠাইয়া হিন্দুদিগকে নয় শত বর্ষব্যাপী মুসলমানদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।" (১)

ভারতের প্রথম আধুনিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি রামমোহন রায় বৃটিশের নিকট জাতীয় পরাধীনতাকে অভিশাপ মনে করেন নি। বরং সমকালের নাগরিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ও জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষালাভের সম্ভাবনা রামমোহন রায়কে ইংরেজ শাসনের সমর্থক করে তুলেছিল।

আমরা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি — ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি, অর্থ, সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙালীর কোন গঠনমূলক চেতনা ছিল না। ফলে জাতীয় জীবনে চূড়ান্ত অবক্ষয় নেমে এসেছিল। উনিশ শতকের গোড়ায় রামমোহনের মতো আত্মসচেতন বাঙালী বা হেয়ার সাহেবের মতো উদার ও মানবতাবাদী ব্যক্তির উদ্যোগে বাঙালীজীবনে প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্রমশ সচেতনতা আসে। রামমোহন, ডেভিডহেয়ার প্রমুখ অনুভব করলেন — বাঙালীর মুক্তির জন্য চাই প্রকৃত শিক্ষা। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন;—

"রামমোহন রায় কলিকাতাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াই অপরাপর অভাবের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব অতিশয় অনুভব করিতে লাগিলেন। রামমোহন রায় কলিকাতাতে আসিলেই ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে বন্ধুতা হইল। হেয়ার এদেশীয়দিগের মধ্যে ইংরাজী শিক্ষার অভাব বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তা করিতেন; এবং তাঁহার ঘড়ির দোকানে সমাগত ব্যক্তিদিগের সহিত সে বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতেন।" (২)

উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে এদেশে ইংরেজী শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক উদ্যোগ দেখা যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য সরকারী, বেসরকারী বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যথা;— ডিরোজিও-এর শিক্ষক ড্রমণ্ড সাহেবের ধর্মতলা একাডেমী, ফর্বেশ সাহেবের চুঁচুড়ায় (১৮১৪) প্রতিষ্ঠিত একটি স্কুল, রবার্ট মে সাহেবের প্রায় ৩৬টি স্কুল, শ্রীরামপুর মিশনারিদের উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রায় শতাধিক স্কুল, হিন্দু কলেজ (১৮১৭), রামমোহনের এ্যাংলো হিন্দু স্কুল (১৮২২) প্রভৃতি স্কুল সেকালে ইংরেজী শিক্ষা লাভের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এছাড়া পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশের জন্য 'স্কুলবুক সোসাইটি' (১৮১৭) এবং বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য 'স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা বা গতিদান করেছিল।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বা সরকারী প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করার পর শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী সমকালের ঘুণেধরা সমাজব্যবস্থার সংস্কারে মনোযোগী হন। এঁদের মধ্যে ভবানীচরণ

202021

14 FEB 2008
NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY

বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঙালীর অবক্ষয় থেকে মুক্তির উপায় বলে মনে করেন। আবার ইয়ং বেঙ্গল সম্প্রদায় বা উগ্র আধুনিকপন্থীগণ দেশীয় আচার সংস্কৃতিকে জাতীয় অবনতির জন্য দায়ী করে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রবল সমর্থক হয়ে উঠেন। কেউ কেউ দেশীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রয়োজনীয় অংশকে গ্রহণ করার মধ্যেই বাঙালীর জাতীয় জীবনের উন্নতির কথা বলেন। আমরা রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সময়ে প্রাচীনপন্থী, নব্যপন্থী ও প্রগতিপন্থী আদর্শের সন্ধান পাই। লক্ষ করা যাবে, এই তিন মতবাদের সমর্থক প্রত্যেকেই স্বদেশের মঙ্গল কামনা করতেন। নব্যপন্থী সম্প্রদায় যতই স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি অস্বীকার করার কথা বলুক, তবুও স্বদেশের জন্য এঁদের অন্তরের বেদনার সন্ধান পাওয়া যায়। এঁরা দেশের চরম দুর্দিনে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সন্ধান পেয়ে এদেশের বুকে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতিকে বইয়ে দিতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্য জাতির মতো সমৃদ্ধজীবন কামনার আন্তরিক উদ্যোগকে শ্রদ্ধা জানাতেই হবে। প্রসঙ্গত ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রাণ-পুরুষ ডিরোজিওয়ের ভারতবর্ষের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের কথা বলা যায়। 'সেকাল আর একাল' প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বসু ডিরোজিও-এর ভারতানুরাগের প্রসঙ্গে একটি আখ্যান কাব্যের 'মুখবন্ধ' মূলক কবিতার উল্লেখ করেন। যথা —

"My Country ! in thy days of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast–
Where is that glory, Where that reverence now ?
Thy egale pinion is chained down at last
And grovelling in the lowly dust art thou :
Thy ministrel hath no wreath to weave for thee.
Save the sad story of thy misery !
Well—let me dive into the depths of time
And bring from out the ages that have rolled
A few small fragments of those wrecks sublime
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be,
My fallen country! one kind wish for thee." (৩)

এই মুখবন্ধ মূলক কবিতায় ডিরোজিও ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলে বন্দনা করেছেন। সঙ্গে প্রাচীন ভারতের

ঐতিহ্যের প্রতি গৌরব ও সমকালের দুঃখিনী ভারতের জন্য বেদনা বোধ করেন। দেশমাতৃকার প্রতি ডিরোজিওয়ের এজাতীয় শ্রদ্ধা আমাদের বিস্মিত করে। কিন্তু জাতির উন্নতির লক্ষে ইয়ংবেঙ্গল বা নব্যবঙ্গীয়দের উগ্র আধুনিক মতবাদ বা অনুকরণবাদ সফল হতে পারে নি। সেজন্য উগ্র আধুনিক মতবাদ বা অনুকরণবাদকে একটি পরীক্ষামূলক মতবাদ হিসাবে ধরা যায় ।

প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীলদের ভাবনাতেও দেশপ্রেম লক্ষ করা যায়। তবুও এঁদের চিন্তা চেতনা যুগধর্মের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ। এঁরা শুধু প্রাচীনকে আঁকড়ে ধরতে চান। প্রাচীন ঐতিহ্যকে এতখানি আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিলেন যে, এঁদের নিরপেক্ষতা বোধ লোপ পেয়েছিল। যা কিছু দেশীয় তাকে রক্ষা করতে হবে। এরকম মানসিকতায় দেশের প্রতি একটি অন্ধ আসক্তি লক্ষ করা যায়। তবুও এই মতের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একটি বিপন্ন জাতির জীবনে সার্বিক উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। ফলে এই মতবাদ, উগ্র আধুনিক মতবাদ বা অনুকরণবাদের মত পরীক্ষামূলক অর্ধসত্য মতবাদ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশ্বরগুপ্ত এই রক্ষণশীল মতবাদে বিশ্বাসী ।

এদিকে প্রগতিপন্থীরা প্রাচীন ঐতিহ্যময় সংস্কৃতিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন ও জাতির চেতনার দ্বার উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে গ্রহণ করতে চাইলেন। এতে দেশীয় ঐতিহ্যকে যেমন অস্বীকার করা হল না তেমনি দেশের বা জাতির প্রয়োজনে পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চাকেও সমর্থন করা হল। দেখা যাবে, আঠারো শতকের শেষ প্রান্তে একটি পঙ্গু মেরুদণ্ডহীন জাতি উনিশ শতকের শেষ প্রান্তে পৃথিবীর মানচিত্রে ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান নানা ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে। আসলে উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাঙালী জাতি জীবনের স্থবিরতা থেকে মুক্তির অন্বেষণ করে। আধুনিক শিক্ষালাভের ফলে যুগচিন্তা নায়কগণ প্রগতিমূলক চিন্তা চেতনার প্রচার করেন। যে মতবাদ বাঙালীকে শ্রেষ্ঠ জাতির মর্যাদা এনে দেয়।

জানা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে মোটামুটি মহাবিদ্রোহের (১৮৫৭) সমসাময়িক কাল পর্যন্ত সময়ে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর, ডিরোজিও ও তাঁর সম্প্রদায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙালীর আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটাতে আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই আত্মচেতনামূলক আন্দোলনকে গতিদান করতে যুগচিন্তা নায়কগণ সভা, সমিতি, পত্র-পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করেন । এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য রামমোহন রায়ের আত্মীয়সভা (১৮১৫), ও 'ব্রাহ্মসভা' (১৮২৮), ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ধর্ম্মসভা' (১৮২৯) ডিরোজিওর 'এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিশেন' (১৮২৮) হিন্দু কলেজের ছাত্রদের বাংলা ভাষানুরাগের ফসল 'সর্বতত্ত্বদীপিকাসভা' (১৮৩৩), 'বঙ্গ ভাষানুবাদ সমাজ' (১৮৫০), বেথুন

সোসাইটি (১৮৫১) প্রভৃতি বাঙালীর মনন চিন্তনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। এছাড়া পত্র-পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য রামমোহনের 'ব্রাহ্মণ সেবাধি' (১৮২১), তারাচাঁদ দত্ত ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) এরপর ভবানীচরণের 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১), ইয়ংবেঙ্গলের মুখপত্র 'জ্ঞানান্বেষণ' (১৮৩১), অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সচিত্র পত্রিকা 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১), হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিখ্যাত ইংরেজী পত্রিকা 'Hindoo Patriot' (১৮৫৩) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকা রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগে বাঙালীর চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল ।

উনিশ শতকে আত্মচেতনা বিকাশের যুগে জাতিকে সঠিক পথ নির্দেশ করতে অনেকে বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উগ্র আধুনিক, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীল মতের উদ্ভব হয় । উনিশ শতকে জাতিকে সমৃদ্ধ করতে যেসব মতবাদের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই মতবাদের সমর্থনে অনেকেই বাংলা সাহিত্য চর্চা করেছিলেন। এঁদের সাহিত্যই আমার গবেষণার বিষয়। এই অধ্যায়ে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগে রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা রচনাগুলি বিশ্লেষণ করে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা অন্বেষণ করা হবে। সেজন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্তের রচিত বাংলা রচনাগুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল।

রাজা রামমোহন রায় ঃ

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২/৭৪—১৮৩৩) উনিশ শতকের বিশাল কর্ম-কুরুক্ষেত্রের প্রথম ও প্রধান বীরপুরুষ। এক কথায় রামমোহন এদেশের নবজাগরণের পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তিনি 'ভারতপথিক'। রামমোহনের পরিবার ইতিহাসের ঘাতপ্রতিঘাতের আবর্তনের সঙ্গে যুক্ত। তাঁর পিতা রামকান্ত রায় ও মা তারিণী দেবী, জন্ম ১৭৭২/৭৪ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার খানাকুলে। রামমোহনের প্রপিতামহের নাম কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবাব সরকারের দক্ষ রাজকর্মচারী হওয়ায় 'রায়' উপাধি পান। তিনি চাকুরীর প্রয়োজনে মুর্শীদাবাদ থেকে হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুলের রাধানগর গ্রামে বাস করেন। কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ব্রজবিনোদ নবাব সিরাজের কর্মচারী ছিলেন। এই ব্রজবিনোদের পঞ্চম পুত্র রামকান্ত রায়, রামমোহন রায়ের পিতা। রামকান্ত প্রথম দিকে নবাবের অধীনে চাকুরী করতেন, পরে কোম্পানীর আমলে কোম্পানীর কাছ থেকে তালুক ইজারা নিয়ে বিষয়কর্ম করেন এবং বর্ধমানের রাণী বিষণকুমারীর মোক্তার হিসাবেও কাজ করেন। এমন একটি পরিবারের সদস্য রাজা রামমোহন রায়ের শিক্ষার ক্ষেত্রেও সন্ধিযুগের শিক্ষার সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমে তিনি পাঠশালায়, চতুষ্পাঠী ও মক্তবে এবং পরে পাটনায় আরবি ও ফারসী শিক্ষা লাভ করেন। শোনা যায়, এই সময় রামমোহন

রায় অ্যারিষ্টটলের চিন্তা চেতনা ও একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। পরবর্তীকালে কাশীতে হিন্দুশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। এরপর ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং ডিগ্‌বী সাহেব নামক এক সাহেবের সহযোগিতায় সার্থক ভাবে ইংরেজী ভাষা শেখেন এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হন।

আমাদের স্থবির জীবনকে 'চরৈবেতির' মন্ত্রে দীক্ষিত করতে রামমোহনের ছিল নিরলস কর্মপ্রয়াস। তিনি এই স্থবিরতা থেকে মুক্তিদানের জন্য নানারকম সংস্কারমূলক কাজ করেন। তাঁর প্রধান কাজ হল মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানো এবং সংস্কারমূলক আন্দোলন হল ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কার। তিনি এই সংস্কারমূলক আন্দোলনকে গতিদানের জন্য সভা, সংগঠন পরিচালনা ও পত্রিকার সম্পাদনা করেন। সভা-সমিতিতে ও পত্রিকার পাতায় তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে নতুন দর্শন প্রচার করেন। এখানেই শেষ নয় — রামমোহন শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যুগোচিত মতামত দেন।

রামমোহন ধর্মপ্রাণ স্বদেশে ধর্মীয় অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেজন্য তিনি প্রাচীন ভারতের বেদ-বেদান্ত থেকে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এর আদর্শ প্রচার করে ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংস্কার করেন। তিনি জানতেন, এদেশের মানুষ অত্যন্ত ধর্মভীরু এবং প্রত্যেকেই কোন না কোন ধর্মের সঙ্গে যুক্ত। এখানেই শেষ নয়, এদেশের অনেক মানুষ নিজ সম্প্রদায়ের মাহাত্ম্যকে ঘোষণা করতে গিয়ে অন্য সম্প্রদায়কে তুচ্ছ জ্ঞান করতে দ্বিধা করে না। তিনি এরকম একটি ধর্মপ্রাণ সমাজের কিছু মঙ্গল করতে গিয়ে প্রথমে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধর্মকে সংস্কার করে নিতে চাইলেন। বহু ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বসবাস এই দেশ। এদেশেরই প্রাচীন ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় শাস্ত্র বেদান্ত বা উপনিষদ থেকে একেশ্বরবাদকে প্রচার করে ধর্মীয় উন্মাদনায় মত্ত মানুষগুলির মধ্যে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা করেন। 'তহতুল মোহদ্দীন' নামে একটি ফারসী গ্রন্থ রচনা করে তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করেন। কলকাতায় আসার আগেই রংপুরে ডিগবি সাহেবের অধীনে কাজ করার সময় তিনি মাঝে মাঝে ধর্মীয় সভা করতেন। ব্রাহ্মণ, সাধু, সন্ন্যাসী, মৌলবী প্রভৃতি অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে তিনি ধর্ম বিষয়ে নানা রকম আলোচনা করতেন।

সমাজসংস্কার রামমোহন রায়ের জীবনের অন্যতম মহৎ কর্ম। যেহেতু আমাদের দেশ ধর্মপ্রাণ, তাই ধর্মীয় শাস্ত্রগ্রন্থের দ্বারা তিনি সমাজ সংস্কার করার চেষ্টা করেন। রামমোহন বর্ণবৈষম্য ও নারী-পুরুষে ভেদাভেদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। এই বিষয়ে তাঁর বাংলা গ্রন্থ হল 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' (১ম ও ২য় ১৮১৮), 'প্রার্থনাপত্র' (১৮২৩), 'বজ্রসূচী' (১৮২৭), 'সহমরণ বিষয়' (১৮২৯) প্রভৃতি। রামমোহনের সমাজ সংস্কারের সবচাইতে বড় সাফল্য সতীদাহ প্রথা রদ (১৮২৯)।

উনিশ শতকের প্রথম ও প্রধান যুগচিন্তা নায়ক রাজা রামমোহন রায় মধ্যপ্রাচ্য, ভারতীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে অনুভব করলেন— দেশের মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মান লজ্জাজনকভাবে নিম্নমুখী। তিনি সমসাময়িক কালের মানুষের মঙ্গলের জন্য হয়ে উঠলেন নিরত চিন্তাশীল। রামমোহন রায় দেশীয় মানুষগুলির জীবনের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মুক্তির পথ অনুসন্ধান করে চললেন। তিনি নানা অভিজ্ঞতা মূলধন করে ঋষি সুলভ চেতনার দ্বারা জাতির স্তব্ধগতিকে সচল করার এক দার্শনিক মন্ত্র দিলেন। তিনি বললেন;—

"আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।" (৪)

রাজা রামমোহন রায়ের 'বেদান্তগ্রন্থ'-এর 'অনুষ্ঠান' অংশের শেষে এরূপ মন্তব্য জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নির্দেশ করে, এবং সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনীয় আধুনিক যুক্তিবাদকে গ্রহণ করার উদার মানসিকতাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ভারতীয় শাস্ত্র ভারতবর্ষের অর্ন্তবিষয়ক জ্ঞানের চরম প্রকাশ, আর যুক্তিবাদ সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের সামগ্রী। রামমোহন রক্ষণশীলের মত প্রাচ্যের সব কিছুকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলেন না আবার নব্যপন্থীদের মত পাশ্চাত্যের যাবতীয় বিষয়কে অনুকরণ করারও পক্ষপাতী নন। বরং জাতীয় ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে বাস্তব জীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনে আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবনাকে গ্রহণ করতে চাইলেন। অর্থাৎ রামমোহন রায় জাতীয় জীবনের উন্নতির লক্ষে একটি প্রগতিপন্থী দর্শনের সৃষ্টি করেন। এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, বাঙালীকে স্বাভাবিকভাবে বাঁচতে হলে এরকম একটি যুগোচিত ভাবনার প্রয়োজন ছিল। বিষয়টি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা রামমোহন রায় উপলব্ধি করেন এবং তিনিই প্রথম জাতিকে আধুনিক জীবন রহস্য আস্বাদন করার প্রেরণা দেন।

রামমোহন রায় বেদান্তকে তৎকালীন বিকলাঙ্গ ভারতীয় জীবনের ক্ষেত্রে সঞ্জীবনী শক্তি মনে করতেন। তিনি বেদান্ত ও উপনিষদের বাংলা অনুবাদ করে সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে শাস্ত্রের প্রকৃত সত্য প্রচার করেন। রামমোহন বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি জাতীয় জীবনের প্রয়োজনীয় পাশ্চাত্যের আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। ঋষি সুলভ সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তিনি অনুভব করলেন, এদেশের মানুষের বাস্তব জীবনের ভীত শক্ত করতে হলে ইংরেজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজন। রামমোহন সারা জীবন ধরে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। তাই আমরা দেখি বিখ্যাত সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অনীহার বৃত্তান্ত। এবিষয়ে তাঁর মতামত এরকম;—

"If it had been intended to keep the British nation in ignorance of real knowledge, the Baconian philosophy would not have been allowed to displace the system

of the schoolmen, which was the best calculated to perpetuate ignorance. In the same manner, the Sanskrit system of education would be the best calculated to keep this country in darkness, if such had been the policy of the British legislature. But as the improvement of the native population is the object of Government, it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instruction,embracing Mathematics, Natural Philosophy, Chemistry, Anatomy, with other useful science, which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talent and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus." (৫)

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, যে রামমোহন সংস্কৃত ভাষার বেদান্তকে জীবনের পাথেয় করেছিলেন, সেই রামমোহন কি করে লর্ড আর্মহার্ষ্টকে চিঠিতে বললেন — বেদান্ত চিন্তার জগৎ বা সংস্কৃত শিক্ষার জগৎ থেকে মুক্ত হওয়া জাতির পক্ষে মঙ্গলজনক। এখানে রামমোহনের স্ববিরোধী মনোভাব স্পষ্ট। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এত বড় একজন পণ্ডিত ব্যক্তি কি করে এমন একটি উদ্ভট কথা বলেন। এই প্রশ্নটির উত্তর অতি সহজেই পাওয়া সম্ভব; যদি রামমোহন রায়কে একজন স্বদেশ প্রেমিক মনে করে সমস্যা সমাধানের পথে এগোই। রামমোহন জানতেন, সরকারী সহযোগিতা পেলে এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সম্ভব। তাছাড়া সংস্কৃত শিক্ষা বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে তেমন কাজে আসে না। বাস্তব বা ঐহিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রয়োজন। সরকারী সহযোগিতায় এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ঘটলে সমৃদ্ধ দেশীয় অধ্যাত্মিক জ্ঞান ভাণ্ডারের সঙ্গে সঙ্গে ঐহিক জ্ঞানেও দেশ সমৃদ্ধ হবে। এবং ভারতীয়রা এই দুটি বিষয়কে আত্মস্থ করলে পৃথিবীতে সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারবে। রামমোহন রায়ের সূক্ষ্ম দূরদৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ঠিক এখানেই। এভাবে বিচার করলে রামমোহনের অন্তরে অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমেরই সন্ধান মেলে।

কলকাতায় আসার পর তিনি 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) নামে একটি সভা গঠন করেন এবং এখানেই তিনি তাঁর উদার বা স্বাধীন মতামত প্রচার করতেন। সে সময় কলকাতার অনেক জ্ঞানীগুণী এই সভার সভ্য ছিলেন। এখানেই রামমোহন আপামর দিক্‌ভ্রষ্ট বাঙালীকে ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধে যথার্থ পথ-নির্দেশ করে জাতির জীবনে সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য নিরলস চেষ্টা করেছিলেন। একই উদ্দেশ্যে রামমোহন 'ব্রাহ্মসভা' (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করেন। এই 'ব্রাহ্মসভা' সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতে খুব জরুরি ছিল। কেননা, হিন্দু কলেজের নব্যবঙ্গগোষ্ঠী দেশীয় সমস্ত বিষয়ের উপর ক্রমশ আস্থা হারাতে বসেছিল। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত

দেশের সাধারণ যুবক ক্রমশ দেশীয় হিন্দু ধর্মের প্রতি আস্থা হারিয়ে বিদেশী খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে যুক্তি ও শাস্ত্র নির্ভর ধর্মমতের প্রবর্তন অত্যন্ত জরুরি ছিল। পাশাপাশি রক্ষণশীলদের সংকীর্ণ প্রভাব থেকে মুক্ত করতেও 'ব্রাহ্মসভা' ছিল যুগোপযোগী।

রামমোহন শুধু সভা-সমিতি করেই বসে থাকেন নি। তিনি তাঁর প্রগতিশীল মত ও পথকে আরো ব্যাপক প্রচার এবং জনপ্রিয় করার জন্য পত্র-পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) ও 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) নামে পত্রিকা দুটিতে মিশনারিরা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজের বিষয়ে নানা কুৎসা প্রচার করে। রামমোহনের মত স্বদেশপ্রেমিক ব্যক্তি দেশীয় ধর্মের নিন্দা সহ্য করতে পারেন নি। ইতিমধ্যে রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) নামে একটি পত্রিকার সম্পাদনা করে নিজ মতাদর্শকে দেশবাসীর কাছে প্রচার করেন। তিনি ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সম্বাদ কৌমুদী' (১৮২১) পত্রিকাতে মিশনারিদের পত্রিকায় প্রকাশিত কুৎসার উপযুক্ত জবাব দেন এবং তিনি স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নানা প্রগতিশীল মত ও পথের আলোচনা করেন। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন রক্ষণশীল। প্রগতিশীল মত ও পথ তাঁর পছন্দ না হওয়ায় তিনি 'সম্বাদ কৌমুদী'র সংসর্গ ত্যাগ করে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) নামে একটি নতুন পত্রিকার সম্পাদনা করেন। রামমোহন সংগঠন, সভা ও পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল মতামত প্রচার করেছিলেন দেশীয় বিকলাঙ্গ জাতিকে সুস্থ ও সবল করার জন্য। ধর্ম সংস্কারের মত সমাজ সংস্কার, দার্শনিক চেতনা উদ্ভাবন, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ক চিন্তাচেতনা, শিক্ষা, ভাষা প্রভৃতি বিষয়ে যুগোচিত ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপ রামমোহন রায়ের কৃতিত্ব — যা বাঙালীকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

ভাষার প্রসঙ্গে বলা যায়, রামমোহন মানুষের মুখের ভাষা অর্থাৎ মাতৃভাষা চর্চা করার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনাগুলি বাংলা ভাষায় বা 'লোকভাষা'য় হওয়ায় বাংলা গদ্য বিশেষ উপকৃত হয়েছিল।

রামমোহন জীবনে যা কিছু করেছেন তা দেশ ও দশের জন্যই। তাঁর যা কিছু ক্রিয়াকলাপ তার প্রেরণা স্বদেশ হিতৈষণা। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, রামামোহন রায়ের জাতীয়তাবাদী ভাবনা বা দেশানুরাগ কি আন্তর্জাতিকতার প্রতিকূল নয়। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হলেও রামমোহনের জাতীয়তাবাদ উদার প্রকৃতির। তিনি মানব সভ্যতার অবমূল্যায়ন থেকে একটি জাতিকে মুক্ত করার সংকল্প নিয়েছিলেন। একটি জাতিকে মানুষের মত করে বাঁচতে শেখানোটা কখনোই আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী হতে পারে না। তাছাড়া তিনি শুধু এদেশবাসীর উন্নতির চিন্তা করেই কর্তব্যের ইতি ঘোষণা করেন নি। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মানুষের জন্য তিনি তাঁর মহৎ ভাবনাকে আবদ্ধ করার মত ব্যক্তি তিনি নন। আমরা জানি,

রামমোহন রায় বেদ-উপনিষদের একান্ত ভক্ত। প্রাচীন এই সব শাস্ত্রে সর্বভূতে ব্রহ্ম বা সাম্যের কথা বলা হয়েছে। তাই রামমোহন রায়ের মত একজন অকৃত্রিম বেদ-উপনিষদের ভক্ত ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমায় বসবাসকারী মানুষকে মানুষ মনে করবেন, আর পৃথিবীর অন্য প্রান্তের মানুষকে মানবিক মর্যাদা দেবেন না—এ হতে পারে না। তাই তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের স্বাধীনতার সংবাদ যখন পেতেন, তখন তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। এবিষয়ে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন;—

> "স্পেনের অত্যাচার থেকে দক্ষিণ আমেরিকার উপনিবেশগুলি রক্ষা পাওয়ার সংবাদে তিনি এতটা উল্লসিত হয়েছিলেন যে, নিজ বাসভবনে য়ুরোপীয় বন্ধুদের ভোজে আপ্যায়িত করেছিলেন।"[৬]

সঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, রামমোহন বিজাতীয় ইংরেজদের কখনোই শত্রু মনে করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন ঐ বিদেশীরা আরো বেশ কিছুদিন রাজত্ব করুন। রামমোহন রায় চেয়েছেন, এদেশবাসী বিদেশী রাজপুরুষদের সংস্পর্শে থাকুক। রামমোহন প্রসঙ্গে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—

> "ইংরেজের এদেশে স্থায়িভাবে বসবাস করানো বিশেষভাবে সমর্থন করতেন।...তিনি মনে করেছিলেন, শিল্প-বাণিজ্যে উন্নত ইংরেজদের ভারতবর্ষে পাকাপাকিভাবে বাস করলে এদেশের শিল্প-বাণিজ্য ও কৃষি ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হবে।"[৭]

একসঙ্গে থাকতে চাওয়া কখনোই বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধের পরিপন্থী নয়। অবশ্য তিনি মনে করতেন, বিদেশীরা এদেশকে উন্নত করে একদিন চলে যাবে। অতএব রামমোহন রায়ের বেদ-বেদান্তের বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধে বিশ্বাস, বিদেশী রাজপুরুষদের সংস্পর্শে থাকতে চাওয়া, বিশ্বের কোন প্রান্তে স্বাধীনতার সংবাদে আনন্দিত হওয়া প্রভৃতি কখনোই আন্তর্জাতিকতার প্রতিকূল মনোভাব নয়। আবার একই সঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, রামমোহনের এই আন্তর্জাতিক ভাবনাতেও স্বদেশ ভাবনার অস্তিত্ব বিরাজমান। তাই বলতে হয়, রামমোহনের চেতনায় জাতীয়তাবাদ বা স্বদেশ ভাবনা ও আন্তর্জাতিকতাবাদ সুগভীর আত্মীয়তার সম্বন্ধে ভরপুর।

এবারে আমরা রাজা রামমোহন রায়ের বাংলা রচনায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করব। পণ্ডিতেরা খাতায় কলমে বাংলা সাহিত্যের বয়স এক হাজার বছরের বেশী প্রমাণ করেছেন। তবুও উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা গদ্যের ব্যাপক প্রচলন ছিল না। আধুনিক বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় স্বনামধন্য গদ্যশিল্পী। তিনি বাংলা গদ্য ভাষার গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন এবং তাকে বাঙালীর চিন্তাজীবনের বাহন করে তুলতে চেয়েছেন। সেদিনের দুর্বল বাংলা গদ্য ভাষাকে তিনি ভারতীয় সাধনার গূঢ় তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করার মতো যোগ্য করে বাংলা সাহিত্যে অমর আসন লাভ করেন। বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরো একটি জায়গায়। এক হাজার বছরের বেশী পুরানো বাংলা সাহিত্যের মধ্যে রামমোহনই প্রথম

সচেতনভাবে জাতির উন্নতিকল্পে কলম ধরেন।

রামমোহন রায় রচিত বাংলা গ্রন্থগুলির বিষয় বা আবেদনের ভিত্তিতে সাতটি শ্রেণীতে বিভাগ করা হল। গ্রন্থগুলির শ্রেণী বিভাগ এই রকম;—

ক) বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ

১। 'বেদান্ত গ্রন্থ' (১৮১৫)

২। 'বেদান্ত সার' (১৮১৫)

৩। 'পঞ্চোপনিষৎ' ('তলবকার উপনিষৎ' ১৮১৬, 'ঈশোপনিষৎ' ১৮১৬, 'কঠোপনিষৎ' ১৮১৭, 'মাণ্ডুক্যোপনিষৎ' ১৮১৭, 'মুণ্ডকোপনিষৎ' ১৮১৯)

খ) বিতর্ক নির্ভর গ্রন্থ বা সমালোচনামূলক গ্রন্থ

১। 'উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার' (১৮১৬—১৭)

২। 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার' ১৮১৭

৩। 'গোস্বামীর সহিত বিচার' ১৮১৮

৪। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' ১৮২০

৫। 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' ১৮২০

৬। 'চারি প্রশ্নের উত্তর' ১৮২২

৭। 'পথ্যপ্রদান' ১৮২৩

৮। 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' ১৮২৬

গ) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গ্রন্থ

১। 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' ১৮১৮

২। 'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' ১৮১৯

৩। 'সহমরণ বিষয়' ১৮২৯

ঘ) ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক গ্রন্থ

১। 'গায়ত্রীর অর্থ' ১৮১৮

২। 'আত্মানাত্ম বিবেক' ১৮১৯

৩। 'গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং' ১৮২৭

৪। 'ব্রহ্ম সঙ্গীত' ১৮২৮

৫। 'অনুষ্ঠান' ১৮২৯

৬। 'ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ' ১৮২৬

ঙ) নীতিমূলক গ্রন্থ

১। 'প্রার্থনা পত্র' ১৮২৩

২। 'বজ্রসূচী' ১৮২৭

৩। 'ব্রহ্মোপাসনা' ১৮২৮

চ) খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনামূলক গ্রন্থ ও মিশনারিদের হিন্দু নিন্দার প্রত্যুত্তর

১। 'ব্রাহ্মণসেবধি' ১৮২১

২। 'পাদরী ও শিষ্য সম্বাদ' ১৮২৩

ছ) ভাষা ও ব্যাকরণ বিষয়ক গ্রন্থ

১। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' ১৮৩৩

—উল্লিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করলে একটি বিষয় সহজেই স্পষ্ট হবে যে, রামমোহন রায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য কলম ধরেন নি। তিনি দীর্ঘ দিনের অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার থেকে বাঙালী জাতিকে মুক্ত করার জন্য বাংলায় গদ্য চর্চা করেন।

ক) বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদ ঃ

রাজা রামমোহন রায় অনুভব করেছিলেন, ধর্মভীরু দেশীয় সমাজে ধর্মীয় ক্ষেত্রে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার দূর না করলে জাতীয় জীবনের উত্তরণ সম্ভব হবে না। তিনি সর্ব প্রকার কুসংস্কার বর্জন করে যুক্তিপূর্ণ মন নিয়ে প্রমাণ করতে চাইলেন, প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি বা আচার আচরণের থেকে একেশ্বরবাদ অনেক বেশী যুক্তিপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক। এবিষয়ে রামমোহনের প্রথম রচনা 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর কথা বলা যায়। সমকালীন বাঙালীর বহুদেবতাবাদ বা ধর্মীয় কুসংস্কারের পরিবর্তে একেশ্বরবাদের সমর্থনে 'বেদান্ত গ্রন্থ' রচনা করতে গিয়ে ভূমিকায় বলেন,—"প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এ সকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্তনিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম।"[৮] তিনি মনে করেন, এ দেশবাসী সত্যিকারের ঈশ্বরকে সেবা করার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই এই অজ্ঞানতা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে রামমোহন বেদান্ত বা উপনিষদের ব্যাপক প্রচারের প্রয়োজন অনুভব করলেন। এবং তাকে বাস্তব রূপদানের উদ্দেশ্যে রামমোহন বাংলা গদ্য ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে 'বেদান্ত' ও 'উপনিষদ'-এর বাংলা অনুবাদ করেন।

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর 'ভূমিকা' অংশে প্রথমেই বেদান্তের মূলবিষয় যে ব্রহ্ম সে কথার উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়;—"বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন।" (৯) 'বেদান্ত গ্রন্থ', 'বেদান্তসার' ও উপনিষদের অনুবাদ করে রামমোহন ব্রহ্মের কথাই বলেছেন। 'বেদান্ত গ্রন্থ'-এর ভূমিকায় তিনি বলেন;—

> "....অনেকেই কখন পশুপক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত-শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্যপ্রবন্ধে এবং পূর্ব্বশিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোকো এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্তশাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমাদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতিপূর্ব্ব পরম্পরায়ে এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্তা ইত্যাদি বিশেষণগুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয়ে ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।।" (১০)

তাঁর মতে, প্রচলিত রূপগুণ বিশিষ্ট দেবতা বা মানুষ কখনই আমাদের উপাস্য হতে পারে না। ব্রহ্ম সর্বত্র বিরাজ করেন। স্বার্থপর শোষক একটি শ্রেণী এই সর্বময় ব্রহ্মকে ছেড়ে পশু, পাখী, মাটির মূর্তি, পাথর প্রভৃতিকে উপাস্য হিসাবে প্রচলন করে। রামমোহন বিস্মিত হয়ে বলেন,—আমাদের সামান্য বুদ্ধি, শাস্ত্রজ্ঞান ও যুক্তিবোধ থাকলে এরকম কুসংস্কারকে কখন মেনে নিতে পারব না। তাঁর মতে এরকম কুসংস্কারের পিছনে রয়েছে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে বেদান্ত শাস্ত্র। যদি বেদান্ত শাস্ত্রের জ্ঞান এ দেশবাসীর প্রতিটি নর-নারীর থাকত, তাহলে স্বার্থপর শোষক চক্রান্তকারী একটি শ্রেণী পুতুল পূজা খেলার প্রচলন করতে পারত না। সেজন্যই তিনি মাতৃভাষায় বেদান্ত শাস্ত্রকে অনুবাদ করেন। কেননা, অনেকে পণ্ডিতের মুখের কথার উপর ভরসা রেখে ও পূর্বশিক্ষা এবং সংস্কারের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সত্যিকারের কথা না জেনে গড্ডালিকার প্রভাবে ভেসে চলে। তাদের মুক্তির উদ্দেশ্যে রামমোহন বেদান্ত ও উপনিষদের অনুবাদে ব্রতী হন।

রামমোহন শুধু অনুবাদই করেন নি, তিনি এই অনুবাদে যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা করে বাংলা সাহিত্যকে নতুন মাত্রা এনে দেন। 'পরব্রহ্ম'এর উপাসনা যে একমাত্র পথ সেকথা 'ভূমিকা'য় অকাট্য যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রূপগুণ বিশিষ্টের উপাসনার বিরোধিতা করে রামমোহন রায় বলেন,—কোন ব্যক্তি যদি অল্প বয়সে, জ্ঞান হবার আগে বাবাকে হারায়, তাহলে সে যুবক বয়সে বাবার উদ্দেশ্যে ক্রিয়া বা মঙ্গলকামনা করার সময় সামনে যে কোন বস্তুকে পিতা বলে গ্রহণ করতে পারে না। বরং সে বলে "যে জন জন্মদাতা তাহার শ্রেয়

হউক"[১১] ব্রহ্ম ঠিক তেমন। রূপগুণের অতীত হলেও জগতের কোন নশ্বর বস্তু তার প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। যুক্তি ও বুদ্ধির উপর ভরসা রেখে রামমোহন আরো বলেন—যে মত পূর্বপুরুষেরা মেনে আসছেন তাকে নির্বিচারে গ্রহণ করা ঠিক নয়। পূর্বপুরুষের সবকিছুই যে ঠিক নয় বুদ্ধির দ্বারা বিবেচনা করলে তা প্রমাণিত হবে। ব্রহ্মের উপাসনা করলে বাস্তব জ্ঞানশূন্য হতে হয়, তাই গৃহস্থের ব্রহ্মের উপাসনা ঠিক নয়। এর উত্তরে রামমোহন বলেন—নারদ, জনক, ব্যাস, শুক, বশিষ্ঠ কপিল প্রমুখ ব্রহ্মজ্ঞানী কেউই বাস্তব জ্ঞানশূন্য ছিলেন না। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সাকার উপাসনার কথা আছে,—অতএব সাকার উপাসনা ঠিক। এরকম প্রশ্নের উত্তরে রামমোহন বলেন পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সাকার উপাসনার কথা থাকলেও বলা হয়েছে "ব্রহ্মের রূপকল্পনামাত্র।"[১২] এবং যাদের মন অত্যন্ত দুর্বল পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে সাকার উপাসনা তাদের জন্য।

উল্লিখিত যুক্তিগুলির দ্বারা রামমোহন দেশবাসীকে ধর্মীয়ক্ষেত্রে পুতুল উপাসনা বা নশ্বর বস্তুর উপাসনা থেকে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট করেন। কেননা, এক শ্রেণীর চক্রান্তকারী মানুষের ষড়যন্ত্রে স্বদেশবাসী মূল সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মের উপাসনা থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছে। স্বদেশবাসীর এই লাঞ্ছনা তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাই তিনি 'বেদান্ত গ্রন্থ'এর 'অনুষ্ঠান' অংশের শেষে দেশবাসীকে পরামর্শ দিয়েছেন—তারা যেন কোনরকম গুজবে কান না দেয়। এবং তাঁর কথাগুলি যেন দেশকালের পটভূমিতে বিচার করেন। রামমোহন বলেন;—"এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন এ মত হয় বিশ্বাস করিবেন না।"[১৩] প্রসঙ্গত রামমোহনের দর্শনটি পুনরায় উল্লেখ করতে হয়, তিনি স্বদেশবাসীকে পরামর্শ দেন;—"আমাদিগ্যের উচিৎ যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহলোকে পরলোকে কৃতার্থ হই।"[১৪] অর্থাৎ দেশীয় পণ্ডিতের সাধনার ফসল শাস্ত্র গ্রন্থের শাশ্বত বাণীকে পাথেয় করে এবং মন থেকে সবরকমের সংকীর্ণতা মুছে ফেলে বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করতে উনিশ শতকের বাঙালীকে তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রামমোহন রায় সূক্ষ্ম দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, ঐ দু'টি বিষয়কে সমকালীন বাঙালীর স্থবির জীবনে প্রয়োগ করলে জাতীয় জীবনে অভাবনীয় উন্নতি হতে বাধ্য।

রামমোহন জাতির উন্নতির মহৎ উদ্দেশ্যে পণ্ডিত সমাজের অন্তর্ভুক্ত সংস্কৃত বেদান্তকে 'লোকভাষা'য় অর্থাৎ বাংলায় সহজ সরল করে অনুবাদের চেষ্টা করেন। এদেশবাসী সম্বন্ধে তিনি জানতেন,— "অনেক লোক অনভ্যাসপ্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না"।[১৫] কিন্তু বেদান্তের বক্তব্যকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করায় যাঁরা বিরক্ত, রামমোহন তাদের ছেড়ে দেননি। তাঁদের তিনি স্মরণ করিয়ে দেন নানাভাবে সংস্কৃত বেদের ভাষান্তর হওয়ার কথা। রামমোহন অকাট্য যুক্তি দিয়ে বলেন গীতা, পুরাণ, পঞ্চমবেদ মহাভারত পণ্ডিত মহাশয়েরা ছাত্রদের পড়াতে গিয়ে গুরুগম্ভীর দার্শনিক বিষয়গুলি

কিন্তু বাংলাতেই বোঝান। কিংবা আলাপ আলোচনা বা শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্রের কাছে ঐসব শ্লোক উচ্চারণও করে থাকেন। সেজন্যই তিনি বলেন;—"যদি এইরূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কিরূপে করিতে পারেন।" (১৬) এখানে রামমোহনের মানবতাবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষ বেদান্তের মূল সত্য বস্তুকে জেনে ইহলোকে ও পরলোকের জন্য সঠিক পথটি বেছে নেয়।

'বেদান্তসার', 'বেদান্তগ্রন্থ'এর সারানুবাদ। এখানেও রামমোহন 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-এর কথাই বলেছেন। এই গ্রন্থে তাঁর মানব প্রীতি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে লিখেছেন;—"বরঞ্চ ব্রহ্মোপাসক মনুষ্য যে সে দেবতার পূজ্য হয়েন" (১৭) কিংবা "ব্রহ্মজ্ঞানীকে সকল দেবতারা পূজা করেন।"(১৮) পরিশেষে রামমোহন তাঁর গ্রন্থের সত্যতা যাচাই করে নেওয়ার কথাও বলেন। তাঁর ভাষায়;—"বেদের প্রমাণ এবং মহর্ষির বিবরণ আর আচার্য্যের ব্যাখ্যা অধিকন্তু বুদ্ধির বিবেচনা এ সকলেতে যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার নিকট শাস্ত্র এবং যুক্তি এ দুই অক্ষম হয়েন।" (১৯) এখানেও তিনি দেশবাসীর বুদ্ধি প্রয়োগের উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আসলে তিনি জানেন, বুদ্ধির প্রয়োগ ভিন্ন আধুনিক জীবন অচল।

রাজা রামমোহন রায় মোট দশখানি উপনিষদের অনুবাদ করতে চাইলেও 'পঞ্চোপনিষৎ'এর অনুবাদ করেন। তাঁর অনুবাদিত উপনিষদের মূল বিষয় ব্রহ্ম। 'ঈশোপনিষৎ'এর 'ভূমিকা'য় তাই তিনি বলেছেন;—

> "এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে পরমেশ্বরের এক মাত্র সর্ব্বত্র ব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মুক্তির প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য্য হয়।" (২০)

অর্থাৎ রামমোহন উপনিষদগুলির অনুবাদ করে 'পরব্রহ্ম' বা 'একেশ্বরবাদ'ই যে একমাত্র মুক্তির পথ তা নির্দেশ করেন। স্বদেশবাসী এই গুরুগম্ভীর দার্শনিক বিষয়গুলি যাতে সহজে বুঝতে পারে, সে দিকে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তিনি লিখেছেন;—"...সেই সকল সূত্রের অর্থ সর্ব্বসাধারণ লোকের বুঝিবার নিমিত্তে সংক্ষেপে ভাষাতে বিবরণ করা গিয়াছে" (২১) এইসব বক্তব্যকে রামমোহনের নিজস্ব বলে যারা প্রচার করেন, তাদের মন্তব্যের প্রতিবাদ করে রামমোহন বলেন—তবে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রমুখ কবিদের রচনাগুলিও নিশ্চিত নতুন বিষয়। অর্থাৎ 'একেশ্বরবাদ' কোন নতুন বিষয় নয়, কালের প্রবাহে অজ্ঞানতার ফলে সাধারণ স্বদেশবাসী তা ভুলে গিয়েছে। তাই তিনি পূর্বনির্দিষ্ট সঠিক পন্থা পুনরায় স্মরণ করে দিয়ে জাতির উন্নতির অন্যান্য দিকগুলির মত ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সচেতনতা আনতে চেয়েছেন।

খ) বিতর্কনির্ভর বা সমালোচনামূলক গ্রন্থ ঃ

রাজা রামমোহন রায় উদার ও মুক্ত মন নিয়ে জাতির উন্নতির জন্য যে নবজাগরণ এনেছিলেন, অনেক পণ্ডিত সহজে মানতে চাননি। একটি নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যেমন ছোট বড় নানা আকারে ঢেউ উঠবে তেমনি ঘূণে ধরা নিস্তরঙ্গ বাঙালী সমাজে রামমোহন রায়ের সংস্কারের ঢেউ ওঠায় অনেক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিষ্ণুভক্ত উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ওরফে ভট্টাচার্য্য, চৈতন্য ভক্ত গোস্বামী, ছদ্মনাম ধারী কবিতাকার, সুব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রী, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, নন্দলালঠাকুর প্রমুখ রামমোহনের প্রবর্তিত মতকে বিভিন্ন দিক থেকে আক্রমণ করেন। রামমোহন রায়ের বিখ্যাত বিতর্ক নির্ভর বা সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ 'উৎসবানন্দবিদ্যাবাগীশের সহিত বিচাব' (সংস্কৃত), 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার', গোস্বামীর সহিত বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'সুব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার', 'চারিপ্রশ্নের উত্তর', 'পথ্যপ্রদান', 'কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার' গ্রন্থের দ্বারা রামমোহন স্থবির বাঙালী সমাজে চিন্তাবিপ্লবের সূচনা করেন। তাছাড়া এই বিতর্ক বা সমালোচনামূলক রচনার দ্বারা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সমালোচনামূলক সাহিত্য রচনার সূচনা হয়। রামমোহনের বিতর্কমূলক বা সমালোচনামূলক রচনার প্রসঙ্গে 'ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার'-এর কথা বলা যায়। 'ভূমিকা'তে রামমোহন 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সমালোচনা করে লেখেন;—

> "সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থ হইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়।।...দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠা এবং পংক্তির নির্দ্দেশপূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন।।"[২২]

এখানে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সমালোচনা লক্ষ করা গেল।

গ) নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে গ্রন্থ ঃ

রাজা রামমোহন রায় জরাগ্রস্ত একটি জাতিকে স্বচ্ছন্দগতি দান করতে চেয়েছেন। সেজন্য তাঁর নিরলস কর্মপ্রয়াস কখনো থেমে যায় নি। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে অনুভব করলেন, সামাজিক কুসংস্কারের প্রভাবে এদেশের নারীরা যুগ যুগ ধরে লাঞ্ছিত হয়ে আসছে। তাই তাঁর বক্তব্যে নারীমুক্তির বাণী শোনা গেল। আধুনিক যুগে তিনি প্রথম বাঙালী, যিনি নারীর বেদনাকে মানুষের বেদনার মর্যাদা দিলেন। নারী শুধু ভোগ্যপণ্য বা

পুরুষের দাসীই নয়, তাঁরাও রক্তমাংসের মানুষ, এই সত্যটি সেদিন রামমোহন উপলব্ধি করেছিলেন। আর নারীর মানবিক অধিকার সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে তিনি পুনরায় হাতিয়ার করেছিলেন শাস্ত্রজ্ঞান ও মানুষের যুক্তিবোধকে। কেননা, তিনি শাস্ত্রজ্ঞান ও মানুষের যুক্তিবোধকেই ঘুণেধরা বাঙালী জাতির উন্নতির চাবিকাঠি বলে মনে করতেন। রামমোহন বলেন, এদেশে নারীদের সামান্য পশুপাখীর মত জীব মনে করা হয়। দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রেম এই প্রবৃত্তিগুলি মানুষের মহৎ গুণ বা ধর্ম। অথচ পুরুষের কাছ থেকে এদেশের নারীরা তা পায় না। তাঁর ভাষায়;—

> "স্ত্রীদাহ পুনঃ ২ দেখিবাতে এবং দাহকালীন স্ত্রীলোকের কাতরতায় নিষ্ঠুর থাকাতে তোমাদের বিরুদ্ধ সংস্কার জন্মে এই নিমিত্ত কি স্ত্রীর কি পুরষের মরণকালীন কাতরতাতে তোমাদের দয়া জন্মে না। যেমন শাক্তদের বাল্যাবধি ছাগমহিষাদি হনন পুনঃ২দেখিবার দ্বারা ছাগমহিষাদির বধকালীন কাতরতাতে দয়া জন্মে না কিন্তু বৈষ্ণবেদের অত্যন্ত দয়া হয়।" (২৩)

রামমোহন রায় নারী জাতির প্রতি পশুর মতোআচরণ বন্ধ করে মানবিক আচরণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনটি গ্রন্থ রচনা করেন।

'সহমরণ বিষয়ক প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ' গ্রন্থটি প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচনা ও গ্রন্থটি বিতর্কমূলক। গ্রন্থের সূচনায় 'প্রবর্ত্তক' আশ্চর্য হয়ে বলেন সহমরণ এদেশের একটি প্রচলিত প্রথা। দীর্ঘদিনের এই প্রথাকে কেন তুলে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে। নিবর্ত্তক যেন বিস্মিত হয়ে বলেন;— "তাঁহারাই আশ্চর্য্য বোধ করিতে পারেন যাঁহাদের শাস্ত্রে শ্রদ্ধা নাই এবং যাঁহারা স্ত্রীলোকের আত্মঘাতে উৎসাহ করিয়া থাকেন।" (২৪) এরপর 'প্রবর্ত্তক' অঙ্গিরা মুনি, হারীত মুনি, পরাশর বচন, ব্রহ্মপুরাণ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে 'সহমরণ'ই যে পথ, তা বলেন। এদিকে 'নিবর্ত্তক'ও 'মনু' প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, বিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করাই বিধবার প্রকৃত বিধি। কিন্তু একটা বিতর্ক থেকে যায়—তাহলে সহমরণ বিষয়ে নানা মুনির নানা মত রয়েছে। রামমোহন এই সমস্যারও সমাধান করেন। তিনি বলেন, যদি মনুর বিপরীত কথা কোন শাস্ত্রে থাকে তাহলে মনুর মতকেই গ্রহণ করতে হবে। রামমোহন শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে লিখেছেন;—

> "........মনু এই বিধি দিয়াছেন যে পতি মরিলে ব্রহ্মচর্য্যে থাকিয়া যাবজ্জীবন কালক্ষেপ করিবেন অতএব মনুস্মৃতির বিপরীত যে সকল অঙ্গিরা প্রভৃতির স্মৃতি তুমি পড়িতেছ তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না যেহেতু বেদে কহিতেছেন।। যৎ কিঞ্চিন্মনুরবদত্তদ্বৈ ভেষজং।। যাহা কিছু মনু কহিয়াছেন তাহাই পথ্য জানিবে। এবং বৃহস্পতির স্মৃতি।। মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতির্ন প্রশস্যতে।। মনুস্মৃতির বিপরীত যে স্মৃতি তাহা প্রশংসনীয় নহে।" (২৫)

অতএব সহমরণের মতো নৃসংশ প্রথাকে অবিলম্বে বন্ধ করা উচিত। পরিশেষে রামমোহন বলেন;—"......এরূপ স্ত্রীবধজন্য পাপ হইতে দেশের অনিষ্ট ও তিরস্কার আর হইবেক না ইতি।" (২৬) —এই সমাপ্তি বাক্যে রাজা রামমোহন রায়ের অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেম লক্ষ করা যায়। তাঁর ভাবনায় স্ত্রীবধের জন্য দেশের অসম্ভব ক্ষতি হচ্ছে। এই 'অনিষ্ট' বা ক্ষতি তিনি সহ্য করতে পারেন নি। তাছাড়া 'তিরস্কার আর হইবেক না'—এই বক্তব্যেও তাঁর মনের নির্ভেজাল স্বদেশপ্রেমের সন্ধান মেলে। কেননা, রামমোহনের মতো সচেতন মানুষগুলি সেদিন বুঝতে পেরেছিলেন, এরকম একটি বর্বর প্রথার জন্য বিদেশীদের কাছে লজ্জিত হতে হচ্ছে। এই দেশ সম্বন্ধে বিদেশীরা ভুল ধারণা পোষণ করছে। তাই রাজা রামমোহন রায় মনে করতেন জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য এই বর্বর প্রথা বন্ধ করা অবশ্যই পালনীয় কর্তব্য।

'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ' গ্রন্থেও সহমরণের মতো অমানবিক প্রথাটি বন্ধ করার আহ্বান করা হয়েছে। নারী-পুরুষের সমানাধিকারের ব্যাপারে রামমোহন কিছু অকাট্য যুক্তি দিয়েছেন। তিনি বিরোধী পক্ষের একাধিক অভিযোগকে একে একে খণ্ডন করেন। রামমোহন বলেন—নারীদের যে অল্পবুদ্ধি বলা হয়, এটি শুধু সন্দেহ মাত্র। কেননা, পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীকে কোনদিনও শিক্ষার সুযোগ দেওয়া হয় নি। তাঁর ভাষায়,—"আপনারা বিদ্যা শিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরূপে নিশ্চয় করেন?" (২৭) স্ত্রীলোক অস্থির মানসিকতার এই অভিযোগের বিরুদ্ধে রামমোহনের যুক্তি—যে দেশের নারী মৃত্যুর উদ্দেশ্যে অগ্নিতে প্রবেশ করার কৃত সংকল্প করে সে দেশের নারী অস্থির মতির অপবাদ বহন করতে পারে না। আর 'বিশ্বাসঘাতক' ও 'সানুরাগা' প্রসঙ্গে রামমোহন বলেন, এই অভিযোগ দু'টি বরং পুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিশ্বাসভঙ্গ এবং একাধিক বিবাহের রেকর্ডে পুরুষই অগ্রগণ্য। যাঁরা বলেন, এদেশের নারীর ধর্মভয় নেই, তাঁদের বিরুদ্ধে রামমোহনের বক্তব্য "এ অতি অধর্ম্মের কথা" (২৮) বরং নারী ধর্মরক্ষার জন্য দুঃখ, অপমান, তিরস্কার সবই সহ্য করে। উনিশ শতকের প্রথমেই নারী সম্বন্ধে রামমোহনের এরকম প্রগতিশীল ভাবনা আমাদের বিস্মিত করে।

গ্রন্থশেষে রামমোহন রায় সহমরণের মতো নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথা বন্ধ করার জন্য সমাজপতিদের আন্তরিক আবেদন করেন। তিনি বলেন;—"দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করা হইতে রক্ষা পায়।" (২৯)

'সহমরণ বিষয়'-এ রামমোহন উল্লিখিত দু'টি গ্রন্থের মতো সহমরণ প্রথা বন্ধ করার বিষয়ে আবেদন করেছেন।

ঘ) ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক ঃ

এখানে ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ক গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়,—

১। গায়ত্রীর অর্থ

২। আত্মানাত্ম বিবেক

৩। গায়ত্র্যা ব্রহ্মাপাসনা বিধানং

৪। ব্রাহ্ম সঙ্গীত

৫। অনুষ্ঠান

৬। ব্রহ্ম নিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ

যদিও এই বিভাগ ত্রুটি মুক্ত নয়, তবুও ব্রহ্ম ও ব্রাহ্মসমাজকে বিষয় করে রচিত হওয়ায় এরকম বিভাগ করা হল।

আমাদের ভারতীয় সমাজ ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্মকে বাদ দিয়ে এই জাতির জন্য বৃহৎ কিছু করা সম্ভব নয়। আর তাই রামমোহন রায় ধর্মকে নিত্যসঙ্গী করে জাতির উত্তরণের সোনালী স্বপ্ন দেখেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন— আমাদের উত্তরণের জন্য প্রয়োজন শাস্ত্রজ্ঞান ও বুদ্ধির প্রয়োগ। তিনি শাস্ত্র জ্ঞান ও বুদ্ধির বলে 'একমেবাদ্বিতীয়ং'কেই উপাসনার কথা বলেন। উক্ত গ্রন্থগুলি এই 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-এর তত্ত্ব ও উপাসনার রীতি এবং পদ্ধতির গ্রন্থ বলা যায়।

ঙ) নীতিমূলক ঃ

রাজা রামমোহন রায় শুধু ধর্মীয় তত্ত্বকথা বা সমাজসংস্কার করেই ক্ষান্ত থাকেন নি। বৃহত্তর মানব সমাজের উন্নতির জন্য নৈতিক চেতনার উদ্বোধন ঘটানোর চেষ্টা করেন। রামমোহন যেন অনুভব করেছিলেন, মানুষের নৈতিক চেতনার উন্নয়ন না করলে একটি সুস্থ ও স্বাভাবিক সমাজ গড়া সম্ভব নয়। সেজন্য বাংলা সাহিত্যে তিনি কয়েকটি নীতিমূলক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর নীতিমূলক গ্রন্থগুলির পাতায় আর একটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে, তা হল মানবিক মূল্যবোধ। রামমোহনের একাধিক গ্রন্থের মধ্যে 'ব্রহ্মোপাসনা', 'ব্রহ্মসূচী' ও 'প্রার্থনা পত্র' তিনটি গ্রন্থকে নীতিমূলক রচনার অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'ব্রহ্মোপাসনা' রচনাটিতে রামমোহন মানুষের নৈতিক কর্মের দু'টি দিকের কথা বলেছেন। যথা;— পরমেশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা এবং অপরের সঙ্গে সৌজন্যমূলক ও সাধু ব্যবহার। তিনি বলেন, ভালো ব্যবহার করা মানুষের নৈতিক কর্তব্য। কেননা মন্দ ব্যবহার অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই সমাজে শান্তিতে বসবাসের জন্য পরস্পর ভালো ও সাধুব্যবহার করা উচিত।

'বজ্রসূচী' নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতে রাজা রামমোহন রায় আমাদের সমাজের জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করেছেন।

তিনি প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা মানতেন না। কেননা, তিনি জানেন—তাতে জাতীয় ক্ষতির সম্ভাবনা বেশী। সেজন্যই রামমোহন বৌদ্ধ মহাজন সম্প্রদায়ের এই গ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন। তিনি বলেন জীবাত্মা, দেহ, জাতি, ধর্ম, বর্ণ, পাণ্ডিত্য ও কর্মের ভেদে ব্রাহ্মণ হয় না। তাঁর মতে;—

> "করতলস্থিত আমলকীফলে যেমন নিশ্চয় হয় তাহার ন্যায় পরমাত্মার সত্তাতে বিশ্বাস দ্বারা কৃতার্থ হইয়া শম দমাদি সাধনে যত্নশীল এবং দয়া ও সরলতা, ক্ষমা, সত্য, সন্তোষ ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট ও মাৎসর্য্য, দম্ভ, মোহ ইত্যাদির দমনে যত্নবান যে ব্যক্তি হন, তাঁহাকেই কেবল ব্রাহ্মণ শব্দে কহা যায়,"(৩০)

অর্থাৎ এই গ্রন্থটিতে রামমোহন রায় জাতিভেদ প্রথার নিন্দা করে তাঁর প্রগতিশীল মতকেই প্রতিষ্ঠিত করেন।

'প্রার্থনা পত্র' নামে ক্ষুদ্র রচনাটিতে রামমোহন রায় অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত করেন। গ্রন্থের নাম করণ করেন 'সবিণয় প্রার্থনা'। লেখকের প্রার্থনা হল—আমাদের মনে যেন সাম্প্রদায়িকতা স্থান না পায়। তাহলেই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করা যাবে, নচেৎ সম্ভব নয়।

চ) খৃীষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদের সমালোচনা ও মিশনারিদের হিন্দু নিন্দার প্রত্যুত্তর ঃ

রাজা রামমোহন রায় মিশনারিদের হিন্দু নিন্দায় যে গভীরভাবে-মর্মাহত হয়েছিলেন তারই সাহিত্যিক প্রমাণ 'ব্রাহ্মণ সেবধি' এবং 'পাদরী ও শিষ্য সম্বাদ' নামক গ্রন্থদু'টি।

শ্রীরামপুরের খৃীষ্টধর্ম প্রচারকগণ এদেশীয় হিন্দুধর্মের নিন্দা করতেন 'দিগ্‌দর্শন' (১৮১৮) ও 'সমাচার দর্পণ' (১৮১৮) নামে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। রামমোহন তাতে মর্মাহত হয়েছিলেন। প্রসঙ্গত মনে হতে পারে, শ্রীরামপুরের কর্মকর্তারা দেশীয় প্রচলিত হিন্দুধর্মের নিন্দা করলে 'একেশ্বরবাদী' রামমোহন রায়ের মর্মাহত হওয়ার তো কিছু নেই। এর উত্তর পাওয়া অত্যন্ত জটিল। যদি রামমোহন রায়কে একজন স্বদেশ হিতৈষী মনে করে সমস্যা সমাধানের পথে অগ্রসর হই, তাহলে সহজেই একটি সমাধান সূত্র পাওয়া যাবে। হিন্দুধর্ম এদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম। এই অধিকাংশ মানুষের ধর্মকে নিন্দা করার অর্থ হল, এদেশের অধিকাংশ মানুষের বিশ্বাসকে আঘাত করা। একজন স্বদেশ প্রেমিক অধিকাংশ মানুষের স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াকে কিছুতেই সহ্য করবেন না। তিনি 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামক গ্রন্থে স্বদেশের মানুষের স্বার্থে তার প্রতিবাদ করেন। শুধু প্রতিবাদ করেই তিনি থেমে থাকেন নি, ঘুণেধরা হিন্দু ধর্মকে সংস্কার করে জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।

'ব্রাহ্মণ সেবধি'র প্রথমেই রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের উদ্দেশ্যে বলেন, ধর্মীয় ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বাংলাদেশের মত নিঃস্ব ও পরাধীন দেশে শোভা পায় না। তিনি একরকম চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন যে, যদি সামর্থ থাকে তাহলে 'তুরকী' ও 'পারসিয়া'র মতো স্বাধীন দেশে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করুন। রামমোহন বলেন;— "যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভর ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন...।"[৩১] অর্থাৎ তুর্কী বা পারসিক প্রভৃতি স্বাধীন দেশে মিশনারিদের ধর্মীয়ক্ষেত্রে এদেশের মতো বাড়াবাড়ি করলে ধর্মীয় নিষ্ঠার যথার্থ প্রকাশ পাওয়া যাবে। আসলে রামমোহন বিশ্বাস করতেন, ওই সব স্বাধীন দেশে খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্ম নিয়ে বাড়বাড়ি করার ক্ষমতা নেই।

রাজা রামমোহন রায়ের খ্রীষ্টান ধর্ম বিষয়ে সমালোচনামূলক গ্রন্থ 'পাদরি ও শিষ্য সম্বাদ'। এই পুস্তকে তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের ত্রিত্ববাদের সমালোচনা করেন। সম্ভবত তিনি খ্রীষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার বিষয়ে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি প্রত্যক্ষ করে এজাতীয় গ্রন্থের অবতারণা করেন।

ছ) বাংলা ভাষা বিষয়ক ঃ

উনিশ শতকের গোড়াতেই রামমোহন ভাষাবিজ্ঞানীর মতো মানুষের মুখের ভাষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তাই তিনি সংস্কৃত ভাষায় আবদ্ধ জ্ঞানীগুণী মানুষের সাধনার ফলকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার কথা বলেন। তাঁর ধারণা মাতৃভাষা মানুষ সহজেই বুঝবে এবং গুরুগম্ভীর যুগোচিত ভাবনাকে মাতৃভাষায় প্রচার করলেই এদেশের মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার খুব তাড়াতাড়ি মুছে যাবে। রামমোহনের বাংলা ভাষা চর্চা করার পিছনে ঐ বিষয়টি কাজ করেছে। রামমোহন শুধু বাংলা চর্চাই করেন নি। বাংলা ভাষাকে প্রকৃত জানার জন্য 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩) রচনা করেন।

অতএব বাঙালী জীবনের উন্নয়নের জন্য ধর্মীয় শৃঙ্খলা, সামাজিক অনাচার দূরীকরণ, নারীকে মানবিক মূল্য দান, নৈতিকতার প্রদর্শন, বাংলা ভাষা ও স্বদেশীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা ও মানুষকে স্বাধীন চিন্তা করতে শেখানোর মহৎ উদ্যোগ রামমোহনের বাংলা রচনাগুলির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যাকে আমরা স্বদেশভাবনা বলে অভিহিত করতে পারি।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

এদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) মতো একজন যুগচিন্তা মহানায়কের আবির্ভাব যুগান্তকারী ঘটনা। জাতির দুর্দিনে তাঁর মতো একজন স্বদেশপ্রেমিক 'প্রমোদশয্যায়' সুখে দিন কাটাতে পারেন

নি। তিনি দেখলেন, শিক্ষার অভাবে জাতি প্রকৃত সত্যকে ছেড়ে নানা 'দেশাচারে' মত্ত। তাঁর ক্লান্তিহীন মহৎ কর্মপ্রয়াসের অন্তরালে দেশবাসীকে মানবিক অধিকার দানের বিষয়টি প্রকাশ পায়। সেদিনের পঙ্গু জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করে জাতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষে তিনি মূলত দু'টি বিষয়ের দিকে মনোযোগী হলেন। প্রকৃত শিক্ষার (আধুনিক শিক্ষা) প্রচলন ও জাতির মন থেকে 'দেশাচার' (কুসংস্কার) বর্জনের জন্য আন্দোলন।

বিদ্যাসাগর বাংলার কর্মভূমিতে আবির্ভূত হয়ে যে বৈশিষ্ট্যটির দ্বারা সবাইকে অভিভূত করেছিলেন, তা হল তাঁর 'অনমনীয় বীর্যবান ব্যক্তিত্ব'। আমরা লক্ষ করব, বিদ্যাসাগরের এই অনমনীয় ব্যক্তিত্বও এক গভীর স্বদেশ প্রেম থেকে উৎসারিত। জন্মকালে পিতামহ বিদ্যাসাগরকে 'এঁড়ে বাছুর' বলে রসিকতা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনী গ্রন্থে এঁড়ে বাছুর বলার যৌক্তিকতা আছে। বিদ্যাসাগরের পিতামহ বলেন;—

> "ইহাকে "এঁড়ে বাছুর" বলিবার কারণ এই যে, এ বালক এঁড়ে বাছুরের মতো একগুঁয়ে হইবে। যাহা ধরিবে, তাহাই করিবে, কাহাকেও ভয় করিবে না। এই বালক ক্ষণজন্মা, প্রতিদ্বন্দ্বিহীন ও পরম দয়ালু হইবে, ইহার যশোগীতের চারিদিক পূর্ণ হইবে, ইহার জন্মগ্রহণে আমার বংশের অক্ষয় কীর্তিলাভ হইল। এই জন্য ইহার নাম রাখিলাম ঈশ্বরচন্দ্র।" (৩২)

বিদ্যাসাগর সমকালের বাঙালীর চরিত্রের অনেক বিষয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন। যেমন উচ্চবর্ণের দেশাচারে মগ্নতা, উচ্চবিত্তের উদ্যোমহীন সুখস্বপ্ন বিলাসিতা, শিক্ষিত শ্রেণীর অনুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি। এসব বিষয় বিদ্যাসাগরের জেদি স্বভাবকে আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ করে তুলেছিল।

শিশুর স্বভাবিক প্রতিভাকে সুষ্ঠুভাবে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন অনুকূল পরিবেশ। সেসময়ের বাংলার পারিপার্শ্বিক পটভূমি বিদ্যাসাগরের একগুঁইয়েমী স্বভাবকে সযত্নে লালন পালন করেছিল। যদি তাঁর জেদি - তেজদীপ্ত স্বভাব না থাকত, তাহলে তিনি জাতির জন্য যতটুকু কাজ করেছিলেন, তা সম্পন্ন করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। হয়ত তাঁর মহৎ সংকল্পগুলি অকালে প্রয়াণ পেত। অতএব, বিদ্যাসাগরের জন্মগত 'এঁড়ে' পরিচয় ও বাল্যকালের 'একগুঁইয়েমী' স্বভাব পরবর্তীকালে সযত্নে অনমনীয় ব্যক্তিত্বের শীর্ষ সীমায় উন্নীত হয়েছে। দাবী করা যায়, তাঁর স্বদেশ ভাবনা অনেকাংশে বাস্তব পূর্ণতা পেয়েছে জেদি ও অনমনীয় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে।

বিদ্যাসাগর 'দেশাচার'কে সমাজের প্রগতির ক্ষেত্রে সংক্রামক ব্যাধির মতো একটি ভয়ঙ্কর ব্যাধি মনে করতেন। ধর্মের বিকৃত রূপ বা পচাগলা রূপ 'দেশাচার' এর বিরুদ্ধে তিনি আজীবন আন্দোলন করেছিলেন। সে সময় ধর্ম বলতে বোঝাত জাতপাত, বর্ণবৈষম্য, স্বার্থান্বেষী উচ্চবর্ণের নানা আচরণ বিধি, যা মূল ভারতীয় ধর্ম বা শাস্ত্রের বিকৃত মত ও পথ। তাঁর মতো একজন স্বদেশপ্রেমিক এই দেশাচারের বিরুদ্ধাচারণ করবেন—

এটাই স্বাভাবিক। আর তাই বিদ্যাসাগর দেশাচারে মগ্ন সমাজকে সংস্কার করতে এগিয়ে আসেন। তাঁর বিধবা বিবাহ প্রচলনে অগ্রণী ভূমিকা নেওয়া ছাড়া বাল্যবিবাহ রদ, বহুবিবাহ রদ, শূদ্রছাত্রদের সংস্কৃত কলেজে প্রবেশাধিকার প্রভৃতি নানা সংস্কারমূলক আন্দোলন একটি পঙ্গু বা অসুস্থ জাতিকে সামান্য হলেও সুস্থতা ও সবলতা দান করতে সক্ষম হয়েছিল।

দেশাচারে মত্ত দেশীয় সমাজকে সুস্থ করতে হলে সর্বপ্রকার সংকীর্ণতা মুক্ত শিক্ষার প্রয়োজন। বিদ্যাসাগর এই বিষয়টি গভীরভাবে অনুভব করেন এবং প্রকৃত শিক্ষা দানের জন্য শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন। কর্মজীবনে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে, এই বিষয়ে ভাবনার আরো অবকাশ পান। তিনি প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য কখনো সরকারী সুযোগকে কাজে লাগানোব চেষ্টা করেন, কখনো বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর মধ্যে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের অন্যতম কাজ। কেননা, বিদ্যাসাগর এদেশের নির্যাতিতা নারী জাতির জন্য অনেক অধিকার আদায় করে দিয়েছিলেন। সেই অধিকারকে স্থায়িকরণের জন্য ও নারীকে নিজের মানবিক মর্যাদা নিজেই রক্ষা করতে শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। সেজন্যই হয়ত নারী শিক্ষার প্রতি তাঁর উৎসাহের শেষ ছিল না। এই যুগচিন্তা নায়ক জাতিকে শিক্ষিত করার জন্য অকৃত্রিম চিন্তা করেছিলেন। সেজন্য তিনি বলেছিলেন, বাঙালীকে প্রকৃত শিক্ষিত করতে হলে প্রথমে বাংলা ভাষার উন্নয়ন প্রয়োজন। নতুবা জাতীয় শিক্ষার মান কোনদিনও উন্নতি হবে না। এবং মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করার বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল,—মাতৃভাষা চর্চাকারীদের দু'টি বিষয়ে নজর দিতে হবে — প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষা জানা, দ্বিতীয়তঃ ইংরেজী ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন।

বিদ্যাসাগর মনে করতেন, সংস্কৃত ভাষা খুব ভালোভাবে জানলে সহজ সরল বাংলা ভাষা চর্চায় বুৎপত্তি হবে। এই সহজ সরল মাতৃভাষাতেই পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান প্রকাশ করতে হবে। তাহলেই জাতীয় ভাষার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে সার্থকভাবে শিক্ষা দান করা সম্ভব হবে। এই জন্যই তিনি তাঁর সংস্কৃত কলেজকে একটি মডেল কলেজ রূপে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল সংস্কৃত কলেজে যাঁরা পড়বেন, তাঁরা দেশহিতৈষী মনোভাব অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে সমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারবেন। জাতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষে তিনি নিজেও বাংলা ভাষা চর্চা করেছিলেন এবং একাধিক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন।

বিদ্যাসাগরের অকৃত্রিম স্বদেশ প্রেমের আরো নিদর্শন পাওয়া যায়, ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম বিষয়ে তাঁর সচেতন উদাসীনতার মধ্যে। আমরা সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করলে বুঝব যে, এখানে তাঁর মনের একটি দ্বন্দ্ব লুকিয়ে আছে। তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতবর্ষ অধ্যাত্মিক জ্ঞানে পরিপূর্ণ কিন্তু ঐহিক বা বাস্তবজ্ঞান একেবারেই শূন্য। তাই তিনি শঙ্করাচার্য-কপিলদেব প্রমুখ দার্শনিকের মত ও পথ ছেড়ে বেন্থাম-মিল প্রমুখ

দার্শনিকের দর্শন গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তিনি অনুভব করেছিলেন জাতির উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য দর্শন জানা অত্যন্ত জরুরি। কেননা ছাত্র যদি জগৎকে মিথ্যা জানে তাহলে দেশের জাগতিক উন্নয়ন সম্ভব হবে না। দেশের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর বললেন বেদান্ত দর্শন ও সাংখ্যদর্শন মিথ্যা মত ও পথ। বিদ্যাসাগর অন্ধভাবে এরকম কথা বলার মানুষ নন। তিনি অন্য আর একটি জায়গায় বলেন, জ্ঞান চোখ খুলে জীবনের সব কিছু বিচার করে দেখা উচিত। এখানে বিদ্যাসাগর উদার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে স্বদেশের মঙ্গলের জন্য বেদান্ত ও সাংখ্য দর্শনকে পরিহার করতে চেয়েছিলেন।

তাছাড়া ধর্মবোধ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে উদাসীন ছিলেন। প্রশ্ন জাগতে পারে, বিদ্যাসাগর ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম সম্বন্ধে আদৌ উদাসীন ছিলেন কি না। আমরা জানি, সে সময় ভারতীয় সংস্কৃতি রক্ষা করার জন্য অনেক স্বদেশ হিতৈষী নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। এও হতে পারে তাঁদের দায়িত্বপূর্ণ কর্মপ্রয়াসের জন্য হয়ত ওই সব বিষয়ের প্রতি তিনি নীরব ছিলেন। যদি সেসময় বিশ্বাসযোগ্য কোন নেতৃত্ব না থাকত তবে দেশীয় ধর্ম ও দেশীয় সংস্কৃতি রক্ষার জন্য তিনি এগিয়ে আসতেন না এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

বিদ্যাসাগর তাঁর লেখনীতে দেশীয় শাস্ত্রের বিষয়ে গভীর শ্রদ্ধার বিষয়টি ব্যক্ত করেন। আমরা জানি, দেশীয় শাস্ত্রগুলি দেশীয় ধর্ম রক্ষার নিয়ম বিধি। দেশবাসী দেশীয় শাস্ত্রের প্রকৃত মত না মানার অর্থ দেশীয় ধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা। এই বিষয়টি বিদ্যাসাগর সহ্য করতে পারেন নি। তিনি বলেছেন, ভারতবর্ষের অবনতির মূল অন্বেষণ করলে শাস্ত্রকে না মানার কারণটি খুঁজে পাওয়া যাবে। অতএব বিদ্যাসাগর দেশীয় ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন,—এমন মত প্রতিষ্ঠা করা যায়। আসলে ধর্মের সঙ্গে দেশাচার ও সাম্প্রদায়িকতা এমনভাবে জড়িয়ে ছিল যে, বিদ্যাসাগর সমকালের প্রচলিত ধর্মের ধারে কাছে ঘেঁষতে চান নি।

এগুলি ছাড়াও তিনি পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্য জেনেও দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃত সাহিত্যের কবি কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা দিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত চিঠিতে হিন্দু দেবদেবীর নাম ব্যবহৃত হত। জানা যায়, ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন। দেশীয় পোষাক পরিচ্ছদ ছেড়ে বিলিতি পোষাক গ্রহণ করেন নি। বিদ্যাসাগরের এইসব ক্রিয়াকলাপগুলি সবই যে যুক্তি আশ্রিত বা Practical ধর্মী—তা নয়। তবুও ব্যক্তিগত জীবনে এগুলিকে মেনে চলতেন। এতে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, বিদ্যাসাগর স্বদেশপ্রেমের খাতিরে অনেক সময় যুক্তি আশ্রিত বিষয় নয় এমন কিছু বিষয়ের সঙ্গে আপোষ করেছিলেন। তাতে তাঁর মনের সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয়ই পাওয়া যায়।

আর একটি বিষয় সম্পর্কে ধারণা লাভ করা আবশ্যক তা হল — রাজনৈতিক পরাধীনতার গ্লানি, অর্থনৈতিক শোষণ ও বৃহত্তর সামাজিক বৈষম্যের বিষয়ে বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে সোচ্চার হন নি। তবু বলা

যায়, এই নীরবতা তাঁর পক্ষে কোন কলঙ্কের নয়। আমরা জানি, বিদ্যাসাগর হৃদয়বানের জীবন্ত বিগ্রহ। অন্যের দুঃখ লাঞ্ছনা দেখলে তাঁর চোখে জল আসত। যদি দেশের চরম দুর্দশা, পরাধীনতা, ঔপনিবেশিক শোষণ, সামাজিক বৈষম্য প্রভৃতির জন্য বৃহত্তর আন্দোলনের মতো পরিবেশ থাকত, তাহলে তিনি কিছুই করতেন না, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। তাঁকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা এমন মত কিছুতেই মানবেন না। ব্যক্তিগতভাবে বিদ্যাসাগর জাতপাত, বর্ণবৈষম্য মানতেন না। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য কেউ চাইলে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। সর্বোপরি তিনি মানবতার অবমাননা দেখলে প্রতিবাদ করতেন। তাই বিদ্যাসাগর উল্লিখিত বিষয়ে যদিও সেরকম কিছুই করেন নি, তবুও তাঁর পক্ষে সেটি বিশেষ দোষার্হ নয়। স্বাধীনতা বা অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কিছু করা তাঁর পক্ষে হয়ত সম্ভব ছিল না। দূরদর্শী বিদ্যাসাগর এব্যাপারটি বুঝেছিলেন। সেজন্যই হয়ত তিনি নীরব ছিলেন। চোখ কান খোলা রেখে নিজের বাস্তব ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে স্বজাতির জন্য যা করেছেন, তা অবশ্যই মহৎ ও বৃহৎ। বাঙালী যতদিন বেঁচে থাকবে, বিদ্যাসাগরের ঋণের কথা চিরদিন মনে রাখতে বাধ্য।

আমরা লক্ষ করব, বিদ্যাসাগর দেশের উন্নতি বা জাতির মঙ্গল কামনায় চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁর রচিত সাহিত্যে সেই মানসিকতারই প্রকাশ ঘটেছে। বিদ্যাসাগরের রচিত সাহিত্যের আন্তরিক প্রেরণা—কখনো দেশবাসীর মনের কুসংস্কার মোচনের তাগিদ, কখনো দেশবাসীকে প্রকৃত শিক্ষা দানের চিন্তাভাবনা, কখনো জাতীয় ভাষা উন্নয়নের প্রচেষ্টা, কখনো বা এদেশের দীর্ঘদিনের নির্যাতিতা নারী জাতির দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করে অধিকার আদায়ের জন্য মরমী আবেদনে সমৃদ্ধ। সর্বোপরি বিদ্যাসাগরের মানবিক মূল্যবোধের সচেতনতা তাঁকে জাতির মনের মণিকোঠায় স্থায়ী আসন দিয়েছে। বিদ্যাসাগরের বাংলা রচনাগুলির বিষয় মূলত সমাজ সংস্কার, শিক্ষামূলক ও জাতীয় ভাষা সাহিত্যের উন্নতির ভাবনায় মুখর।

সমাজ সংস্কারমূলক বাংলা রচনা ঃ

সমাজের মানুষের উন্নত চিন্তাচেতনা না থাকলে উন্নয়ন অসম্ভব। দীর্ঘদিন ধরে বাঙালী সমাজ উদার ও উন্নত চিন্তাচেতনা ছেড়ে কুসংস্কারকে গ্রহণ করেছে। উনিশ শতকের উদার ভাবনার প্রভাবে অনেক যুগচিন্তা নায়ক জাতির সামাজিক অন্ধত্বকে আক্রমণ করে প্রগতির কথা ভেবেছিলন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের একাধিক চিন্তানায়কের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ। তিনি লক্ষ করলেন, এদেশের ছেলে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে হবার নিয়ম, কুলীন ব্রাহ্মণদের একাধিক বিয়ের নিয়ম, বিধবা রমণীদের কঠোর ব্রত পালনের দুর্বিষহ নিয়ম; এছাড়া মানুষে মানুষে ভেদাভেদ, বর্ণবৈষম্য প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির মতো বিষয়গুলি সমাজকে অসুস্থ করে তুলেছিল। বিদ্যাসাগর এইসব সামাজিক দেশাচার ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে উঠলেন। তিনি

প্রমাণ করার চেষ্টা করেন এই নিয়ম বিধিগুলি মূল শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে পৃথক মত ও পথ। এগুলি আসলে দেশীয় শাস্ত্র ও ধর্ম বহির্ভূত প্রথা। বিদ্যাসাগরের সমাজ সংস্কার বিষয়ক বাংলা রচনাগুলি হল;—

ক) 'বাল্যবিবাহের দোষ'

খ) 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব'

গ) 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব'

ঘ) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'

ঙ) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার'

একথা ঠিক বিদ্যাসাগর জাতির সামাজিক বৈষম্যের প্রতিবাদে বৃহত্তর কর্মপ্রয়াস গড়ে তোলন নি। কিন্তু অবহেলিত বৃহত্তর নিম্ন বর্ণের বাঙালী জাতির চেয়েও অবহেলার তলানিতে ঠেকে যাওয়া এদেশের নারী সমাজ। বিদ্যাসাগর এই চূড়ান্ত অবহেলিত নারী সমাজের প্রতি সমাজিক অবহেলা ও নির্যাতন দেখে গভীর ভাবে ব্যথিত হয়েছিলেন। সেজন্য তাঁর কর্মপ্রয়াসের বৃহত্তর ভাবনার অনেকটাই এদেশের নারী সমাজের জন্য ব্যয় হয়েছিল। তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিধবা বিবাহকে সমর্থন জানিয়ে ভাই শম্ভূচন্দ্রের কাছে মনোভাব ব্যক্ত করেন এই ভাষায়;—

> "বিধবাবিবাহের প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম, জন্মে ইহা অপেক্ষা অধিক কোনো সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই; এবিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত করিয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি;" (৩৩)

সমাজের বিধবা নারীর করুণ বেদনা বিদ্যাসাগরের হৃদয়কে স্পর্শ করেছিল, তাই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে গিয়ে প্রাণের ভয়কেও তুচ্ছ জ্ঞান করেছিলেন। এর চেয়ে দেশের নারী সমাজের প্রতি মহান আত্মোৎসর্গ আর কিছু হতে পারে না। এবারে আমরা বিদ্যাসাগরের সমাজ বিষয়ক গ্রন্থগুলি আলোচনা করব।

ক) 'বাল্যবিবাহের দোষ' (১৮৫০) ঃ

যদি কেউ বলেন 'বাল্যবিবাহের দোষ' যে বিদ্যাসাগরের রচনা তাঁর প্রমাণ চাই, তাহলে অন্য কথা। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনীকার ও অনেক গবেষক প্রবন্ধটির আভ্যন্তরীণ বিষয়ের দ্বারা সিদ্ধান্তে উপনীত হন— 'বাল্যবিবাহের দোষ' বিদ্যাসাগরেরই রচনা।

যদি 'বাল্যবিবাহের দোষ' বিদ্যাসাগরের রচনা হয়, তাহলে তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক একাধিক গ্রন্থের মধ্যে এটিই প্রথম। বিদ্যাসাগরের মনে স্বদেশ প্রেম যে কত গভীর ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'বাল্যবিবাহের

দোষ' নামক প্রবন্ধটিতে। তিনি লিখেছেন;—"অন্যান্য জাতি অপেক্ষা অস্মদ্দেশীয় লোকেরা যে শারীরিক ও মানসিক সামর্থ্যে নিতান্ত দরিদ্র হইয়াছে, কারণ অন্বেষণ করিলে পরিশেষে বাল্যবিবাহই ইহার মুখ্য কারণ নির্দ্ধারিত হইবেক সন্দেহ নাই।" (৩৪) কিংবা তিনি আরো বলেছেন;—

> "অস্মদ্দেশীয়েরা ভূমণ্ডলস্থিত প্রায় সর্বজাতি অপেক্ষা ভীরু, ক্ষীণ, দুর্বলস্বভাব এবং অল্পবয়সেই স্থবির দশাপন্ন হইয়া অবসন্ন হয়, যদ্যপি এতদ্বিষয়ে অন্যান্য সামান্য কারণ অন্বেষণ করিলে প্রাপ্ত হওয়া যায় বটে, কিন্তু বিশেষ অনুসন্ধান করিলে ইহাই প্রতীতি হইবে যে, বাল্যবিবাহই এ সমুদায়ের মুখ্য কারণ হইয়াছে।" (৩৫)

আবার বাঙালী জাতির মধ্যে বীরপুরুষের অভাব এর কারণ হিসাবে তিনি বলেন;—

> "এই ভারতভূমিও বীর প্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।...এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়?" (৩৬)

—অতএব অল্প বয়সে বাঙালীর বিবাহ জাতির সর্বনাশের একটি মুখ্য কারণ নির্ধারিত হয়। যুগচিন্তানায়ক বিদ্যাসাগর বাঙালীর এরকম বৃহত্তর সর্বনাশের প্রতিবিধানের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি 'বাল্যবিবাহের দোষ' নামক প্রবন্ধে আরো কয়েকটি অমঙ্গলের কথা বলেন। যেমন বিদ্যাচর্চার ব্যাঘাত, ভালোবাসার বন্ধনে শীথিলতা, নিরক্ষর মায়ের সন্তানের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্ভাবনা, উপার্জনে অক্ষমের ফলে দরিদ্রতা, বাল্যবিবাহিত ছেলেদের বাল্য বয়সেই মৃত্যুর সম্ভাবনা এবং তার ফলে নারীর বাল্যেই বৈধব্য যন্ত্রণা প্রভৃতি অভিশাপ বাল্যবিবাহের চরম পরিণতি।

এই প্রবন্ধের দ্বারা বিদ্যাসাগর জাতিকে সুস্থ ও সবল জীবন ধারণের পরামর্শ দিয়েছেন।

খ) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব ঃ

বিধবা বিবাহ প্রচলন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মহৎ মানবিকতার প্রকাশ। শুধু দৈহিক দিক থেকে নারী-পুরুষ আলাদা হওয়ায় নারীর একবারের বেশী বিবাহ নিষিদ্ধ। স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁকে সারা জীবন ধরে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই সামাজিক বিধান বিদ্যাসাগরকে গভীরভাবে আহত করেছিল। তিনি নারী-পুরুষের আকাশ-পাতাল ভেদাভেদ দূরীকরণের জন্য বিধবাবিবাহের প্রস্তাব দেন। বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব'-এ বলেন;—"বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত না থাকাতে যে নানা অনিষ্ট ঘটিতেছে, ইহা এক্ষণে অনেকেরই হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে।" (৩৭) দেশীয় সমাজের এই অনিষ্ট দূরীকরণ ও বিধবাদের মানবিক মর্যাদা প্রাদান করবার জন্য বিদ্যাসাগর নেতৃত্ব দেন।

রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে সরকারী সহযোগিতায় ইতিপূর্বে সহমরণের মতো একটি বর্বর প্রথা নিষিদ্ধ হয়। সহমরণ রদ হওয়ায় অথচ বাল্য বিবাহ প্রচলন এবং অধিকবয়স্ক ব্যক্তির বালিকা বিবাহের রীতি প্রচলিত থাকায় বালিকা বিধবাদের দুর্দশার সীমা ছিল না। তাই বিদ্যাসাগর লেখেন;—

> "দুর্ভাগ্যক্রমে, বাল্যকালে যাহারা বিধবা হইয়া থাকে, তাহারা যাবজ্জীবন যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে, তাহা যাঁহাদের কন্যা, ভগিনী, পুত্রবধূ প্রমুখ অল্পবয়সে বিধবা হইয়াছেন, তাঁহারা বিলক্ষণ অনুভব করিতেছেন।" (৩৮)

তিনি বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটিয়ে এই যন্ত্রণার অবসানের কথা ভেবেছিলেন। তিনি আরো বলেন;—

> "যাবৎ এই শুভকরী প্রথা প্রচলিত না হইবেক, তাবৎ ব্যভিচারদোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত, কলঙ্কের প্রবাহ ও বৈধব্য যন্ত্রণার অনল উত্তরোত্তর প্রবল হইতেই থাকিবেক।" (৩৯)

বিদ্যাসাগর জানেন যে, এমনিতে তাঁর কথা কেউ গুরুত্ব দেবে না। তাই বিধবা বিবাহ যে শাস্ত্রানুমোদিত তা তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কেননা, ভারতীয়রা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ও ধর্ম-শাস্ত্রানুসারে চলতে ভালবাসে। 'মনু', 'অত্রি', 'বিষ্ণু', 'হারীত', 'অঙ্গিরা', 'পরাশর', 'ব্যাস' প্রমুখ এদেশের ধর্মশাস্ত্র প্রণেতা। দেশবাসী এঁদের নির্দেশিত পথকে ধর্মশাস্ত্র অনুসারী মত ও পথ বলে মনে করে। কলিযুগের জন্য ধর্মশাস্ত্র হল 'পরাশর সংহিতা'। এই 'পরাশর সংহিতা' কলিযুগের মানুষের জন্য নির্দেশিত ধর্মপথ। 'পরাশর সংহিতা'য় বিধবাদের জন্য লেখা আছে;—

> "নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
> পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে।।" (৪০)

—অর্থাৎ স্বামী হারিয়ে গেলে, মরে গেলে, ক্লীব হলে, সংসার ধর্ম ত্যাগ করলে, অথবা পতিত হলে নারী পুনরায় বিয়ে করতে পারে। অবশ্য পরাশর কলিযুগের নারীর জন্য তিনটি বিধান দিয়েছেন যথা;— বিবাহ করা, সহমরণে যাওয়া ও ব্রহ্মচর্য অবলম্বন করা। সহমরণ প্রথা রামমোহনের প্রচেষ্টায় পূর্বেই নিষিদ্ধ হয়েছিল। এখন থাকল ব্রহ্মচর্য ও বিবাহের বিধি। এদিকে ব্রহ্মচর্য পালনের বিধান প্রচলিত থাকায় সমাজে নানা ব্যভিচার দেখা দিচ্ছে। অতএব দেশীয় সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে হলে 'পরাশর সংহিতা' মতে বিবাহ বিধিই একমাত্র পথ। বিদ্যাসাগর এই শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপন করে দেশবাসীকে বিধবা বিবাহের প্রচলনের জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

গ) বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব ঃ

বিধবা বিবাহের প্রথম প্রস্তাব প্রকাশিত হওয়ার পর এদেশে রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি হয়। অনেকেই এই প্রস্তাবকে উদ্দেশ্য করে নানা রকম প্রশ্ন করেন। 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব' হল পাঠকের জিজ্ঞাসার উত্তরমূলক গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর বলেন;—

> "আমি এই প্রত্যুত্তর প্রদান বিষয়ে বিস্তর যত্ন ও বিস্তর পরিশ্রম করিয়াছি। পাঠকবর্গের নিকট বিনয়বাক্যে প্রার্থনা এই, তাঁহারা যেন, অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্বক, নিবিষ্ট চিত্তে; এই প্রত্যুত্তর পুস্তক অন্ততঃ একবার আদ্যোপান্ত পাঠ করেন," (৪১)

বলা বাহুল্য এই গ্রন্থটিও বিধবা বিবাহের সমর্থনে রচিত। কিন্তু শাস্ত্রীয় প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল দেশাচারের দোহাই দিয়ে একটি শ্রেণী আছে যারা বিধবা বিবাহের বিরোধী। আলোচ্য গ্রন্থে ঠিক এরকম প্রসঙ্গ উঠলে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তি মনের ছবিটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠে। এই সময় তাঁর মনের অকৃত্রিম স্বদেশভাবনা অকপটে প্রদর্শিত হয়। তিনি দেশীয় শাস্ত্রের অমর্যাদার কথা স্মরণ করে বলেন;—

> "হা শাস্ত্র! তোমার কি দুরবস্থা ঘটিয়াছে! ...এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ যে বহুবিধ দুর্নিবার পাপ প্রবাহে উচ্ছলিত হইতেছে, তাহার মূল অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে, তোমার প্রতি অনাদর ও লৌকিকরক্ষায় একান্ত যত্ন ব্যতীত আর কিছুই প্রতীত হয় না।" (৪২)

—যারা দেশীয় ধর্ম বা শাস্ত্র সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরকে নীরব থাকতে দেখেন, তাঁদের মতকে এরপর আর পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। দেশের দুরবস্থা লক্ষ করে বিদ্যাসাগর কতখানি ব্যথাতুর ছিলেন, তার সন্ধান পাওয়া যায় এই গ্রন্থেরই একটি অংশে;—

> "হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচারগুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে; কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, ...কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক," (৪৩)

অন্য আর একটি অংশে দেশীয় মানুষের কর্মবিমুখতা বা উদাসীনতার প্রসঙ্গে বলেন;—"হা ভারতর্ষীয় মানবগণ! আর কত কাল তোমরা, মোহনিদ্রায় অভিভূত হইয়া, প্রমোদশয্যায় শয়ন করিয়া থাকিবে!" (৪৪) তিনি দেশীয় মানবগণকে জ্ঞান চোখ খুলতে বলেন এবং দেশীয় শাস্ত্রের যথার্থ ব্যবহার করতে বলেন।

অতএব বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে যে দু'টি গ্রন্থ রচনা করেন তাতে দেশীয় অতীত ঐতিহ্য, দেশীয় শাস্ত্র প্রভৃতি সম্বন্ধে যেমন গর্ববোধ করেছেন সঙ্গে সঙ্গে সমকালের দেশের দুরবস্থার বিষয়ে গভীর

বেদনায় দগ্ধ হয়েছেন এবং তা থেকে উত্তরণের সদুপদেশ দিয়েছেন। এতে তাঁর মনের স্বদেশভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ঘ) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব ঃ

এই গ্রন্থটির প্রকাশ কাল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দ তখন এদেশে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। পুস্তকটি প্রকাশ কালে 'সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা' বহুবিবাহ রদের ব্যাপারে আন্দোলন গড়ে তোলে। বিদ্যাসাগর সেজন্য এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে বলেন;—

"তাঁহারা, সদ্বভিপ্রায় প্রণোদিতহইয়া, যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।" [৪৫]

বহুবিবাহ যে সামাজিক একটি কুপ্রথা তা বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি পুস্তকটিতে বহুবিবাহের একটি তালিকা দিয়ে বহুবিবাহের প্রথাকে অমানবিক কুপ্রথা প্রমাণ করেন। এমনও লোক আছে যারা আশি-নব্বই টি পর্যন্ত বিয়ে করেছেন। এরকম বহুবিবাহ নারী জাতি তথা সচেতন বাঙালী সমাজের পক্ষে যথেষ্ট অপমানকর। তাই পুস্তকের শেষে বিদ্যাসাগর বলেন যে, "বহুবিবাহ প্রথা যে, যারপরনাই, অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বোধ হয়, চক্ষুকর্ণ হৃদয় বিশিষ্ট কোনও ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারেন না।" [৪৬]

অতএব এই পুস্তক রচনার দ্বারা বিদ্যাসাগর নারী জাতির দুরবস্থা মোচনের সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় সমাজের উন্নয়নের কথা ভেবেছেন।

ঙ) 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক' ঃ

বিদ্যাসাগর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক'-এ অধ্যাপক তারানাথ তর্কবাচস্পতি, রাজকুমার ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, সত্যব্রত সামশ্রমী প্রমুখ অধ্যাপক ও পণ্ডিতের প্রশ্নের উত্তর দান করেন। এই গ্রন্থে বহুবিবাহ প্রথা যে শাস্ত্র সম্মত নয় তা প্রমাণ করেন। যাঁরা বহুবিবাহকে শাস্ত্র সম্মত বলে দাবী করেন—তাঁদের মতের প্রতিবাদ করে বিদ্যাসাগর গ্রন্থের উপসংহারে বলেন;—

"আমারবোধে, যে সকল মহাত্মারা, জগতের হিতের নিমিত্ত শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তাদৃশ ধর্মবহির্ভূত লোকবিগর্হিত বিষয়ে অনুমতি প্রদান বা অনুমোদন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনে করিলে মহাপাতক জন্মে।" [৪৭]

এখানেও শাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদ্যাসাগর প্রচলিত বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা বন্ধ করার বাসনা প্রকাশ করেছেন।

চ) প্রতিপক্ষের প্রতি ব্যঙ্গধর্মী রচনা ঃ

বিদ্যাসাগর জাতির প্রগতির জন্য বা দেশীয় সমাজে অবাঞ্ছিত 'দেশাচার' দূরীকরণের জন্য সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সেজন্য তিনি একাধিক প্রবন্ধ পুস্তক রচনা করেন। যাঁরা এইসব প্রবন্ধ পুস্তকগুলি যুক্তিহীন হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন, বিদ্যাসাগর তাদের নিয়ে—'অতিঅল্প হইল', 'আবার অতিঅল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', প্রভৃতি কয়েকটি গ্রন্থ লেখেন। এসব পুস্তকে বিদ্যাসাগর নিজের মত ও পথের সমর্থনে বিরোধী পক্ষকে ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করেন।

শিক্ষামূলক বাংলা রচনা ঃ

এবার আমরা বিদ্যাসাগর রচিত শিক্ষামূলক গ্রন্থের বিষয়ে আলোচনা করব। জাতিকে কিভাবে যুগোপযোগী ও বাস্তবসম্মত শিক্ষা দেওয়া যায়, সে বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনার শেষ ছিল না। হয়ত সেজন্যই তিনি জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে একটি বাস্তব সম্মত প্রস্তাব তৈরী করতে পেরেছিলেন।

সার্থক শিক্ষা জাতিকে সমৃদ্ধ করে। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, এই ভবিষ্যতকে সুনিশ্চিত করতে না পারলে জাতি কোন দিনও সমৃদ্ধ হবে না। তাই এইসব শিশুদের কুসংস্কারমুক্ত বাস্তবসম্মত শিক্ষাদান করতে বিদ্যাসাগর ছিলেন বদ্ধ পরিকর। এদেশে এই বিষয়টিকে সার্থক করতে তিনি আদর্শনিষ্ঠ গ্রন্থকার ও শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। বিদ্যাসাগর এসব পরিকল্পনা করে বসে না থেকে জাতির ভবিষ্যতকে সমৃদ্ধ করার জন্য নিজে উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থ রচনায় ব্রতী হন। তিনি 'বর্ণপরিচয়' থেকে শুরু করে সহজ সরল বাংলা ভাষায় কুসংস্কার মুক্ত যুগোপযোগী জ্ঞানসমৃদ্ধ পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন। আমরা বিদ্যাসাগরের শিক্ষামূলক গ্রন্থগুলির সম্বন্ধে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ ও দ্বিতীয়ভাগ ঃ

'বর্ণপরিচয়' পুস্তক দু'টি বর্ণজ্ঞানহীনের বাংলা বর্ণজ্ঞানার্জনের বিজ্ঞানসম্মত বই। বিদ্যাসাগরের লক্ষ ছিল সহজভাবে শিক্ষা দান। 'বর্ণপরিচয়' সম্বন্ধে অনেক প্রবীণের মুখে শোনা যায় বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ যে পড়বে তার কাছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যে কোন গ্রন্থ পাঠ করা অসাধ্য হবে না। লোকশ্রুতিটি অমূলক নয়। বিদ্যাসাগর একজন যথার্থ শিক্ষাবিদের মতো বাঙালীর বর্ণপরিচয় দানের জন্য 'বর্ণপরিচয়' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ রচনা করেন।

নীতিমূলক গ্রন্থ ঃ (কথামালা ও নীতিবোধ)

শিক্ষার্থীর নৈতিক মানের উন্নয়ন ও সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধের জাগরণের কথা বিদ্যাসাগরের মাথায় ছিল, সেজন্য 'কথামালা' ও 'নীতিবোধ' অনুবাদিত এবং রচিত হয়। কথামালা সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর বিজ্ঞাপনে বলেছেন—"গল্পগুলি অতিমনোহর; পাঠ করিলে, বিলক্ষণ কৌতুক জন্মে, এবং আনুষঙ্গিক সদুপদেশ লাভ হয়।" [(৪৮)] এরকম সদুপদেশমূলক আর একটি পুস্তক 'নীতিবোধ'। 'কথামালা' ও 'নীতিবোধ' পাঠ করলে শিক্ষার্থী নিজের জন্য যেমন নানা উপদেশ পাবে তেমনি পরিবার সমাজ প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন হবে। অতএব 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর 'মতিলাল' নামক চরিত্রটির মতো নীতিহীন, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধহীন চরিত্রের বিপরীত বাঙালী চরিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'কথামালা' ও 'নীতিবোধ' গ্রন্থদু'টির লক্ষ্য।

বোধোদয় ঃ

বিদ্যাসাগরের শিক্ষা বিষয়ক ভাবনার অন্যতম লক্ষ ছিল শিক্ষার্থীকে বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান দান করা। অথচ এদেশে বাস্তব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করার বিশেষ সুবিধা নেই। বিদ্যাসাগর 'বোধোদয়'-এর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন;—"যে কয়টি বিষয় লিখিত হইল, বোধ করি, তৎপাঠে অমূলক কল্পিত গল্পের পাঠ অপেক্ষা, অধিকতর উপকার দর্শিবার সম্ভাবনা।" [(৪৯)] আর তাই 'বোধোদয়'-এর পাতায় বিষয় হিসাবে স্থান পেয়েছে চেতনপদার্থ, অচেতন পদার্থ, উদ্ভিদ, খনিজ সম্পদ, নদী, সমুদ্র, বাণিজ্য, কৃষি, শিল্পের মতো বাস্তব সম্মত বিষয়।

'বোধোদয়'-এ কোন কোন সময় প্রত্যক্ষভাবে মাতৃভাষা ও সংস্কৃতভাষা সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। তিনি লিখেছেন;—"অগ্রে মাতৃভাষা না শিখিয়া, পরের ভাষা শিক্ষা কোনও মতে উচিত নহে।" [(৫০)] "সংস্কৃত ভাল না জানিলে, হিন্দী, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষাতে উত্তম ব্যুৎপত্তি জন্মে না।" [(৫১)] শিল্প, বাণিজ্য সমাজের আলোচনায় শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে পুনরায় শিল্পের হারান গৌরব ফিরিয়ে পাওয়ার জন্য উৎসাহ ব্যক্ত করেন।— "পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে শিল্পকর্ম্মের বিশেষ উন্নতি ছিল। ....যাহাতে পুনর্বার উহাদের উন্নতি হয়, তজ্জন্য সর্বপ্রকারে যত্নবান্ হওয়া উচিত।" [(৫২)]

চরিতাবলী ঃ

বিশ্ববিখ্যাত কিছু চরিত্রের সমাহার 'চরিতাবলী'র বিষয়। এঁরা দুঃখ কষ্টে বা প্রতিকূলতার মধ্যে লেখাপড়া শিখে ভবিষ্যতে বিখ্যাত হয়েছেন। বিদ্যাসাগর চরিতাবলীর বিজ্ঞাপনে লিখেছেন—

"যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হইলে, বালক দিগের লেখাপড়ায় অনুরাগ জন্মিতে ও উৎসাহ বৃদ্ধি হইতে পারে, এই পুস্তকে তদ্রূপ বৃত্তান্ত মাত্র সঙ্কলিত হইয়াছে।" (৫৩)

অর্থাৎ পুস্তকটির উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে অনুরাগ ও উৎসাহ সৃষ্টি করা।

জীবনচরিত ঃ

'জীবনচরিত' পুস্তকে কোপার্নিকাস, গালিলিয়, নিউটন প্রমুখ বিশ্ববিখ্যাত মহাত্মাগণ বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছেন। বিদ্যাসাগর বলেন, এই পুস্তকের উদ্দেশ্য দুটি। যথা— মহাত্মাগণের জীবনের বৃহত্তর অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীর জীবনে উপদেশ হিসাবে গ্রহণ করার উদ্দেশ্য ও মহাত্মাগণের আলোচনায় সমকালের রীতিনীতি, আচার ও ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান অর্জন। একটি বিষয় লক্ষ করার মতো যে, বিদ্যাসাগর এখানে কাল্পনিক বিষয়কে পুস্তকের অন্তর্ভূক্ত না করে শিক্ষার্থীর জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করার পক্ষে উপযোগী ইউরোপের বিখ্যাত মহাত্মার জীবনকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন।

বাঙ্গালার ইতিহাস ঃ

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন বাস্তবমুখী শিক্ষা। মার্শম্যানের ইতিহাসের সহায়তায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনার পিছনে এদেশে বাস্তব সম্মত শিক্ষা দেবার বিষয়টি স্পষ্ট। তিনি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থের অভাব পূরণের জন্য 'বাঙ্গালার ইতিহাস' রচনা করেন। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার কথাও ভেবেছিলেন।

এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর অনেকক্ষেত্রে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের মতামত মানেন নি। যেমন ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের নিকট অন্ধকূপ হত্যার জন্য সিরাজদ্দৌলা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সেই অন্ধকূপ হত্যার বিষয়ে বিদ্যাসাগর সন্দেহ পোষণ করে সিরাজদ্দৌলাকে কলঙ্ক মুক্ত করার চেষ্টা করেন।

আখ্যান মঞ্জরী ঃ

'আখ্যানমঞ্জরী' তিনভণ্ডে বিভক্ত। এই পুস্তকটি ছাত্রদের জন্য রচিত। বিদ্যাসাগর 'আখ্যান মঞ্জরী'র 'বিজ্ঞাপন'-এ উদ্দেশ্যের কথা বলেন; —"যদি আখ্যানগুলি বালকদিগের ভাষাজ্ঞান ও আনুষঙ্গিক নীতিজ্ঞান বিষয়ে কিঞ্চিৎ অংশেও ফলোপধায়ক হয়, তাহা হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।" (৫৪)

বাসুদেব চরিত ঃ

'বাসুদেবচরিত', ভাষা শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের সহজে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করার জন্য লিখিত।

জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের ভাবনা ঃ

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জাতীয় ভাষার সঙ্গে জাতির উত্তরণের বিষয়টিকে এক করে দেখেছেন। প্রসঙ্গতঃ পুনরায় উল্লেখ করতে হয় যে, বিদ্যাসাগরই জাতীয় ভাষা সমৃদ্ধ করার বৈজ্ঞানিক প্রথা আবিষ্কার করেন। তিনি বলেন, ইংরেজী ভাষায় ধারণ করা জ্ঞান ভাণ্ডারকে প্রথমে জানতে হবে, এবং সেই জ্ঞান ভাণ্ডারকে সহজ সরল করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন ভালভাবে সংস্কৃত ভাষা জানা। নইলে সহজ সরল বাংলা রচনার দক্ষতা জন্মাবে না।

বিদ্যাসাগর সহজ সরল বাংলা ভাষা সৃষ্টি করতে নিজেই কলম ধরেন। তাঁর বাংলা ভাষা সৃষ্টির মহৎ কাজটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যানুরাগী চিরদিন মনে রাখবে। বাংলা ভাষার উন্নতিকল্পে কলম ধরে তিনি যেন তাঁর উপযোগবাদের সঙ্গে শিল্পের যথার্থ মেলবন্ধন ঘটাতে ভোলেন নি। তাঁর মতো একজন যুগচিন্তানায়ককে তাই জাতীয় ভাষা ও সাহিত্যের সৃষ্টি পর্বে ভাষা ও সাহিত্য চিন্তানায়ক বলে অভিহিত করা যায়।

বিদ্যাসাগরের সাহিত্য রচনাগুলির মধ্যে 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব'-এর উল্লেখ স্বতন্ত্র ভাবে করা প্রয়োজন। কেননা, এই গ্রন্থে দেশীয় ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ে লেখকের গৌরববোধ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন গ্রন্থের সূচনাতেই তিনি বলেছেন—"সংস্কৃত অতি প্রাচীন ও অতি উৎকৃষ্ট ভাষা"[৫৫] এবং উপসংহারে সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন সম্বন্ধে বলেন;—"সংস্কৃতভাষানুশীলনের নানা ফল" [৫৬] তিনি বলেন, পাশ্চাত্য শব্দবিদ্যার উন্নতির পিছনে ইউরোপীয়দের সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন অন্যতম কারণ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে জানতে সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন করা প্রয়োজন। বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উন্নতি করতে সংস্কৃত ভাষা অনুশীলন অবশ্যই প্রয়োজন। এছাড়া সাহিত্য পাঠে যে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যায় সংস্কৃত সাহিত্যে তার সন্ধান মিলবে। অতএব বিদ্যাসাগরের চোখে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য, বিশ্বভাষা ও সাহিত্যের সম্পদ বিশেষ। কালিদাস প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য—"কোনও দেশের কোনও কবি—আমাদিগের কালিদাসের ন্যায়, সকল বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না"[৫৭] কিংবা " বোধহয়, —কোনও দেশের কোনও কবি উপমাবিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন" [৫৮]

বিশুদ্ধ সাহিত্য বলে বাংলায় তখন বিশেষ কিছু ছিল না। তখন সাহিত্য ছিল তত্ত্ব ও তথ্যে ভরপুর। বড়জোর ছিল তীক্ষ্ম রঙ্গব্যঙ্গ ও কৌতুকময়তা। বিদ্যাসাগরই 'শকুন্তলা' বা 'সীতার বনবাস'-এর মতো রচনার দ্বারা মধুর রস, করুণ রস ও নিসর্গের প্রথম যথার্থ প্রয়োগ ঘটান। তিনি রঙ্গলাল, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বেই জাতীয় সাহিত্যের এরকম রূপ দান করে সাহিত্য চিন্তানায়ক হিসাবেও সার্থকতা লাভ করেন। বিদ্যাসাগরের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচনাগুলি হল;—'বেতাল পঞ্চবিংশতি', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'বিদ্যাসাগর চরিত',

'প্রভাবতী সম্ভাষণ', 'শব্দমঞ্জরী', 'শব্দসংগ্রহ'।

আমরা লক্ষ করব, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষা গঠনে যথেষ্ট সফল। ভাষা ক্ষেত্রে পূর্ণচ্ছেদ, সেমিকোলন, প্রভৃতির প্রয়োগ শিখিয়ে বাংলা ভাষার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অতএব সমাজ সংস্কারে উদ্যোগ, সুশিক্ষা দানের পরিকল্পনা, বাংলা ভাষার প্রতি দরদ, দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি মহৎ কাজগুলি বিদ্যাসাগরকে দেশানুরাগী বলে পরিচিত হতে সাহায্য করে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে এদেশের কিছু ব্যক্তি বাণিজ্য ও রাজপুরুষদের সহযোগিতা করে অসম্ভব ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার এরকম রাজনৈতিক পরিবর্তনের অতুল সম্পত্তির অধিকারী একটি পরিবার। বণিক রাজার সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর উনিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম (১৮১৭—১৯০৫)। এই সময় পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেখানেই পৌঁছে গিয়েছে সেখানে মধ্যযুগীয় চেতনা পড়েছে সংকটে। পাশাপাশি খ্রীষ্টান মিশনারি উদ্যোগে খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে গিয়েছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অনেক নব্য বঙ্গীয় হিন্দুর নিকট খ্রীষ্টান হওয়াটা গর্ব বলে বিবেচিত হত। অবশ্য ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামমোহন রায় প্রমুখ মিশনারিদের মাত্রাতিরিক্ত ধর্ম প্রচারের প্রতিবাদ করেন। শিক্ষিত অনেক যুবক রামোহনের 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এর আদর্শে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আবার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রমুখ রক্ষণশীল পন্থীর মধ্যে দেখা যায় চিরাচরিত ও প্রচলিত ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে এদেশে শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। 'হিন্দুকলেজ' (১৮১৭), 'সংস্কৃতকলেজ' (১৮২৪) তখন বৃটিশ উপনিবেশ কলকাতায় আপন মহিমায় উজ্জ্বল। এছাড়া ডেভিড হেয়ার, রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেববাহাদুর প্রমুখের প্রচেষ্টায় শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বিদ্যালয় ও পরিকাঠামোর ব্যাপক উন্নতি হয়।

বলা যায়, দেবেন্দ্রনাথ যখন স্বদেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করবেন, ঠিক তার পূর্বেই জাতির প্রথম আধুনিক মানুষ রাজা রামমোহন রায় পরলোক গমন (১৮৩৩) করেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০—১৮৯১) তখনও দেশের বৃহৎ কর্মভূমিতে পদার্পণ করেননি। রামমোহন প্রদর্শিত মত ও পথকে অবলম্বন করে একটি গোষ্ঠী কোনরকমে বেঁচে ছিল, এই গোষ্ঠীর কোন যুগান্তকারী ভূমিকা ছিল না। তবে একথা স্বীকার

করতে হবে যে, রামমোহনের চিন্তাচেতনা বাঙালী সমাজে আগামী দিনের বড় বড় মনীষী আবির্ভাবের সঞ্জীবনী মন্ত্রবীজ রোপিত ছিল। ঠিক এমন সময় ভারতীয় ভাবধারাকে যথার্থ উপলব্ধি করে বাংলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতি-জগতে অক্লান্ত সৈনিক মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবির্ভাব। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম জীবনে বিলাসময় জীবন কাটাতেন। একদিন তাঁর পিতামহীর মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, এখান থেকেই দেবেন্দ্রনাথের প্রচলিত জীবন যাত্রায় প্রথম অন্যমনস্কতা। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন;—

> "ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি, চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সংকীর্ত্তন হইতেছিল— 'এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে'; বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কানে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে আশ্চর্য্য উদাস ভাব উপস্থিত হইল আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল; গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল; মনের মধ্যে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।" (৫৯)

দেবেন্দ্রনাথের কর্মপরিচয় ঃ

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মবীর পুরুষ। দেবেন্দ্রনাথকে ছাড়া উনিশ শতকে বাঙালীর পরিচয় পূর্ণতা পাবে না। বাঙালী সমাজ তখন দিক্‌ভ্রান্ত। রক্ষণশীল, প্রগতিশীল ও নব্যবঙ্গীয়ের প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালী শ্রেয় ও প্রেয়ের দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত। ঠিক এমন সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অতুল বিষয় সম্পত্তির সুখ বর্জন করে আপন উপলব্ধির দ্বারা রাজা রামমোহনের যথার্থ উত্তরাধিকারীর মতো বাঙালী সমাজকে সঠিক পথ নির্দেশ করার চেষ্টা করেন। দেবেন্দ্রনাথের এরকম পরিবর্তনে পিতা অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। পিতার এই মনোভাব ব্যক্ত করতে গিয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন;—

> "আমাদের বাড়ীতে বিদ্যাবাগীশ সাহস করিয়া আমাকে পড়াইতে পারিতেন না; যে-হেতুক, আমার পিতার একটি কথা শুনিয়া তিনি ভয় পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যাবাগীশের প্রতি এক দিন বিরক্ত হইয়া বলিয়াছিলেন যে, 'আমি তো বিদ্যাবাগীশকে ভাল বলিয়া জানিতাম; কিন্তু এখন দেখি যে, তিনি দেবেন্দ্রের কাণে ব্রহ্মমন্ত্র দিয়া তাহাকে খারাপ করিতেছেন। একে বিষয়-বুদ্ধি অল্প, এখন সে ব্রহ্ম ব্রহ্ম করিয়া আর বিষয়কর্ম্মে কিছুই মনযোগ দেয় না।" (৬০)

দেবেন্দ্রনাথ এই বিষয় সুখ বর্জন করে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করার মহৎ ও বৃহৎ উদ্দেশ্যকে বাস্তব রূপদানের জন্য তিনি এরকম অনেক অপবাদ ও নিন্দা সহ্য করেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জাতির জন্য

অবিস্মরণীয় কিছু কাজ করেছিলেন। যথা;— ব্রাহ্মধর্মের নেতৃত্ব, প্রগতিশীল চেতনার প্রসার, পত্রিকা ও সভা-সংগঠনের উদ্যোক্তা হওয়া, জাতির উন্নতির লক্ষে শিক্ষা প্রসারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও বাংলা গদ্য রচনা প্রভৃতি।

স্বদেশ ভাবনায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে কায়মনোবাক্যে ভারতীয় ছিলেন, তা তাঁর চিন্তায় ও কর্মে প্রকাশিত। তিনি জাতির ভবিষ্যতের গৌরবের সোনালী দিনের প্রস্তুতির যুগের এক কর্মবীর পুরুষ ছিলেন। রামমোহনের ঔপনিষদিক ভাবধারাকে দেবেন্দ্রনাথ যেন মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এদেশে ঔপনিষদিক চেতনার বিপ্লব ঘটান। তাঁর এই ঔপনিষদিক ভাবধারা প্রচারের পিছনে ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে একধর্ম স্থাপনের মহৎ উদ্দেশ্য। তিনি লিখেছেন;—

> "তাঁহাকে উপাসনা করিয়া, তাহার ফল—আমি তাঁহাকে পাই। তিনি আমার উপাস্য, আমি তাঁহার উপাসক; তিনি আমার প্রভু, আমি তাঁহার ভৃত্য; তিনি আমার পিতা, আমি তাঁহার পুত্র;—এই ভাবই আমার নেতা। যাহাতে এই সত্য আমাদের ভারতবর্ষে প্রচার হয়, সকলে যাহাতে এই প্রকারে তাঁহার পূজা করে, তাঁহার মহিমা এইরূপেই যাহাতে সর্ব্বত্র ঘোষিত হয়, আমার জীবনের লক্ষ্য তাহাই হইল।" (৬১)

একধর্ম স্থাপনের ব্যাপারে তিনি আরো স্পষ্ট করে লেখেন;—

> "যখন উপনিষদে বহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনা প্রাপ্ত হইলাম, এবং জানিলাম যে সেই উপনিষদ্ এই সমুদায় ভারতবর্ষের প্রামাণ্য শাস্ত্র, তখন এই উপনিষদের প্রচার দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করা আমার সংকল্প হইল। ঐ উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলিয়া সকল শাস্ত্রকারেরা মান্য করিয়া আসিতেছেন। বেদান্ত, সকল বেদের শিরোভাগ ও সকল বেদের সার। যদি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতে পারি, তবে সমুদায় ভারতবর্ষের ধর্ম্ম এক হইবে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন-ভাব চলিয়া যাইবে, সকলে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, তার পূর্ব্বকার বিক্রম ও শক্তি জাগ্রৎ হইবে, এবং অবশেষে সে স্বাধীনতা লাভ করিবে—আমার মনে তখন এত উচ্চ আশা হইয়াছিল।" (৬২)

এখানে আমরা লক্ষ করলাম, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষে একধর্ম স্থাপন করে জাতির উন্নয়নে আন্তরিক প্রয়াসী। এই উদ্দেশ্যের পিছনে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুগভীর স্বদেশ ভাবনাকে অনুভব করা যায়। উনিশ শতকের দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম ব্যক্তি যিনি সচেতনভাবে সম্পূর্ণ একটি পৃথক ধর্মের প্লাটফর্ম সৃষ্টি

করে সমগ্র ভারতবর্ষে একধর্ম ও এক জাতি গঠনের জন্য চিন্তাশীল ছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর ধর্মমতকে কতখানি সর্বজনীন করতে পেরেছেন,—সেবিষয়টি বিচার না করে বরং তাঁর একধর্ম মত প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যে অসীম আন্তরিকতা যে দেখা যায় সে বিষয়টি সত্যই বিস্ময়কর।

দেবেন্দ্রনাথ স্বদেশীয় হিন্দুধর্মের উপর খৃষ্টধর্মের প্রভাবকে ভালো চোখে দেখেন নি। উমেশ চন্দ্র সরকার ও তাঁর স্ত্রীকে অনেকটা জোর পূর্বক খৃষ্টানধর্মে দীক্ষিত করায় তিনি খৃষ্টান মিশনারিদের প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন;—

> "ইহা শুনিয়া আমার বড়ই রাগ হইল ও দুঃখ হইল। অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্য্যন্ত খ্রীষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস্, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি। এই বলিয়া আমি উঠিয়া পড়িলাম। আমি তখনই শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের লেখনীকে চালাইলাম, এবং একটি তেজস্বী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশ হইল। —'অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্ম্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল। এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমাদের চৈতন্য হয় না! আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব। ধর্ম্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমাদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভব হইল।...অতএব যদি আপনার মঙ্গল প্রার্থনা কর, পরিবারের হিত অভিলাষ কর, দেশের উন্নতি প্রতিক্ষা কর, এবং সত্যের প্রতি প্রীতি কর, তবে মিশনারিদিগের সংস্রব হইতে বালকগণকে দূরস্থ রাখ।" (৬৩)

এখানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বধর্ম ও স্বসংস্কৃতির প্রতি সুগভীর দরদের পরিচয় পাওয়া গেল।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শুধু ধর্মকে নিয়েই মত্ত হয়ে থাকেন নি। বাঙালী জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের শীর্ষ চূড়ায় উন্নীত হতে গেলে প্রয়োজন প্রকৃত শিক্ষা। পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে প্রাচ্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁর সন্তানগণের শিক্ষায় সেকথা স্পষ্ট হয়। সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা দেবেন্দ্রনাথকে ভাবিয়েছিল। সমসাময়িক কালে খৃষ্টান মিশনারিদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিদেশী খৃষ্টান ধর্মের প্রচার করা হত। খৃষ্টান পাদ্রীদের ধর্ম প্রচারে বিরক্ত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ 'হিন্দুহিতার্থী' (১৮৪৫) বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এবিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ বলেন;—

> "১৩ই জ্যৈষ্ঠ আমাদের একটা মহা সভা হইল। এই সভাতে প্রায় সহস্র ব্যক্তি একত্র হইয়াছিলেন। স্থির হইল যে, পাদ্রিদের বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে যেমন ছেলেরা পড়িতে পায়, তেমনি আমাদেরও একটা বিদ্যালয় হইবে, তাহাতে বিনা বেতনে ছেলেরা পড়িতে পাইবে। আমরা চাঁদা পুস্তক লইয়া, তাহাতে

কে কি স্বাক্ষর করেন তাহার অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব আমাদের নিকট হইতে চাঁদার বহি চাহিয়া লইয়া তাহাতে দশ হাজার টাকা স্বাক্ষর করিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাজা রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা। এইরূপে সেই দিনই চল্লিশ হাজার টাকা স্বাক্ষর হইয়া গেল। তখন জানিলাম, আমাদের পরিশ্রমের ফল হইল।

এই সভা হইতে 'হিন্দুহিতার্থী' নামে একটা বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইল, এবং তাহার কর্ম্ম সম্পাদন জন্য শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর সভাপতি হইলেন। আমি ও হরিমোহন সেন সম্পাদক হইলাম। এই অবৈতনিক বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় নিযুক্ত হন। সেই অবধি খ্রীষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনারিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল।"(৬৪)

আমরা দেখলাম, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমসাময়িক কালে শিক্ষা দানের সঙ্গে ধর্ম প্রচারের যে কৌশল খৃষ্টান পাদ্রীরা নিয়েছিল, সেই কৌশলকে তিনি ব্যর্থ করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অর্থাৎ উদার ও আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে তিনি প্রচলিত সংকীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন দেশী-বিদেশী ধর্মকে দূরে রাখার প্রতি মত দেন।

আমরা দেখব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্ম প্রচারের নেতৃত্ব দিলেও তিনি ছিলেন সমস্ত রকমের সংকীর্ণতার উর্ধ্বে। এখানে তাঁর উদার ও নিরপেক্ষ মনের প্রসঙ্গে বলা যায়;—

"ব্রাহ্ম সমাজ যখন আমি প্রথম দেখিতে যাই, তখন দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। যখন ব্রাহ্ম সমাজের উদ্দেশ্য এই যে, সকলের নিকটেই ব্রহ্মোপাসনা প্রচার করা— যখন ট্রষ্টডীডেতে আছে যে, সকল জাতিই নির্ব্বিশেষে একত্র হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিতে পারিবে, তখন কার্য্যে ইহার বিপরীত দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগিল। আবার একদিন দেখি যে, সেই ব্রাহ্ম সমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বোধ হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম, এবং বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম।" (৬৫)

তাছাড়া তাঁর আদর্শকে প্রচার করতে তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র (১৮৪৩) প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত সভা, সমিতি ও পত্রিকাতে স্বদেশের মানুষের চেতনার প্রসার ঘটে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন;—

"...একখানি পত্রিকা, অতি আবশ্যক হইল। আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভার কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। আর, রামমোহন রায় জীবদ্দশায় ব্রহ্মজ্ঞান বিস্তার উদ্দেশ্যে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহারও প্রচার আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সংকল্প করি।" (৬৬)

অর্থাৎ তাঁর সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠা ও পত্রিকা প্রকাশের মূলে ছিল দেশীয় মানুষের চেতনার বিকাশ ঘটানোর মহৎ উদ্যোগ। যা তাঁর স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

দেবেন্দ্রনাথ স্বজাতির আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটাতে গিয়ে বাংলা গদ্য সাহিত্যের উন্নতি করেন। তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন, যেগুলি ব্রাহ্মধর্মের নীতি বা উপদেশে সমৃদ্ধ। যেমন;—'জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি' নামক গ্রন্থে তিনি বলেন;—

"...জাতি, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধনা এই কয়টীই আত্মার উন্নতির কারণ; সকলের উপরে ঈশ্বরের প্রসাদ আবশ্যক, তাহা না হইলে কিছুই হইবে না। ...আমাদের পরম পিতা পরমেশ্বরের নিত্যমঙ্গল ইচ্ছা এই যে, জগতে জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতি হউক। ...জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে রাজ্যের উন্নতি; জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে সমাজের উন্নতি; জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে বংশের উন্নতি; জ্ঞান ধর্ম্মের উন্নতিতে প্রতি জনের ইহলোকে, পরলোকে, অনন্তকালে উন্নতি।" (৬৭)

আবার 'ব্রাহ্ম ধর্ম্মের ব্যাখ্যান' নামক রচনায় তিনি বলেন;—

"যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত হয় নাই, ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্য হইতে শান্ত হয় নাই, যাহার চিত্ত সমাহিত হয় নাই, সে কেবল জ্ঞানমাত্র দ্বারা পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হয় না। যখন বিষয়-লালসা আসিয়া চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে, যখন জীবনের মহান লক্ষ্য ভুলিয়া গিয়া নীচ চিন্তা মলিন কামনাতে মন অভিভূত হয়, তখন তাঁহাকে দেখিতে পাই না। অনন্তের মহিমা সেই জানে, যে বিষয় কামনা হইতে নিবৃত্ত হইয়া, সমাহিত-চিত্ত হইয়া, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করে।" (৬৮)

তাছাড়া তাঁর রচিত একটি বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী' (১৮৯৮)। দেবেন্দ্রনাথ

ঠাকুর বাংলা গদ্যের চর্চা করেছিলেন দেশ ও জাতির প্রয়োজনে। বাংলা গদ্যের প্রথম দিকে তাঁর গদ্যসাহিত্য চর্চা বাংলা সাহিত্যের উন্নতির সহায়ক। তিনি যদিও বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কিছু করেন নি, তবুও তাঁর পরিবারে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। সেই জন্যই হয়ত রবীন্দ্রনাথের মত্যে অবিস্মরণীয় কবি ও সাহিত্যিকের আবির্ভাব হয়। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলাকার কথা স্মরণ করতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিত সমাজ অন্দরে মেয়ে মহলে ঠেলে রেখেছিলেন; ...আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।" (৬৯)

অতএব বলা যায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকে বাঙালীর ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে আত্মচেতনার বিকাশ ঘটাতে অক্লান্ত সৈনিক ছিলেন। সেজন্য এই অবিস্মরণীয় মনীষীর প্রতি বাঙালী চিরদিন শ্রদ্ধা জানিয়ে যাবে।

অক্ষয়কুমার দত্ত

অক্ষয়কুমারের আবির্ভাব (১৮২০-১৮৮৬) মুহূর্তে এদেশে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চেতনা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে। সরকারী সাহায্যে ইতিমধ্যে 'হিন্দুকলেজ' (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার এরকম একটি সময়ে বাঙালী জাতির উন্নতির জন্য প্রকৃত পথ-নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিখ্যাত সংবাদপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সফল সম্পাদক। তাঁর আরো একটি বড় পরিচয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানমনস্কতা। তিনি বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের সামঞ্জস্য আবিষ্কার করে সমকালীন বাঙালীকে মুক্তির পথ দেখান। আর সেজন্যেই তাঁর গ্রন্থগুলি নৈতিকতা, বিজ্ঞান মনস্কতা, যুক্তিবোধ বা বুদ্ধি বৃত্তি, আধুনিক শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, সর্বোপরি বঙ্গসমাজে মানব সম্পদ বৃদ্ধির বন্দনায় মুখর। আসলে তিনি উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে মানব সম্পদ বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। কেননা, প্রাক্ উনিশ শতকে আমরা দেখেছি বাঙালীর ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের চিত্র। এমনকি অক্ষয়কুমারের সমসাময়িক কালেও (১৮২০-১৮৮৬) যার অস্তিত্ব জাতির অবক্ষয় থেকে মুক্তির ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সৃষ্টি করেছিল। সেকারণে বাঙালী সমাজের উন্নতির পক্ষে প্রতিবন্ধক দীর্ঘদিনের যুক্তিহীন জীবনাচরণ, কুসংস্কারে বিশ্বাস, সমকালের নৈতিক জ্ঞানের অধঃপতন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার প্রতি উৎসাহহীনতা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলির জন্য তিনি উদ্বিগ্ন। তাঁর বাংলা রচনায় তিনি কখনো নৈতিকতা, কখনো বিজ্ঞান মনস্কতা, কখনো চিন্তার স্বাধীনতা, কখনো তীক্ষ্ম যুক্তিবোধ ও বুদ্ধি বৃত্তির জয়গান, কখনো আধুনিক শিক্ষা লাভের প্রেরণা দিতেন।

অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত উল্লেখযোগ্য বাংলা গ্রন্থগুলি হল;—'ভূগোল'(১৮৪১), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬), 'চারুপাঠ' (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯), 'হেয়ার সাহেবের সাম্বৎসরিক বক্তৃতা' (১৮৪৫), 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১, ১৮৫৩), 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬), ''ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০, ১৮৮৩)। উল্লিখিত গ্রন্থগুলিতে দু'টি উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। বালকের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ যথা;—'ভূগোল', 'পদার্থবিদ্যা', 'চারুপাঠ' এবং আপামর বাঙালীকে প্রয়োজনীয় নীতি উপদেশের উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থ যথা;—'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার','ধর্ম্মনীতি' ইত্যাদি।

অক্ষয়কুমার দত্ত অনুভব করেছিলেন, এদেশে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের উপযোগী ভালো পাঠ্যপুস্তকের বড় অভাব। অবশ্য 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) নানারকম পাঠ্যপুস্তকের যোগান দিয়ে সে অভাব মোচনের চেষ্টা করেছিল। তবুও অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত 'ভূগোল' (১৮৪১), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) ও 'চারুপাঠ' (১৮৫৩, ১৮৫৪, ১৮৫৯) সেকালে অসংখ্য পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেও মনে রাখার মতো। তিনি 'ভূগোল' গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন;—

> "ইদানিং দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহি মহাশয়দিগের দৃঢ় উদ্যোগে স্থানে২ যে প্রকার প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে বঙ্গভাষার অনুশীলন হইতেছে, তাহাতে ভবিষ্যতে এদেশীয় ব্যক্তিগণের বিদ্যাবুদ্ধির উন্নতি হওনের বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে, কিন্তু এভাষায় এপ্রকার প্রচুর গ্রন্থ দৃষ্ট হয় না যে তদ্বারা বালকদিগকে সুচারুরূপে শিক্ষা প্রদান করা যায়। এই সুযোগযুক্ত সময়ে যদি এ অকিঞ্চন হইতে কিঞ্চিৎ দেশের উপকার সম্ভবে এ মানস করিয়া চন্দ্রসুধালোভি উদ্বাহু বামনের ন্যায় দীর্ঘ আশায় আসক্ত হইয়া বহুক্লেশে বহু ইংরাজী গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া বালকদিগের বোধগম্য অথচ সুশিক্ষাযোগ্য এই ভূগোল পুস্তক প্রস্তুত করিয়াছি।"[৭০]

ভূমিকায় আমরা লক্ষ করেছি, গ্রন্থটি রচনার পিছনে অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশের স্বার্থকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। সেই স্বার্থ হল স্বদেশীয় ভাষায় ভালো পাঠ্য পুস্তকের অভাব মোচন। যার দ্বারা এদেশের শিশুরা প্রকৃত শিক্ষা পেতে পারে। তাঁর 'চারুপাঠ'-ও শিক্ষা জগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আমরা রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' (১৯০৩) উপন্যাসে দেখি নায়ক মহেন্দ্র স্ত্রী আশাকে শিক্ষা দানের জন্য 'চারুপাঠ' পড়িয়েছে।[৭১] 'চারুপাঠ' যে বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত সেকথা লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত স্বীকার করেন। এই গ্রন্থটিতে তিনি কয়েকটি বিশেষ দিকের প্রতি নজর দিয়েছেন। যথা;—বাস্তব জ্ঞান সমৃদ্ধ বিষয়ের উপর গুরুত্ব, গ্রন্থটি পাঠ করতে গিয়ে বিরক্তি না জন্মানোর জন্য সতর্কতা, পাঠকের বোধশক্তির বিকাশ প্রভৃতি। এবিষয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত নিজেই বলেছেন;—

"যেরূপ প্রস্তাব পাঠ করিলে, করুণাময় পরমেশ্বরের বিশ্ব-কার্য্য সম্বন্ধীয় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয়ের জ্ঞান লাভ হইতে পারে, তাহাই ইহাতে নিবেশিত হইয়াছে। এসকল বিষয়ের আলোচনা অকিঞ্চিৎকর কাল্পনিক গল্প পাঠ অপেক্ষা সমধিক কল্যাণকর তাহার সন্দেহ নাই।

এক বিষয়ের অনেক প্রস্তাব উপর্য্যুপরি অধ্যয়ন করিতে হইলে, বিরক্তি জন্মে ও ক্লেশবোধ হয়, এ নিমিত্ত প্রত্যেক পরিচ্ছেদে নানাবিধ প্রস্তাব একত্র স্থাপিত হইয়াছে। আর পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্য ও চিত্ত-রঞ্জনার্থে, প্রয়োজনানুসারে, অনেক বিষয়ের চিত্রময় প্রতিরূপও প্রকাশ করা গিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় সুপ্রণালী-সিদ্ধ-পুস্তক অতি অল্প। এ সময়ে বালক দিগের পাঠোপযোগী দুই একখানি গ্রন্থ রচনা করিতে পারিলে, অনেক উপকার দর্শিতে পারে, এই বিবেচনায় চারুপাঠ প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...বালকগণের শিক্ষা সাধন বিষয়ের অত্যল্প আনুকূল্য হইলেও, সমুদায় পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিয়া চরিতার্থ হইব।" (৭২)

অর্থাৎ এই 'চারুপাঠ' পুস্তকটি রচনা করতে গিয়েও অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশের স্বার্থকে সবসময় মনে রেখেছেন। এবিষয়ে গ্রন্থেই তাঁর মতামতের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাবে 'স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন নামক আলোচনাংশে। এখানে তিনি একজন মানুষের দায়িত্ব ও কর্তব্যকে খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করেন। তিনি লিখেছেন;—

"অতএব, জনসমাজে অবস্থিতি পূর্ব্বক অপর সাধারণের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধর্ম্ম প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতি সাধন চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ইতর জন্তুর ন্যায় কেবল আত্মোদর পরিপূরণ ও আত্ম পরিবারের ভরণপোষণ করিয়া ক্ষান্ত থাকা মনুষ্যের ধর্ম্ম নহে। প্রতি দিবস আপন আপন নিত্য কর্ম্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে ক্ষেপণ করা কর্ত্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান, ধর্ম্ম, সুখ স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয় কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজনিয়ম সংশোধিত ও সত্যধর্ম্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্টিত হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবার প্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পদনার্থে যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি পরিচালন করা যে মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না। তাঁহারা ইতর প্রাণীর ন্যায় কেবল লোভ কামাদি নিকৃষ্ট রিপু সমুদায়কে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তই সর্ব্বদা ব্যস্ত। পরম মঙ্গলকর পরমেশ্বর ভূমণ্ডলস্থ অন্যান্য সমস্ত জন্তু অপেক্ষা মনুষ্যকে বিশিষ্টরূপে শ্রেষ্ঠ করিয়াছেন, তাহার মত কি কার্য্য করিতেছি, ইহা সকলেরই এক এক বার চিন্তা করা উচিত। ক্রমে ক্রমে সর্ব্বসাধারণের মঙ্গলোন্নতি হয় ইহাই পরমেশ্বরের অভিপ্রেত এবং ইহাই তাহার সমুদায় নিয়মের উদ্দেশ্য। এই পরম

মনোহর উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কার্য্য করা সকলেরই বিধেয়। আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা করা যে প্রকার আবশ্যক, সেইরূপ, সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ বিমোচন ও সুখ সম্পাদনের পরামর্শ ও চেষ্টা করাও সর্ব্বতোভাবে কর্তব্য।" [৭৩]

এখানে আমরা লক্ষ করলাম, অক্ষয়কুমার দত্ত স্বদেশের প্রতি কতগুলি কর্তব্য নির্দেশ করেছেন। যে সব দায়িত্ব পালন করা মানুষের কর্তব্য বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আপামর বাঙালীকে প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশের জন্য লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;— 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮৫১ ও ১৮৫৩) 'ধর্ম্মোন্নতি সংসাধন বিষয়ক প্রস্তাব', (১৮৫৬), 'ধর্ম্মনীতি' (১৮৫৬), 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১ম ও ২য়, ১৮৭০ ও ১৮৮৩)। এইসব গ্রন্থে মানব জীবনের দায়িত্ব-কর্তব্য, চিন্তার নিরপেক্ষতা, কল্পনা ও কুসংস্কারের পরিবর্তে বাস্তব জ্ঞান ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপস্থাপন চোখে পড়ার মতো। ডঃ সুকুমার সেন বলেন;—

"পাশ্চাত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার সার্থকভাবে করেন সর্ব্বপ্রথম অক্ষয় কুমার" [৭৪]

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' গ্রন্থটি সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেন। তাঁর ভাষায়;—

"অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনা হইতেছে দুইভাগ 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (১৮৭০। ১৮৮৩)। গ্রন্থটি অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ রচনাই নয়, বাঙ্গালা ভাষায় একটি বিশিষ্টতম গ্রন্থ বটে।... উপক্রমণিকা দুইটিতে অক্ষয় কুমারের শ্রমশীল পাণ্ডিত্যের ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির পরিচয় রহিয়াছে। প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় মূল আর্য (ইন্দো-ইউরোপীয়), আর্য (ইন্দো-ইরাণীয়) এবং ভারতীয় আর্য (বৈদিক ও সংস্কৃত) ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা ভারতবাসী কর্তৃক এই প্রথম।" [৭৫]

আসলে সুকুমার সেন বলতে চেয়েছেন অক্ষয়কুমার দত্তই প্রথম বিজ্ঞানমনস্ক বাঙালী। ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন ভারতবাসী কর্তৃক প্রথম ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা করার গৌরব অক্ষয় কুমার দত্তকে অর্পণ করেছেন।

অক্ষয়কুমার দত্তের বিখ্যাত একটি গ্রন্থ 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১৮৫১, ১৮৫৩) আলোচনা করে আমরা তাঁর স্বদেশ ভাবনার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব। এই গ্রন্থটিতে আপামর বাঙালীর দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে সচেতন করার উদ্দেশ্যে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। গ্রন্থটি যে বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য সেকথা অক্ষয়কুমার দত্ত বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেন;—

"দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা, কিন্তু কি উপায়ে এই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে পারে তাহা সম্যকরূপে অবগত না থাকাতে, মনুষ্য অশেষ প্রকার দুঃখ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। অতি পুর্ব্বাবধি নানাদেশীয় নীতি-প্রদর্শক ও ধর্ম্ম প্রয়োজক পণ্ডিতেরা এবিষয় বিস্তর উপদেশ প্রদান করিয়াছেন—কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অদ্যপি ভূমণ্ডলে রোগ, শোক, জরা, দারিদ্র্য প্রভৃতি নানা প্রকার দুঃখে আকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। অতএব, এবিষয়ের যাহা কিছু জ্ঞাত হইতে পারা যায়, তাহা একান্ত যত্ন পূর্ব্বক প্রচার করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব্ সাহেব-প্রণীত "কান্স্টিটিউশন আব ম্যান্" নামক গ্রন্থে এবিষয়ে সুন্দর রূপে লিখিত হইয়াছে। তিনি নিঃসংশয়ে নিরূপণ করিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের নিয়ম প্রতিপালন করিলেই সুখের উৎপত্তি হয়, এবং লঙ্ঘন করিলেই দুঃখ ঘটিয়া থাকে। জগদীশ্বর কি প্রকার নিয়ম প্রণালী সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, এবং কোন্ নিয়মানুসারে চলিলে কিরূপ উপকার হয়, ও কোন্ নিয়ম অতিক্রম করিলে কি প্রকার প্রতিপালন প্রাপ্ত হওয়া যায়, ঐ গ্রন্থে তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থের অভিপ্রায় সমুদায় স্বদেশীয় লোকের গোচর করা উচিত ও অত্যাবশ্যক বোধ হওয়াতে বাঙ্গালাভাষায় তাহার সার সংকলন পূর্ব্বক 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক এক এক প্রস্তাব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'তে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।...ইহা ইংরেজী পুস্তকের অবিকল অনুবাদ নহে। যে সকল উদাহরণ ইউরোপীয় লোকের পক্ষে সুসঙ্গতও উপকার জনক কিন্তু এদেশীয় লোকের পক্ষে সেরূপ নহে তাহা পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যে সকল উদাহরণ এদেশীয় লোকের পক্ষে সঙ্গত ও হিতজনক হইতে পারে, তাহাই লিখিত হইয়াছে। এদেশের পরম্পরাগত কুপ্রথা সমুদায় মধ্যে উদাহরণ স্বরূপে উপস্থিত করিয়া তাহার দোষ প্রদর্শন করা গিয়াছে।" [৭৬]

অতএব, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' নামক গ্রন্থে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের সুখ ও সমৃদ্ধিই লেখক অক্ষয় কুমার দত্তের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আমরা লক্ষ করব, অক্ষয়ককুমার দত্ত ধর্মপ্রাণ বাঙালীকে ধর্ম বিষয়ে সুচিন্তিত মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ধর্ম বলতে জপ, তপ, ধ্যান প্রভৃতি আচার সর্বস্বকে নির্দেশ করেন নি। আধুনিক যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে ধর্মের সংজ্ঞা নির্দেশ করেন। 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' এর দ্বিতীয় ভাগে, 'বিদ্যা ও ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ বিচার' নামক দশম অধ্যায়ে তিনি বিদ্যার সঙ্গে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক দেখিয়ে বলেন;— "......বিদ্যার সহিত ধর্ম্মের এ প্রকার সংযোগ হইলে, সংসারের অশেষ উপকার সম্ভাবনা।" [৭৭] আর ধর্মের বিষয়ে তিনি 'বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন;—

"বিশ্বপতি যে সকল শুভকর নিয়ম সংস্থাপন করিয়া বিশ্বরাজ্য পালন করিতেছেন, তদনুযায়ী কার্য্যই তাঁহার প্রিয় কার্য্য; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি প্রকাশপূর্ব্বক তৎসমুদায় সম্পাদন করাই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম।" (৭৮)

তিনি আরো বলেন, বাস্তব কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস অবলম্বন করা মোটেই উচিত নয়। প্রসঙ্গত বলা যায়, আমাদের দেশে ধারণা প্রচলিত আছে যে ধর্ম বা পূণ্য অর্জন করতে হলে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের শরণ নিতে হবে। উনিশ শতকেও এই ধারণা অপরিবর্তিত ছিল। এতে দেশের মানুষের ত্যাগ ধর্মের মাহাত্ম্য প্রকাশ পেলেও পরোক্ষে স্বদেশের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছিল। এতে এদেশের মানুষের বাস্তব কর্মের প্রতি অনেকটা শিথিল মনোভাব সৃষ্টি হয়। অক্ষয়কুমার সেজন্য 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে বলেন;—

"ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেশকেরা সংসারে বদ্ধ থাকা পাপের কর্ম্ম এবং সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করা পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন। কিন্তু এই উপদেশ আমাদিগের স্বভাব বিরুদ্ধ। আমাদের সমুদায় মনোবৃত্তিই গার্হস্থ্যাশ্রমের উপযোগী, অতএব, লোকে তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না।"(৭৯)

অক্ষয়কুমার দত্ত জাগতিক কর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণের বিরোধিতা করেন; তাঁর ভাষায়;—

"যখন লোকে নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, যথার্থ কর্ম্ম সাধন সাংসারিক সুখের কারণ, কোন ক্রমেই কষ্টের কারণ নহে, তখন আপনা হইতেই তাহাদিগের কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ও অনুরোক্তি হইবে।" (৮০)

কেননা, মানুষ চায়;—"দুঃখ নিবৃত্তি হইয়া সুখ বৃদ্ধি হয় ইহা সকলেরই বাঞ্ছা," (৮১) অক্ষয়কুমার দত্ত মানুষের কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে আরো লিখেছেন;—

"আমাদিগের মনোবৃত্তি সমুদায়ের স্বরূপ ও কার্য্যাকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতিত হয়, আমরা জনসমাজের উন্নতি সাধন করিবার নিমিত্তেই সৃষ্ট হইয়াছি, তাহা পরিত্যাগ করা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে।" (৮২)

অক্ষয়কুমর দত্তের মতে, প্রচলিত ধর্ম যদি এই মহৎ কর্তব্য পালনে প্রতিবন্ধক হয়, তবে সেই ধর্মকে সংস্কার করতে হবে। তিনি বলেন ;—"অতএব, যে সকল প্রচলিত ধর্ম্মের সহিত জগতের নিয়ম শৃঙ্খলার ঐক্য নাই তাহা সংশোধন করা কর্ত্তব্য।"(৮৩) এখানে অক্ষয়কুমারের উদার ও বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি স্বদেশীয় ধর্মের ঐতিহ্যের গৌরব করতে গিয়ে সংকীর্ণ হতে পারেন নি। আমাদের প্রচলিত ধর্ম যদি মানব কল্যাণে প্রতিকূল হয়, তাহলে সেই ধর্মকে তিনি সংশোধন করার কথা বলেন। এতে তাঁর ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে নিরপেক্ষ মনের পরিচয় আমাদের বিস্মিত করে। আমরা জানি, উনিশ শতকেও বঙ্গসমাজে ধর্মের নামে

নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যথা;—বর্ণবৈষম্য ও নারী-পুরুষে ভেদাভেদের মত্র অমানবিক প্রথা, আচার-আচরণ প্রভৃতি ধর্ম বলে পরিচিত। অক্ষয়কুমার জানেন সমাজ থেকে ধর্মের নামে প্রচলিত উক্ত কুসংস্কারকে বর্জন করতে না পারলে বাঙালীর উন্নতি সম্ভব নয়। সেজন্যই তিনি 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' গ্রন্থে ধর্মের সংশোধন করা কর্তব্য বলে মন্তব্য করেন। লেখক অক্ষয়কুমার ধর্মপ্রাণ বাঙালীর উন্নতির পক্ষে অন্তরায় প্রচলিত সংকীর্ণ ধর্মকে সংস্কার করার পরামর্শ দিয়ে বাঙালী সমাজের উন্নতির পথ-নির্দেশ করেছেন। যে নির্দেশ বা উপদেশ উনিশ শতকের বাঙালীর মুক্তির জন্য খুবই জরুরি। অক্ষয়কুমার দত্ত রচিত বাংলা ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ বঙালী সমাজের ধর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়নের ভাবনায় সমৃদ্ধ —সেকথা বলাই বাহুল্য।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষী আপামর বাঙালীকে প্রকৃত মত ও পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। তাঁদের রচিত বাংলা রচনাও এই মনোভাবকে যথার্থ রূপে ব্যক্ত করে। আমরা লক্ষ করেছি—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মনীষী সামাজিক, ধর্মীয় ও জীবনের অন্যান্য স্থবিরতা থেকে মুক্তির মন্ত্র শুনিয়েছেন। তাঁরা প্রয়োজনে যুক্তি-নির্ভর জীবনাচরণের প্রতি বাঙালীকে আকৃষ্ট হতে বলেন। কেননা বাঙালীর মুক্তির একমাত্র উপায় অন্ধবিশ্বাস, দেশাচার প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলি ত্যাগ করে প্রকৃত সত্যকে জানা। সেজন্য দাবী করা যায়—রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্তের সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার অস্তিত্ব বর্তমান।

উল্লেখপঞ্জী

১। বাংলাদেশের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড (আধুনিক যুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, ৩য় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৮৮ বঙ্গাব্দ (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণীমুদ্রণ ঃ ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯, পৃ: ৪৯৯।

২। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ এজ প্রথম সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬২, চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ভাদ্র, ১৩৯০, আগষ্ট ১৯৮৩, পৃ: ৭৮।

৩। সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, সম্পাদনা ঃ বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ—১ বৈশাখ ১৪০২, পরিবেশক ঃ দে বুক স্টোর-১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, পৃ: ৩০২।

৪। অনুষ্ঠান, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১১।

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ এজ প্রথম সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬২, চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ভাদ্র, ১৩৯০, আগষ্ট ১৯৮৩, পৃ: ৮২।

৬। পাদটীকা ও তথ্যপঞ্জী, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রথম পর্ব), অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ঃ ১৯৮৯, পৃ: ২৪২।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৭।

৮। ভূমিকা, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ৭।

৯। ভূমিকা, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩-৪।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।

১৩। অনুষ্ঠান, বেদান্তগ্রন্থ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১১

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ: ১০

১৭। বেদান্তসার, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১২৩

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৪

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬

২০। ভূমিকা, ঈশোপনিষৎ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪, পৃ: ১৯৫।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৫

২২। ভূমিকা, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার, রামমোহন গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ১৫৫-১৫৬।

২৩। সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫০, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ১১-১২।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

২৬ প্রাগুক্ত, পৃ: ১২।

২৭। সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ, রামমোহন গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫০, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ৪৬।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮।

৩০। বজ্রসূচী, রামমোহন গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ২৮।

৩১। ব্রাহ্মণ সেবধি, রামমোহন গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০, পৃ: ৫।

৩২। বিদ্যাসাগর, শ্রী চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, প্রথম আনন্দধারা সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭৬, পৃ: ৮।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৪।

৩৪। বাল্যবিবাহের দোষ, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ৩-৪।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬।

৩৭। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রথম প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৬৯।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৮।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৮-৫৭৯।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৩।

৪১। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৮২-৫৮৩।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৩।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৩-৬৮৪।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৮৪।

৪৫। বিজ্ঞাপন, বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৬৮৬।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩০।

৪৭। বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক, বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯, পৃ: ৮৮২।

৪৮। বিজ্ঞাপন, কথামালা, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ২৯।

৪৯। বিজ্ঞাপন, বোধোদয়, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ১৭৫

৫০। বাক্যকথন—ভাষা, বোধোদয়, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ১৮৬।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।

৫২। শিল্প-বানিজ্য-সমাজ, বোধোদয়, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ২১১।

৫৩। বিজ্ঞাপন, চরিতাবলী, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ৮১।

৫৪। প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, আখ্যানমঞ্জুরী, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ৩৭৭

৫৫। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাব, বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রী অশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২, পৃ: ৯৫।

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৩।

৫৯। আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৮৯৮, চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৯৬২, পৃ: ৩-৪।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯।

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২-৬৩।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪-৬৫।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫-৩৬।

৬৭। চতুর্থ উপদেশ — আত্ম উন্নতির উপায়, জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত, ১ম মুদ্রণ ঃ ১৮১৫ শক—১০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৮৪৬, শক—৫০০, পৃ: ১০৬।

৬৮। দ্বাবিংশ ব্যাখ্যান, ব্রহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম প্রকাশ, ১ম প্রকরণ ঃ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক, দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ বৈশাখ ১৭৮৮ শক, মাসিক ব্রহ্ম সমাজের উপদেশ, আষাঢ় ১৭৯০ শক, পৃ: ১০৬।

৬৯। অবতরণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৫।

৭০। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৪০৩, পৃ: ২৭।

৭১। চোখের বালি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ: ২৪।

৭২। বিজ্ঞাপন, চারুপাঠ — অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৭৭৫ শকাব্দ, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ১-২, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি)।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪-৬৬।

৭৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ডডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৪০৩, পৃ: ২৬।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮।

৭৬। বিজ্ঞাপন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৭৭। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—২য় খণ্ড, অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩০, পৃ: ১৪৯, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা পাওয়া যায় নি)।

৭৮। বিজ্ঞাপন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৭৯। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—২য় খণ্ড, অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩০, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৮০। প্রাগুক্ত।

৮১। বিজ্ঞাপন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—অক্ষয়কুমার দত্ত, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৮২। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার—২য় খণ্ড, অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩০, (প্রচ্ছদ পৃষ্ঠা ও ভিতরের প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠা নং পাওয়া যায় নি)।

৮৩। প্রাগুক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

উনিশ শতকের নক্‌সা ও নক্‌সা জাতীয় সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা

নক্‌সা সাহিত্যে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা আলোচনা করার পূর্বে প্রথমে নক্‌সা সাহিত্য কি সেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করা প্রয়োজন । উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য সংকীর্ণ সাহিত্যিক পরিমণ্ডল থেকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বেরিয়ে আসে। পরিবর্তন আসে বিষয়ে-রূপে-রীতিতে। নক্‌সা বলতে আমরা যেসব রচনাকে নির্দেশ করছি, সেগুলির উনিশ শতকের পূর্বে অস্তিত্ব ছিল না। কেননা নক্‌সার বাহন গদ্য এবং সামাজিক উন্নতি করার প্রত্যক্ষ প্রবণতা; যা উনিশ শতকের পূর্বে ছিল না। সাহিত্যের বিচিত্র রসাস্বাদমূলক প্রকরণ নক্‌সা। নক্‌সা বলতে এক কথায় বোঝায়, পাঠককে সচেতন করার লক্ষ নিয়ে গদ্যে রচিত লঘু রসাত্মক বা রঙ্গব্যঙ্গমূলক রচনা। সার্থক কথাসাহিত্য সৃষ্টির পূর্বে, কথাসাহিত্যের প্রস্তুতি পর্বের রচনাবলীকে এখানে নক্‌সা জাতীয় রচনা বলা হয়েছে। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে, সমকালের পাঠককে সচেতন করার লক্ষ নিয়ে বাংলা গদ্যে ব্যঙ্গাকারে বাঙালী জীবনের সমস্যার রূপ নির্মাণে যাঁরা সক্রিয় ছিলেন, এখানে তাঁদের রচনাকে নক্‌সা জাতীয় রচনা বলা হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথম দিকে গদ্যচর্চা ও নবগঠিত সমাজ বাংলা নক্‌সার সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করেছিল। এই শতকের পূর্বে বাংলা গদ্য বলতে চিঠিপত্র বা দলিল বোঝাত, কিন্তু বাংলা গদ্য যে বিচিত্র ও গভীর ভাবের বাহক এবং ধারক হবার যোগ্য, উনিশ শতকের পূর্বে সে বিষয়ে ধারণাই ছিল না। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর মিশন ও কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলায় অনেকগুলি গদ্যগ্রন্থ অনুবাদ ও রচনা হয়। রাজা রামমোহন রায় প্রথম ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে বেদ, বেদান্ত সম্পর্কিয় ভারতীয় দর্শনের বিভিন্ন নিগূঢ়তম তত্ত্বকে বাংলা ভাষায় গদ্যের আধারে সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করলেন । গদ্যের মাধ্যমে যুক্তি মীমাংসা ইত্যাদি জটিল বিষয়ের বক্তব্যকে বোধগম্যতার ভাষায় রূপায়িত করার বিশেষ সময়েই আমরা নক্‌সাজাতীয় সাহিত্যের আবির্ভাব লক্ষ করি । ভবানীচরণ বন্দোপাধ্যায় 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) রচনার দ্বারা নক্‌সা সাহিত্যের সূচনা করেন ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কেম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত ভাগ্য নির্ধারক হয়। এই শতক থেকেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের অনুকূলে এদেশে একটি দেশীয় স্তাবক-শ্রেণীর সৃষ্টি করে। স্তাবকবৃন্দ নতুন জমিদারী ও ব্যবসার দ্বারা প্রচুর অর্থ সম্পত্তির অধিকারী

হয়। এদের অধিকাংশেরই প্রকৃত শিক্ষা ও সচেতনতা ছিল না। চরম ভোগবিলাসকে জীবনের উদ্দেশ্য বলে গ্রহণ করে। এই শ্রেণীর অর্থসম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তির পোশাকী নাম 'বাবু'। বাবু সম্প্রদায় ভোগ বিলাসকে চরিতার্থ করতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খল ও নীতিভ্রষ্ট হয়, যা একাধারে তার নিজের পরিবার ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং জাতীয় জীবনে আত্ম-উন্মোচনে প্রধান বাধা। উনিশ শতকের চিন্তানায়কগণ আচারভ্রষ্ট ও নীতিভ্রষ্ট বাবু সম্প্রদায় সম্বন্ধে চিন্তাশীল ছিলেন। তাঁরা জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের জন্য নানামুখী নীতি-আদর্শের সূচনা ও প্রচার করেন। সার্থক উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ বাংলা গদ্যে রঙ্গব্যঙ্গ ও লঘুরসের দ্বারা নানারকম নীতি আদর্শের অবতারণা করেছিলেন। এই জাতীয় রচনাকে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

নক্‌সা ও নক্‌সা জাতীয় রচনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি বৈশিষ্ট্য হল সমাজ, দেশ তথা জাতীয় জীবনে হিতসাধনের প্রত্যক্ষ শুভেচ্ছা। বলা যায়, হিত সাধনের শুভ ইচ্ছা থেকেই নক্‌সা ও নক্‌সা জাতীয় রচনার সৃষ্টি। কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতি সাহিত্য প্রকরণে সমাজ, জাতি তথা দেশের আত্ম-উন্মোচনের ভাবনা নির্ভর করে বিশেষ দেশ কাল পাত্রের উপর। শুধুমাত্র হিতসাধনের ইচ্ছে থেকে সাহিত্যের এইসব প্রকরণের সৃষ্টি হয় না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সমাজ কল্যাণ বা জাতীয় কল্যাণের আবেদন থাকলেও কবি বা লেখকের অবশ্যই লক্ষ থাকে প্রকরণটিকে যথাসম্ভব রসসমৃদ্ধ করার দিকটিতে। নক্‌সা জাতীয় রচনায় সাহিত্যরসের অবতারণা করার বিশেষ অবকাশ নেই। ব্যবহারিক জীবনে আমরা কোন বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার জন্য নক্‌সা অঙ্কন করি। যেমন কোন একটি গ্রাম বা শহরের নক্‌সা তৈরী করার কারণ গ্রাম বা শহরটিতে কোথায় কী আছে তার একটি সামগ্রিক পরিচয় দান। নক্‌সা রচয়িতা সমাজ কল্যাণ বা জাতীয় কল্যাণের জন্য মানুষের ভুলত্রুটি নক্‌সাকারে পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। সেজন্য নক্‌সার লেখক প্রয়োজনে ইচ্ছেমত ব্যঙ্গ ও শ্লেষেরও আশ্রয় নেন। এর একটি-ই উদ্দেশ্য — পাঠক যেন সচেতন হয়ে জীবনের ক্ষতিকর দিকগুলি থেকে নিজেকে বিরত রাখে, যা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে লেখকের সমাজ কল্যাণ বা জাতীয় কল্যাণের মনোভাবের ইঙ্গিত বহন করে। বাংলা সাহিত্যে নক্‌সা জাতীয় রচনার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। যেমন;— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাস' (১৮২৫) 'নববিবিবিলাস' (১৮৩০) 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), 'মদ খাওয়া বড়দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১ম খণ্ড ১৮৬২, ১ম ও ২য় খণ্ড ১৮৬৪), ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের "আপনার মুখ আপনি দেখ" (১৮৬৩), ক্ষেত্রমোহন ঘোষের কাকভূষুণ্ডীর কাহিনী (১৮৬৫), ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'নিশাচর' ছদ্মনামে 'সমাজ কুচিত্র' (১৮৬৫), রামসর্ব্বস্ব বিদ্যাভূষণের— 'পল্লীগ্রামস্থ বাবুদের দুর্গোৎসব' (১৮৬৮), চুণিলাল মিত্রের 'কলিকাতার নুকোচুরি' (১৮৬৯) প্রভৃতি।

উল্লিখিত একাধিক নক্‌সা ও নক্‌সা জাতীয় রচনার মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নব বাবু বিলাস', 'নব বিবি বিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়', প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', 'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'কে আলোচনা করা হচ্ছে। প্রতিনিধিমূলক এইসব নক্‌সায় আলোচনা করা হবে জাতীয় জীবনের অন্ধকার দূর করার ক্ষেত্রে এগুলি কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৭৮৭—১৮৪৮) নক্‌সাগুলি জাতীয় জীবনের আত্মবিকাশে কতখানি ভূমিকা পালন করেছে — এবিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে ব্যক্তি ভবানীচরণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা নেওয়া বাঞ্ছনীয়। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষ পাদে ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে। পিতা রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় টাকশালের উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী। ধনাঢ্য নাগরিক পিতার সন্তান হওয়ায় সেকালের রীতি অনুসারে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, ফারসী ও ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করেন। ইংরেজী ও ফারসী ভাষায় দক্ষ হওয়ায় তাঁর রাজকীয় কাজ ও অর্থোপার্জন করতে সুবিধা হয়, তিনি সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষিত হওয়ায় ভারতীয় শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্বকথা অনুভব করতে সক্ষম হন এবং বাংলা ভাষায় দক্ষ হওয়ায় তাঁর বাংলা গদ্য রচনার পথ সুগম হয়।

কলকাতা শহরের মানুষগুলি ভবানীচরণের চোখের সামনেই আকাশ-পাতাল পরিবর্তিত হচ্ছে। নীতিহীনতা ও লক্ষভ্রষ্ট জীবন এদেরকে পেয়ে বসেছে। তাঁর চারপাশে অধিকাংশ দেশীয় মানুষের উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে। সমস্ত জীবন তিনি এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে গিয়েছিলেন। এখানেই রামমোহন রায়ের সঙ্গে তাঁর মিল। কিন্তু এই মিল কর্মের পথে ছিল না। রামমোহন জীবনে যুক্তিকে প্রয়োগ করার কথা বলেন। আর ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় যাবতীয় আধুনিক বিষয়কে ত্যাগ করে ভারতীয় সনাতন আদর্শ, সনাতন ধর্ম, সনাতন সংস্কৃতিকে বরণ করে জীবনে প্রশান্তি ও শৃঙ্খলা আনতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি প্রথমে 'সম্বাদকৌমুদি' (১৮২১) ও পরে 'সমাচার চন্দ্রিকা' (১৮২২) নামে বাংলা সংবাদপত্রের সম্পাদনা করেন এবং 'ধর্ম্মসভা' (১৮৩০) নামে একটি সংগঠন সৃষ্টি করে নেতৃত্ব দেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই 'ধর্ম্মসভা' ইতিহাসের বিচারে স্বদেশীয় ভাবধারা লালনপালনের প্রথম প্রতিষ্ঠানের বিরল সম্মান পেতে পারে।

ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশীয় সংস্কৃতি লালনপালনের ভাবনাকে ব্যাপক প্রচার করার জন্য সংস্কৃত ভাষা ও বাংলা ভাষাকে হাতিয়ার হিসাবে গ্রহণ করেন। সংস্কৃত ভাষাকে ভারতীয় অধ্যাত্মবাদ, দর্শন ও নিগূঢ় তত্ত্বকথার প্রকাশক হিসাবে গ্রহণ করেন। সেজন্যই তিনি একাধিক সংস্কৃত গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। যেমন 'শ্রীমদ্ভাগবত' (১৮৩০), 'মনুসংহিতা' (১৮৩৩), 'ঊনবিংশ সংহিতা' (১৮৩৩?), 'শ্রীভগবদ্গীতা' (১৮৩৫)

প্রভৃতি। এসব ছাড়াও তিনি লঘুরস বা ব্যঙ্গরসের দ্বারা পাঠকের চেতনার বিকাশ ঘটাতে চেয়েছেন। এখানে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লঘুজাতীয় গদ্যরচনাগুলি আলোচিত হয়েছে।

নব বাবু বিলাস (১৮২৫)

লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'নব বাবু বিলাস'-এর 'ভূমিকা'য় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার করেন। সেকালে কলকাতা ও তার আশপাশের 'চিতপুর', 'খিদিরপুর', 'ভবানীপুর', 'শিবপুর', 'চুচড়া', 'শ্রীরামপুর' প্রভৃতি অঞ্চলের বাবুকালচার প্রত্যক্ষ করে 'নববাবুবিলাসাবিধান' রচনা করেন। তিনি বলেন, এইসব নববাবু সম্প্রদায় "ধর্মকর্মানুষ্ঠানবিবর্জিত স্বীয়ধর্মচ্যুত অন্যধর্মাশ্রিত"। [১] স্বদেশীয় সমাজের এইসব জঞ্জালকে নির্মূল করতে লেখক এই জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতে, যারা এই গ্রন্থটি মনোযোগ সহকারে পড়বেন তাদের "স্ব স্ব রোষদোষ বিমোচন হইবেক" [২]। এই মহৎ উদ্দেশ্যে 'নব বাবু বিলাস' রচিত হয়।

'নব বাবু বিলাস' চারটি খণ্ডে বিভক্ত। 'অঙ্কুর খণ্ড', 'অথপল্লব খণ্ড', 'অথ কুসুম খণ্ড' ও 'অথ ফল খণ্ড' নামে চারটি খণ্ডে নববাবুর আদ্যোপান্ত জীবনীর পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষ বিবরণ পাওয়া যায়। তৎকালীন সমাজে নতুন ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রের আদর্শহীন শিক্ষা দানের ইতিহাস পাওয়া যায়; যা ভারতীয় টোল চতুষ্পাটির শিক্ষা নয়, আবার ইউরোপীয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষাও নয়। ফলে নীতিহীন, রুচিহীন কোলাহলময় জীবনকে নববাবুরা অনায়াসে গ্রহণ করে। জীবনটাকে এরা ভোগের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে দেয়। গঠনমূলক চিন্তা চেতনাহীন বাবুরা সুরাপান, বারাঙ্গনা গৃহে গমন ও মোসাহেব পরিবৃত হয়ে থাকে। পরিশেষে নিজের পরিবারের সর্বনাশ ডেকে আনে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে দেখিয়েছেন, নববাবু চরম দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে খেদ প্রকাশ করেছে। 'অথনববাবুর খেদ বর্ণনা' নামক পরিচ্ছেদে নববাবুর বিবেক দংশন প্রকাশ পেয়েছে। এখানে নব বাবু তার কৃতকর্মের জন্য বিলাপ করেছে। যথা;—

"বহুশ্রমে পিতা করি ধন উপার্জন।
রেখেছিলেন প্রাণপণে আমারি কারণ।।
আমার কপাল গুণে বিদ্যা না হইল।
কুমন্ত্রী খলিপা কর্ণে কুমন্ত্রণা দিল।।

— — —

মতি ছিল নিরন্তর কুকর্মেতে আশা।
কুকর্ম করিয়া আমার এই দেখ দশা।।" [৩]

নব বাবু তার অসহ্য দুর্দশার জন্য মৃত্যু প্রার্থনা করে। নক্সাকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন;—

"করহ উদ্ধার বিধি এ ঘোর সঙ্কটে।

লয়ে যাও ত্বরা করি যমের নিকটে।।" [৪]

—কেননা ভোগবাদী উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনে নববাবুর নানা রকম দুরবস্থা দেখা যায়। যথা;—নির্ধন হবার পূর্বে রক্ষিতার কাছে অপমানিত ও বিতাড়িত হয়, নিকট আত্মীয়রা তাকে একঘরে করে, স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস না করেও পাঁচটি কন্যা সন্তানের পিতা হতে হয়, কারাবাস করতে হয়। পরিশেষে সর্বস্বান্ত নববাবু বলে "তণ্ডুলাদি প্রতিদিন আনি ভিক্ষা মাগি।" [৫] গ্রন্থকার ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবুর বিষাদময় চিত্র অঙ্কন করে সমকালের উচ্ছৃঙ্খল ও কোলাহলময় জীবনাচরণে আসক্ত বাবুদের এবং গ্রন্থের অন্যান্য পাঠককে আত্ম সচেতন করে তোলার দায়িত্ব নেন।

নব বিবি বিলাস (১৮৩২)

'নব বিবি বিলাস' যেন 'নব বাবু বিলাস'-এর কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ রূপ। উচ্ছৃঙ্খল ও বেলেল্লাপনা জীবনকে যারা বরণ করে নিয়েছিল, তাদের অন্তপুরের গৃহবধূর পথভ্রষ্ট হওয়ার মর্মান্তিক নক্সা 'নব বিবি বিলাস'। কাহিনীর শেষে 'অথ নব বিবির বিলাপ' নামক অংশে নববিবির অনুশোচনা দেখান হয়েছে। একদা স্বামীর সোহাগ বঞ্চিতা গৃহবধূ অভিমানে অসংযমী ঘৃণ্য জীবনাচরণকে বেছে নেয়। কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে তার মনে হয়েছে গৃহকোণই নারীর সঠিক আশ্রয়স্থল। নববিবি বলে;—

"আমার দুঃখের কথা করি নিবেদন।
শুনিয়া সর্তক হও কুলনারীগণ।।

— — —

ধর্ম রক্ষা কর সবে হইও না অসতী।
অসতী হইলে পাবে অশেষ দুর্গতি।।

— — —

সকল গৃহস্থকন্যা জানিবে নিশ্চয়।
সুখভোগ ইহাতে কখন নাহি হয়।।

— — —

অতএব পুন২ করি নিবেদন।
কুলধর্ম রক্ষা কর কুলনারীজন।।" [৬]

—লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নববাবুর পাশাপাশি কুলনারীদের নিকট আবেদন করেন — তারা যেন ভারতের চিরাচরিত ধর্ম, আচার, রীতি বিসর্জন দিয়ে আধুনিক প্রচলিত সর্বনাশী জীবন অবলম্বন না করে।

'নব বিবি বিলাস'-এর কাহিনী অত্যন্ত বিষাদময়। যা পাঠ করলে নববাবু ও নববিবি সম্পর্কে সমাজের মানুষের মনে ঘৃণা জাগবে। পতি সোহাগ বঞ্চিতা অভিমানী গৃহবধূ এক কুট্টিনী নাপিতিনীর পরামর্শে দেহের উত্তেজনা চরিতার্থ করতে প্রথমে রাজি হয়। নব বিবি, বিবাহিত স্বামীর আশা ত্যাগ করে অসংযমী জীবনযাপন করে। কিন্তু যৌবন গত হলে বেশ্যাবৃত্তি ত্যাগ করে ক্রমান্বয়ে দাসীবৃত্তি, কুট্টিনীবৃত্তি ও পরিশেষে ভিক্ষাবৃত্তির দুর্বিষহ জীবন বেছে নিতে বাধ্য হয়।

'নব বিবি বিলাস'-এর 'ভূমিকা'য় লেখক ভবানীচরণ গ্রন্থের উদ্দেশ্যের কথা বলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "যাঁহারা সুবোধ অথচ রসিক বাবু তাঁহারা কাহারো কাবু না হইয়া নববাবু ও নববিবি উভয়েরি নষ্ট চরিত্র দেখিয়া আপন২ চরিত্র পবিত্র করিতে পারিবেন যেহেতুক বিচক্ষণ লোক অন্যের দোষ বিলক্ষণ রূপে সমীক্ষণ পূর্বক আপন দোষ পরিহার করিয়া সাবধান হয়েন।" (৭)

—'নব বিবি বিলাস'-এর কাহিনীতে জানা যায় — নববাবুর চরিত্র দোষে নববিবির উদ্ভব এবং পরিণামে চরম দুর্গতির চিত্র। 'ভূমিকা'র শেষে লেখক তাই আশা ব্যক্ত করেন;— "ইহা শ্রবণে কুলবধূজনের মনে বেশ্যাদিগের দুরবস্থায় দুঃখ সম্ভাবনায় লজ্জা ও ভয় উভয় জন্মিয়া জ্ঞানোদয় হইতে পারিবেক..."(৮) এইসব বক্তব্যে লেখকের সুস্থ সমাজ গঠনের মনোভাব ধরা পড়ে।

কলিকাতা কমলালয় (১৮২৩)

'কলিকাতা কমলালয়'-এর বিষয় ও ভূমিকা পাঠ করলে মনে হবে কলকাতার ব্যবহার, রীতি ও বাক্চাতুরী ইত্যাদি পরিচয়ের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভূমিকায় লিখেছেন; —

> "এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ করিয়া কলিকাতা কমলালয় নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত হইলাম এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন," (৯)।

লেখক এখানে কলকাতার স্পষ্ট পরিচয় উদ্‌ঘাটনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গ্রন্থটি প্রশ্নোত্তরের ভঙ্গিতে রচিত। গ্রাম থেকে আগত এক ব্যক্তির কলকাতা সম্বন্ধে নানা প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন শহরবাসী এক ব্যক্তি। গ্রন্থটিতে চিত্রিত নক্‌সা সমকালীন কলকাতার ঐতিহাসিক দলিল হয়ে উঠেছে।

কিন্তু 'কলিকাতা কমলালয়' আগাগোড়া পাঠ করলে পরোক্ষে অন্য আর একটি উদ্দেশ্যের সন্ধান পাওয়া যাবে। গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে ভবানীচরণ আত্মসম্ভ্রমের পরিচয় দেন। উনিশ শতকের গোড়ায় লেখক অবক্ষয়িত সমাজের প্রেক্ষাপটে গ্রামবাসী ও শহরবাসীর প্রশ্নোত্তরের দ্বারা প্রমাণ করেন,— অভদ্র, অসচেতন, হঠাৎ টাকাওয়ালা অশিক্ষিত সমাজ জাতীয় সংস্কৃতির অবক্ষয় এনেছে। কিন্তু কলকাতার ভদ্র, চিত্তশুদ্ধ ও শিক্ষিত সমাজে অবক্ষয় আসে নি। তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চললেও স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা জানাতে ভোলেন নি। এই বিষয়টি প্রকাশ করতে লেখক যথেষ্ট নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেন। এই গ্রন্থের দ্বারা তিনি ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে স্বীকৃতি জানিয়েছেন। পরোক্ষে ভবানীচরণ ইঙ্গিত দেন, ভারতীয় শাশ্বত সংস্কৃতিকে অবলম্বন করলে সমাজে ভদ্র, পবিত্র, শৃঙ্খলপরায়ণ ও শান্তিপূর্ণ জীবনাচরণ করা যায়। পাঠক ও শ্রোতার নিকট এই কাঙ্ক্ষিত বার্তাটি পৌছান গ্রন্থকারের একটি উদ্দেশ্য, একথা বলা যায়।

বিদেশী ওরফে গ্রামবাসী সমকালের কলকাতার অবক্ষয়ের বিষয়ে প্রশ্ন করেন;—"শুনিতে পাই কলিকাতার অনেক লোক আচারভ্রষ্ট হইয়াছেন..."(১০); উত্তরে নগরবাসী বলেন, আপনি যা শুনেছেন —তা 'যথার্থ' "কিন্তু এতাদৃশী রীতি হিন্দু মাত্রের প্রায় নাই তবে যদি কাহার থাকে সে কেবল হিন্দুবেশধারী হইবেক..."(১১)। ভবানীচরণ জোর দিয়ে বলেন যুগের পরিবর্তন এলেও ভদ্রলোকের কাছে হিন্দু আচার আচরণের মূল্য এখনও আছে । বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা, দেশীয় শাস্ত্রের প্রতি অবহেলা প্রভৃতি প্রসঙ্গে নগরবাসী বলেন এসব বক্তব্য পুরোপুরি ঠিক নয় । তাঁর ভাষায়;—

> "কেহ সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না তুমি ইহাই শুনিয়াছ কিন্তু সে ভ্রান্তিমাত্র দেখ অমুক২ বাবু কতপ্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ করিয়াছেন আর অনেক ভদ্রলোকের সন্তানেরা অগ্রে সংস্কৃতানুযায়ি বাঙ্গালা ভাষা ও লেখাপড়া অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজী ও পার্সি বিদ্যা শিক্ষা করেন..."(১২)।

গ্রন্থের উল্লিখিত বক্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে —যুগের প্রয়োজনে ইংরেজী ও পার্সী ভাষা শিখলেও সমকালে সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন ও বাংলা ভাষা চর্চা আদৌ বন্ধ হয় নি। লেখক এখানে ইংরেজীর মতো ভাষার গুরুত্বের কথা স্বীকার করলেও দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রশ্নে আপোষ করেন নি। উত্তরদাতা শহরবাসীর মুখ দিয়ে তিনি যেন তাঁর বক্তব্যের আবৃত্তি করান। লেখক যেন বলতে চেয়েছেন — সন্ধ্যাপূজা, দৈবকর্ম, পিতৃকর্মের মতো একান্ত দেশীয় পবিত্র সংস্কৃতির ক্রিয়াকর্মে বিদেশী ভাষা ব্যবহার অনুচিত কিন্তু বিষয়কর্মে, হাস্যপরিহাসে ও নিত্যপ্রয়োজনীয় কর্মে বিদেশী ভাষা ব্যবহার দোষের নয় ।

'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থের লেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্রমাণ করেন— কলিকাতায় অনাচার নেমে এলেও দান-ধ্যান, আচার ক্রিয়াকর্ম প্রভৃতি ভারতীয় সনাতন বিষয়গুলি আজও

অব্যাহত। এসব পবিত্র বিষয় জীবনে অবলম্বন করলে জীবনের মান আরো উন্নত হবে । লেখকের এরকম মানসিকতায় ভারতীয় নীতি, ধর্ম, সভ্যতা, আচার প্রভৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার দিকটি স্পষ্ট হয় । সঙ্গে সঙ্গে পরোক্ষে যেন বলে দেয় ভারতবাসীর দুর্দিনে ভারতীয় রীতি-নীতি, আচার-ধর্মকে অবহেলা করলে জাতীয় মুক্তির পথ আরো কঠিন হবে ।

প্যারীচাঁদ মিত্র

উনিশ শতকের স্বনামধন্য এক চরিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩)। তাঁর জীবনাদর্শ ছিল— অধ্যাত্মবাদে প্রগাঢ় বিশ্বাস, আধুনিক বিদ্যা শিক্ষার প্রতি নিষ্ঠা, সঙ্গে সক্রিয় সমাজকল্যাণ বা জনকল্যাণের মনোভাব । একাধিক বাংলা ও ইংরেজী গ্রন্থগুলি তাঁর জীবনাদর্শের প্রকাশরূপ । তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তাকে জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করে সমৃদ্ধ ও শৃঙ্খলাপরায়ণ সমাজগড়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। সেজন্য তাঁর সব রচনায় তত্ত্বকথা, নীতিকথা, উপদেশ যথেষ্ট সক্রিয়, যা পাঠকের চেতনাকে বিকশিত করার যোগ্যতা রাখে ।

প্যারীচাঁদ মিত্রের সমস্ত গ্রন্থে সমাজহিতৈষী ভাবনার আবেদন রাখলেও বিষয়বস্তু ও প্রকরণ গত ভিন্নতার কারণে তাঁর বাংলায় রচিত গ্রন্থগুলির চারটি শ্রেণী বিভাগ করা যায়। যথা;—

(১) লঘুরস বা রঙ্গব্যঙ্গ রস প্রধান নক্‌সা জাতীয় রচনা—'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও 'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯) ।

(২) নীতি আদর্শের প্রচার মূলক আখ্যান — 'রামারঞ্জিকা' (১৮৬০), 'যৎ কিঞ্চিৎ' (১৮৬৫), 'অভেদী' (১৮৭১), 'আধ্যাত্মিকা' (১৮৮০) ও 'বামাতোষিনী' (১৮৮১)।

(৩) প্রবন্ধ জাতীয় রচনা —'কৃষি পাঠ' (১৮৬১), 'ডেভিড হেয়ারের জীবনচরিত' (১৮৭৮), 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা' (১৮৭৯)।

(৪) কাব্য জাতীয়—'গীতাঙ্কুর' (১৮৬১)।

এখানে নক্‌সাজাতীয় রচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' গ্রন্থ দু'টিকে। লেখকের অন্যান্য রচনার সঙ্গে এ দু'টি গ্রন্থের প্রধান পার্থক্য লঘুরসের প্রাধান্য ও রঙ্গব্যঙ্গের উপস্থিতি। যেমন; 'রামারঞ্জিকা' ও 'বামাতোষিনী'তে স্ত্রীকে আদর্শবাদী ও সচেতন করার জন্য অনেক গুরুগম্ভীর তত্ত্বকথা আছে । 'যৎকিঞ্চিৎ', 'অভেদী' ও 'আধ্যাত্মিকা'য় ঈশ্বর বিষয়ক কথার সঙ্গে নানারকম তত্ত্বকথা আছে । 'কৃষিপাঠ', 'ডেভিডহেয়ারের জীবনচরিত' ও 'এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্বাবস্থা'

গ্রন্থ তিনটির প্রকরণ গত নাম প্রবন্ধ হওয়ায় বলা যায় নক্সা জাতীয় রচনার সঙ্গে কোন সাদৃশ্য নেই। এছাড়া কাব্যজাতীয় 'গীতাঙ্কুর' নামক গ্রন্থটিতে অধ্যাত্মিক বিষয় থাকায় প্রকরণগত ও বিষয়গত উভয় ক্ষেত্রেই নক্সা জাতীয় রচনার সঙ্গে বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। আসলে প্যারীচাঁদ মিত্র রঙ্গব্যঙ্গ ও লঘুরস প্রধান নক্সা জাতীয় রচনায় বাঙালী জীবনকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে কোন প্রভাব ফেলেছেন কি না —সেই বিষয়টি এখানে আলোচনা করা হবে।

আলালের ঘরের দুলাল (১৮৫৮)

বাবা-মার মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ ও আদর এবং বদসঙ্গ পেয়ে মতিলাল বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অমানুষ হওয়ার উপন্যাসধর্মী একটি আকর্ষণীয় কাহিনী 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ আছে। এই কাহিনীর সূত্রে সমকালের অনেকগুলি ছোটোখাটো চিত্র নক্সাকারে ফুটে উঠেছে। গ্রন্থটিতে একদিকে উপন্যাসের লক্ষণ অন্যদিকে নক্সার ধর্ম উভয়ই উপস্থিত। সেজন্য খুব বির্তকে না গিয়ে 'আলালের ঘরের দুলাল'কে বিশুদ্ধ নক্সা না বলে নক্সা জাতীয় রচনা বলা হল। আমার আলোচনার মূল বিষয় হল 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ কোন রকম আত্মসচেতন ভাবনা আছে কি না।

প্যারীচাঁদ মিত্র শিশুর প্রকৃত শিক্ষা সম্বন্ধে সুগভীর ভাবনা ব্যক্ত করেন 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে। তিনি দেখিয়েছেন একটি শিশুকে সুনাগরিক করতে হলে চাই উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ ও সুসঙ্গ। সমকালের কলকাতা বিশেষত উনিশ শতকের প্রথমার্ধে হঠাৎ বাবুদের নিকট সন্তানের শিক্ষা দেওয়ার মানসিকতা পেয়ে বসে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক হওয়ায় সন্তানের সুশিক্ষার ব্যাপারে কোন রকম অবহেলা করত না। এইসব নতুন বুর্জোয়া শ্রেণী অনুভব করতে পেরেছিল এযুগে সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া খুবই জরুরি। নইলে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সম্মানের সঙ্গে টিকে থাকতে অসুবিধা হবে। কিন্তু অভিভাবকের এই সদিচ্ছা সবসময় সার্থক হত না। শিক্ষা সম্বন্ধে চেতনাহীন অভিভাবক শিশুকে আদর্শ পারিবারিক পরিবেশ ও সুস্থ সামাজিক পরিবেশ দিতে পারত না। সেকালের সমাজের এই বিশেষ চিত্রটিকে ফুটিয়ে তোলার জন্য প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটি রচনা করেন। গ্রন্থের 'Preface' অংশে তিনি স্বীকার করেন

> "It chiefly treats of the pernicious effects of allowing children to be improperly brought up, with remarks on the existing system of education, on self-formation and religious culture, and is illustrative of the condition of Hindu society, manners, customs, &c. and partly of the state of things in the Moffussil."[১৩]

শিশুকে সঠিক নিয়মে প্রতিপালন করতে না পারলে বা সুশিক্ষা দিতে না পারলে পরিবার ও সমাজের পক্ষে কতখানি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে, লেখক অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে মূলত এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন ।

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কাহিনী এই রকম;—বুর্জোয়া বাবুরামবাবু একমাত্র সন্তান মতিলালের শিক্ষা দেওয়ার কথা ভাবেন। সেকালের রীতি অনুযায়ী তিনি মতিলালের জন্য বাংলা, ইংরেজী, সংস্কৃত, ফার্সী শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু একাধারে শিক্ষকের অযোগ্যতা, অভিভাবকের অজ্ঞতা ও বদসঙ্গে মতিলাল অমানুষ হয়ে উঠে। মতিলাল নববাবু হয়ে ভোগ, বিলাস, উচ্ছৃঙ্খলতাকে জীবনের হেতু মনে করে। পিতৃ বিয়োগের পর তার বাবুগিরি পূর্ণতা পায়। মতিলালের অত্যাচারে পরিবার ও সমাজ জর্জরিত হয়। চূড়ান্ত উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলে পিতৃদত্ত ধন কিছু দিনের মধ্যেই ফুরিয়ে আসে এবং এক সময়ে নিঃস্ব হয়ে যায়। তার নিঃস্ব হওয়ার পিছনে মোকাজান মিয়া ওরফে ঠকচাঁচা ও বাঞ্ছারাম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাহিনীর শেষে মতিলাল নিজের অশিক্ষা ও বদসঙ্গের জন্য বিবেক দংশনগ্রস্ত হয়ে কাশীতে এক সন্ন্যাসীর প্রেরণা ও আশ্রয়ে ধীরে ধীরে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। কাহিনীর শেষে মা-ভাই-বোন-স্ত্রী সকলের কাছে বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং যৌথ পরিবারের শান্তির নীড়ে ফিরে যায়। খুব সংক্ষেপে মূল কাহিনীটি এরকম ।

প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ নীতিঘেষা কাহিনী নির্বাচন করেন। নীতিমূলক করুণ রসাত্মক কাহিনী চয়নের পিছনে লেখকের সমাজ কল্যাণের ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠে। অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই কলকাতায় ইংরেজ সৃষ্ট একটি ধনাঢ্য গোষ্ঠী তৈরী হয়। এরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সুসম্পর্ক রেখে প্রচুর ধন সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল । অনেকের শিক্ষা-সচেতনতা ছিল তথৈবচ। উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্যারীচাঁদ মিত্র যখন এই গ্রন্থখানি লিখছিলেন তখনও এইসব বাবুদের অস্তিত্ব ছিল। এদের পরিবারেই মতিলালের মত অমানুষের জন্ম হত । যার বাবুগিরিতে বিপন্ন হত গোটাপরিবার ও সমাজ। প্যারীচাঁদ মিত্র যুগোপযোগী করুণ রসের কাহিনী নির্বাচন করে সমকালের পাঠককে সচেতন করার কথা ভাবেন। যাতে মতিলালের মত বদ্ চরিত্রের ছেলে সমাজে আর তৈরী না হয় । সুযোগ বুঝে লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র অনেকগুলি নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। যেমন;—

ক) "ছেলেকে সৎ করিতে হইলে, আগে বাপের সৎ হওয়া উচিত।" (১৪)

খ) "শিক্ষকের কর্তব্য, যে শিষ্যকে কতকগুলো বহি পড়াইয়া কেবল তোতা পাখী না করেন।" (১৫)

গ) "শিশুদিগের প্রতি এমন নিয়ম করিতে হইবেক যে তাহারা খেলাও করিবে — পড়াশুনাও করিবে। ক্রমাগত খেলা করা অথবা ক্রমাগত পড়াশুনা করা ভাল নহে।" (১৬)

ঘ) "সঙ্গদোষের ন্যায় আর ভয়ানক নাই। বাপ মা ও শিক্ষক সর্বদা যত্ন করিলেও সঙ্গদোষ সব যায়, যে স্থলে ঐরূপ যত্ন কিছুমাত্র নাই, সে স্থলে সঙ্গদোষ কত মন্দ হয়, তাহা বলা যায় না।" (১৭)

ঙ) 'লেখাপড়া শিখিবার তাৎপর্য এই, যে সৎ স্বভাব ও সৎ চরিত্র হইবে—সুবিবেচনা জন্মিবে ও যে২ বিষয় কর্মে লাগিতে পারে, তাহা ভাল করিয়া শেখা হইবে। এই অভিপ্রায় অনুসারে বালকদিগের শিক্ষা হইলে তাহারা সর্বপ্রকারে ভদ্র হয় ও ঘরে বাইরে সকল কর্ম ভালরূপ বুঝিতেও পারে — করিতেও পারে। কিন্তু এমত শিক্ষা দিতে হইলে, বাপ মারও যত্ন চাই — শিক্ষকেরও যত্ন চাই।" (১৮)

চ) "ছেলে একবার বিগ্‌ড়ে উঠলে আর সুযুত হওয়া ভার। শিশুকাল অবধি যাহাতে মনে সদ্ভাব জন্মে এমত উপায় করা কর্তব্য, ...অতএব যে পর্যন্ত ছেলেবুদ্ধি থাকিবে সে পর্যন্ত নানা প্রকার সৎ অভ্যাস করান আবশ্যক।" (১৯)

— শিশুকে মানুষ করার ক্ষেত্রে উল্লিখিত উপদেশ ও শিক্ষাতত্ত্বগুলি আজও অনুসরণ করার মতো। একটি শিশুর জীবনে এইসব তত্ত্ব প্রয়োগ করলে সে অবশ্যই মানুষের মতো মানুষ হয়ে উঠবে। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থটিকে অধিক জনপ্রিয় ও প্রচার করার বাসনা লেখকের প্রথম থেকেই ছিল। 'ভূমিকা'য় তিনি বলেন—

"অন্যান্য পুস্তক অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি রচিত হইল।" (২০)

— আসলে প্যারীচাঁদ মিত্র জানতেন, বিষয়কে অধিক জনপ্রিয় করতে না পারলে মানুষের নিকট নিজের নীতি আদর্শ পৌঁছুবে না। তিনি চেয়েছিলেন শিক্ষা সম্বন্ধে সমকালের পাঠকের নিকট প্রকৃত পথ ও মত তুলে ধরতে। তিনি হয়ত মনে করেন প্রবন্ধ, নাটক প্রভৃতি প্রকরণে তাঁর কথা যথেষ্ট জনপ্রিয় হবে না। সেজন্যই সমকালের জনপ্রিয় প্রকরণ উপন্যাসকে বেছে নেন। অর্থাৎ 'আলালের ঘরের দুলাল' উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়েছে, একথা লেখকের বক্তব্যেই স্পষ্ট বোঝা যায়। প্রসঙ্গত পুনরায় বলতে হয়, সে বক্তব্যের অন্তর্নিহিত মনোভাব হল শিশুর অশিক্ষার ফলে অমানুষ হওয়ার বিপদ থেকে পাঠককে সচেতন করে তোলার মহৎ উপদেশ।

'আলারের ঘরের দুলাল' রচনাটির ছোটোখাটো অনেকগুলি নক্‌সা বা চিত্র আছে, যেগুলি পাঠককে ভালোমন্দ বিবেচনা করতে শেখায়। যেমন — হিন্দু আচার ও সংস্কার, অন্তঃসারশূন্য বাবু ও তার পারিষদ, ধর্ম-সংস্কৃতির মতো ছোটোখাটো চিত্র।

আচার সর্বস্ব হিন্দুর নিকট হিন্দুত্ব বা ধর্ম হল তিলোক পরা, কোশাকোশী নিয়ে পূজা করা, হরিনামের মালা জপা ইত্যাদি। মতিলাল পুলিশের কাছে ধরা পড়লে মুক্তির জন্য তার বাড়িতে চণ্ডীপাঠ, স্বস্ত্যয়ণ, শিবপূজা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। মতিলালের বিয়েতে মোকাজান মিঞা বা ঠকচাঁচা উপস্থিত হলে জাত-পাত বা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বলা হয়েছিল;—"হিন্দুর কর্মে মোছলমান কেন?" (২১) অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত আচার সর্বস্ব হিন্দুর কাছে সর্বভূতে শ্রীকৃষ্ণ থাকেন —এ বিশ্বাসের চাইতে জাতপাতের বিষয়টিই বড়। হিন্দু সমাজ বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার মতো সামাজিক ব্যাধিতে জর্জরিত। এই সব চিত্রকে লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র নিপুণতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন। বালক মতিলালের বিয়েতে বেণীবাবু আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন;— "অসময়ে বিবাহ দিলে ছেলের নানা প্রকার হানি করা হয়।" (২২) বহু বিবাহের চিত্রটি ফুটে উঠে বাবুরামবাবুর দ্বিতীয় বিবাহের দ্বারা। বেণীবাবু প্রসঙ্গত বলেন—"এক স্ত্রী সত্বে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করা ঘোর পাপ। যে ব্যক্তি আপন ধর্ম বজায় রাখিতে চাহে সে এ কর্ম কখনই করিতে পারে না।" (২৩) কুলীন মেয়েদের জীবনে ভয়ঙ্কর কৌলীন্য প্রথার চিত্রটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে বাবুরামবাবুর দুই কন্যা মোক্ষদা ও প্রোমদার যন্ত্রণাময় জীবন চিত্রের দ্বারা। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথার মত প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে প্যারীচাঁদ মিত্র অবাঞ্ছিত ও কুসংস্কার হিসাবে চিত্রিত করেন। ধর্মের প্রকৃত অর্থ সেকালে বেশীরভাগ মানুষের কাছে ছিল অস্পষ্ট। ধর্ম বলতে তাঁরা আচার প্রথাকেই মনে করতেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনাতেই দেখা যায়, বরদাপ্রসাদের মতো ব্যক্তির নিকট প্রচলিত আচার সর্বস্ব ধর্মের চাইতে শুদ্ধ চিত্তে পরমেশ্বরের স্মরণ ও পরহিতৈষী হওয়ার মূল্য বেশী। বরদাপ্রসাদের আদর্শে মতিলালের ছোটো ভাই রামলাল প্রকৃত মানুষ হয়ে উঠে।

উনিশ শতকে বাবু কালচার সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক দিক ছিল 'আলালের ঘরে দুলাল'-এ বাবুরামবাবু ও মতিলালের চরিত্রে তার পরিচয় পাওয়া যায়। মোসাহেব পরিবৃত কাণ্ডজ্ঞানহীন বাবুর জীবনাচরণ, স্বার্থপর মন্ত্রণাদাতার পরামর্শ বাবুর সর্বনাশ ডেকে আনে। এই সর্বনাশ বাবুর গোটা পরিবারকেও দুর্দশার সম্মুখীন করে তোলে। লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক বাবুর উৎসভূমি সমকালীন অপরিকল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থাকে চিহ্নিত করে শিক্ষা বিষয়ে পাঠককে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন, যা 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর রচয়িতার দায়িত্বপূর্ণ মনোভাবকে মনে করিয়ে দেয়।

মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায় (১৮৫৯)

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর উদ্দেশ্যের সাফল্য, লেখক প্যারীচাঁদ মিত্রকে 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' রচনায় উৎসাহিত করে। গ্রন্থটিতে স্পষ্টত দু'টি অংশ। মদ্য পানের ধ্বংসাত্মক দিক ও সমকালের বিপন্ন হিন্দুত্ব তথা জাত রক্ষা করার নামে ভ্রষ্টচারিতার চিত্র। এখানে নববাবুর মদ্যপান ও প্রাচীনপন্থীর

জাত রক্ষার নামে বাগাড়ম্বর, অলসতা, নেশাখোর ও নিষ্কর্মা মনোভাবের বিরুদ্ধে বক্তব্যের সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি এই গ্রন্থে রঙ্গব্যঙ্গ, উপদেশ ও নীতিকথার দ্বারা পাঠকের সচেতনতা বৃদ্ধি কল্পে দায়িত্ব পালন করেন।

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'— এর রচনা কাল ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ এবং পটভূমি উনিশ শতকের ইংরেজ রাজত্বকাল। লেখক দেখেছিলেন সমকালের ভ্রষ্টচারিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, বেলেল্লাপনার ভয়ঙ্কর বিচিত্র দৃশ্য। মদ্যপান এইসব উপসর্গগুলিকে সার্থক করে তোলে। প্যারীচাঁদ মিত্র নক্সার দ্বারা পাঠকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন—মদ্যপান একটি ব্যাধি, যা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। এজন্য তাঁকে অনেক নীতি উপদেশ প্রচার করতে হয়েছিল। যেমন;—

ক) "মদ্য পানে যে কেবল শরীর নষ্ট হয় এমত নহে; শরীরের সঙ্গে বুদ্ধি ও ধনও যায়।" [২৪]

লেখক সমকালের পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন মদ্যপান করলে স্বাস্থ্য নামক সম্পত্তির ক্ষতি হয়। তিনি বলেন অধিক মদ্যপায়ীর প্লীহা, পক্ষাঘাত ও নানা জাতীয় ভয়ঙ্কর রোগ হয়। শুধু তাই নয় মদ্যপান মানে অর্থের ক্ষতি ও হিতাহিত জ্ঞানের নাশ। কেননা মদ্যপায়ীর বুদ্ধি কাজ করেনা।

খ) "বাঙ্গালিরা মদ খাইতে আরম্ভ করিলে প্রায় মদে তাহাদের খায়," [২৫]

প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে বাঙালীর মদ্যপানের অতিরঞ্জনকে নির্দেশ করেন। বাঙালী একবার মদের স্বাদ পেলে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে মদ নিয়ে পড়ে থাকতে চায়। তখন চারদিক থেকে সর্বনাশ এসে তাকে গ্রাস করে।

গ) "বিদ্যা শিক্ষার সময় ধর্ম বিষয়ে উপদেশ না হইলে বড় অহঙ্কার হয়, কেবল ইংরাজী চলন ইংরাজী কথোপকথন ও ইংরাজী ভোজন করিতে ইচ্ছা হয়।" [২৬]

সমকালের ধর্মজ্ঞানহীন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনাদর্শকে লেখক নির্দেশ করেন। এখানে পাশ্চাত্য জ্ঞানের সঙ্গে দেশীয় ধর্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে।

ঘ) "সংসারে নৈরাশ্য বিষাদ সন্তাপ বিয়োগ ইত্যাদি নানা উৎপাত ও আপদ সর্বদাই ঘটিয়া থাকে। প্রকৃত ধার্মিক ব্যক্তি তত্তৎ অবস্থায় সুস্থির হইয়া মনঃসংযম করিতে আরো রত হন। তাঁহার দৃঢ় সংস্কার এই যে, পরমেশ্বর কর্তৃক যাহা প্রেরিত, তাহাই মঙ্গলজনক।" [২৭]

এখানে লেখক বলেন ধার্মিক ব্যক্তি বিপদের সময় অধৈর্য্য ও অসংযমী হন না । কেন না ধর্ম মানুষের চিত্ত শুদ্ধি ঘটায়, হিতাহিত জ্ঞানের প্রখরতা বৃদ্ধি করে। উল্লিখিত নীতি কথায় মদ্যপানের অপকারিতা ও ধর্মজ্ঞানের উপকারিতার কথা প্রাকশ পেয়েছে। এই গ্রন্থেরই দু-একটি নক্সা থেকে মদ্যপানের অপকারিতার বিষয়টি তুলে ধরা হবে ।

ভবানীবাবু কলেজের ছাত্র, স্বচ্ছল পরিবার, কিন্তু নীতি শিক্ষার অভাবে জীবনকে ঠিক পথে চালিত করতে পারে নি। অধিক সুখের আশায় মদ্যপান শুরু করে । মদ্যপান করতে গিয়ে ধীরে ধীরে মদই তাকে পান করতে থাকে। ভবানীবাবু তার মা, স্ত্রী ও সন্তানের প্রতি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় । সমস্ত অর্থ সম্পত্তির ক্ষতি করে সপারিষদ মদ খেয়ে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠে । প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন —

> "পিতা যৎকিঞ্চিৎ যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমে২ দশ জনে লুটে পুটে লইতে আরম্ভ করিল। ...একদিন তাঁহার পক্ষাঘাত হইল, এক হাত ও এক পা অবশ হইয়া পড়িল, কেবল কথা এড়িয়ে যায় নাই।" (২৮)

—অভিজ্ঞ ডাক্তার হেয়ার সাহেবের সুচিকিৎসায় ভবানীবাবু এ যাত্রায় সুস্থ হল। কিন্তু পুনরায় নেশাগ্রস্ত না হওয়ার জন্য ডাক্তারবাবু তাকে সতর্ক করেন। ভবানীবাবুও অনুশোচনাগ্রস্ত হয়ে সৎ ও সুস্থ জীবনযাপনের কথা ভাবে। সওদাগরের বাড়িতে একটি ভাল কাজও পেয়ে যায়। কিছু দিনের মধ্যেই এরকম নেশাহীন এক ঘেয়েমি জীবন সম্বন্ধে বিরক্তি আসে। কিন্তু পুনরায় মদ্যপায়ী হলে এবার গুরুতর অসুস্থ হয় এবং পরিবার পরিজনকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ঠেলে দিয়ে মদ্যপানের চরম পরিণতি মৃত্যুকে বরণ করে।লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র এখানে দেখাতে চেয়েছেন মদ্যপায়ী হওয়ায় ভবানীবাবু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হয়েছে।

মদ্য পান বিষয়ে আর একটি আকর্ষণীয় নক্সা জয়হরিবাবুকে নিয়ে রচিত হয়েছে। জয়হরিবাবু যশোহরের মানুষ, ইংরেজী শিক্ষিত। কলকাতায় এসেছে ভালো কাজের আশায়। কিন্তু কাজ না পেলে তাকে হতাশা-নিরাশা পেয়ে বসে। জয়হরি ধীরে ধীরে সমকালীন কলকাতার উচ্ছৃঙ্খল জীবনাচরণে জড়িয়ে পড়ে। মদ্যপান ও বদসঙ্গে পড়ে পরিবারকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে শেষে অপরাধ মূলক কাজ-কর্মের অভিযোগে কারারুদ্ধ হয় ।

'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'-এ পক্ষীরাজ আগড়ভমসেন বাবুর নক্সা বেশ রঙ্গব্যঙ্গ মূলক । নেশাখোর অলস পক্ষীরাজ আগড়ভমবাবু বিয়ে করে রাজত্ব ও রাজ কন্যা লাভের স্বপ্নে বিভোর হয়। এরকম দিবাস্বপ্নে তাকে কিরকম নাস্তানাবুদ হতে হয়েছিল, তার একটি উপভোগ্য ব্যঙ্গমূলক চিত্র এখানে রয়েছে ।

মদ্যপান যে একটি সামাজিক ব্যাধি লেখক প্যারীচাঁদ মিত্র 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'-এর প্রথমাংশে পাঠকের কাছে প্রকাশ করে কৌশলে পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন।

ভারতের ঐতিহ্যবাহী ধর্ম ও সংস্কৃতি আছে। উনিশ শতকে বাঙালীর ধর্ম এবং সংস্কৃতি উগ্র নব্যপন্থী, সংকীর্ণ প্রাচীনপন্থী ও ধনাঢ্য অনুকরণকারীর ক্রিয়াকলাপে বিকশিত হতে না পেরে সর্বনাশের খাদে নিমজ্জিত হয়। প্রগতিশীল একটি গোষ্ঠী জাতির প্রকৃত ধর্ম ও সংস্কৃতি উদ্ধারে তৎপর হয়। 'মদখাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়'—গ্রন্থের দ্বিতীয়াংশে অলস, উচ্ছৃঙ্খল, নিষ্কর্মা বাবু ও হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারীর হিন্দুত্ব রক্ষার নামে ব্যভিচার ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে লেখক প্রকাশ করেন। 'জাতি মারিবার মন্ত্রণা' (২৯) নামক শিরোনামের রচনাংশে ভবশঙ্করবাবু ও তাঁর পারিষদ বাচস্পতি, গোস্বামী ও প্রেমচাঁদ প্রমুখ মদ্যপান করে জাতির পবিত্রতা রক্ষা করার স্বপ্ন দেখে। এখানে ধর্ম বা জাতির ঐতিহ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ, নেশাখোর, বাগাড়ম্বরপ্রিয়, নিষ্কর্মা বাবুসম্প্রদায়ের ধর্ম রক্ষা করার উদ্যোগকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'কি আজব দেখিলাম সহর কলিকাতায়' (৩০) নামক শিরোনামের রচনাংশে সমকালের কলকাতার বেলেল্লাপনা, মাতলামী, ব্যভিচার, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি নেতিবাচক চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র বলেন,— এর ফলে জাতি বিপন্ন হয়েছে ও ধর্ম বিকৃত আকার পেয়েছে। তিনি পাঠকের নিকট জাতীয় সমস্যা কৌশলে তুলে ধরে পরোক্ষে সচেতন করার চেষ্টা করেন। 'বাহিরে গৌরাঙ্গ অন্তরেতে শ্যাম অবতার' (৩১) নামক পরিচ্ছেদে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক চরিত্র সৃষ্টি করে লেখক কৌলীন্য প্রথার চিত্র অঙ্কন করেন। এইসব কুলীন ব্রাহ্মণের অলসতা, বাক্‌পটুতা ও ব্যভিচার পাঠকের মনে ঘৃণা উদ্রেক করে। পাঠককে আত্মসচেতন করে তুলবার পক্ষে রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কুলীন ব্রাহ্মণের নক্‌সা বড় ভূমিকা পালন করে।

অতএব প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' নামক রঙ্গব্যাঙ্গমূলক রচনার দ্বারা পাঠককে সচেতন করতে চেয়েছেন — এমন দাবী করলে অতিশয়োক্তি হয় না।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

কালীপ্রসন্ন সিংহের (১৮৪০-১৮৭০) 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১ম খণ্ড ১৮৬২, ১ম ও ২য় খণ্ড ১৮৬৪) বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। আমাদের আলোচনার বিষয় 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বাঙালীর জন্য কোন রকম হিত ভাবনা আছে কিনা। মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে গ্রন্থকার সম্বন্ধে একটু আলোকপাত করা যাক। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-কে লিখেছেন — এ বিষয়ে বিতর্ক আছে। বিতর্কের জটিল সমস্যায় না গিয়ে বরং অধিকাংশ গবেষক ও সমালোচকের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বলতে পারি — 'হুতোম

প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ। কালীপ্রসন্ন সিংহ সল্পায়ু ছিলেন (১৮৪০-১৮৭০)। তবু এই অল্প সময়ের মধ্যে তিনি উনিশ শতকের সাহিত্য সংস্কৃতির জগতে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। বিখ্যাত অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন সিংহের জীবনপঞ্জীর যে তথ্য দিয়েছেন তাতে সংস্কৃতি চেতনা ও দেশানুরাগের পরিচয় আছে। যথা;—

"...সাংস্কৃতিক কর্মে যোগদান—বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৫১), বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ (১৮৫৬), বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫) প্রতিষ্ঠা।

পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা — বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫), সর্বতত্ত্ব প্রকাশিকা (১৮৫৬), বিবিধার্থ সংগ্রহ (শেষ আটটি সংখ্যা সম্পাদনা, ১৮৬৮ বৈশাখ—অগ্রহায়ণ), পরিদর্শক (দৈনিক পত্রিকা, পরিচালক ও সম্পাদক, ১৮৬৩)।

দানশীলতা — স্কুলে ইংরেজি শিক্ষার জন্য মাসিক দান, 'সংবাদ প্রভাকরের' বার্ষিক সম্মেলনে লেখকদের আর্থিক সহায়তা, সাহিত্য রচনার জন্য পুরস্কার প্রদান, মাইকেল মধুসূদন দত্তকে মেঘনাদ বধ কাব্য রচনার জন্য বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন (১৮৬১), সংবাদ প্রভাকর, ব্রাহ্মসমাজ, Hindu patriot প্রভৃতিসাময়িক পত্র ও প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা, সাহিত্যের উন্নতিকল্পে ছাত্র ও তরুণ লেখকদের পুরস্কৃত করা।

মহৎকর্ম ও সমাজসংস্কারে যোগদান—বিধবা বিবাহে সহায়তা, নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদের প্রকাশক রেভাঃ লঙ সাহেবের জরিমানার সমস্ত আর্থিক দণ্ড প্রদান, বিধবা বিবাহকারীদের এক হাজার টাকা পুরস্কার (১৮৬৫), সোমপ্রকাশে আর্থিক সাহায্য (১৮৬২), Bengalee পত্রের জন্য মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় (১৮৬২), Hindu petriot-কে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা (১৮৬১), Mukherjee's Magazine-এর জন্য (একহাজার টাকা) মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করে দান, দুর্ভিক্ষ ও মহামারী নিরোধে বিপুল অর্থ সাহায্য, দাতব্য ঔষধালয় স্থাপন, জনসাধারণের পানীয় জলের জন্য চারটি ধারাযন্ত্র (Fountain) বিদেশ থকে এনে কলকাতার প্রধান রাস্তায় স্থাপন, উদ্ধত ইংরেজ বিচারকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বাঙালি হিন্দুর নেতৃত্ব, দক্ষতার সঙ্গে বিচার কার্য নির্বাহ করার জন্য দেশী ও ইংরেজ সমাজে সম্মানিত।"[৩২]

অতএব বলা যায় — উনিশ শতকের সাংস্কৃতিক জগতে কালীপ্রসন্ন সিংহ এক অবিস্মরণীয় নাম।

প্রথমে আলোচনা করা হবে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র বিষয় ও গ্রন্থের নামকরণই বা এমন হল কেন ?

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র পটভূমি তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের রাজধানী কলকাতা এবং বিষয় সুস্থ সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে কীটের মতো ক্ষতিকারক দিকগুলি। যেমন; কলকাতার মানুষের হুজুক প্রিয়তা, বুজরুকি পোষকতা, দেবউৎসবে ভক্তিহীন উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধবিশ্বাস, বাবু কালচার প্রভৃতি । কালীপ্রসন্ন সিংহ ভেবেছেন এই বিষয়গুলোর অপকারিতার বার্তা পাঠকের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত হবে নক্‌সা রচনা করা । তাতে সমাজের উক্ত বিষয়গুলিকে অনেকটা অবিকৃত করে পাঠকের নিকট তুলে ধরা যাবে । সেজন্য লেখক গ্রন্থটির নাম 'আরসি' রাখতে চেয়েছিলেন । তাঁর ভাষায়;—

> "নক্‌শাখানিকে আমি এক দিন আরসি বলে পেশ কল্লেও কত্তে পাত্তেম, কারণ পূর্ব্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ কদর্য দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন," (৩৩)

অবশ্য শেষ পর্যন্ত এজাতীয় নামকরণ থেকে লেখক কোন কারণে পিছিয়ে আসেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বাঙালী জীবনের মন্দ দিক ও সঙ্গে ভাষার অবিকৃতি থাকায়—মনে হবে লেখক গালাগালি দিচ্ছেন । সম্ভবত লেখকও এই বিষয়ে সচেতন ছিলেন। সেজন্যই গ্রন্থটি ছদ্মনামে পাওয়া যায় । প্যাঁচা যেমন 'Rod Cells'-এর সাহায্যে রাতের অন্ধকার পৃথিবীকে স্পষ্ট দেখতে পায়, ঠিক তেমনি কালীপ্রসন্ন সিংহ ওরফে হুতোমও সমকালের কলকাতার সমাজ ও সংস্কৃতির পক্ষে মন্দ বা অন্ধকার দিকগুলি স্পষ্ট দেখতে পান । এবং মন্দ দিকগুলি পাঠকের নিকট তুলে ধরে পাঠককে আত্মদর্শন করিয়ে সচেতন করতে চান । মনে হয় সেজন্যই গ্রন্থটির নাম 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' রাখা হয়েছে ।

আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র প্রকৃতউদ্দেশ্য কি তার অনুসন্ধান করব। প্রথমবারের 'ভূমিকা' উপলক্ষে একটা কথা'য় লেখক বলেছেন,—

> "আজকাল বাঙ্গালী ভাষা আমাদের মত মূর্ত্তিমান কবিদলের অনেকেরই উপজীব্য হয়েচে, বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্‌নি বেওয়ারিস বাঙ্গালী ভাষাতে অনেকে যা মনে যায় কচ্চেন; যদি এর কেও ওয়ারিসান্‌ থাক্‌তো, তা হলে ইস্কুলবয় ও আমাদের মত গাধাদের দ্বারা নাস্তানাবুদ হতে পেতো না—তা হলে হয়ত এত দিন কত গ্রন্থকার ফাঁসি যেতেন; কেউ বা কয়েদ থাকতেন, সুতরাং এই নজিরেই আমাদের বাঙ্গালী ভাষা দখল করা হয় । কিন্তু এমন নতুন জিনিস নাই যে আমরা তাতেই লাগি—সকলেই সকল রকম নিয়ে জুড়ে বসেচেন—বেশির ভাগই অ্যাকচেটে, কাজে কাজেই এই নক্‌শাই আমাদের অবলম্বন হয়ে পড়লো ।" (৩৪)

স্বয়ং গ্রন্থকার স্বীকার করেছেন সমসাময়িক কালের বাংলা গ্রন্থগুলি যা খুশি তাই নিয়ে লেখা হচ্ছে। যদি বাংলা ভাষার কেউ 'ওয়ারিস' থাকত তাহলে অনেক গ্রন্থকারকে হয় ফাঁসিতে ঝুলতে হত নয়ত কয়েদী হতে হত। উক্ত স্বীকারোক্তি আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করলে মনে হবে গ্রন্থগুলির মান অতিসাধারণ, কিংবা সমাজের পক্ষে হয়ত ক্ষতিকারক। তাহলে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' কি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক গ্রন্থ? হুতোমই বলেন;— "ভ্রম! হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয় তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম তত দূর নীচ নন যে, দাদ তোলা কি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন।"[৩৫] তা হলে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? উত্তরটি আমরা লেখকের ভাষায় শুনবো—"অনেকে সুদ্‌রেচেন, সমাজের উন্নতি হয়েচে ও প্রকাশ্য বেলেল্লাগিরি বদমাইশি ও বজ্জাতির অনেক লাঘব হয়েচে।" [৩৬] 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় একটি সঞ্জীবনী শক্তি রয়েছে যা সমাজের উন্নয়নে বিশেষ উপযোগী। অতএব 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সমাজের ক্ষতিকারক কোন গ্রন্থ নয়, বরং সমাজের উপকারের উদ্দেশ্যেই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে।

বিষয়টিকে একটু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় অনেকগুলি সামাজিক চিত্র পাব, যথা;— হুজুক, বুজরুকি, দেব উৎসবে ভক্তি গৌণ, মুখ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ বিশ্বাস, বাবু কালচার প্রভৃতি নেতিবাচক বা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক দিক; সঙ্গে দেশ প্রেমের ভাবনা ও প্রত্যক্ষ নৈতিকতারও অবতারণা ইত্যাদি। দেশপ্রেম ভাবনা ও নৈতিকতার অবতারণা ব্যতীত 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র সামাজিক নক্‌সাগুলি সমাজ বা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। নক্‌সাকার কালীপ্রসন্ন সিংহ সেইসব চিত্রগুলি পাঠকের কাছে তুলে ধরে পরোক্ষে পাঠকের নীতিবোধকে জাগ্রত করতে চেয়েছেন। আমাদের মনে হয়েছে যাঁরা দেশ প্রেমিক, সমাজ হিতৈষী, তাঁদের চোখে 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' সমাজ বা দেশের ক্ষত নিবারণের জন্য বিশল্যকরণীর মতো একটি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ। একথা বলা যায় — যা পাঠ করলে নৈতিকতায় সমৃদ্ধ মানব সম্পদ বৃদ্ধি হবে। 'হুতোম' সেই জন্যই বোধ হয় পাঠককে জানিয়েছেন;—

> "যাঁরা সহৃদয়, সর্ব্বসময় দেশের প্রিয় কামনা করে থাকেন ও হতভাগ্য বাঙ্গালী সমাজের উন্নতির নিমিত্ত কায়মনে কামনা করেন, তাঁরা হুতোমের নক্‌শা আদর করে পড়ে সর্ব্বদাই অবকাশ রঞ্জন করেন।" [৩৭]

এবার 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' গ্রন্থের ইতিবাচক ভূমিকাটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। আমরা ধারাবাহিকভাবে 'হুজুক', 'বুজরুকি', দেবউৎসবে ভক্তি গৌণ, মুখ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্ধ বিশ্বাস, বাবুকালচার, দেশপ্রেমের ভাবনা ও নৈতিকতার চিত্রগুলি আলোচনা করব।

হুজুক ঃ

বাঙালী সমাজে কর্মভীরু নিষ্কর্মার উপস্থিতি নক্‌সাকার কালীপ্রসন্ন সিংহকে ভাবিয়েছিল। এই কর্মভীরু নিষ্কর্মা সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করা 'হুজুক' নামক নক্‌সার অন্যতম বিষয়। যারা অগভীর চিন্তাশীল, নিষ্কর্মা তাদের দ্বারা সমাজতো উপকৃত হবেই না বরং ক্ষতি হওয়ার প্রবণতা অধিক, অনেকটা সমাজের পক্ষে বোঝার মতো। সমাজে এইসব মানুষের পরিবর্তন না হলে বাঙালীর জাতীয় জীবনে অবক্ষয়ের গতি থামবে না। সে জন্য লেখক বলেন;—

> "পাঠক! যত দিন বাঙ্গালির বেটর অকুপেশন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ্য প্রণালীর রিফর্ম্মেশন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই।"(৩৮)

সমাজের ভালো পেশা বা কর্মসংস্থান সামাজিক বা পারিবারিক সুশিক্ষা ও ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন। অর্থাৎ নিষ্কর্মা সৃষ্টির পিছনে আর্থ-সামাজিক ও ধর্মীয় প্রেক্ষাপটের সমালোচনা করা হয়েছে। অতএব নিষ্কর্মার দল যত দিন সমাজে থাকবে তত দিন 'হুজুক' নামক ব্যাধিটির অবসান হবার নয়। বলা যায় — সুশৃঙ্খল ও উন্নত সমাজগঠনের পরিপন্থী। এইসব মানুষগুলি—

> "দিবারাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিষ্কর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব হুজুক তুলবে, তার বড় বিচিত্র নয়!" (৩৯)

কালীপ্রসন্ন সিংহ নিষ্কর্মা লোকেদের দ্বারা সৃষ্ট একাধিক নক্‌সাচিত্র অঙ্কন করেন। 'ছেলেধরা', 'প্রতাপচাঁদ', 'মহাপুরুষ', 'কৃশ্চানি হুজুক', 'মিউটনি', 'মরাফেরা', 'সাতপেয়েগরু' নক্‌সাগুলি উল্লেখ করা যায়। উল্লিখিত একাধিক নক্‌সার মধ্যে 'মরাফেরা' নামক 'হুজুক' নক্‌সাটির আলোচনা করা হচ্ছে। হুজুক উঠল দশ বছরের মধ্যে যারা মরেছে তারা আগামী ১৫ই কার্ত্তিক ফিরে আসবে। সঙ্গে হুজুক উঠল এই কথাটি "নদের রামশর্ম্ম আচায্যি গুণে বলেচেন।" (৪০) আরো বলা হল স্বর্গের কোন দেবতার বিয়ে উপলক্ষে এরকম একটি উদ্যোগ। এই হুজুক প্রচারিত হওয়ায় সমাজে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। গ্রন্থকারের ভাষায়;—

> "...বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যেসাগরের প্রতি যে ভক্তিটুকু জন্মেছিল, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌মমেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিগ্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্‌লো।"(৪১)

হুজুকে প্রভাবিত হয়ে ১৫ই কার্ত্তিক অনেকেই নিকট আত্মীয় ফিরে পাওয়ার আশায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে গেল। রাত ১০ টা পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর অনেকে মরার মত হয়ে বাড়ি ফিরল। এভাবেই "মরা ফেরার হুজুক থেমে গ্যালো!" (৪২)

'হুজুক' নামক নক্‌সায় এইসব আজগুবি গালগল্প ও গল্পকার সম্বন্ধে বাঙালী পাঠককে সচেতন করাই লেখকের উদ্দেশ্য।

বুজরুকি ঃ

বুজরুকি বা ভণ্ডামী একটি সামাজিক ব্যাধি। এই বুজরুকি সুস্থ সমাজের পক্ষে মোটেই সুখবর নয়। সমকালের কলকাতায় শিক্ষিত সমাজে বুজরুকির প্রভাব কমলেও অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে এর প্রভাব বেশ মারাত্মক। নক্‌সাকার কালীপ্রসন্ন সিংহ বলেন;—

> "যখন হিন্দুধর্ম্ম প্রবল ছিল, লোকে দ্রব্যগুণ কিমিয়া ও ভূততত্ত্ব জান্‌তো না, তখনই এই সকলের মান্য ছিল। আজকাল ইংরাজি লেখাপড়ার কল্যাণে সে গুড়ে বালি পড়েচে, কিন্তু কল্‌কেতা সহরে না দেখা যায়, এমন জিনিষই নাই;" (৪৩)

সমাজে বুজরুকির চিত্র অঙ্কন করে তিনি সমকালের ভণ্ডামীর প্রবণতাকে স্পষ্ট করেন।

প্রসঙ্গত 'ভূত নাবানো' নামক নক্‌সাটির কথা বলা যায় — ডাক্তার, কবিরাজের চিকিৎসার সঙ্গে ঠাকুর দেবতার পূজা অর্চনা করার পরেও রোগ না সারায় সিদ্ধান্ত হয় যে নিশ্চয় ভূতে ধরেছে। শেষে ওঝা ডেকে আনা হল। মেঠাই, ক্ষীর, লুচি প্রভৃতি খাদ্য ভূতের 'জলযোগে'র ব্যবস্থা করা হয়। ভূত প্রথমে অস্বীকার করলেও পরে জলযোগে রাজি হয়। কিন্তু হঠাৎ ওলাওঠা রোগীর বমির শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। পরে দেখা যায় বমি করছিল ওঝা ও তার সহকারী, কারণ ভূতের জলযোগের খাবারে মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্র 'টারটামেটিক' মিশিয়েছিল। ওঝার বুজরুকি ওতেই ধরা পড়ে। এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সমাজের মানুষকে সচেতন করার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

দেব উৎসবে ভক্তি গৌণ, মুখ্য উচ্ছৃঙ্খলতা ঃ

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় 'দুর্গোৎসব' 'রামলীলা', 'মাহেশের স্নানযাত্রা', 'কলিকাতার চড়ক পার্ব্বণ', 'কলিকাতার বারো ইয়ারিপূজা'র মতো একাধিক দেব উৎসবের প্রসঙ্গ আছে। শিব, রাম, দুর্গা বা গঙ্গার পূজায় আর সবই আছে, নেই শুধু অন্তরে বিশুদ্ধ ভক্তি। এই সময়ের বাঙালীর একটি শ্রেণী দেবপূজার নামে আমোদ প্রমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতাকেই প্রকাশ করত; যা উন্নত ও সুস্থ সমাজ গঠনের অন্তরায়।

প্রসঙ্গত 'মাহেশের স্নানযাত্রা'র কথা বলা যায়। এদেশে গঙ্গা স্নান পবিত্রতা অর্জনের একটি রীতি বা আচার। কিন্তু 'মাহেশের স্নানযাত্রা' পাপ ও পঙ্কিলতাকে অর্জন করার চিত্র বা নক্‌সা। হুতোমের ভাষায়;—

"গঙ্গারও আজ চূড়ান্ত বাহার; বোট, বজরা, পিনেস ও কলের জাহাজ গিজ্‌গিজ্ কচ্চে, সকলগুলি থেকেই মাতলামো রং, হাসি ও ইয়ারকির গর্‌রা উঠ্‌চে, কোনটিতে খ্যাম্‌টা নাচ হচ্চে, গুটি ত্রিশ মোসাহেব মদে ও নেশায় ভোঁ হয়ে রং কচ্চেন;" (৪৪)

'মাহেশের স্নানযাত্রা'র নায়ক গুরুদাস বাবুর আয়োজন সবই ঠিক্‌ঠাক্ কিন্তু মেয়ে মানুষ না থাকায় তাদের ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। গোপাল বলেছে;—

"দ্যাখ্ ভাই গুরুদাস! আমাদের আমোদের চূড়ান্ত হয়েচে, কিন্তু একটার জন্যে বড় ফাঁক ফাঁক দ্যাখাচ্চে; সবই হয়েচে, কেবল মেয়ে মানুষ না হলে তো স্নানযাত্রায় আমোদ হয় না!" (৪৫)

আর এক বন্ধু নারায়ণ বলেছে;—"যে নৌকোখানায় তাকাই, সকলি মাল ভরা, কেবল আমরা ব্যাটারাই নিরামিষ্‌ষি! আমরা যেন বাবার পিণ্ডি দির্তে গয়া কাশী যাচ্চি।"(৪৬) বন্ধুদের দ্বারা গুরুদাস উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে অনেক চেষ্টা করেও মেয়ে মানুষের সন্ধান না পেয়ে শেষে তার বিধবা পিসিকে নির্বোধের মতো বলেছিল;—

"পিসি, যদি তুমি আমাদের সঙ্গে স্নানযাত্রা দেখ্‌তে যাও, তা হলে বড় ভাল হয়। দেখ পিসি, সকলেই একটি দুটি মেয়েমানুষ নিয়ে স্নানযাত্রায় যাচ্চে, কিন্তু পিসি, আমাদের একটিও মেয়েমানুষ জুটে ওঠে নাই — দেখ পিসি, সুদুই বা কেমন করে যাওয়া হয়, আমার নিজের জন্য যেন না হলো, কিন্তু পাঁচো ইয়ারের সুদু নিরিমিষ্‌ষি রকম যেতে মন সচ্চে না — তা পিসি আমোদ কত্তে কত্তে যাবো, তুমি কেবল বসে যাবে, কার সাধ্যি তোমারে কেউ কিছু বলে।" (৪৭)

এখানে পুণ্য অর্জনের লেশমাত্র লক্ষণ নেই। গঙ্গাস্নান যেন আমোদ প্রমোদের জন্যই একটি উৎসব। ধর্মের নামে চরম উচ্ছৃঙ্খলতারই প্রকাশ 'মাহেশের স্নানযাত্রা'। কালীপ্রসন্ন সিংহ যেন উৎসবের নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে প্রকাশ করে পাঠককে আত্মসচেতন করাতে চেয়েছেন।

অন্ধবিশ্বাস ঃ

'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় মানুষের মনের অন্ধবিশ্বাসের ছবিটি পাওয়া যায়। 'রেলওয়ে', 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা' ও 'কলিকাতার চড়কপার্ব্বণ' এ মানুষের প্রচলিত আচার রীতি ও অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসের অন্তসার শূন্যতা স্পষ্ট হয়েছে। যেমন 'কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা'য় তথাকথিত ধর্ম ব্যবসায়ী গুরুদেবের চরিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। 'গুরুপ্রসাদী' একটি প্রথা। বিবাহিত নারী কায়মনবাক্যে স্বামী সেবা করার পূর্বে কুলগুরুকে সেবা করার এক জঘন্য রীতি 'গুরু প্রসাদী'। 'গুরুপ্রসাদী' বর্ণনায় লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ তথাকথিত লম্পট

ধর্মগুরু বা ধর্মব্যবসায়ীর মুখোশ খুলে দিয়েছেন। আসলে কালীপ্রসন্ন সিংহ 'গুরুপ্রসাদী'র মতো কাহিনী চয়ন করেছেন, যাতে পাঠক সচেতন হয় ।

বাবুকালচার ঃ

প্রসঙ্গত পুনরায় উল্লেখ করতে হচ্ছে যে ইংরেজের প্রভাবে এদেশে বাবু নামক একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এদের শিক্ষা-দীক্ষা তথৈবচ। অনেকেই পাশ্চাত্যের বিকৃত সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে । এরা মদ্যপান, বেশ্যালয়ে গমন, অশ্লীলনাচ-গান প্রভৃতিঅপসংস্কৃতির পোষক। আবার কেউ কেউ ধর্মনাশের আশঙ্কায় আধুনিক প্রগতিশীল ভাবনার বিরোধী। লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ বাবুসম্প্রদায়ের এজাতীয় বিকৃত মনোভাব দেখে মর্মাহত। 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য় বিভিন্ন স্থানে উক্ত অপসংস্কৃতির প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সমালোচনা আছে। 'বাবু পদ্মলোচন দত্ত ওরফে হঠাৎ অবতার'এ বাবু সম্প্রদায়ের অপসংস্কৃতিকে আঘাত করা হয়েছে। পদ্মলোচন সংকীর্ণ মানসিকতার। তার ইংরেজী বিদ্যায় অনীহা, বিদ্যাসাগরের প্রতি বিদ্বেষ জনিত কারণে সংস্কৃতে অনীহা, ডাক্তারী ঔষধে মদ বা অ্যালকোহল থাকায় ডাক্তারী চিকিৎসার পরিহার প্রভৃতি মধ্যযুগীয় মানসিকতা চোখে পড়ার মতো । এই সব মধ্যযুগীয় মানসিকতা সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে অন্তরায়। হুতোম অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে বলেন;—"যে দেশের বড় লোকের চরিত্র এই রকম ভয়ানক, এই রকম বিষময়, সে দেশের উন্নতির প্রার্থনা করা নিরর্থক।" (৪৮) তিনি আরো বলেন;—"এই মহাপুরুষেরাই রিফর্ম্মেশনের প্রবল প্রতিবাদী, বঙ্গসুখসৌভাগ্যের প্রলয় কণ্টক ও সমাজের কীট।" (৪৯) —তিনি এইসব ব্যক্তিদের কীটের সঙ্গে তুলনা করে আপামর বাঙালীকে সচেতন করার আহ্বান জানান ।

দেশপ্রেম ও নৈতিকতার অবতারণা ঃ

গ্রন্থকার কালীপ্রসন্ন সিংহ 'ভূমিকা উপলক্ষে একটি কথা'য় লিখেছিলেন;—"কি অভিপ্রায়ে এই নক্‌শা প্রচারিত হলো, নক্‌শাখানির দু-পাত দেখ্‌লেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব কত্তে সমর্থ হবেন," (৫০) লেখকের এই বক্তব্যের ভিত্তি যে দেশপ্রেম ও নৈতিকতা সঞ্চয়ের দ্বারা বাঙালী সমাজে মানব সম্পদ বৃদ্ধি করার তাগিদ —সেকথা প্রতিষ্ঠার জন্য দেশপ্রেম ও নৈতিকতার উদাহরণ তুলে ধরা হল। এদেশের মেয়েদের দুরবস্থার প্রসঙ্গে হুতোম বলেন;—

> "বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা — তবে ক্যান বড়ি দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝক্‌ড়া ও হিংসায় কাল কাটায় ? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চিরকাল ফরনেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান, সে কেবল বাপ মা ও ভাতারবর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র।"(৫১)

কালীপ্রসন্ন সিংহ নিজ দেশের নারী সম্প্রদায়ের দুর্দশার জন্য গৃহের অভিভাবকের ত্রুটির কথা বলেন। দেশের অর্থশালী ব্যক্তিরা স্বদেশের হিত সাধনের জন্য কাজে আসতে পারেন। কিন্তু সেই অর্থশালী ব্যক্তির সংকীর্ণ মানসিকতা ও সুখ বিলাসিতা লেখককে আহত করে। তাঁর ভাষায়;—

> "হায়! যাদের জন্মগ্রহণে বঙ্গভূমির দুরবস্থা দূর হবার প্রত্যাশা করা যায়, যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্য কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে!"(৫২)

এখানে কালীপ্রসন্ন সিংহ অর্থপ্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির বিপথগামিতায় মর্মাহত হয়েছেন। সমকালে স্বদেশের গৌরবময় বিষয় বলতে ছিল প্রাচীন ঐতিহ্য। পূর্বকালের গৌরব ও সমকালের কলঙ্কের বিষয়ে বলা হয়েছে;— "আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পরস্পর লড়াই করেচেন, আজকাল আমরা সর্বদাই পরস্পরের অসাক্ষাতে নিন্দাবাদ করে থাকি, শেষে এক পক্ষের "খেউড়ে" জিত ধরাই আছে।" (৫৩) উক্ত বক্তব্যে প্রাচীনকালের বাঙালীর বলবীর্যের জন্য গৌরব করা হয়েছে এবং বর্তমানের পরচর্চা ও পরনিন্দা-কলঙ্কের নিন্দা করা হয়েছে। সময় গতিশীল এই চিরন্তন সত্য বাক্যটি হুতোমের ভাষায়;—"সময় কারও হাত ধরা নয়; সময় জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুই অপেক্ষা করে না।" (৫৪) এই বক্তব্য পাঠককে যেন সময়ের সৎব্যবহার করার নীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করে।

অতএব সিদ্ধান্তে আসা যায়, পাঠককে আত্মদর্শন করিয়ে আত্মসচেতন করাই 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'র লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্দেশ্য। সেজন্য গ্রন্থটিতে সমাজ সচেতনতা, নৈতিকতা, দেশানুরাগ প্রভৃতি ইতিবাচক দিক থাকবে — একথা বলাই বাহুল্য।

সমগ্র আলোচনার শেষে বলা যায় — নক্‌সা বা নক্‌সা জাতীয় রচনা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণ কাব্য, নাটক, উপন্যাস প্রভৃতির মতো স্বীকৃত সাহিত্য প্রকরণ বা কুলীন সাহিত্য প্রকরণ নয়। কিন্তু তবুও উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করতে গিয়ে নক্‌সাকে গুরুত্বসহকারে পৃথক একটি অধ্যায়ে স্থান দেওয়া হয়েছে। কারণ উনিশ শতকের এই শ্রেণীর রচনাতেই স্পষ্টত সাহিত্য রসের চাইতে সমাজ কল্যাণ বা দেশ কল্যাণের উদ্দেশ্য গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্‌সা বা নক্‌সা জাতীয় রচনার দ্বারা লেখকের সমাজ কল্যাণ বা দেশকল্যাণের প্রতি অনুরাগের পরিচয় পেয়েছি। নক্‌সা রচয়িতার এই ইতিবাচক মানসিকতা উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

গ্রন্থপঞ্জী

১। ভূমিকা, নব বাবু বিলাস, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং ১: নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ৫।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩। নব বাবু বিলাস, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং-১—নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয় — ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ — সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ৩০।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

৬। নব বিবি বিলাস, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং-১ — নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ৯৭-৯৯।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮।

৯। কলিকাতা কমলালয়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং-১—নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয়—ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নব সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯, পৃ: ১০৩।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১২-১১৩।

১৩। Preface, আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ৩।

১৪। আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ — ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ১৫।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২।

২০। ভূমিকা, আলালের ঘরের দুলাল, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ৩।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৫।

২৪। মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়, প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ—১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯, পৃ: ১৪১।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫২।

২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৬।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৪-১৪৫।

২৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২।

৩২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৮ম খণ্ড (বঙ্কিম পর্ব)—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯৮, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১৪৩।

৩৩। ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৪।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৩৫। দ্বিতীয়বারের গৌরচন্দ্রিকা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৩৮। হুজুক, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৫৮।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮।

৪০। মরাফেরা, হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৭০।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১।

৪৩। বুজরুকি, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৮৯।

৪৪। মাহেশের স্নানযাত্রা, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১২৪।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৮।

৪৮। হঠাৎ অবতার, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১১৮।

৪৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৯।

৫০। ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৩।

৫১। কলিকাতার বারোইয়ারি পূজা, ভূমিকা উপলক্ষে একটা কথা, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৫২।

৫২। হঠাৎ অবতার, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১০৯।

৫৩। রামলীলা, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৫২।

৫৪। হুজুক, হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস, নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ, ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৭৯।

চতুর্থ অধ্যায়

উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা

নাটক বিশ্ব সাহিত্যের একটি প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রকরণ। সংস্কৃত, গ্রীক প্রভৃতি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ভাষায় প্রাচীনকালেই বহু সমৃদ্ধ নাটক রচিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে। সুখের বিষয়, এই সময়েই বাংলা সাহিত্যের এই নব প্রকরণটি বেশ সমৃদ্ধ হয়। আমরা লক্ষ করব, নাট্যসাহিত্যের উদ্ভবের সময় বাঙালীর আত্ম-উন্মোচনের মনোভাবটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকের নাটকের আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায়, নাট্যকারের বিশেষ আন্তরিকতা ও সক্রিয়তায় বাংলা নাটকের ক্রমান্বয়ে সাহিত্য হিসাবে উত্তরণ ঘটে বা প্রতিষ্ঠাপায়। এখানেই শেষ নয়, এই সময়ের বাংলা নাটক সমাজ-সংস্কারের কাজকে গতিদান করার চেষ্টা করেছে, জাতীয়তাবাদ প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে ও উনিশশতকেই বাংলা নাটক বাঙালীর নিজস্ব নাটক হিসাবে পরিচিত হতে চেয়েছে।

আমরা এই অধ্যায়ে উনিশ শতকের বাংলা নাটকে যে মাত্রাগুলি সংযোজিত হয়েছে তা বাংলা নাটকের ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণ, সমাজ সংস্কারের প্রেরণায় বাংলা নাটক সৃষ্টি, জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় বাংলা নাটক রচনা, নিজস্ব নাটকের সন্ধানে বাঙালী ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করব।

বাংলা নাটকের ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণ ঃ

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে নাটক বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব ছিল না। প্রাগাধুনিক যুগের সাহিত্য বলতে শুধুই কাব্য। অবশ্য প্রাক্ চৈতন্যযুগে রচিত কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ নাট্য লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু তাকে নাটক বলা উচিত নয়। কালের হিসাবে হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফের 'কাল্পনিক সংবদল' (১৭৯৫) মধ্যযুগের ফসল। নাটকটি অনুবাদিত ও অভিনীত হয়েছিল ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে। হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফের 'কাল্পনিক সংবদল'-এ আধুনিক নাটকের লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। সেই হিসাবে বলা যায় — ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূচনার অন্তত ৫-৬ বছর পূর্বে অর্থাৎ মধ্যযুগে আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা হয়। এরপর দীর্ঘ দিন বাংলায় নাট্যচর্চা হয়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে উনিশ শতকে শিক্ষিত সমাজে ইউরোপীয় নাট্যশিল্পের জনপ্রিয়তা বেড়ে যায়। অনতিবিলম্বে দেশীয় শিক্ষিত ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য ইংরেজের অনুকরণে রঙ্গমঞ্চ

প্রতিষ্ঠা ও অভিনয়ের প্রচলন করেন। বাংলা নাটকের গবেষক ও সমালোচকগণ এবিষয়ে মোটামুটি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১) বাঙালী প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ। জানা যায়, শ্যামবাজারের নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত রঙ্গমঞ্চে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে 'বিদ্যাসুন্দর' অভিনীত হয়। এরপর একে একে অনেক ধনাঢ্য নাট্যপিপাসু ব্যক্তিগণ নাট্যপিপাসা চরিতার্থ করার জন্য রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬) 'বেণীসংহার' নাটকের অভিনয়ের দ্বারা (১৮৫৭) উদ্বোধন করা হয়। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' (১৮৫৮)। 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন হয়। চিৎপুরের রামগোপাল মল্লিকের বাড়িতে 'মেট্রোপলিটান থিয়েটার' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। এখানে অভিনীত হয় বিধবাবিবাহের সমর্থনে উমেশচন্দ্র মিত্রের রচিত 'বিধবা বিবাহ' নাটক। এছাড়া যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে 'পাথুরিয়াঘাটা রঙ্গনাট্যালয়' (১৮৬৫), শোভাবাজার রাজবাড়িতে 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি (১৮৬৫) প্রভৃতি নাট্যশালা বা রঙ্গমঞ্চ বাংলা নাটকের চাহিদা বৃদ্ধি করে তোলে। রঙ্গমঞ্চগুলির প্রয়োজনে প্রথমদিকে ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাষায় রচিত বিখ্যাত নাটকগুলির অনুবাদ অভিনীত হত। এবং নাট্যকারের নিকট ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকই আদর্শ বলে গৃহীত হয়েছিল। জানা যায়, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) ও তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) প্রকাশিত হয়। জি. সি. গুপ্ত ও তারাচরণ শিকদার বাংলায় যে নাট্যরচনার ধারা প্রবর্তন করলেন— তা কিন্তু হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফের নাট্যরচনা প্রবর্তনের মত নয়। এবার একে একে বাংলায় বহু নাটক রচিত ও প্রকাশিত হল। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' (১৮৫৩), রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ নাটক' (১৮৫৬), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিক্রমোর্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী-সত্যবান' (১৮৫৮) প্রভৃতি নাটক মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাট্যকার হিসাবে অবির্ভাবের পূর্বে ('শর্মিষ্ঠা' ১৮৫৯) উল্লেখযোগ্য। অবশ্য স্বীকার করতে হবে মধুসূদন দত্তের নাট্যকার হিসাবে আবির্ভাবের পূর্বে বাংলায় যে নাটক রচিত ও অভিনীত হয়েছিল সেগুলির শিল্পরূপ সাধারণ মানের। মধুসূদন দত্তের 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯), 'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) ও দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০), 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'জামাই বারিক' (১৮৭২) প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন বাংলা নাট্যসাহিত্যকে প্রথম সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল।

তাহলে কি বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বদেশীয় কোন ইতিহাস নেই ? এদেশে অভিনয় শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না ? উত্তরে বলা যায়, আধুনিক পাশ্চাত্যধরনের নাট্যশিল্পের সদৃশ শিল্পকলার অস্তিত্ব না থাকলেও

এদেশে অভিনয়ের ধারা প্রচলিত ছিল। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত সাধারণ মানুষগুলি ধর্মীয় আচার উৎসব উপলক্ষে প্রাগাধুনিক যুগেই অভিনয়ের প্রচলন করেন। এতে অবশ্য বাস্তব জীবন সমস্যার কোন দ্বন্দ্ব থাকত না, মূলত ধর্মীয় ভাবনার বিষয়টি গৃহীত হত। এভাবে বহুদিন ধরে সাধারণ মানুষের মধ্যে অভিনয়ের একটি ধারা প্রচলিত ছিল। এজাতীয় অভিনয়কে 'যাত্রা' বলা হয়। ডঃ অজিত কুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটকের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে এই 'যাত্রা' বিষয়ে বলেন;—

> "যাত্রা কথাটি অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতীত কোনো দেবতার লীলা উপলক্ষে লোকেরা এক জায়গা হইতে অন্য আর এক জায়গায় গমন করিয়া নাচ গানের সঙ্গে সেই দেবতার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিত। ইহাই যাত্রা নামে অভিহিত ছিল। সুতরাং প্রথমতঃ, যাত্রা বলিতে উৎসব উপলক্ষে গমন এই ব্যাপারটি অপরিহার্য ছিল। কালক্রমে কোন স্থানে গমন না করিয়া একই স্থানে বসিয়া দেবলীলা অভিনয় করা হইত। এই ভাবে দেবযাত্রা অভিনেতব্য যাত্রা রূপ লাভ করে।" (১)

জানা গেল, এদেশে যাত্রা নামে অভিনয়ের একটি ধারা দীর্ঘ দিন থেকে প্রচলিত ছিল। আবার অষ্টাদশ শতক থেকে কবিগান নামে একটি কথোপকথন মূলক সঙ্গীতের ধারা জনমনোরঞ্জনের মাধ্যম ছিল। যা পরবর্তী শতকেও বেশ জনপ্রিয় ছিল।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে যাঁরা বাংলা নাটক রচনা করেছিলেন তাঁরা হলেন;—জি. সি. গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, হরচন্দ্র ঘোষ, উমেশচন্দ্র মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ। একটি বিষয় বিশেষভাবে নজরে আসে, তা হল — প্রথমতঃ এঁরা প্রত্যেকেই বাংলা সাহিত্যের এই নবপ্রকরণটির উন্নয়নের জন্য মনোযোগী ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ সমকালীন সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এই সময়ের নাটক একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল।

বাংলা নাটকের আদর্শ সন্ধানে প্রথম দিকে যাঁরা সফল সৈনিক ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ্। তিনিই প্রথম বাংলা নাটক রচনা করেন। তাঁর রচিত নাটক 'কাল্পনিক সংবদল' ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ২৭শে নভেম্বর বেঙ্গলী থিয়েটারে অভিনীত হয়। সচেতনভাবে বাংলা নাটক রচনা ও অভিনয়ের দিক থেকে যা প্রথম পদক্ষেপ। আশ্চর্যের বিষয় এরপর দীর্ঘ প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর বাংলা নাটক রচিত হয় নি। এমনকি দু-একটি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া গেলেও বাংলা নাটকের অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যায় না। হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ্-এর সবচাইতে বড় কৃতিত্ব হল—বাংলায় যে নাটক লেখা ও তার অভিনয় করা সম্ভব তা প্রথম তাঁর দ্বারাই প্রামণিত হয়। এবং সবচাইতে বিস্ময়ের

ব্যাপার একজন রুশ দেশীয় অধিবাসী হয়েও এদেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল সুগভীর। প্রথম দিকে বাংলা নাটক রচনা করায় তাঁর 'কাল্পনিক সংবদল'-এ কতগুলি অদ্ভুত অনুবাদ আমাদের চোখে পড়ে । নাটকের সঙ্গে কতগুলি পরিভাষা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। যেমন Play, অঙ্ক, দৃশ্য প্রভৃতি পরিভাষাকে নিজের মত বাংলা করেছেন। যেমন — Play অর্থে 'খেলা', অঙ্ক অর্থে 'ক্রিয়া' দৃশ্য অর্থে 'ব্যক্ততা'। পরবর্তীকালে নাট্যকার হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ্-এর এইসব অদ্ভুত পরিভাষা যদিও গ্রহণ করা হয় নি তবুও আমরা তাঁর নাট্যচর্চার উদ্যোগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে এখনো স্মরণ করি ।

তারাচরণ শিকদার রচিত 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে নাট্যশিল্পের উন্নয়নে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

'ভদ্রার্জুন' এর রচনাকাল ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। অবশ্য এই বছরেই 'কীর্তিবিলাস'-এর মত আর একটি বিখ্যাত নাটক রচিত হয় । এর পূর্বে বাংলা নাটক বলতে যা বোঝায়, তার অস্তিত্ব ছিল না । তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' নাটকের উদ্দেশ্যমূলকতা স্পষ্ট। নাটকের 'বিজ্ঞাপন' এর প্রথমেই এবিষয়ে নাট্যকার বলেন;

> "মনোমধ্যে কোন অভিপ্রায়ের উদয় না হইলে নিতান্ত নির্বোধ ব্যক্তিও কোন কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। সেই অভিপ্রায়ের বিষয় এক প্রকার লাভ ভিন্ন অন্য কিছু প্রকাশ পায় না। কেহ ধনলাভকে প্রধান জ্ঞান করেন; কাহারও অর্থ সহকারে যশোলাভের বাসনা থাকে; কেহ বা কেবল পরোপকার দ্বারা যশঃসঞ্চয়ের বাঞ্ছা করেন। কোন অভিনব গ্রন্থ প্রকাশ করিতে উদ্যত হইলে গ্রন্থকর্তারদিগেরও অভিপ্রায় প্রায় এই তিন প্রকার লাভ ব্যতীত অন্য কিছু লক্ষ করে না। প্রাগুক্ত সামান্য ধন লাভের প্রাধান্য জন্য পরোপকাররূপ পরম লাভ মনুষ্যসমাজে প্রায়ই আচ্ছাদিত থাকে, সুতরাং গ্রন্থকর্তারদিগেরও মানসচন্দ্রমা তুচ্ছ লাভরূপ নিবিড় নীরদ দ্বারা আবৃত হয়; কিন্তু তাহার স্বচ্ছ করকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না, অবশ্যই তাহার এক প্রকার প্রভা মানবগণের জ্ঞানগোচর হইতে থাকে। অতএব আমি স্বীয় অভিপ্রায়ের বিষয়ে আর কিছু প্রকাশ না করিলেও সূক্ষ্মদর্শি মহাশয়েরদিগের সমক্ষে তাহা অব্যক্ত থাকিবে না।" (২)

নাট্যকার কথিত 'অব্যক্ত' না থাকার বিষয়টি কি ? আমরা বলব নাটকের উন্নতির বিষয়। অর্থাৎ 'ভদ্রার্জুন' নাটকের দ্বারা নাট্যকার তারাচরণ শিকদার বাংলা নাটকের উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা করেন। 'বিজ্ঞাপন'-এ নাট্যকার সমকালের বাংলা নাটকের কয়েকটি বিষয়ে বিরক্তির কথা প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায় ;—

"এতদ্দেশীয় কবিগণ প্রণীত অসংখ্য নাটক সংস্কৃতভাষায় প্রচারিত আছে, এবং বঙ্গভাষায় তাহার কয়েক গ্রন্থের অনুবাদও হইয়াছে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, এদেশে নাটকের ক্রিয়াসকল রচনার শৃঙ্খলানুসারে সম্পন্ন হয় না। কারণ কুশীলবগণ রঙ্গভূমিতে আসিয়া নাটকের সমুদায় বিষয় কেবল সঙ্গীত দ্বারা ব্যক্ত করে, এবং মধ্যে মধ্যে অপ্রয়োজনার্হ ভণ্ডগণ আসিয়া ভণ্ডামি করিয়া থাকে।" (৩)

নাট্যকার মনে করেন নাট্যদ্বন্দ্বের উপস্থিত হলে সঙ্গীতের দ্বারা তাকে প্রকাশ করা ও মাঝে মাঝে অপ্রয়োজনীয় চরিত্রের উপস্থিতি নাটকের শিল্পরূপের পক্ষে ক্ষতিকারক। সেজন্য নাট্যকার তারাচরণ শিকদার ইউরোপীয় ও প্রয়োজনীয় দেশীয় আদর্শে সমকালীন সমাজ সংস্কারকদের মত বাংলা নাটকের সংস্কার করার চেষ্টা করেন। তিনি 'নান্দী' 'সূত্রধার', 'বিদূষক' প্রভৃতি চরিত্রকে পরিহার করেন। নাটকের Unity of Action ও Unity of Space-এর সঠিক ব্যবহার করেন এবং ইংরেজী নাটকের মতো অঙ্কের ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে 'সংযোগস্থল' নামে অঙ্কের বিভাগ করেন। আবার দেশীয় নাটকের মতো গদ্য ও পদ্যের ব্যবহার করেন। তারাচরণ শিকদার বাংলা নাটকের উন্নয়নের কথাটি মাথায় রেখে বলতে বাধ্য হন;—

"বোধ হয়, কেবল উপযুক্ত গ্রন্থের অভাবই ইহার মূল কারণ। তন্নিমিত্ত মহাভারতীয় আদিপর্ব হইতে সুভদ্রা হরণ নামক প্রস্তাব সঙ্কলন করিয়া এই নাটক রচনা করিলাম। ইহা দ্বারাই যে সেই অভাব একেবারে দূরীভূত হইবে এমত নহে; কিন্তু এই পুস্তক অপক্ষপাতি পাঠক মহাশয়েরদিগের তুষ্টিকর হইলে আদর্শ স্বরূপ হইতে পারে। পরিশেষে ক্রমে ক্রমে এতদ্দেশীয় সুকবিগণ কর্তৃক উত্তম উত্তম বহুবিধ নাটক বাঙ্গালা ভাষায় প্রকাশিত হইয়া দৃঢ় বদ্ধমূল সেই অভাবকে অবশ্যই উন্মূলন করিতে পারিবে সন্দেহ নাই।" (৪)

অতএব ভূমিকায় এই স্বীকারোক্তি থেকেই স্পষ্ট হয়, সমকালের বাংলা নাটকের অনুৎকর্ষতা দূর করার জন্য নাট্যকার তারাচরণ শিকদার 'ভদ্রার্জুন' নাটক রচনায় ব্রতী হয়েছেন।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) একটি উল্লেখযোগ্য নাটক। এই নাটকের একটি সমস্যা আছে। সমস্যাটি হল 'কীর্তিবিলাস'-এর রচয়িতা কে ? পাদ্রী লঙ্ সাহেব বলেন — 'কীর্তিবিলাস'-এর রচয়িতা 'G. C. Gupta', ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—যোগেশচন্দ্র গুপ্ত এবং সুকুমার সেন মনে করেন— নাট্যকারের নাম গোবিন্দচন্দ্র গুপ্ত। অবশ্য নাট্যকার সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছু জানা না গেলেও নাটকটি সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। নাট্যকার 'ভূমিকা'-য় বলেছেন সাধারণ অজ্ঞ ব্যক্তির দ্বারা রচিত যাত্রাগুলি

অত্যন্ত বিরস। তিনি আশা করেন;—"যদি সাধারণের উৎসাহে পণ্ডিত লোকেরা সমস্ত রচনা করে তবে যাত্রার উৎকৃষ্টতা জন্মে...।" [৫] বলা বাহুল্য, এখানে নাট্যকারের যাত্রার 'উৎকৃষ্টতা' সৃষ্টির প্রয়াস উৎকৃষ্ট নাটক রচনাকেই নির্দেশ করেছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, 'কীর্তিবিলাস'-এর রচয়িতা অভিনয়ের উপযোগী রচনাকে 'উৎকৃষ্টতা' দানের জন্য কলম ধরেছেন।

'কীর্তিবিলাস' বাংলা সাহিত্যে প্রথম বিয়োগান্তক নাটক হিসেবে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেতে পারে। ভারতবর্ষে ট্র্যাজেডি বলে কোন দর্শন ছিল না। ভারতীয়রা মিলনান্ত দর্শনে বিশ্বাসী। 'কীর্তিবিলাস'- এর নাট্যকার বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্তক বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ভাষায়;—

> "অনেকের এইরূপ ভ্রান্তি জন্মাইতে পারে যে, যে অভিনয় অবলোকন করিলে অন্তরে অশেষ শোক উপস্থিত হয়, সে অভিনয় দর্শন করিতে কিরূপে মানবগণ স্বভাবতঃ অভিলাষী হইবে। অত্যল্প বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, একারণ সেক্সপিয়ার নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখিয়াছেন, আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহন হইতেছে, তত্রাপি আমার মন অবিরত ঐ শোক প্রয়াসী ...অ্যারিস্টটল নামা গ্রীস দেশীয় সুপণ্ডিত লিখিয়াছেন যে, যদি কখন উক্ত দেশস্থ নাট্যশালে অভিনয়কালীন দুই বা অধিক সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইত, যে কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট তখন করুণাভিনয়কারকেরাই জয়পতাকা পাইত।" [৬]

'কীর্তিবিলাস' নাটকের 'ভূমিকা'তে পাশ্চাত্য বিয়োগান্তক নাটকের জনপ্রিয়তার কথা জানা গেল। আমাদের বাঙালী নাট্যকারও যেন চেয়েছেন বাংলা নাট্যসাহিত্যে বিয়োগান্তক আদর্শ প্রচলনের দ্বারা বাংলা নাট্য সাহিত্যের সমৃদ্ধি। এজন্য তিনি 'ভূমিকা'- য় ভারতীয় পণ্ডিতের উপর দোষ চাপিয়ে দিতে দ্বিধা করেন নি। তিনি বলেন;—

> "ভারতবর্ষীয় পূর্বতন পণ্ডিতেরা অনুমান করিতেন যে, ধার্মিক ব্যক্তির দুঃখাভিনয় করিবার সময়ে তাঁহাকে দুঃখার্ণবে রাখিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে নাহি। ইহা কেবল তাহাদিগের ভ্রান্তি মাত্র।" [৭]

অর্থাৎ নাট্যকার ভারতীয় মিলনান্তক দর্শনকে অসম্পূর্ণ দর্শন বলতে চেয়েছেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দেবার জন্য ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্তক বিষয়কে বাংলা সাহিত্যে স্থান দিয়ে উদার মনোভাবের পরিচয় দেন। সেজন্য নাট্যকার 'কীর্তিবিলাস'-এর রাজকুমার কীর্তিবিলাস ও তার পত্নী সৌদামনীর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে বিষাদময় পরিণতি অঙ্কন করেছেন। যাকে আমরা মাতৃভাষার নাটককে সমৃদ্ধ করার একটি সাহসী পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

বাংলা নাট্যচর্চার প্রথম দিকে স্বনামধন্য নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬)। তিনি এত নাট্যপ্রাণ ছিলেন যে, তাঁর নামই হয়েছিল 'নাটুকে রামনারায়ণ'। তাঁর একাধিক নাটকের মধ্যে মধুসূদনের অবির্ভাবের পূর্বে রচিত হয়েছিল —'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), 'বেণীসংহার' (১৮৫৭) ও 'রত্নাবলী' (১৮৫৮)।

'কুলীনকুলসর্বস্ব'(১৮৫৪) নাটকটি রামনারায়ণের প্রথম নাটক। বাংলার কুলীন রমণীদের দুরবস্থার চিত্র উদ্‌ঘাটনই এর মুখ্য বিষয়। নাটকের 'বিজ্ঞাপন'- এ তিনি প্রার্থনা করেন;— "এক্ষণে প্রার্থনা সজ্জনগণ সমীপে ইহা আদরণীয় হয়, তাহা হইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।" (৮) 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটিকে বিজ্ঞ সমাজে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য নাট্যকার রামনারায়ণের একটি উদ্যোগ চোখে পড়ার মতো। আমরা বলতে পারি নাট্যকারের এরকম উদ্যোগের পিছনে নাটকের প্রতি একটা গভীর ভালোবাসার সম্বন্ধ ছিল। তাছাড়া তিনি শুধু কালীচন্দ্র চতুর্ধরীণের বিজ্ঞাপনে উৎসাহিত হয়েই এরকম নাটক রচনায় এগিয়ে আসেন নি, এবিষয়ে কিছু লিখবেন বলে তাঁর একটি পরিকল্পনা ছিল। নাট্যকার রামনারায়ণের ভাষায়;—

> "পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কূল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্ত অভিলাষী ছিলাম;" (৯)

রামনারায়ণের প্রাক্‌পরিকল্পনা ও কালীচন্দ্র চতুর্ধরীণের উৎসাহ তাঁকে বাংলা নাট্য সাহিত্য সেবায় নিয়োগ করে।

'বেণীসংহার' (১৮৫৭) রামনারায়ণ তর্করত্নের একটি অনুবাদমূলক নাটক। এই নাটকটি অর্ধশিক্ষিত ও সাধারণ দর্শকের জন্য রচিত হয়। নাট্যকার 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এ লিখেছেন;—

> "মহাকবি ভট্টনারায়ণ কুরু পাণ্ডবদিগের যুদ্ধবৃত্তান্ত বিষয়ে বেণীসংহার নামে যে এক সংস্কৃত নাটক রচনা করেন, তাহা বীর করুণারসে পরিপূর্ণ, ও স্বভাবোক্তি প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুতরাং এতদ্দেশে সুপাঠ্য-নাটকমধ্যে পরিগণিত রহিয়াছে।...কিন্তু সংস্কৃত ভাষানবিজ্ঞ বিজ্ঞগণ তাহার রস আস্বাদনে অসমর্থ, এই হেতু আমি বহু পরিশ্রমে চলিত ভাষায় উক্ত নাটকখানি অনুবাদিত ও মুদ্রিত করিলাম।" (১০)

সংস্কৃত পণ্ডিত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন সাধারণ মানুষের জন্য বাংলা ভাষায় 'বেণীসংহার' নাটকটি অনুবাদ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল,—সংস্কৃত পণ্ডিত নাট্যকার এই নাটকে নান্দী, সূত্রধার, নটী, বিদূষক, এমনকি সঙ্গীতেরও ব্যবহার করেন নি। প্রাক্ মধুসূদন যুগে এরকম বাংলা নাটক বাংলা

নাট্যসাহিত্যে বৈচিত্র্য এনেছে। 'প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন'-এর শেষে নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন আশা করেন;—"এক্ষণে দেশীয় ভাষানুরাগী মহোদয়গণ দৃষ্টিগোচর করিলে পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব ইতি।" (১১) মাতৃভাষায় নাটকটির অনুবাদ ও মাতৃভাষানুরাগী ব্যক্তির সহানুভূতি কামনা নাট্যকারের মাতৃভাষার নাটককে সমৃদ্ধ করার বাসনাকেই মনে করিয়ে দেয়।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে রামনারায়ণ তর্করত্নের বিখ্যাত নাটক 'রত্নাবলী' (১৮৫৮)। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বাংলা নাটকের উন্নয়নের জন্য যে কলম ধরেছেন; সেকথা 'রত্নাবলী'র বিজ্ঞাপনে স্পষ্ট। সমকালের দর্শক ইংরেজী নাটক ও সংস্কৃত নাটকের সমৃদ্ধ সাহিত্য রস আস্বাদনের ফলে দেশীয় যাত্রার প্রতি অনেকটা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করত। অতএব মাতৃভাষায় অভিনয়ের উপযোগী ভালো নাটকের অভাব একটা বড় সমস্যা। যা দূর করা বাঞ্ছনীয়। তাই রামনারায়ণ মাতৃভাষায় সাহিত্য রস সমৃদ্ধ নাটক রচনার জন্য কলম ধরেন। বিষয়টিকে নাট্যকারের ভাষায় ব্যক্ত করা যায়;—

> "সরস সংস্কৃত ও ইংরাজি নাটকসমূহের অতুল্য রসমাধুরী অবগত হইয়া প্রচলিত ঘৃণিত যাত্রাদিতে সকলেরই সমুচিত অশ্রদ্ধা হইয়া উঠিয়াছে। নির্মল সুধাকরবিনিঃসৃত সুধাধারের অস্বাদন পাইলে কাঞ্জিকাতে কাহারও অভিরুচি হয় না। কিন্তু সজ্জনসমূহের এরূপ প্রবৃত্তি পরিবর্তন হওয়া যদিও নিরতিশয় আহ্লাদের বিষয় বটে, তথাপি বঙ্গভাষায় নাটক সংখ্যা অতি অল্পমাত্র থাকাতে তদ্বিষয়ে সকলের ঐ নবীন অনুরাগ সম্যক সফল হইতেছে না; অতএব সেই অভাব দূরীকরণ পক্ষে সাধ্যানুসারে যত্নশীল হওয়া আবশ্যক। অতি অকিঞ্চিৎকর ক্ষমতা সত্বেও এই গুরুতর অধ্যবসায়ে আমার প্রবৃত্তি হওয়ারও ইহাই এক প্রধান কারণ।" (১২)

অর্থাৎ রামনারায়ণ বাংলার হীনরুচি সম্পন্ন যাত্রার রস থেকে উন্নত রুচিসম্পন্ন নাটক রচনায় আগ্রহী হন। হয়ত এই উদ্দেশ্যে তিনি মধুসূদন দত্তের আবির্ভাবের পরেও অনেকগুলি নাটক রচনা করেন।

এই সময়ে আরো যাঁরা বাংলা নাটক রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে উলেখযোগ্য—হরচন্দ্র ঘোষ ও কালী প্রসন্ন সিংহ। হরচন্দ্র ঘোষের 'ভারতী দুঃখিনী' (১২৮২ বঙ্গাব্দ) ও কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু' (১৮৫৪) নাটক দু'টি মৌলিক রচনা। এঁদের বাকী অন্য নাটকগুলি সবই অনুবাদ মূলক। হরচন্দ্র ঘোষ ও কালীপ্রসন্ন সিংহ মূলত অনুবাদমূলক নাটক লিখে বাংলা রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটানোর সঙ্গে সঙ্গে বাংলা নাট্যসাহিত্যধারাকে গতিদান করেছেন। এরপর আমরা দুই প্রতিভাবান নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) ও দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) বাংলা নাট্যসাহিত্যে অবদান বিষয়ে আলোচনা করব।

বাঙালী কর্তৃক সচেতনভাবে বাংলা নাটক রচনার ধারা প্রবর্তিত হয় ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে। এই সময়ে প্রথম কয়েকটি বছর ইংরেজী অথবা সংস্কৃত নাটকের আদর্শকে অনুসরণ করা হয়েছিল। কখনো ইংরেজী নাটকের আদর্শে জি.সি. গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ নাটকে পঞ্চমাঙ্ক, বিয়োগান্তক কাহিনী নির্বাচন, নটনটী-সূত্রধার-নান্দী প্রভৃতি চরিত্র বর্জন, আবার কখনো রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রমুখ নাট্যকার সংস্কৃত নাট্যাদর্শকে গ্রহণ করে নটনটী-নান্দী-সূত্রধার প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ ও সংগীতের দ্বারা নাট্য কাহিনী রচনা প্রভৃতি নানামুখী পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা বাংলা নাটক রচিত হয়। বাংলা নাটক রচনার এমন একটি দোলাচল বৃত্তির সময়ে নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত আবির্ভূত হন ।

প্রকৃত বন্ধুর সুপরামর্শ ও সঠিক পথনির্দেশ কত মূল্যবান তা মধুসূদন দত্তের জীবনে লক্ষ করা যায় । মাদ্রাজে 'ক্যাপটিভ লেডী'-র (১৮৪৯) আশানুরূপ সমাদর না হওয়ায় যখন তিনি বিষন্ন, ঠিক তখন বন্ধু গৌরদাস বসাক তাঁকে কলকাতায় ফিরে আসতে বলেন। গৌরদাস তাঁকে একটি কেরাণীর চাকুরীর ব্যবস্থা করে দেন। এখানেই শেষ নয়, গৌরদাসই মধুসূদনকে 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদের দায়িত্ব অর্পণ করার প্রস্তাব দেন। এ প্রসঙ্গে 'মধুসূদন দত্তের 'জীবনচরিত'-এ যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেছেন;—

> "মধুসূদন তখন মান্দ্রাজ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া পুলিস আদালতে কার্য্য করিতেছিলেন। 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ করা স্থির হইলে, গৌরদাসবাবু তাঁহার উপর এই ভার দিবার প্রস্তাব করিলেন। মধুসূদনের নাম বেলগাছিয়া নাট্যশালার অনুষ্ঠাতৃগণের অবিদিত ছিল না। হিন্দু কলেজে অধ্যায়নাবস্থা হইতেই ইংরাজী সাহিত্যে সুপণ্ডিত বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা ছিল; এবং 'ক্যাপটিভ্ লেডী' হইতে অনেকেই তাঁহার ইংরাজী ভাষার উপর অসাধারণ অধিকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং রাজারা আহ্লাদের সহিত গৌরদাসবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং মধুসূদনের উপর 'রত্নাবলী'র অনুবাদের ভার অর্পণ করিলেন।" (১৩)

এই সময় বাংলা ভাষায় অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার ছিলেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। 'রত্নাবলী' নাটকটি প্রতাপসিংহ ও ঈশ্বর সিংহের 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'-য় অভিনয়ের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয় । মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের অনুবাদ করতে এসে অনুভব করেন, মাতৃভাষায় নাটকের কি নিদারুণ দশা। মধুসূদন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু গৌরদাসকে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মাতৃভাষায় নাটকের অনুৎকর্ষতার কথাটি জানান। এবং সাহিত্য গুণ সমৃদ্ধ নাটক লেখার প্রতিশ্রুতি দেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন;—

> "একদিন 'রত্নাবলী'র অভিনয়াভ্যাস (Rehearsal) দেখিতে দেখিতে মধুসূদন, গৌরদাসবাবুকে বলিলেন, "দেখ, কি দুঃখের বিষয় যে, এই একখানা অকিঞ্চিৎকর নাটকের জন্য, রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন।"

গৌরদাসবাবু শুনিয়া বলিলেন, "নাটকখানা যে অকিঞ্চিৎকর, তাহা আমরাও জানি; কিন্তু উপায় কি ? 'বিদ্যাসুন্দরে'র ন্যায় নাটক আমরা অভিনয় করি, ইহা অবশ্যই তোমার ইচ্ছা নয়। ভাল নাটক পাইলে, আমরা 'রত্নাবলী' অভিনয় করিতাম না, কিন্তু ভাল নাটক বাঙ্গালা ভাষায় কোথায় ?" মধুসূদন বলিলেন, "ভাল নাটক ? আচ্ছা, আমি রচনা করিব ।" (১৪)

স্বদেশীয় সংস্কৃতি তথা মাতৃভাষায় নাটকের দুরবস্থায় মধুসূদন যে মর্মপীড়িত ছিলেন, তা তাঁর প্রথম নাটকের 'মঙ্গলাচরণ' ও প্রস্তাবনায় স্পষ্ট। মধুসূদন দত্ত প্রতাপ চন্দ্র সিংহ ও ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে 'শর্মিষ্ঠা' উপহার দিয়ে বলেন;—

"মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এদেশের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারতভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন ইতি।" (১৫)

এখানে প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্পের প্রতি মধুসূদনের গৌরববোধের প্রকাশ এবং মাতৃভাষায় সেই গৌরব অর্জনের জন্য বাসনা প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়টি 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনা মূলক সঙ্গীতেও স্পষ্ট। সঙ্গীতটি এই রকম;—

শুন গো ভারত-ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ ত্যজ ঘুম ঘোর, হইল, হইল ভোর
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়।
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে, বঙ্গে,
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারস অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু, মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু স্থানে এই মাগো,
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক্ তব তনয়-নিচয়।" (১৬)

—এই সঙ্গীতটিতেও প্রাচীন ভারতের নাট্যশিল্পের জন্য গৌরব এবং সমকালের নাটকের অনুৎকর্ষতার জন্য বেদনা প্রকাশ পেয়েছে।

বাংলা নাট্য সাহিত্যকে শিল্পসমৃদ্ধ করার জন্য মধুসূদন দত্ত 'শর্মিষ্ঠা'র পরেও একাধিক নাটক ও প্রহসন লেখেন। যথা;—'পদ্মাবতী' (১৮৬০), 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৬০), 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) এবং 'মায়াকানন' (১৮৭৪) উল্লেখযোগ্য।

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা নাট্য সাহিত্যের উন্নতি করতে চেয়ে কতখানি সফল হয়েছেন। তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'কৃষ্ণকুমারী' রচনার পূর্বে দীনবন্ধু মিত্রের কোন নাটকই প্রকাশিত হয় নি। 'কৃষ্ণকুমারী'র রচনা কাল ১৮৬০-এর ৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বর এবং দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এর প্রকাশ কাল ২রা আশ্বিন ১৭৮২ শকাব্দ বা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী'র রচনার পর দীনবন্ধু মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'নীল দর্পণ' (১৮৬০) প্রকাশিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন বাংলা নাটকের এই পর্বের নাটকগুলি পাঠ করে মনে করেন 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক হিসাবে সার্থক। তাঁর ভাষায়;—

> "কৃষ্ণকুমারী—নাটকের মূলকথা হইতেছে ধনলোভী কপট পুরুষের প্রতি নারীর প্রতিহিংসা এবং তাহার ফলে এক নিরপরাধ তরুণীর আত্মাহুতি।...কৃষ্ণকুমারী পূর্ববর্তী বাঙ্গালা নাট্যরচনাগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরবর্তী অধিকাংশ নাটকের তুলনায়ও ভালো।" (১৭)

অর্থাৎ 'কৃষ্ণকুমারী' তথা মধুসূদন দত্তের দ্বারা বাংলা নাটক প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এরকম একটি সার্থক নাটকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্পষ্ট করা যাক্। প্রথমে বলা যায়, বাংলা নাট্য সাহিত্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টিতে মধুসূদন যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই নাটকে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র ধনদাস ও মদনিকা। ধনদাস জয়পুরের রাজা জগৎ সিংহের পারিষদ। অলস ও বিলাসপ্রিয় রাজা জগৎসিংহের সমস্ত অপকর্মের অভিভাবক। ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ধনদাস রাজা জগৎসিংহকে পরিচালনা করে। এমনকি সে রাজার কাছে মন্ত্রীর চেয়েও বিশ্বস্ত। জয়পুর রাজগৃহে ধনদাস এলে রাজা তাকে স্বাগত জানায়। সংলাপটি এইরকম;—

> "রাজা। ...(ধনদাসের প্রবেশ) আরে, ধনদাস ? এস, এস, তবে ভাল আছ ত ?
>
> ধন। আজ্ঞা, এ অধীন মহারাজের চিরদাস। আপনার শ্রীচরণপ্রসাদে এর কি অমঙ্গল আছে?
>
> মন্ত্রী। (স্বগত) সব প্রতুল হলো — আর কি ? একে মনসা, তায় আবার ধূনার গন্ধ ! এ কর্মনাশাটা থাকতে দেখছি কোন কর্মই হবে না। দূর হোক্ ! এখন যাই। অনিচ্ছুক ব্যক্তির অনুসরণ করা পণ্ড পরিশ্রম। (প্রস্থান)।
>
> রাজা। তবে সংবাদ কি, বল দেখি ?

ধন। (সহাস্য বদনে) মহারাজ, এ নিকুঞ্জবনের প্রায় সকল ফুলেই আপনার এক একবার মধুপান করা হয়েছে, নূতনের মধ্যে কেবল ভেরেণ্ডা, ধুতুরা প্রভৃতি গোটাকতক কদর্য ফুল বাকী আছে। কৈ? জয়পুরের মধ্যে মহারাজের উপযুক্ত স্ত্রীলোক ত আর একটিও দেখতে পাওয়া যায় না।

রাজা। সে কি হে ? সাগর বারিশূন্য হলো না কি ?

ধন। আর, মহারাজ! এমন অগস্ত্য অবিশ্রান্ত শুষতে লাগলে, সাগরে কি আর বারি থাকে ?

রাজা। তবে এখন এ মেঘবরের উপায় কি? বল দেখি ?

ধন। আজ্ঞা, তার জন্যে আপনি চিন্তিত হবেন না। এ পৃথিবীতে একটা তো নয় সাতটা সাগর আছে!

রাজা। ধনদাস, তোমার কথা শুনে আমার মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠলো। তবে এখন উপায় কি, বল দেখি?" (১৮)

—এখানে ধনদাস ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কৌশলে রাজা জগৎসিংহের নিকট থেকে একটি 'উপায়' বের করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল বলেই ধনদাস রাজাকে মোহিত করতে পেরেছে। বাংলা নাট্য সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র সৃষ্টি করেন। বাংলা সাহিত্যে সার্থক ট্র্যাজেডী রচনার কৃতিত্বও মধুসূদনের প্রাপ্য। মধুসূদন দত্তের জীবনীকার এই প্রসঙ্গে বলেন;—

> " 'কৃষ্ণকুমারী' বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বিষাদান্ত নাটক। 'নীলদর্পণ' ইহার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষাদান্ত নাটকের অভিনয়-দর্শন ক্লেশকরও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাহার রচনা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন কোন নিষেধবিধির দ্বারা পরিচালিত হইবার পাত্র ছিলেন না; তিনি পাশ্চাত্যরীতি অনুসারে তাঁহার নাটক বিষাদান্ত করিয়া রচনা করিয়াছিলেন।" (১৯)

'কৃষ্ণকুমারী'র ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠক ও দর্শকের মনে করুণ অনুভূতি জাগিয়ে তোলে। রাজা ভীম সিংহ হীনবল, নিজ শক্তির দ্বারা আত্মরক্ষা করার সামর্থ তাঁর নেই। যে মহাবিপদ তাঁর এসেছে, সেই মহাবিপদ থেকে রক্ষা পেতে কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করার পরামর্শ দিয়ে একটি প্রস্তাব আসে। রাজা ভীম সিংহ আদরের কন্যার প্রাণ রক্ষা ও রাজ্য রক্ষার কর্তব্য পালনে দোলাচল হয়ে পড়েন। ভীম সিংহ বলেন;—

> "(চিন্তা করিয়া) আমার মৃত্যুই শ্রেয়। — না, —তাতেই বা কি হবে ? ...বিশেষতঃ, আপন রাজ্যের ও পরিবারের সমূহ বিপদ জেনে মরাও কাপুরুষতা। না, না,—কৃষ্ণা থাকতে এ বিপদ যে মেটে, এমন ত্রে কোন মতেই বোধ হয় না। আর এ বিবাদ ভঞ্জন না হলেও সর্বনাশ। উঃ —না, না, (গাত্রোত্থান)

তা বলে কি আমি একর্মে সম্মত হতে পারি ? সত্যদাস, এমন কর্ম চন্ডালেও কত্যে পারে না। আর চন্ডাল ত্রে মনুষ্য, এমন কর্ম পশুপক্ষীরাও কত্যে বিমুখ হয়। দেখ, যে সকল জন্তুরা মাংসাশী, তারাও আবার আপন শাবকগণকে প্রাণপণ যত্নে প্রতিপালন করে।" (২০)

নাটকে একদিকে কন্যাস্নেহ ও অন্যদিকে রাজ্যরক্ষার মহাদায়িত্ব তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছে। ভীমসিংহের এই করুণ দশা নাটকটি করুণ রসাত্মক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক। পূর্ববর্তী নাট্যকারের তুলনায় মধুসূদন দত্তের নাটকে নাটকীয় স্বগতোক্তির শিল্পসমৃদ্ধ প্রকাশ চোখে পড়ে। প্রাক্ মধুসূদন পর্বের বিখ্যাত নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্নের বিখ্যাত নাটক 'কুলীনকুল সর্ব্বস্ব' (১৮৫৪) এর নাটকীয় স্বগতোক্তি নিতান্ত সাধারণ। নাট্যকারের ভাষায়;—

"কুলপা। (স্বগত) হা বিধে। আমার কি পূর্বজন্মার্জিত পুঞ্জ পুঞ্জ মহাপাতক ছিল! কি ক্লেশ! কতদিনে এ দীনের প্রতি দীননাথ দয়া করিবেন; কবে আমাকে চিন্তাবিহীন করিবেন; শাস্ত্রে কথিত আছে "চিতা চিন্তা দ্বয়োর্মধ্যে চিন্তা নাম গরীয়সী। চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিনং।" আর মনুষ্যদিগের চিন্তাই জ্বর, চিন্তাপেক্ষা ক্লেশদায়ক কেহই নয়। আমি কন্যাভারগ্রস্ত হইয়া রাহুগ্রস্ত দিনকরের ন্যায় চিন্তায় ক্ষীণকায় হইতেছি; কুলকুণ্ডলিনী কবে আমাকে কুলে আনিবেন; কবে কুল রক্ষা করিবেন ? আমি, বহুদিন হইল, যে অঘটন ঘটনা-পটু ঘটকদ্বয়কে ঐ উদ্দেশে পাঠাইয়াছিলাম তাঁহারাও অদ্যাবধি প্রত্যাগত হইলেন না, কি করি ?" (২১)

কুলীন রীতি অনুসারে মেয়ের বিয়ে দিতে না পেরে কুলপালক চিন্তিত। কুলপালক সেই চিন্তার জন্যই যেন স্বগতোক্তির দ্বারা বিলাপ করেছেন। অন্যদিকে মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মদনিকা ধনদাসের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এরকম অবস্থায় একাকী মদনিকা স্বগতোক্তি করেছে;—

"মদনিকা। (চিত্রপট হস্তে অগ্রসর হইয়া স্বগত) আহা! রাজমহিষীর শোক দেখলে বুক ফেটে যায়! তা এমন মেয়েকে মা বাপে যদি এত স্নেহ না করবে তবে আর করবে কাকে? এই যে নূতন দূত কোন্ দেশ থেকে এলো, সেটা ভালো করে জানতে পেলেম না। যাই, দেখিগে বৃত্তান্তটা কি ? আমার ত বিলক্ষণ বিশ্বাস হচ্যে যে এ দূত রাজা মানসিংহই পাঠিয়েছেন। —আহা, পরমেশ্বর যেন তাই করেন। এখন গিয়ে ত আবার পুরুষ বেশ ধরিগে। এ যদি মানসিংহের দূত হয়, তবে ধনদাসের সর্বনাশ করবো! হা! হা! যারা স্ত্রীলোককে অবোধ বল্যে ঘৃণা করে, তারা এটা ভাবে না, যে স্ত্রীলোকের শক্তিকুলে জন্ম! যে মহাদেব ত্রিভুবনকেএক নিমিষে নষ্ট কত্যে পারেন, ভগবতী কৌশলক্রমে তাঁকে আপনার পদতলে ফেলে রেখেছেন! হায়! হায়! স্ত্রীলোকের বুদ্ধির কাছে কি আর বুদ্ধি আছে ? এই দেখাই যাবে, ধনদাসেরই কত বুদ্ধি, আর আমারই বা কত বুদ্ধি। —এই যে রাজনন্দিনী আবার এই দিকে ফিরে

আসচেন। হয়েছে আর কি! —মুখ দেখে বেশ বোধ হচ্যে, মনটা যেন একটু ভিজেচে। তাই যদি না হবে, তা হলে আমাকে এত ঘন ঘন দেখতে চান কেন ? এইবার চিত্রপটখানা দেখাতে হবে। দেখি না, তাতে কি ভাব দাঁড়ায়। হা, হা, হা! এ তো মানসিংহের কোন পুরুষেরই প্রতিমূর্তি নয়। নাই বা হলো, বয়ে গেল কি? কাঠের বিড়াল হউক না কেন, ইঁদুর ধরতে পাল্যেই হয়।" (২২)

—শুধুমাত্র একমুখী আত্মতুষ্টি নয়, মদনিকার উক্ত স্বগতোক্তিতে সহানুভূতি বা সহমর্মিতা, কার্যকে আরো সফল করার উদ্যোগ ও কৌশল অবলম্বন, প্রতিযোগী মনোভাব প্রভৃতি একাধিক প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে; যা বাংলা নাট্যসাহিত্যের স্বগতোক্তির ধারায় সার্থক প্রয়াস।

আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন, তা হল পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শে মধুসূদনের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাঁর প্রথম নাটক শর্মিষ্ঠা থেকেই পাশ্চাত্য নাটকের আদর্শ অনুসরণ লক্ষ করা যায়। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' (১৮৫২) জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' (১৮৫২) প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে পাশ্চাত্য আদর্শ দেখা গেলেও মধুসূদনের নাটকেই পাশ্চাত্য আদর্শের সফল প্রয়োগ হয়েছে। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন ;—

"সংস্কৃত রীতি ভিন্ন অন্য কোন রীতিতে যে নাটক রচনা হইতে পারে, অনেকের সেরূপ ধারণা পর্য্যন্ত ছিল না। মধুসূদন 'শর্মিষ্ঠা'য়, কিয়ৎপরিমাণে, ইংরাজী রীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।" (২৩)

অর্থাৎ বাংলা নাটকের দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শ যে একান্ত প্রয়োজন, মধুসূদন তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। নাট্যকার মধুসূদন দত্তের এইসব মহৎ প্রয়াস পরবর্তীকালে বাংলা নাট্য সাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধ করেছে বললে অতিশয়োক্তি হবে না।

এবার বাংলা নাট্যসাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) অবদান বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। দীনবন্ধু মিত্রের প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। এতে সমকালের আর্থ-রাজনৈতিক সমস্যা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যে এজাতীয় নাটক এই প্রথম। 'নীলদর্পণ'-এর পর দীনবন্ধু মিত্র আরো একাধিক নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। যথা;— 'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬০), 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬), 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬), 'লীলাবতী' (১৮৬৭), 'জামাই বারিক' (১৮৭২), 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩)। আমাদের প্রশ্ন, দীনবন্ধু মিত্র উল্লিখিত একাধিক নাটক লিখে নাট্যশিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রাখতে পেরেছিলেন। ডঃ সুকুমার সেন দীনবন্ধু মিত্র প্রসঙ্গে বলেন;—

"কিন্তু দীনবন্ধুর হাতে বাঙ্গালা নাটকের গঠনকৌশলের কোনই উন্নতি হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কৃতিত্ব নিজের অভিজ্ঞতাসামগ্রী হইতে বিভিন্ন ভূমিকার ও উপাখ্যানের পরিকল্পনা।" (২৪)

আদুরী, তোরাপ, পেঁচোর মা, পদ্মলোচন, রাজীব মুখোপাধ্যায়, নিমচাঁদ প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি এবং 'নীলদর্পণ'-এর আর্থ-রাজনৈতিক কাহিনী, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র রাজীব মুখোপাধ্যায়ের বুড়ো বয়সে বিয়ের বাসনার মতো কাহিনী, 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদের শিক্ষিত মনের দুর্বিষহ বেদনা ও ধনীর পুত্র মুর্খ অটলের বাবুগিরির কাহিনী—সমকালে বাংলা নাট্যধারার মধ্যে অভিনব আস্বাদের আবেদন রেখেছিল। দীনবন্ধুর জনপ্রিয়তা আরো ব্যাপক আকার পায়, যখন তাঁর নাটকগুলি নাট্যানুরাগী সাধারণ যুবকের দল অভিনয়ের ব্যবস্থা করে। প্রথম দিকে সাধারণ দর্শকের অভিনয় দেখার সুযোগ হত না। সে সময় রাজা-জমিদারের উদ্যোগে সখের থিয়েটারে বাংলা নাটক অভিনীত হত। গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধামাধব কর প্রমুখ নাট্যানুরাগী যুবক 'বাগবাজার এমেচার থিয়েটার' নামে একটি অভিনয়ের দল গঠন করেন। বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তমীপূজার দিন 'সধবার একাদশী'র দ্বারা বাগবাজার এমেচার থিয়েটারে প্রথম অভিনয় হয়। এরপর দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' ও অন্যান্য নাটকের অভিনয়ের উদ্যোগ করা হয়। এমতাবস্থায় অর্ধেন্দু শেখর মুস্তাফি, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ টিকিট বিক্রির দ্বারা অভিনয়ের ব্যাপারে ভাবনাচিন্তা করেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই ডিসেম্বর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দুশেখর, ধর্মদাস সুর, অমৃতলাল বসু প্রমুখ ন্যাশনাল থিয়েটারে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। এরপর থেকেই সামান্য অর্থের বিনিময়ে আপামর সাধারণ বাঙালী বাংলা নাটকের অভিনয় দেখার সুযোগ পান। 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' নামক গ্রন্থে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান বিষয়ে বলা হয়েছে;—

> "দীনবন্ধুর সহিত বঙ্গীয় নাট্যশালার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ ছিল। তাঁহার নাটক ও প্রহসনগুলি কলিকাতা ও মফস্বলের সখের নাট্যশালা কর্তৃক বহুবার অভিনীত হইয়াছে। কিন্তু সখের অভিনয়ে বাঙালী জনসাধারণের নাট্যাভিনয় দেখিবার আগ্রহ তৃপ্ত হয় নাই। এই সকল অভিনয় প্রায়ই কোন না কোন অভিজাত বংশীয় ধনীর উৎসাহে ও সাহায্যে তাঁহার নিজের বাড়ীতে বা বাগানবাড়ীতে হইত। ক্রমে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব হইতে লাগিল।....মুষ্টিমেয় ভদ্রসন্তান সখের থিয়েটার হইতে শেষে কলিকাতায় সাধারণ রঙ্গালয়—'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা (৭ই ডিসেম্বর ১৮৭২) করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন," [২৫]

নগেন্দ্রনাথ, ধর্মদাস সুর, অর্ধেন্দুশেখর, গিরিশচন্দ্র প্রমুখ নাট্যানুরাগী যুবক দীনবন্ধুর নাটক হাতে পেয়েছিলেন বলেই সহজে অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের নাটক না থাকলে তাঁরা বাংলা নাটক অভিনয় করতে সাহসী হতেন না। এবিষয়ে নটনাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে উদ্দেশ্য করে বলেন;—

> "বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন। আমি সেই রঙ্গালয় আশ্রয় করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি, মহাশয় আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন। ...যে সময়ে 'সধবার একাদশী'র অভিনয় হয়, সে সময় ধনাঢ্য ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত নাটকাভিনয় করা একপ্রকার অসম্ভব হইত; কারণ পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে যেরূপ বিপুল ব্যয় হইত, তাহা নির্ব্বাহ করা সাধারণের সাধ্যাতীত ছিল। কিন্তু আপনার সমাজচিত্র 'সধবার একাদশী'তে অর্থব্যয়ের প্রয়োজন হয় নাই। সেই জন্য সম্পত্তিহীন যুবকবৃন্দ মিলিয়া 'সধবার একাদশী' অভিনয় করিতে সক্ষম হয়। মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া "ন্যাসান্যাল থিয়েটার" স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।" [২৬]

অর্থাৎ নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র বাংলা সাধারণ রঙ্গমঞ্চের উপযুক্ত নাটক লিখে বাংলা নাটককে জনমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে এক বিরাট অবদান রাখেন। ডঃ সুকুমার সেন দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের জনপ্রিয়তার পিছনে আরো কতকগুলি কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

> "দীনবন্ধুর নাট্যরচনাগুলি লইয়াই কলিকাতায় পাবলিক থিয়েটার বা সাধারণ নাট্যশালা জমিয়া উঠিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে এমনকি তাহার পূর্ব হইতেও আমাদের দেশে নৃত্যগীতাভিনয়ের মধ্যে সঙই ছিল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তাই প্রহসন জাতীয় নাট্যরচনাই অভিনয়ে সাধারণ দর্শককে বেশী আকৃষ্ট করিত। দীনবন্ধুর নাটকে কৌতুকরসই প্রধান, এবং এই কৌতুক রস সর্বত্র ভাঁড়ামিতে পর্যবসিত নয়। তাই সাধারণ দর্শকের কাছে দীনবন্ধুর নাটকের অভিনয় সমাদৃত ছিল। [২৭]

অর্থাৎ সাধারণ দর্শকের কাছে হাস্যরসাশ্রিত কৌতুক রসপ্রধান বিষয় খুব জনপ্রিয় ছিল।

অতএব দীনবন্ধু মিত্রের সামাজিক বিষয় নির্ভর নাটকের স্বল্প ব্যয়ে অভিনয় করার সুবিধা ও বাঙালী রুচির অনুকূল হাস্যরসাশ্রিত কৌতুক রস প্রধান বাংলা নাটক আপামর বাঙালীকে নাটক দেখার সুযোগ এনে দিয়েছিল। সংক্ষেপে বাংলা নাট্য সাহিত্য ও নাট্যশিল্পে দীনবন্ধু মিত্রের অবদান এরকম।

বাংলা নাটক ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণের আলোচনার শেষে বলা যায়, হেরাসিম স্তেফান্‌ভিচ লেবেডেফের 'কাল্পনিক সংবদল' (১৭৯৫) ছাড়া প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নাটকের অস্তিত্ব ছিল না। উনিশ শতকের মধ্যভাগে জি. সি. গুপ্ত (১৮৫২) তারাচরণ শিকদার (১৮৫২) প্রমুখ নাট্যকার বাংলায় নাটক রচনা করেন। এই পর্বে শুধু নাটক রচনা করাই নয়, বাংলা ভাষায় সমৃদ্ধ নাটক রচনা করার মহৎ উদ্দেশ্যটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। এই মহৎ উদ্দেশ্যটি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের হাতে প্রথম সার্থকতা লাভ করে এবং বাংলা নাটক সাহিত্য হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি পায়। আমরা বাংলা নাটকের শিল্প

হিসাবে প্রতিষ্ঠার পর্বকে ক্রমান্বয়ে বাংলা নাটকে উত্তরণ বলতে চেয়েছি। মাতৃভাষায় বাঙালীর নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য, স্বদেশের নাট্যশিল্প ও সাহিত্যকেই সমৃদ্ধ করেছে। অতএব বাংলা নাটক ক্রমান্বয়ে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে উত্তরণের মধ্যে পরোক্ষে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনারই পরিচয় পাওয়া যায়।

সমাজ সংস্কারের প্রেরণায় বাংলা নাটক সৃষ্টি ঃ

বাংলা দেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ক্রমশ মানব কথা স্থান পায়। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রকরণ নাট্যসাহিত্যেও মানবকথা আসে। সাহিত্যের এই উদারতার ফলে এই শতকে বাঙালী সমাজের নানা আন্দোলন বিষয় হয়ে উঠে আসে। রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বাঙালী মনীষী সমকালীন সমাজের নানা বৈষম্যকে মেনে নেন নি। বিশেষত নারী ও নিম্নবর্ণের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ মানবতাবাদী মনীষী প্রতিবাদী হয়ে উঠেন। তাছাড়া এই সময়ে প্রাচীনপন্থীর সংকীর্ণতা ও নব্যপন্থীর উচ্ছৃঙ্খলতা মানবতাবাদী মনীষীকে বেশ ভাবিয়েছিল। সমাজের দুর্বলদের প্রতি বৈষম্য, প্রাচীনপন্থীদের সংকীর্ণতা, নব্যপন্থীদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনুকরণপ্রিয়তা বাঙালী সমাজের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক। নাট্যকার সমাজ-সচেতন হওয়ায় সমাজের পক্ষে এইসব ক্ষতিকারক দিকগুলিকে নাটকের বিষয় করেছিলেন। সেজন্য বলা যায়, এই শতকের সমাজ সংস্কারমূলক নাটকগুলি বাঙালীর আত্মচেতনা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই আত্মচেতনামূলক সামাজিক নাটকগুলি অনেক সময় ব্যঙ্গমূলক, আবার অনেক সময় মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদনমূলক। অর্থাৎ উনিশ শতকের বাংলা নাটক শুধুমাত্র বিনোদনের বিষয় হয়ে না থেকে সমাজ সংস্কারের গতিকেও ত্বরান্বিত করেছিল। এই সময়ের নাট্যকারগণ সমাজ সংস্কারের ভাবনাকে দু'ভাবে প্রভাবিত করেন। রঙ্গব্যঙ্গ রচনা বা প্রহসন মূলক রচনার দ্বারা ও মানবিক অনুভূতির কাছে আবেদনের দ্বারা। আমরা প্রথমে রঙ্গব্যঙ্গ বা প্রহসনের দ্বারা সমাজ সংস্কারের প্রেরণা বিষয়ে আলোকপাত করব। ঊনবিংশ শতাব্দীর দু'জন বিখ্যাত নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদন ও দীনবন্ধুর কয়েকটি প্রহসন মূলক নাটকের দ্বারা সমাজকে সচেতন করার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করা যায়।

আমরা জানি, মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের উৎকৃষ্টতা সৃষ্টির জন্য কলম ধরেছেন। কিন্তু দুখানি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে তিনি সমাজের অনাচারকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করেছেন।

উনিশ শতকের কলকাতাবাসীর অনেকেই স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বর্জন করে ইউরোপীয় সভ্যতাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের বিবেচনায় স্বদেশীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির থেকে বিদেশীয় সভ্যতা ও

সংস্কৃতি অনেক বেশী প্রয়োজনীয়। অতএব তাঁরা মনে করতেন—বিদেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বাঙালী জীবনে জরুরি। নাট্যকার মধুসূদন দত্ত এই বিদেশী সভ্যতা-সংস্কৃতির অনুকরণকারিদের নিয়ে নাটক লিখেছেন। নাট্যকার দেখানোর চেষ্টা করেন যে, এই অনুকরণকারিদের জীবনাচরণ সমাজকে উন্নত না করে বরং ক্ষতি করছে। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন;—

> "তখন কলিকাতা-সমাজে শিক্ষিত-নামধারী এমন এক শ্রেণীর লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল যে, তাঁহারা, সভ্যতার ও সমাজ-সংস্কারের নামে, স্বেচ্ছাচারের ও উচ্ছৃঙ্খলতার একশেষ প্রদর্শন করিতেছিলেন। দলবদ্ধ হইয়া মদ্যপান, নিষিদ্ধ দ্রব্য ভক্ষণ, এবং স্বদেশীয় প্রত্যেক আচার-ব্যবহারে অশ্রদ্ধা-প্রদর্শন, ইহাই তাঁহাদিগের নিকট সভ্যতার ও সমাজ সংস্কারের পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীন পণ্ডিতগণ তাঁহাদিগের নিকট অজ্ঞ ও কৃপাপাত্র বলিয়া উপেক্ষিত হইতেন, এবং শাস্ত্রগ্রন্থসমূহ তাঁহাদিগের নিকট অবিশ্বাস্য ও কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া অনাদৃত হইত। লোকে ইহাদিগকে 'ইয়ংবেঙ্গল' বলিত। ...'একেই কি বলে সভ্যতা' এই শ্রেণীকেই লক্ষ্য করিয়া রচিত হইয়াছিল।" (২৮)

'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রতিনিধি নবকুমার ও কালীনাথবাবুরা বিদেশীয় আচার আচরণকে মেনে চলে; পাশাপাশি দেশীয় আচার-আচরণকে ঠিক ততখানি ঘৃণা করে। এরা বিধবা বিবাহ, স্ত্রী স্বাধীনতা প্রভৃতি 'সোসীয়াল রিফরমেশন' এর চেষ্টায় রত। নবকুমার বলেছে;—

> "জেণ্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপরষ্টিসনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি নে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর" (২৯)

কিংবা,

> "জেণ্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর—তাদের স্বাধীনতা দেও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে—নচেৎ নয়।" (৩০)

এখানে ভারতবর্ষের উন্নয়নের জন্য ইয়ংবেঙ্গলের মতামত প্রকাশ পেয়েছে। তাদের মতে ভারতীয় আচার-রীতি ত্যাগ করে, বিদেশীয় সভ্যতার অনুকরণ করলেই ভারতবর্ষের উন্নয়ন হবে। ইয়ংবেঙ্গলের দেশানুরাগের পথ যে সঠিক নয় 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় ব্যঙ্গ করে নাট্যকার মধুসূদন দত্ত সেকথাই প্রকাশ করার চেষ্টা

করেন। স্বীকার করতে হবে তাদের দেশানুরাগ অতি মহৎ কিন্তু তারা উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগানুরাগের উর্ধ্বে উঠে দেশানুরাগী হতে পারেন নি। 'একেই কি বলে সভ্যতা'-য় ইয়ংবেঙ্গলের অনুকরণপ্রিয়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও ভোগানুরাগকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

নবকুমার, কালীনাথবাবু ও তাদের সাথীরা বিধবা-বিবাহ, স্ত্রী-স্বাধীনতা, শিক্ষার প্রসার, জাতপাত বর্জনের মতো মহৎ ও পবিত্র কাজের ব্যাপারে আগ্রহী। অবশ্য এসব মহৎ কাজে তাদের উদ্যোগ শুধুমাত্র সভা-সমিতিতে গালভরা বক্তব্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এরা সাহেবদের অনুকরণে যুবতী বোনের গালে চুম্বন দেয়, দেশীয় ঠাকুর দেবতাকে হাঁটু মুড়ে মাথা নোয়ানোর ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে, বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করে। এছাড়া মদ্যপান, বারবিলাসিনীর সংসর্গ প্রভৃতি উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণের মধ্যেই এদের সোসাল রিফর্মেশন সীমাবদ্ধ। সেজন্য ইয়ংবেঙ্গলের প্রতিনিধি নবকুমারের স্ত্রী হরকামিনী স্বামীর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বলেছে;— "...ছি, ছি, ছি! (চিন্তা করিয়া) বেহায়ারা আবার বলে কি, যে আমরা সায়েবদের মতন সভ্য হয়েচি। হা আমার পোড়া কপাল! মদ মাস খেয়ে ঢলাঢলি কল্লেই কি সভ্য হয়? — একেই কি বলে সভ্যতা ? (৩১)

'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'—মধুসূদনের সমাজ সচেতনতার ফসল। ক্ষমতাবান ব্যক্তির লাম্পট্য ও ভোগাকাঙ্ক্ষা সুস্থ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে পাশ্চাত্য উদার চেতনা বর্জিত সংকীর্ণ ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্য ও অনাচার মূল বিষয়। ভক্তপ্রসাদ রূপবতী নারী দেখলে হিতাহিত জ্ঞান হারায়। প্রতিবেশী কন্যাসম পাঁচিকে দেখে তার লালসা জেগে উঠে। সে বলে;—

> "হাঁ, তা সত্য বটে। (স্বগত) ছুঁড়ীর নবযৌবনকাল উপস্থিত, তাতে আবার স্বামী থাকে বিদেশে। এতেও যদি কিছু না কত্যে পারি তবে আর কিসে পারবো। (প্রকাশে) ও পাঁচি, একবার নিকটে আয় তো তোকে ভাল করে দেখি। সেই তোকে ছোটটি দেখেছিলেম, এখন তুই আবার ডাগর ডোগরটি হয়ে উঠেচিস্।" (৩২)

কিংবা বিধর্মী হানিফের সুন্দরী স্ত্রী ফতেমার রূপের কথা শুনে, ভক্তপ্রসাদের ভোগাকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে উঠে। সে বলেছে ;—"দীনবন্ধো, তুমিই যা কর। হাঁ স্ত্রীলোক—তাদের আবার জাত কি? তারা তো সাক্ষাৎ প্রকৃতিস্বরূপা, এমনতো আমাদের শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যাচ্যে; — বড় সুন্দরী বটে," (৩৩) —এতো গেল ভক্তপ্রসাদের লাম্পট্য দোষের খতিয়ান, যা সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে অন্তরায়। তার সংকীর্ণ মনোভাবও সুস্থ ও উন্নত সমাজ গঠনের প্রতিকূল। ধর্ম তার কাছে আচার-আচরণ সর্বস্ব। এবং অধর্মাচরণ বলতে সে মনে করে;—"এই দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খ্রীষ্টিয়ানি মত—" (৩৪) কিংবা কলকাতার উদারপন্থীর বর্ণ বৈষম্য বা জাতপাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করার মতো ঘটনায় ভক্তপ্রসাদ শঙ্কিত। তার

ভাষায়;—"কি সর্বনাশ! হিন্দুয়ানির মর্যাদা দেখচি আর কোন প্রকারেই রইলো না! আর রইবেই বা কেমন করে ? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বই তো নয়।" (৩৫) —যার মনোভাব এমন সংকীর্ণ, তার দ্বারা সমাজের উন্নয়ন সম্ভব নয়। কাহিনীর শেষে ভক্তপ্রসাদ হানিফের স্ত্রী ফতেমাকে ভোগ করতে গিয়ে ধরা পড়েছে। এবার ভক্তপ্রসাদ চরম অপমানিত হয়ে বাচস্পতি ও হানিফের দেওয়া শর্তে রাজি হয়। নাটকের শেষে বিবেক দংশনগ্রস্ত ভক্তপ্রসাদ বলে;—

> "...আমি বিবেচনা করে দেখলেম যে এ কর্মের দক্ষিণান্ত এই রূপেই হওয়া উচিত। যা হোক্ ভাই, তোমাদের হাতে আমি আজ বিলক্ষণ উপদেশ পেলেম।...এখন নারায়ণের কাছে এই প্রার্থনা করি যে এমন দুর্মতি যেন আমার আর কখন না ঘটে।" (৩৬)

আলোচ্য প্রহসন দু'টিতে মধুসূদন দত্ত সমাজের অনাচারকে বিষয় করেছেন। বলাবাহুল্য এই অনাচার সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। আমরা লক্ষ করলাম;— 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় উগ্র আধুনিক তথা আধুনিকতার অনুসরণকারীদের ব্যঙ্গ করা হয়েছে এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'তে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, লাম্পট্য ও সংকীর্ণ মনোভাবের প্রাচীনপন্থীকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র অভিনয় দেখলে বা পাঠ করলে উগ্র আধুনিকপন্থী বা অনুকরণকারীর দল এবং অনুদার প্রাচীনপন্থীর দল সম্বন্ধে মানুষ সচেতন হতে বাধ্য। এমনকি যাদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা হয়েছে, গ্রন্থ দু'টির বিষয় তাদের চেতনাকেও নাড়া দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। হয়ত সেজন্যই মধুসূদন দত্ত এই প্রহসন দু'টি রচনা করেছিলেন।

এবার দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকটি ব্যঙ্গমূলক নাটকের আলোচনা করা হবে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' একটি ব্যঙ্গমূলক নাট্যগ্রন্থ। বিয়ের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ আনুষ্ঠানিকভাবে মিলিত হয়। এদেশের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ পুরুষের একাধিক বিবাহ অনুমোদন করে, তাতে বয়সের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। পাশাপাশি মেয়েদের বিবাহের ক্ষেত্রে ছিল কঠিন সামাজিক নিয়ম। বিশেষত পাত্র নির্বাচনে তাদের মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। তাই বালিকার সঙ্গে বুড়োর বিয়ে এদেশে নতুন নয়। এতে অনেক ক্ষেত্রে বালিকাবধূ যৌবনে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিধবা হত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র সমাজে বালিকার সঙ্গে বৃদ্ধের অসাঞ্জস্যপূর্ণ বিবাহের ট্র্যাজেডির প্রসঙ্গ এনেছেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়ে পাগল বুড়ো রাজীবলোচনের সঙ্গে কোন বালিকার বিয়ে হয় নি। বালিকার সঙ্গে বুড়োর বিয়ের প্রসঙ্গ থাকলেও রাজীবলোচন শেষপর্যন্ত নকল বালিকাকে বিয়ে করেছে। এবং বউ ভেবে হাত ধরে বাড়িতে এনেছে পেঁচোর মাকে। সেজন্য কোন হৃদয়বান ব্যক্তি 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' পাঠ করে বা অভিনয় দেখে আহত হন না। বরং বৃদ্ধ বয়সে বিয়ে করতে উদ্যোগী রাজীবলোচনের নাকাল দশা দেখে আমাদের হাসি পায়।

আমরা লক্ষ করেছি, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৬৬) প্রকাশিত হয়। এই সময় সমাজে নবজাগরণ দেখা দিলেও চেতনাহীন ব্যক্তি বহুবিবাহ, বালিকা বিবাহ বা পুরুষের অধিক বয়সে বিয়ে করাকে অন্যায় মনে করত না। দীনবন্ধু মিত্র তাঁর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'য় এই জাতীয় মনোভাবকে ব্যঙ্গ করেছেন। পাশাপাশি সমাজে নারীর মানবিক মহিমা রক্ষার জন্য বিধবার বিয়ের সমর্থন-এর প্রসঙ্গ আছে। বৃদ্ধ রাজীবলোচন নিজের অল্পবয়স্ক বিধবা মেয়ের বিবাহ দিতে অস্বীকার করলেও বালিকা বিবাহ করতে এসে বলেছে;— "...বিধবা বিবাহ দেওয়া অতি কর্ত্তব্য, সকল ভদ্রলোকের মত আছে, কেবল কতকগুলো খোশামুদে বুড়, বকেয়া, বার্ষিকখেগো বিদ্যাভূষণ বিপক্ষতা কচ্চে।"(৩৭) রাজীবলোচনের দুই বিধবা মেয়ে বিধবা বিবাহকে মনে প্রাণে সমর্থন করে। বড় মেয়ে রামমণি বলে;—"আহা! যিনি সমরণের পদ্দি উঠিয়ে দিলেন, তিনি যদি বিধবা বিয়ে চালিয়ে যেতেন তা হ'লে বিধবাদের এত যন্ত্রণা হত না।" (৩৮)

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র মতো 'সধবার একাদশী'তে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আছে। আমরা জানি বিধবা- নারীর নিকট একাদশী একটি কঠিন ব্রত। 'সধবার একাদশী'তে স্বামী বেঁচে থাকলেও কুমুদিনী স্বামী সোহাগ থেকে বঞ্চিত, অবহেলিত এবং অপমানিত। বাস্তবিক সে সধবা হয়েও বিধবার মতো যন্ত্রণা নিয়ে দিনাতিপাত করে। সেই হিসাবে 'সধবার একাদশী' গ্রন্থনাম সার্থক। প্রশ্ন হতে পারে— কুমুদিনীর এই যন্ত্রণার জন্য দায়ী কে? অবশ্যই তার স্বামী অটল। অটল সমকালীন ব্যভিচারের স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে। ধনাঢ্য পিতার শাসনহীনতায় ও মায়ের আদরে তাঁর মানুষ হওয়া হয়নি। অটল প্রসঙ্গে নিমচাঁদের মূল্যায়ন এইরকম;—

"মাতালের মান তুমি, গণিকার গতি,
সধবার একাদশী, তুমি যার পতি" (৩৯)

—অটল বন্ধুবান্ধব নিয়ে মদ্যপানে বিভোর, বারবিলাসিনীর পোষক এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি কর্তব্য পালনে ব্যর্থ। এজাতীয় চিত্র আমরা প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' ও ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাসে' লক্ষ করেছি। এই সব রচনার উদ্দেশ্য সমাজকে সচেতন করা। 'সধবার একাদশী'তেও আমরা ধনীর দুলালের অধঃপাতে যাওয়ার একটি আখ্যান পাই। অতএব এই রচনাটির উদ্দেশ্য সমাজ সচেতন করা— সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে 'সধবার একাদশী' গ্রন্থটির আবেদন— আরো একটু বিস্তৃত নিমচাঁদ শিক্ষিত ও বিবেকবান হয়েও মুর্খ অটলের বন্ধু। নিমচাঁদ তার শিক্ষা ও চেতনাকে সৎকাজে প্রয়োগ করতে পারছে না। সমকালীন কলকাতার সমাজ সম্বন্ধে তার খেদ রয়েছে। সে বলে;—

"কলিকাতায় লোকে গুণ দেখে না; কেবল বিষয় খোঁজে, মা আমি চুক্‌লি কচ্চি নে—কলিকাতার লোকে স্বর্ণখুরে গর্দভকে কন্যাদান করবে, তবু সদ্‌গুণবিশিষ্ট বিষয়হীন সুপাত্রকে মেয়ে দেবে না—মা, হস্তিমূর্খ অটল-ছাগলের বিবাহ হয়েছে, আর অধিক আপনাকে কি পরিচয় দেব।" (৪০)

এখানে নিমচাঁদ নেশার আড়ালে সমাজের সমালোচনা করেছে। যা একটি অসুস্থ সমাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ বলে গৃহীত হতে পারে। সমকালীন এই অসুস্থ সমাজ প্রকৃত জ্ঞানীর মূল্য দিতে চায় নি। হয়ত সেজন্যই নিমচাঁদের মতো প্রতিভাবান সোনার ছেলে মাতাল হয়েছে। নারী হরণের মতো অভিযোগ যখন তার বিরুদ্ধে এলো, তখন নিমচাঁদ বলেছে এজাতীয় ব্যভিচার সে করে নি। তার ভাষায়;—"সময়। সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।" (৪১) নিমচাঁদের এই মন্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যভিচার কে করেছে? নিমচাঁদের কাছে এর উত্তর হল 'সময়'। 'সময়' ব্যভিচারের জন্য দায়ী। আসলে গভীরভাবে ভাবলে বলতে হবে—সত্যি নিমচাঁদ ও অটল এর জন্য দায়ী নয়। কেননা, সমকালের ধনীর দুলালের বদভ্যাস, এমন কি শিক্ষিত ব্যক্তির বারাঙ্গনা গৃহে গমন, মদ্যপান, প্রভৃতি অনাচার সমাজকে গ্রাস করেছিল। সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষা নবশিক্ষিত যুবককে সম্পূর্ণ রক্ষা করতে পারে নি। বরং পাশ্চাত্য শিক্ষার একটি অসম্পূর্ণ দিক আছে; যা সমকালের সভ্যতাকে আরো সমৃদ্ধ করার পক্ষে গঠনমূলক ভূমিকা নিতে পারে নি। নিমচাঁদ বলে;—"সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়।" (৪২) 'সধবার একাদশী'তে নিমচাঁদ, অটল প্রমুখ চরিত্রের জীবনে 'বিড়ম্বনা'র জন্য দায়ী প্রকৃত শিক্ষার অভাব। এই অভাবের প্রসঙ্গের দ্বারা দীনবন্ধু মিত্র যেন পাঠক ও দর্শকের মনে জাতীয় জীবনের ব্যভিচার দূর করার আবেদন জানিয়েছেন।

'জামাই বারিক' দীনবন্ধু মিত্রের আর একটি শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গমূলক গ্রন্থ। বহুবিবাহ, স্ত্রৈণতা, কর্মবিমুখতার মতো একাধিক বিষয়কে এখানে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। আমরা জানি, সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পক্ষে বহুবিবাহ, স্ত্রৈণতা ও কর্মবিমুখ মানসিকতা অত্যন্ত ক্ষতিকারক। বহু বিবাহ করলে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হবে। 'জামাই বারিক'-এ পদ্মলোচনের দুই স্ত্রী। দুই স্ত্রী দিনরাত কলহ করে। পদ্মলোচন তার গৃহ বিষয়ে অভয়কুমারকে বলেছে;—

> "আমার পক্ষাঘাত হয়েছে—দুই সতীনে শরীরটে ভাগ করে নিয়েছে; ডান দিক্‌টে বড় আবাগীর, বাঁ দিক্‌টে ছোট আবাগীর। ছোট আবাগী এতক্ষণ তেল মাকাচ্ছিল; চুলচেরা ভাগ, বাঁ অঙ্গে মাখ্‌য়েছে ডান অঙ্গ পড়ে রয়েছে—দেখ না ডান দিক তেলের দাগটি লাগে নি; বড় আবাগী আসে, ডান দিকে তেল পড়্‌বে, নইলে এইরূপেই বসে থাক্‌তে হবে।" (৪৩)

'জামাই বারিক'-এর অভয়কুমার স্ত্রৈণ হতে চায় নি। স্ত্রী কামিনীর সেজদিদির বর, স্ত্রৈণ প্রকৃতির। কামিনী চেয়েছিল, তার স্বামী অভয়কুমারও স্ত্রৈণ হোক্। কামিনী দুঃখ করে বলেছে;— "...সেজদিদির ভাতারের দেখিছি—সেজদিদি যত বার বাইরে যায়, সে তত বার সঙ্গের সাথী; দোর খুলে দেয়, দোর দিয়ে আসে, জল খাব বল্লে গেলাসটি মুখে তুলে ধরে।" (৪৪) —কামিনীর কথামত অভয়কুমার চলে না, সেজন্য তাদের অশান্তি। অভয়কুমার অভিমান করে শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করে। 'জামাইবারিক'-এ জামাই, ভাই-এর জামাই, বোনের জামাই,

জামাই-এর জামাই সকলেই অকর্মণ্য । নিষ্কর্মা, নেশাখোর প্রকৃতির ব্যক্তি 'জামাইবারিক'-এ এসে জোটে। কেননা, সেখানে থাকা ও খাওয়ার মতো প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাগুলি বিনা পরিশ্রমে পাওয়া যায় ।

দীনবন্ধু মিত্র 'জামাইবারিক'-এ নিষ্কর্মা, স্ত্রৈণ ও বহুবিবাহকে ব্যঙ্গ করেছেন । কেননা, এই সব বিষয় উন্নত ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের পক্ষে অন্তরায়। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র যেন ব্যঙ্গের দ্বারা সমাজকে সচেতন করার চেষ্টা করেন ।

আমরা এবার মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদনের দ্বারা নাট্যকারের সমাজ সংস্কারের বিষয়টি স্পষ্ট করব। মানুষের মানবিক মহিমার শক্তি অপরিসীম । মানবিকতা বোধ মানুষের এক মহৎ গুণ । বাঙালী নাট্যকার বাঙালী সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য সমকালীন দর্শক ও পাঠকের মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন। আবেদনের বৈচিত্র্য অনুসারে মানবিক অনুভূতিমূলক নাটককে দু'টি বিভাগ করা হয়েছে। যথা;—নারীর মানবিক মহিমা প্রচারমূলক ও বাঙালী গার্হস্থ্য জীবন বা সমাজ জীবনের মানোন্নয়নের নীতি উপদেশমূলক ।

প্রথমে নারীর মানবিক মর্যাদা প্রচারমূলক বিভাগটি সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে । উনিশ শতকের নবজাগ্রত ভাবপ্রবাহে যুগচিন্তা নায়কগণ অনুভব করেছিলেন যে, জাতির সামগ্রিক উন্নয়ন চাইলে ও বিদেশীদের নিকট দেশের লজ্জা নিবারণ করতে হলে নারীকে তার মানবিক মর্যাদা প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। অথচ সমকালে পুরুষের নিকট নারী দাসী বা সেবিকা মাত্র। পুরুষের আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের মত্রে নারীও একটি উপকরণ মাত্র। যুগচিন্তা নায়কগণের সঙ্গে সমকালের নাট্যকারগণও এই অন্যায় প্রথার বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন। নাট্যকারগণ নারীকে মানবিক মর্যাদা প্রদান বিষয়ক একাধিক নাটক লিখলেন । এ বিষয়ে 'কুলীনকুল সর্বস্ব', 'নবনাটক' ও 'বিধবা বিবাহ' প্রভৃতি নাটকের নাম করা যায় ।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫২) রামনারায়ণ তর্করত্নের রচনা। নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক। বিজ্ঞাপনে রামনারায়ণ সেকথা স্বীকার করেছেন। নাটকটি মূলত কুলীন নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের ইতিকথা। সমাজে কুলীন নারীর যন্ত্রণাময় জীবনের বিনিময়ে কুলরক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল। কিন্তু উনিশ শতকে যুগচিন্তা নায়কগণ এই রীতিকে একটি ভ্রান্ত নিয়ম বলে মনে করলেন এবং কুলীন পুরুষের একাধিক বিবাহের বিরুদ্ধে সচেতনতা জাগানোর চেষ্টা করলেন। কুলীন সম্প্রদায়ভুক্ত নারীর যন্ত্রণার বিনিময়ে কুল রক্ষার ভ্রান্ত নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মূলক গ্রন্থ 'কুলীনকুলসর্বস্ব'। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন নাটকটির 'বিজ্ঞাপন'-এ রঙ্গপুরের জমিদার কালীচরণ রায়চৌধুরীর উৎসাহের কথা স্বীকার করেন। বিজ্ঞাপনে তিনি লিখেছেন;—

"বল্লালসেনীয় কৌলীন্য প্রথা প্রচলিত থাকায় কুলীন—কামিনীগণের এক্ষণে যেরূপ দুর্দশা ঘটিতেছে, তদ্বিষয়ক প্রস্তাব সম্বলিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নামে এক নবীন নাটক যিনি রচনা করিয়া রচকগণমধ্যে সর্বোৎকৃষ্টতা দর্শাইতে পারিবেন তাঁহাকে তিনি ৫০ টাকা পারিতোষিক দিবেন।" (৪৫)

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি রচনার পিছনে সেকালের হৃদয়বান ব্যক্তির উৎসাহ রয়েছে। এ বিষয়ে নাট্যকার ভূমিকায় 'ভাস্কর' পত্রের একটি বিজ্ঞাপনের উল্লেখ করেন। তাছাড়া নাট্যকার কুলীন রমণীর দুর্দশায় মর্মাহত ছিলেন, এই সংবাদটিও 'বিজ্ঞাপন'-এ রয়েছে। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখেছেন;—

"পুরাকালে বল্লাল ভূপাল আবহমান প্রচলিত জাতি মর্যাদা মধ্যে স্বকপোলকল্পিত কুল-মর্যাদা প্রচার করিয়া যান। তৎপ্রথায় অধুনা বঙ্গস্থলী যেরূপ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন প্রস্তাব লিখিতে আমি নিতান্তই অভিলাষী ছিলাম;" (৪৬)

এখানে কুলীন নারীর অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় কাতর নাট্যকারের দর্শকের মনে সহানুভূতি জাগাতে 'কুলীনকুল সর্বস্ব' রচনা করার পরিকল্পনাটি জানা গেল।

নাটকখানি সেকালে সর্বোৎকৃষ্ট বলে স্বীকৃত হয়। নাটকটির কাহিনী এই রকম;—সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ কুলপালকের চার মেয়ের কুলীন পাত্র পাওয়া যাচ্ছিল না। এদিকে মেয়েকে পাত্রস্থ করতে না পারলে কুল রক্ষা হচ্ছে না। এক কপট ঘটকের প্রচেষ্টায় ষাট বছরের ঊর্ধ্বে এক কুলীন পাত্রের সন্ধান মেলে। কুলপালক কুলীনপাত্রের হাতে চার মেয়েকে সম্প্রদান করে। নাটকটির অভিনয় দেখলে কিংবা পাঠ করলে সহৃদয় ব্যক্তি আহত হতে বাধ্য। কেননা, পাত্রটি পূর্বেই একাধিক বিবাহিত। বিবাহ ব্যবসায়ই পাত্রের কাজ বা জীবিকা। সে কুলপালকের চার মেয়েকে একসঙ্গে বিয়ে করেছে। যাদের বয়স যথাক্রমে ৩২-৩৩, ২৬-২৭, ১৪-১৫ ও প্রায় ৮ বছরের একটি শিশু। প্রথম তিনজন না হয় বিয়ে কি—সে সম্বন্ধে জানে। কিন্তু শিশু কন্যাটির বয়স মাত্র আট বছর, যার স্বামীর বয়স ৬০ বছর। যে শিশুটি বিয়েকে একটি ভাল খাবার হিসাবে মনে করে। এরকম একটি শিশুর বিয়ে দিয়ে কুল রক্ষার ভ্রান্ত আচার 'কুলীনকুল সর্বস্ব'-এ পাওয়া যায়। তাছাড়া নাট্যকার দেখিয়েছেন, কুলীন নারীর কাছে স্বামীপ্রেম অনেকটা স্বপ্নের মতো। কেননা বিবাহ ব্যবসায়ী স্বামী বিয়ের পর স্ত্রীকে তার বাপের বাড়িতে রেখে দেয়। এবং পরবর্তীকালে পিতৃগৃহে স্বামী বিরহে অনেকসময় পরপুরুষের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়।

'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটকটি দেশীয় নারীর যন্ত্রণাময় একটি দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যা পাঠক ও দর্শকের মনে নারীর প্রতি সহানুভূতি জাগাতে সাহায্য করে।

রামনারায়ণের আর একটি বিখ্যাত নাটক 'নবনাটক'। সুখশান্তিতে পরিপূর্ণ-পরিবারের কর্তার বহু বিবাহের ফলে পরিবারটি কিরূপ নিঃস্ব ও ছন্নছাড়া হয় তারই নীতিশিক্ষামূলক নাটক 'নবনাটক'। নাটকে দম্ভাচার্য, চিত্ততোষ, বিধর্ম বাগীশ প্রমুখ জমিদার গবেশের স্তাবক ও প্রাচীনপন্থী। অন্যদিকে সুপণ্ডিত সুধীর, নাগর প্রমুখ উদার ও নিরপেক্ষ মত-পথের সমর্থক। সেজন্য সুধীর প্রমুখ বহুবিবাহ নিবারণী সভার সক্রিয় সদস্য তথা কর্মী। এরা জানে, বহু বিবাহ একটি কুপ্রথা, এর অবসান প্রয়োজন । জমিদার গবেশবাবু বহুবিবাহে উৎসাহী হলে সুধীর তাকে বহুবিবাহ না করার পরামর্শ দিয়েছিল। নানা শাস্ত্রীয় যুক্তির পর সুধীর বলে;—

> "যিনি বহুবিবাহ করেছেন এই সুখময় সংসার তাঁর কখনই সুখে নির্বাহিত হয় নাই, গৃহকন্দল-কুজ্ঝটিকাতে দিবানিশি তাঁকে ব্যতিব্যস্ত হতে হয়েছে, সচ্চরিত্র লোকও অসচ্চরিত্র বলে লোকসমাজে পরিগণিত হয়ে গেছেন, ..." (৪৭)

কিন্তু জমিদার সৎ পরামর্শে কান না দিলে সংসারে অশান্তি নেমে আসে। জমিদারিতে বিশৃঙ্খল সৃষ্টি হয়, প্রথমপত্নী সাবিত্রী আত্মহত্যা করে, জমিদার স্বয়ং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র গৃহত্যাগ করে । অর্থাৎ সুখশান্তিতে পূর্ণ সমৃদ্ধ একটি পরিবার বহুবিবাহের অভিশাপে নিঃস্ব ও ছন্নছাড়া হয় ।

'নবনাটক' নাটকটি উদ্দেশ্যমূলক। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন স্বীকার করেন যে, 'যোড়াসাঁকো নাট্যশালা কমিটী' তাঁর ওপরে এরকম একটি নাটক রচনার ভার অর্পণ করে। নাট্যকার নাটকটির বিষয় সম্বন্ধে 'উপহার' পত্রে বলেন;—'ইহা বহুবিবাহ প্রভৃতি বিবিধ কুপ্রথা নিবারণের নিমিত্ত সদুপদেশ সূত্রে নিবদ্ধ।" (৪৮) 'নব নাটক'-এর উদ্দেশ্য যে সমাজ সচেতন করা, তা 'উপহার' অংশে স্পষ্ট উল্লেখ আছে। আসলে নাট্যকার সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহের মতো কুপ্রথা নিবারণ করার আন্তরিক প্রয়াস নেন। বলা যায়, এই আন্তরিক প্রচেষ্টা দর্শক তথা পাঠকের মানবিক অনুভূতির নিকট আবেদন। নাটকের গৌরচন্দ্রিকায় বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে । সূত্রধার তার প্রিয়াকে বলে;— "...এ অতি সুবিজ্ঞ সমাজ, এ সমাজে সদুপদেশ-পূর্ণ কোন বিশুদ্ধ নাটক প্রকাশ করতে হবে।" (৪৯) এবং নাটকের শেষে সূত্রধার পুনরায় বলে;— "...সভ্য মহোদয়বর্গ ! আপনারা গুণগ্রাহী, এই নাটকখানি দেখলেন, অভিনয়ে গণেশবাবুর দুরবস্থা সকলেই স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করলেন, আর কি আপনারা বহুবিবাহ প্রথায় অনুমোদন করবেন ?" (৫০)

—অর্থাৎ এদেশের বহুবিবাহের প্রতি ঘৃণা জাগিয়ে নারীর পূর্ণ মানবিক মর্যাদা প্রদান করে সংসার ও সমাজের সমৃদ্ধি ও শান্তি বর্ধনের ইঙ্গিতমূলক নাটক 'নবনাটক'।

উমেশচন্দ্র মিত্রের বিখ্যাত নাটক 'বিধবা বিবাহ' (১৮৫৬)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এদেশের বিধবা নারীর দুঃখ নিবারণের জন্য বিধবা বিবাহের পক্ষে আন্দোলন গড়েন। 'বিধবা বিবাহ' নাটকটি সেই মহৎ

কর্মের সমর্থনে রচিত। বলা চলে, বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে যুক্তি দেখিয়েছেন, সেই দার্শনিক বা শাস্ত্রীয় যুক্তি বা তথ্যের রসময় নাট্যরূপ 'বিধবা বিবাহ'। নাটকটি বিধবা বিবাহের পক্ষে এদেশের হৃদয়বান মানুষের কাছে আবেদনমূলক গ্রন্থ।

কীর্তিরাম নিছক সংকীর্ণ ধারণায় প্রভাবিত হয়ে বিধবা পুত্রবধূ ও বিধবা কন্যার কঠোর জীবন যাপন সমর্থন করে। সে বিধবা বিবাহ নামক ব্যবস্থাটির প্রতি ক্ষুব্ধ। যারা বিধবা নারীর মনের খবর না রেখে বিধবাকে একাদশীর ব্রতপালনকারী মহিলা বলে মনে করে,—তাদের প্রতিনিধি কীর্তিরাম ঘোষ। প্রতিবেশী শ্যামাচরণ মিত্র বিধবা বিবাহের সমর্থক। তাঁর মতে সমাজে বিধবার পুনরায় বিয়ের ব্যবস্থা না থাকলে ব্যভিচার, ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি ঘটনা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। যা সুস্থ সমাজ গঠনের পক্ষে অন্তরায়। সমাজে প্রগতি আনতে হলে বিধবা নারীর পুনরায় বিবাহ প্রথা প্রচলন জরুরি। তাই 'বিধবা বিবাহ' নাটকে বিধবা কন্যার বিবাহ বাসরে শাস্ত্রালোচনার দ্বারা বিধবা বিবাহের যৌক্তিকতা প্রমাণিত হয়।

অন্যদিকে কীর্তিরাম ঘোষের জ্যেষ্ঠ কন্যা বিধবা সুলোচনা, প্রতিবেশী যুবক মন্মথের সঙ্গে অবৈধ দেহ সম্পর্কে লিপ্ত হয়ে পরিশেষে আত্মহত্যা করে। এই আত্মহত্যার বিয়োগান্তক পরিণতিই মধ্যযুগীয় মানসিকতার কীর্তিরামকে সচেতন করে। নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র এরকম একটি বিয়োগান্তক কাহিনীর দ্বারা সহৃদয়বান মানুষের অন্তরে সহানুভূতি জাগাতে চেয়েছেন।

উনিশ শতকের বাঙালী-নাগরিক জীবন ছিল অভিনব। নতুন যুগে নতুন জীবনযাত্রায় শুভ ও অশুভ উভয় দিকই ছিল। যা সমাজের পক্ষে অশুভ তা সমাজ হিতৈষীর নিকট ভীষণ কষ্টদায়ক। সেই সমাজ হিতৈষী যদি লেখক হন, তাহলে তাঁর লেখায় সমাজ পতনের জন্য অনুশোচনা ও তা থেকে মুক্তির সদুপদেশ থাকবে। এই সময়ের কলকাতার নাগরিক জীবনে ছলচাতুরী, স্বার্থপরতা, কুটকুশলতা প্রভৃতি নেতিবাচক দিকগুলি বাঙালী জীবনের পূর্ণ মানোন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত নাগরিক জীবনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বা স্বার্থপর মনোভাব গার্হস্থ্য জীবনের শান্তি ছিনিয়ে নিয়েছিল। সেই শান্তিহীনতার জন্য সমকালের বাংলা নাটকে অনুশোচনা ব্যক্ত হয়েছে; আবার শুধু অনুশোচনাই নয়, তা থেকে মুক্তির সদুপদেশও রয়েছে।

আমরা নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের সামাজিক নাটক থেকে সমকালীন গার্হস্থ্য তথা পারিবারিক জীবনের চিত্র অনুসন্ধান করব। গিরিশচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'পৌরাণিক নাটক' নামক প্রবন্ধে সামাজিক নাটকের বিষয়ে বলেন;—

> "দোষ-গুণ লইয়া নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে, কৌন্‌সুলীর

জেরাতে হটে নাই, গৃহে অস্ত্রহীন হইয়া দুই একজন পাইক ছিল, তাহাদের মারিয়া ডাকাইতি করিয়াছে, এইমাত্র দোষের চিত্র। লাম্পট্য দোষের বিবরণ,—দুই একটা বেশ্যা রাখিয়াছে, কেহ বা এক পরিবারস্থ থাকিয়া কুলঙ্গনাকে বাহির করিয়াছে;" (৫১)

গিরিশচন্দ্র যে দোষগুণগুলির নির্দেশ করলেন, সেগুলি বাঙালীর নাগরিক জীবনের দোষগুণ। তিনি এই সব দোষ গুণগুলিকে নিয়ে সামাজিক নাটক লিখেছন। তাঁর নাটক লেখা ও অভিনয়ের উদ্দেশ্য— পাঠক ও দর্শককে নীতিশিক্ষায় শিক্ষিত করা। তিনি 'নটের আবেদন'-এ বলেন;—"...সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধর্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া, নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি-মার্জ্জিত করিব" (৫২) গিরিশচন্দ্র ঘোষ পাঠক তথা দর্শককে নীতিশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা প্রদান ও রুচি মার্জিত করার প্রতি মনোযোগী ছিলেন। আমাদের আলোচ্য সামাজিক নাটকে বাঙালীর পারিবারিক তথা গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নানারকম নীতিকথা ও উপদেশের পরিচয় পাব।

প্রথমে 'প্রফুল্ল' (২২ আগষ্ট, ১৮৮৯) নাটকের আলোচনা করা যাক্। নাটকের প্রধানচরিত্র যোগেশ, ত্রিশ বছর কঠোর পরিশ্রম করে পিতৃহীন একটি নিঃস্ব সংসারকে সমৃদ্ধ করে। কনিষ্ঠ দুই ভাই রমেশ ও সুরেশকে শিক্ষিত করার চেষ্টা করেছে, মাকে কাশীতে পাঠিয়ে মায়ের মনোবাঞ্ছা পূরণ করতে উদ্যোগী হয়েছে। নাটকের সূচনায় আমরা দেখব, পরিবারটি সুখী ও যথেষ্ট সমৃদ্ধ। উমাসুন্দরী জ্যেষ্ঠ পুত্র-বধূকে সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করে বলেছে;— "তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী! তোমায় ঘরে এনে আমার যোগেশের বাড় বাড়ন্ত; তোমায় কচি বেলা থেকে যে দিকে ফিরিয়েচি, সেই দিকে ফিরেছ। তুমি মা একেলে মেয়ের মতন নও, তোমায় আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তোমা হ'তে আমার ঘর ঘরকন্না সব বজায় থাক্‌বে।"(৫৩) কিন্তু সুখ শান্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হয়নি। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের শেষে যোগেশ নিঃস্ব হবার সংবাদ পেয়েছে। যোগেশ এরকম আঘাত পাওয়ার জন্য তৈরী ছিল না, তবুও কিছু সময় পরে হয়ত স্বাভাবিক হত। কিন্তু রমেশের ছল চাতুরী তার 'সাজান বাগান'কে ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। এমন সময় কনিষ্ঠ ভাই সুরেশের প্রতি চৌর্যবৃত্তির মিথ্যা অভিযোগ, রমেশের জোচ্চুরীকে মা এবং স্ত্রীর সমর্থন, তাকে দিশাহারা করে তোলে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক নিঃস্বতার সঙ্গে সঙ্গে মানবিক নিঃস্বতাকে যোগেশ মেনে নিতে পারে নি। তাই সে হতাশার সঙ্গে বলে — আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল।

যোগেশের পরিবারে পতনদশার সূচনা ব্যাঙ্ক ফেলের কারণে হলেও সেটি মুখ্য নয়। ব্যাঙ্ক ফেলের দুঃসংবাদ বেশীক্ষণ স্থায়ী হত না। কেননা ব্যাঙ্ক ফেল যে হয় নি সে সংবাদও যোগেশকে দেওয়ার জন্য লোক এসেছিল। আসলে যোগেশের মর্মান্তিক পরিণতির জন্য দায়ী সমকালের নাগরিক-ব্যক্তিস্বার্থ। রমেশের মধ্যে

এই ব্যক্তিস্বার্থ সক্রিয়। রমেশ শিক্ষিত ও পেশায় উকিল। তার কাছে ছলাকলার দ্বারা ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করা সাধারণ ব্যাপার। তার মতো মানুষের কাছে মানবিকতার চেয়ে ব্যক্তিস্বার্থই বড়। রমেশের ব্যক্তিস্বার্থের নিকট পিতৃতুল্য দাদা, মা ও মাতৃতুল্য বৌদি, নিষ্পাপ ফুলের মতো ভাইপো এবং স্ত্রীর মানবিকতাবোধ নিতান্ত তুচ্ছ। দেবতুল্য দাদা তার নিজের কষ্টার্জিত সম্পত্তি যখন ছোট ভাই দুটিকে সমান অংশ দিতে চেয়েছিল, তখনই রমেশের মনে দুরভিসন্ধি জেগে উঠে। রমেশ স্বার্থপরের মতো বলেছে;—"যা'তে পরের অপকার, তা'তে আপনার উপকার। ভাইয়ের চেয়ে পর কে ? প্রথমে মা বখ্‌রা, তারপরে বাপের বিষয় বখ্‌রা, ভাইপো হবেন জ্ঞাতি শত্রু!" (৫৪)

আসলে উনিশ শতকে বাঙালী নাগরিক জীবনে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থের বিকৃত বাসনা প্রবল হয়ে উঠেছিল। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ উক্ত সময়ের বাঙালী গার্হস্থ্য জীবনের এই বিয়োগান্তক অধ্যায়কে 'প্রফুল্ল' নাটকে ফুটিয়েছেন। বাঙালীর সহজ, নিঃস্বার্থ, কপোট হীন যৌথপরিবারের সুবর্ণ দিনগুলির অবসান চিত্র 'প্রফুল্ল' নাটকে পাওয়া যায়। নাটকটি পাঠ করলে কিংবা অভিনয় দেখলে পাঠক ও দর্শক সমকালের ব্যক্তিস্বার্থ জর্জরিত সমাজের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্বন্ধে সচেতন হবেন। আমরা জানি, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ পাঠক ও দর্শককে ধর্মশিক্ষা বা নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য কলম ধরেছেন। অতএব বলা যায়, 'প্রফুল্ল' নাটক পরিকল্পনার পিছনে নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমকালীন ব্যক্তিস্বার্থ জর্জরিত সমাজকে যৌথপরিবারের সহজ, সরল ও নিঃস্বার্থ কপোটহীন জীবনযাপন করে শান্তি লাভ করার জন্য আহ্বান জানান।

'প্রফুল্ল'-এর মতো 'হারানিধি'ও (১৪ই জুন ১৮৯০) গিরিশচন্দ্র ঘোষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক নাটক। এই নাটকে পরোপকার ধর্ম, বিপদে ধৈর্যশীল হওয়া, অর্থ সম্পত্তির সদ্‌ব্যবহার প্রভৃতি সম্বন্ধে সৎপরামর্শ আছে। নাটকটিতে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে সৎপরামর্শ বাঙালীর সমাজ জীবনের মানোন্নয়নে কার্যকরী ভূমিকা নেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মানুষের অর্থলালসার প্রবৃত্তি অনেকসময় ভয়ানক হয়ে উঠে। সেই অর্থলালসা পরিবার ও সমাজের শান্তি বিঘ্নিত করতে পারে। 'হারানিধি' নাটকে মোহিনীমোহনের অর্থলালসার নিকট দয়া, মায়া, বন্ধুত্ব, সমস্তই তুচ্ছ। সে তার স্ত্রীকে বলেছে;—

> "দয়া, ধর্ম্ম, শাপ, মন্নি এসব যদি মনে ছিল, বড়লোকের ঘরে এলে কেন ? তুমি ছোট ঘরের মেয়ে, বড়লোক কেমন ক'রে হয়, জান না, ...ক্রোড়টাকার সম্পত্তি কি অমনি হয় ? গ্রাম জ্বালিয়ে প্রজা শাসন করতে হয়, গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিতে হয়, নাতোয়ানের বিষয়-কেড়ে নিতে হয়, তবে বড়লোক হয়।" (৫৫)

মোহিনীমোহনের ধারণা ধনাঢ্য হওয়ার উপায় নানা কৌশলে অর্থশোষণ করা। যেসব ধনাঢ্য ব্যক্তি দেশের মঙ্গলের চিন্তায় মগ্ন, তাঁদের সে 'আহাম্মক' বলেছে। তার ভাষায়;—"হাঁ হাঁ, আছে বটে — আছে বটে। তুমি যে রকম বল্‌চ, দু'ট একটা আহাম্মক আছে বটে; ...পরোপকার এক ঢেউ।" (৫৬) মোহিনীর কাছে মানুষ ও কুকুর বেড়ালের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সে বলে;—"কার সর্ব্বনাশ হয়, কে মরে, কার অন্ন জোটে না, তা ধর্‌তে গেলে বড়লোকের বিষয় রক্ষা করা হয় না। তোমরা কি কুকুর-বেরাল, শুওর-গাধা খেতে পেলে কি না, দেখ? (৫৭) মোহিনীর অর্থলালসা তার সমস্ত মানবিক গুণগুলিকে দমিয়ে রেখেছে। অর্থাৎ 'বড়লোক' বা ধনাঢ্য হতে গেলে মানবিকতাকে বিসর্জন দেওয়া উচিত,—এমন একটি বিকৃত মনোভাব মোহিনীমোহনকে চালিত করেছিল। এই মনোভাব যে পরিবার ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক, তা নাটকে মোহিনীমোহনের মনোভাব পরিবর্তনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত। সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে বলেছে;—

> "...অর্থের আশ্চর্য্য মহিমা! এই অর্থকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করেছি, ...যার অর্থ নাই, অর্থ কি বিষময় পদার্থ, সে জানে না। অর্থে কেবল অনর্থ হয়, দুর্ব্বলকে আশ্রয় দেওয়া দূরে যাক, দুর্ব্বলপীড়ন প্রথম শিক্ষা দেয়। অষ্টপ্রহর মনকে উপদেশ দেয়, 'সতীর সতীত্ব নাশ কর, পরের অপহরণ কর!' এই অর্থের প্রতারণায় যে প্রতারিত না হয়, সে সাধু, আমি মত্ত হয়েছিলুম।" (৫৮)

পরোপকার পরম ধর্ম, এই নীতি শিক্ষা 'হারানিধি' নাটকে স্পষ্ট। হরিশ মোহিনীর বন্ধু। সে যথাসর্বস্ব দিয়ে বন্ধুর উপকার করেছিল। কিন্তু মোহিনীমোহন বন্ধু হরিশের সরলতার সুযোগ নিয়ে সর্বস্ব হরণ করতে চেয়েছিল। সেজন্য হরিশ অকৃতজ্ঞ বন্ধুকে বলেছে;—

> "হ্যাঁ হে, তুমি কি সব ভুলে গেলে? তুমি সাঁতার দিতে দিতে জলে ডুবে যাও, আমি আপনার প্রাণের মায়া না ক'রে তোমায় বাঁচাই; তোমার মার গহনা চুরি করেছিলে, তোমার বাপ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়,—আমি তোমায় মুখের খাবার খাওয়াই; তোমার কষ্ট হবে ব'লে বিছানা ছেড়ে দিয়ে মাদুরে শুই; হাড়ীপাড়ায় দাঙ্গা করেছিলে, তোমায় বাঁচাবার জন্য হাড়ীর লাঠি খেয়ে ছ মাস শয্যাগত হই; ...আমি বিশ্বাস ক'রে গলা বাড়িয়ে দিয়েছি, আর তুমি গলায় ছুরি দিচ্চ? (৫৯)

হরিশ বন্ধুর অর্থলালসায় নিঃস্ব হয়েছে। মোহিনীমোহনের বিপদগ্রস্ত কন্যাকে হরিশের স্ত্রী হৈমবতী ও কন্যা সুশীলা সেবা শুশ্রূষা করেছিল। হৈমবতী ও সুশীলার নিয়মিত মোহিনীমোহনের বাড়িতে যাওয়াকে হরিশ সন্দেহ করে। সুশীলা বুঝতে পেরে পিতা হরিশকে বলেছিল;—

> "কে আমার কথা ফুটতে ফুটতে শিখিয়েছিল, পরোপকার পরম ধর্ম্ম? কে আমায় শিখিয়েছিল, শত্রুকেও স্নেহ করবে? কে আমায় শিখিয়েছিল, অনাথাকে আশ্রয় দেবে? কে আমায় শিখিয়েছিল, পরোপকারে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?" (৬০)

অর্থাৎ শত্রুকে স্নেহ করা, অনাথকে আশ্রয় দেওয়া, এমনকি পরোপকারের জন্য প্রাণ তুচ্ছ করা যে মহৎ ধর্ম— এবিষয়ে নীতিশিক্ষা এখানে স্পষ্ট ।

মানুষের জীবনে বিপদ আসবেই । বিপদে বিভ্রান্ত হলে আরো বিপদ, কিন্তু সাধারণ মানুষ বিপদে বিভ্রান্ত হয়ে বিপদকে জটিল করে তোলে । 'হারানিধি' নাটকে বিপদে ধৈর্যশীল হওয়ার সৎ পরামর্শ আছে । নীলমাধব অত্যন্ত ধৈর্যশীল । বিপদে কাতর আত্মহত্যায় উদ্যত কাদম্বরীকে সে বলেছে;—

> "...আমার কি দুরবস্থা, তুমি জান না, আমার পিতা বিশ্বাসঘাতকের ছলে প্রতারিত হয়ে উদ্‌বাস্তু হয়েছেন, আজ তাঁর পিতা-পিতামহের ভিটে ত্যাগ ক'রে যাবেন; আমি বৃত্তিহীন, কাল্‌কের সংস্থান নাই, দুখিনী মার গহনা বেচে উদরান্ন কর্‌তে হবে; বিধবা ভগ্নী, আমি সংসারের একমাত্র আশ্রয়, কিন্তু দেখ, আমি কাতর নই।" (৬১)

নীলমাধব বিপদের দিনেও স্থির। সে বিভ্রান্ত না হয়ে বিপদকে অতিক্রান্ত করার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করেছে । পিতা হরিশ বলেছে;— "...আমি দুর্ব্বল, বিপদে কাতর হয়েছিলুম, কিন্তু তোমরা লোকশিক্ষা দিলে, বিপদে লোককে কিরূপ ধৈর্য্যশীল হ'তে হয়।" (৬২) অর্থাৎ হরিশ বলতে চেয়েছে তার পুত্র, কন্যা, স্ত্রী ও ভাই বিপদের দিনে কাতর না হয়ে বরং বিপদ অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে । এই প্রচেষ্টা সমাজজীবনের কাছে আদর্শস্বরূপ, যার থেকে মানুষ শিক্ষা পেতে পারে।

নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ এখানে বাঙালী সমাজের উন্নতির জন্য, সমাজের দোষ গুণের অবতারণা দ্বারা সমাজকে সৎ পরামর্শ দিতে চেয়েছেন ।

'মায়াবসান' (৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৯৮) গিরিশচন্দ্র ঘোষের নীতি-আদর্শমূলক আর একটি সামাজিক নাটক । আমরা সমাজজীবনে কোন না কোন কিছুর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ি । যশ, অর্থ, লোভ প্রভৃতি স্বার্থ আমাদের চালিত করে। 'মায়াবসান' নাটকে যশ, অহংকার, লোভ প্রভৃতিকে মায়া বা ভ্রম বলা হয়েছে । সমাজকে সুস্থ ও সমৃদ্ধ করতে হলে এসবের উৎপাটন জরুরি । 'মায়াবসান'-এ তারই নীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে । আমরা নাটকে দেখব কালীকিঙ্কর একজন মহৎ ব্যক্তি । তিনি পরহিতৈষী । তবুও তাঁর মনে শান্তি নেই । কেননা তিনি পরহিত ব্রত গ্রহণ করলেও ফলকামনা ত্যাগ করেন নি । ফলের মায়া বা মোহ তাঁকে পরিচালিত করেছিল । কালীকিঙ্কর তাঁর উপলব্ধির বিষয়ে বলেছেন;—

"...আমিও পরহিতে জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেম। কিন্তু শান্তি পাই নি কেন জানো ? মুখে ব'ল্‌তেম— নিষ্কাম ধর্ম্ম-নিষ্কাম ধর্ম্ম; কিন্তু অভিমান ফল-কামনা ছাড়ে না। সুখ-আশায় পরহিত ক'রেছি, ধর্ম্ম উপার্জ্জন ক'র্‌তে পরহিত ক'রেছি, আত্মোন্নতির জন্যে পরহিত ক'রেছি, ফল-কামনায় পরহিত ক'রেছি। আজ গঙ্গাজলে ফল বিসর্জ্জন দিয়ে পর-কার্য্যে রইলেম;..." (৬৩)

নাটকের শেষে কালীকিঙ্করের ফলের মায়াবসান হয়।

যাদব ও মাধব দুই ভাই। এরা সম্পত্তির লোভে ভ্রাতৃসংঘাতে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, এদের সম্পত্তির লোভ বা মায়া সমৃদ্ধ পরিবারটির শান্তি ছিনিয়ে নেয়। দুই ভাই অবশেষে বুঝতে পেরেছিল, সম্পত্তির লোভে ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ করাটা অন্যায় হয়েছে। সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করে দুই ভাইয়ে ভ্রাতৃপ্রেম কামনা করেছে। যাদব বলেছে;—"দাদা, জীবনে মরণে আর আমাদের কেউ তফাৎ ক'র্‌তে পার্‌বে না।" (৬৪)

গণপতি মনে করত, অন্যায়কে প্রশ্রয় না দিলে সমাজ চলতে পারে না। কিন্তু তার এই মনোভাবের পরিবর্তন হয়। সে ম্যাজিষ্ট্রেটের পত্নী মেমকে বলে;—"আজ্ঞা মেম সাহেব, পূর্ব্বে আমার জানা ছিল, মিথ্যাতেই সংসার চলে, সত্য একটা কথার কথা," (৬৫) অর্থাৎ 'মায়াবসান' মিথ্যা মায়া বা মোহকে অতিক্রম করে প্রকৃত সত্যকে চেনার নীতিমূলক নাটক।

আমরা লক্ষ করব, 'মায়াবসান' নাটকের কাহিনীতে বিপদে স্থির থাকা, অসৎ চিন্তা মনে স্থান না দেওয়া, কর্তব্যপালন, পতিভক্তি, স্বদেশ উদ্ধারের পথাদর্শ, ক্ষমাপরায়ণ হওয়া ও গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের মতো অনেকগুলি নীতি উপদেশ রয়েছে।

কালীকিঙ্কর ও অন্নপূর্ণার চরম বিপদের দিনে, রঙ্গিনী হলধরকে বলেছে;—"...আমার ধর্ম্ম বল, সত্য বল, কৃতজ্ঞতা বল, আমার ইষ্ট-সেবা, মাতৃ-সেবা বল, এ সামান্য বিপদ্‌কে আমি ভয় করি না;" (৬৬) রঙ্গিনী তার ধর্মবল, সত্যবল, কৃতজ্ঞতা বল প্রভৃতি মহৎ শক্তির উপর বিশ্বাস রেখে স্থির ও ধৈর্যশীল। যাদব ও মাধব বিপদগ্রস্ত হয়ে পিতৃসম কাকা কালীকিঙ্করের নিকট ক্ষমা চেয়েছিল। তারা বাঁচতে চেয়েছিল, কালীকিঙ্কর বলেছে;—

"... আমার চিরদিন ধারণা, মিথ্যায় কখনও সুফল ফলে না; সত্যের সংসার-সত্যপথই নিরাপদ্ পথ। ...শিক্ষা কার নাম জান ? —যে পথে অধঃপতিত হ'য়েছ, সে পথ থেকে ফেরা; যে কুকাজ ক'রেছ, তার সংশোধন করার চেষ্টা পাওয়া—অনুতাপ করা। দণ্ডের ভয়ে না, পুলিসের ভয়ে না।" (৬৭)

একথা যেন চিরন্তন সত্য। কেননা অপরাধীর মনে অপরাধবোধ বা অনুশোচনা না জাগলে পুনরায় সে অপরাধ করতে পারে। তাই বলে আদর্শ সমাজে ক্ষমা থাকবে না, তা নয়। মানুষের জীবনে এমন মুহূর্ত আসে, যখন মার্জনা বা ক্ষমা পেলে পরম শান্তি পাওয়া যায়। এতে ক্ষমা-দাতার মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যাদব ও মাধবের দুষ্টমতীকে কালীকিঙ্কর শেষ পর্যন্ত ক্ষমা করেছেন। তিনি বলেন;—"মার্জ্জনাই-মনুষ্যত্ব, দেবত্ব, ঈশ্বরত্ব।"(৬৮) সংসারের কর্মপথ অত্যন্ত কঠিন, সে পথে অনেক কষ্ট থাকে। কালীকিঙ্কর বাস্তব সংসারের যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উদভ্রান্ত জীবনাচরণ করলে, রঙ্গিনী বলে;—"তোমার যন্ত্রণার ভয়, তাই তুমি আরাম হ'চ্ছ না, কিন্তু তোমার শিক্ষায়—আমার যন্ত্রণায় ভয় নাই, যন্ত্রণাই আমার আনন্দ।" (৬৯) এখানে বাস্তব সংসারের কঠিন কর্মপথকে বরণ করার জন্য রঙ্গিনীর আহ্বান বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। কর্মবিমুখ হয়ে জীবনযাপন নয়, কর্মময় জীবনের পরম আনন্দ রঙ্গিনী পেয়েছে। সেজন্য রঙ্গিনী সত্য, ধর্ম ও পরোপকারকে জীবনের ব্রত বা কর্তব্য মনে করে। শ্বশুর কালীকিঙ্করকে হত্যা করার মিথ্যা অভিযোগে অন্নপূর্ণা অপরাধী। আদালত থেকে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে। পুলিশ তাকে ধরতে এলে সে নিজেকে আড়াল করে বাঁচতে পারত। কারণ পুলিশই তাকে সে সুযোগ দিতে চেয়েছে। কিন্তু অন্নপূর্ণা পালিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চায় নি। বরং পুলিশকে তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছে। তার ভাষায়;—"... রাজা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, বিচারকর্ত্তা, পরমেশ্বরের প্রতিনিধি। রাজা যদি আমায় পুলিসে নিয়ে যাবার অনুমতি দিয়ে থাকেন, তা হ'লে আমি পালিয়ে থেকে অনুমতিলঙ্ঘনের চেষ্টা ক'র্‌বো না। রাজার উপর ভগবান্ বিচারের ভার দিয়েছেন।" (৭০) অন্নপূর্ণা চরিত্রের দ্বারা ভারতীয় নারীর স্বামী-ভক্তির চরম আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে। অন্নপূর্ণা মৃত্যুশয্যায় ঈশ্বরের নাম মুখে আনতে পারে নি। কেননা, ঈশ্বরের নামে তার স্বামীর নাম। অন্নপূর্ণা বলে;—"আমার ও নাম মুখে আন্‌তে নেই, পাছে হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়! স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম ক'র্‌তে নেই; হৃদয়ে চেপে রাখ্‌তে হয়।' (৭১) বিন্দু বলে, এরকম সতীসাধ্বীর শিয়রে স্বয়ং বিষ্ণু পতিরূপে বসে আছেন। আমরা লক্ষ করব, অন্নপূর্ণা, জগৎপতিকে স্বামীর আসন দিতে নারাজ। সে বলেছে, তার স্বামী ঈশ্বরের তুলনায় যত ক্ষুদ্রই হোক্, তবু সে স্বামী। তার ভাষায়;—"না, না, বিষ্ণু নন, তিনি— তিনি।" (৭২) এই বক্তব্যের পর অন্নপূর্ণার স্বামী-ভক্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। যে স্বামী-ভক্তি সংসারকে শান্তির কুঞ্জে পরিণত করতে পারে। এই নাটকে উনিশ শতকের স্বদেশের জন্য কয়েকটি পরামর্শ পাওয়া যায়। 'মায়াবসান' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম গর্ভাঙ্কে কালীকিঙ্কর বলেছেন, এদেশে ধর্মীয় একতা স্থাপনের কথা। তাছাড়া দেশের মুক্তির জন্য সচেতন মানুষের উচিত সাধারণ মানুষকে সুনীতি শিক্ষা দেওয়ার উপদেশ ও ইংরেজদের অনুকরণে চলতে গিয়ে দেশের ভয়ঙ্কর ক্ষতি না করার উপদেশের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নাটকটিতে আর একটি মহৎ আদর্শ রয়েছে, তা হল—গীতার নিষ্কাম তত্ত্ব। কালীকিঙ্কর বলেন, আত্মত্যাগ করতে হবে। সমস্ত কামনা বাসনা পরিত্যাগ

করে জগৎ ও জীবনের জন্য কাজ করে যেতে হবে। তাকেই বলা হয় নিষ্কাম ধর্ম। এই নিষ্কাম ধর্মপথ ভিন্ন সমাজ ও দেশের পরিপূর্ণ মঙ্গল নেই। 'মায়াবসান' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে জগৎ ও জীবনের প্রতি মিথ্যা আসক্তি বা মায়া ত্যাগ করে সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য নিবেদিত প্রাণ হবার মহৎ আদর্শের কথা প্রকাশ পেয়েছে।

জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় বাংলা নাটক ঃ

উনিশ শতকের প্রথম দিকে প্রগতিশীল বাঙালী ইউরোপীয় সংস্পর্শে থাকাকেই শ্রেয় মনে করতেন। এ বিষয়ে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুদার লিখেছেন;—

> "বিদেশী ইংরেজ শাসনের প্রতি বাঙ্গালী হিন্দুর কোন বিদ্বেষভাব ছিল না। উনিশ শতকের গোড়ায় প্রসিদ্ধ নেতা রাজা রামমোহন রায় ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে অনন্যসাধারণ উদার মত পোষণ করিতেন। কিন্তু তিনিও মুসলমান রাজ্যে হিন্দুদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়াছেন যে, তিনি ইংরেজদিগকে ভারতে পাঠাইয়া হিন্দুদিগকে নয় শত বর্ষব্যাপী মুসলানদের লাঞ্ছনা ও অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন... প্রসন্নকুমার ঠাকুরও বলিয়াছেন, ভগবান যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি স্বাধীনতা চাও না ইংরেজের অধীন হইয়া থাকিতে চাও, আমি মুক্তকণ্ঠে ইংরেজের অধীনতাই বর বলিয়া গ্রহণ করিব।" [(৭৩)]

কিন্তু এই মোহ অচিরেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায়। এ বিষয়ে রমেশচন্দ্র মজুমদারই বলেন;—

> "উনিশ শতকের প্রথমে জাতীয়তাভাবের জাগরণের পূর্বে হিন্দু নেতাগণ মুসলমান শাসনের পরিবর্তে ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন,... কিন্তু ধীরে ধীরে এই মনোভাবের পরিবর্তন হইল।" [(৭৪)]

কেননা, ইংরেজ শাসকের দল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতীয়দের বঞ্চনা করত। প্রসঙ্গত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের একটি আইনের কথা বলা যায়। ইতিহাসে যা 'কালো আইন' নামে পরিচিত। পূর্বে আইনে ছিল, ইউরোপীয়দের বিচার সুপ্রিম কোর্টেই হবে। এতে গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর ইউরোপীয়দের অত্যাচার ক্রমে বৃদ্ধি পেতে থাকে। কারণ অত্যাচারী ইংরেজকে শাস্তি দিতে হলে সাধারণ মানুষকে কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে যেতে হবে। যা তাদের সাধ্যের বাইরে। বেথুন সাহেব এই আইনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। যাতে মফস্বলের সাধারণ মানুষ সুবিচার পায়। প্রবল বিরোধিতায় শেষপর্যন্ত নতুন আইন প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। এতে শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী অসন্তুষ্ট হয়। ইংরেজগণ এই নতুন আইনকে 'কালো

আইন' বলে অভিহিত করেন। এছাড়া ইংরেজ শাসকের বৈষম্যের প্রতিবাদে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় সিপাহী বিদ্রোহী হয়ে উঠে । যা সিপাহী বিদ্রোহ বলে পরিচিত । এর কিছু পরে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় নীলচাষী নীলকর সাহেবের শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়। উনিশ শতকে এরকম আরো অনেক বৈষম্যমূলক ঘটনা আছে । অতএব উনিশ শতকের মধ্যভাগেই শিক্ষিত বাঙালী, সিপাহী, চাষী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে অনেক সময় অসন্তুষ্ট ও কখনো বিদ্রোহী হয়েছিলেন । জাতীয়তাবাদী আবহাওয়াকে আরো ব্যাপকতা এনে দেয় হিন্দুমেলা (১২৭৩ বঙ্গাব্দ) । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দুমেলা প্রসঙ্গে বলেছেন;—

> "আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন । ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয় । মেজদাদা সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সংগীত "মিলে সবে ভারতসন্তান" রচনা করিয়াছিলেন । এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" (৭৫)

এই হিন্দুমেলাও শিক্ষিত সচেতন মনে দেশানুরাগ সৃষ্টিতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে । এমন সময় বাংলা নাটকের চাহিদা বৃদ্ধি পেল। ইতিমধ্যে মধুসূদন দত্ত ও দীনবন্ধু মিত্র বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন । তবুও মঞ্চে অভিনয়ের উপযোগী নাটকের অভাব দূরীভূত হয় নি। অনেক নাট্যকার নাট্যসাহিত্যে বাঙালীর সমকালের জাতীয় ভাবনাকে স্থান দিয়ে নতুন করে নাটক রচনায় হাত দেন । ফলে জন্ম নেয় জাতীয় চেতনা সমৃদ্ধ বাংলা নাটক । এই নাটকগুলি জাতীয়তাবাদী নাটক বলেই পরিচিত। এখানে আলোচনার সুবিধার জন্য জাতীয়তাবাদী নাটকের দু'টি শ্রেণী করা হয়েছে । যথা; ঐতিহাসিক নাটক ও আর্থ-রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ নাটক ।

প্রথমে ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনা করা হবে । বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১); রচনা করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। নাটকটির সৃষ্টিই যেন সমকালের স্বাজাত্যবোধকে নির্দেশ করে। মধুসূদন দত্ত 'রিজিয়া' নামে একটি ঐতিহাসিক নাটক লেখার পরিকল্পনা করেছিলেন। সে সময়ের বিখ্যাত অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মধুসূদনকে রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে ঐতিহাসিক নাটক লেখার অনুরোধ করেন। যোগীন্দ্রনাথ বসু এবিষয়ে লিখেছেন;—

> "মধুসূদন ইহার পর সম্রাট আলটামাসের দুহিতা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর — একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশববাবুকে এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক

> সাধারণ হিন্দু দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া 'রিজিয়া' সম্বন্ধেও তাঁহারা কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। 'রিজিয়া'র পরিবর্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশববাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্যপূর্ণ যে, মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন।" (৭৬)

এখানে ইতিহাস অবলম্বনে নাটক লেখার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে। মধুসূদন নাটককে জনপ্রিয় করার জন্য স্বজাতীয় ইতিহাস অবলম্বনে 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ পরামর্শদাতার বিশ্বাস ছিল, বাঙালী দর্শকের নিকট রাজস্থানের গৌরবময় ইতিহাসের অভিনয় দর্শন অবশ্যই জনপ্রিয় হবে। কেননা সমকালের শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত ছিল। অতএব বলা যায়, স্বাজাত্যচেতনায় সমৃদ্ধ এই নাটক বাঙালীকে স্বাজাত্যবোধে জাগ্রত করবে।

মধুসূদন দত্ত তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে দেশানুরাগকে প্রকাশ করেছেন। আমরা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে স্বদেশের প্রতি সুগভীর অনুরাগ লক্ষ করব। ভারতবর্ষের সমকালীন দুরবস্থায় রাজা ভীমসিংহ মর্মাহত। তিনি স্বদেশের প্রাচীন গৌরব স্মরণ করে বলেন;—

> "ভগবতি, এ ভারতভূমির কি আর সে শ্রী আছে! এ দেশের পূর্বকালীন বৃত্তান্ত সকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোন মতেই এ বিশ্বাস হয় না! জগদীশ্বর যে আমাদের প্রতি কেন এত প্রতিকূল হলেন, তা বলতে পারি নে। হায়! হায়!...ভগবতি, আমরা কি আর এ আপদ হত্যে কখন অব্যাহতি পাবো? (৭৭)

এই বক্তব্য একজন অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের। এখানে স্বদেশের দুরবস্থার জন্য বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। তবে স্বদেশের মুক্তি যে আসন্ন; নাটকে সে কথাও বলা হয়েছে। তপস্বিনী বলেছেন;—"মহারাজ, ভারতভূমির এ অবস্থা কিছু চিরকাল থাকবে না। যে পুরুষোত্তম সাগরমগ্না বসুধাকে বরাহ রূপ ধরে উদ্ধার করেছিলেন, তিনি কি এ পূণ্যভূমিকে চিরবিস্মৃত হয়ে থাকবেন? " (৭৮) উল্লিখিত কথোপকথনে স্বদেশের প্রতি সুগভীর মমতা প্রকাশ পেয়েছে; যা উনিশ শতকের সচেতন বাঙালীকে প্রভাবিত করেছিল। এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন;—"মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ সুস্পষ্ট প্রকাশ কৃষ্ণকুমারী নাটকে। ভীমসিংহের খেদে আমরা সেকালের ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনের কথা শুনি।". (৭৯)

এই শ্রেণীর নাটক রচনায় আর যাঁরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁরা হলেন— জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ। আমরা উনিশ শতকের ঐতিহাসিক নাটকের আলোচনা করব। সে হিসাবে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক নাটকগুলির কথা বলতেই হবে। অন্য ভাবে বলা যায়, উনিশ শতকে একাধিক ঐতিহাসিক নাটক লিখে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ঐতিহাসিক নাটকের রচনাকাল বিংশ শতকের গোড়ায়। সময়ের হিসাবে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটকগুলি উনিশ শতকের রচনা নয়। সেজন্য এবার আমরা নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকগুলি আলোচনা করব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যকার হিসাবে স্বনামধন্য। তবুও তাঁর পরিবারের কথা বলতেই হয়। তিনি ঔপনিষদিক পরিবারের সদস্য। পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদ-উপনিষদের আদর্শে স্বদেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষায় ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তন করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহযোগিতায় স্বদেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে অক্ষয়কুমার দত্তের সম্পাদনায় তত্ত্ববোধিনী (১৮৪৩) পত্রিকা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন,—

> "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আমল হইতেই প্রকৃতপক্ষে স্বদেশীভাবের প্রচার আরম্ভ হয়। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উক্ত পত্রিকাতে ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী লিখিয়া লোকের মনে সর্বপ্রথম দেশানুরাগ উদ্দীপিত করিয়াছিলেন; তাহার পর রাজনারায়ণ বসু মহাশয় হিন্দুমেলার কল্পনা করিয়া এবং নবগোপাল মিত্র মহাশয় অনুষ্ঠানে তাহা পরিণত করিয়া এই স্বদেশীভাবের প্রবাহে সে সময়ে প্রচণ্ড একটা বলসঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। বলিতে গেলে পূর্বে আদিব্রাহ্মসমাজই তখন স্বদেশীয়ভাবের প্রধান কেন্দ্র ছিল।"[৮০]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, হিন্দুমেলা, সর্বোপরি ঠাকুর পরিবারের গঠনমূলক পরিবেশে মানুষ হওয়ায় অকৃত্রিম দেশানুরাগী হয়ে ওঠেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বীকার করেন;—

> "হিন্দুমেলার পর হইতে কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব-গাথা ও ভারতের গৌরবকাহিনী কীর্তন করিলে হয়তো কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কটকে থাকিতে থাকিতেই আমি "পুরু-বিক্রম" নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"[৮১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐতিহাসিক নাটকে বীরত্বগাথা ও ভারতের অতীত ঐতিহ্য বিষয়ে বক্তব্য বা প্রসঙ্গ দর্শক ও পাঠকের মনে দেশানুরাগ জাগাতে সমর্থ হয়েছে— সে বিষয়ে আলোচনা করব।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম ঐতিহাসিক নাটক 'পুরুবিক্রম' (৯ই জুলাই ১৮৭৪)। দিগ্বিজয়ী গ্রীকসম্রাট ভারতবর্ষে এসে পুরুর দ্বারা যথেষ্ট বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। শুধু বাধাপ্রাপ্তই নয়, পুরুর সাহস ও বীরত্বে স্বয়ং আলেকজাণ্ডার বিস্মিত ও মুগ্ধ। প্রাচীন ভারতের এরকম গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক কাহিনীকে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

'পুরুবিক্রম' নাটকটি বেশ জনপ্রিয় ছিল। আমাদের মনে হয়েছে এই জনপ্রিয়তার পিছনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল নাটকের কাহিনীর খোলসে নীতি ও উপদেশাবলী। নাটকটি পাঠ করলে কিংবা অভিনয় দেখলে মনে দেশানুরাগ সঞ্চারিত হবে। আমরা 'পুরুবিক্রম' নাটকটির নীতি উপদেশকে দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি। যথা; ১। দেশানুরাগের প্রতি নিষ্ঠা।

২। দেশসেবায় পরোক্ষে উৎসাহ।

'পুরুবিক্রম' নাটকে পুরু, ঐলবিলা, উদাসিনী গায়িকা প্রমুখ স্বদেশপ্রাণ চরিত্র। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে এঁদের নিষ্ঠার অভাব নেই। মাতৃভূমি বিদেশী শত্রু সেকন্দরশার দ্বারা আক্রান্ত। এ যেন জাতীয় কলঙ্ক। এই কলঙ্ক মোচনের জন্য ঐলবিলার উদ্যোগে সমস্ত রাজকুমার একত্র হয়েছেন। পুরুও সেই গোষ্ঠীতে আছেন। পুরু রাজকুমারী ঐলবিলাকে বলেছেন;—

> "আমি যদি দেশকেই উদ্ধার করতে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে? ...সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবনসৈন্যের সহিত সংগ্রাম করব। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু যবনেরা একথা যেন না বলতে পারে যে, তারা ভারতবাসীগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।"[৮২]

পুরু রাজদূত এফেস্টিয়নকে মনে করিয়ে দেন;—

> "যবনরাজ সেকন্দর শা কি উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন? তিনি কেন আমাদের দেশ আক্রমণ কল্লেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীর শান্তি বিরাজ করছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লেন? ...তাঁর এতদূর স্পর্ধা যে তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে সাহসী হলেন?"[৮৩]

—নাটকটির নায়ক পুরু। পুরুর জীবনাদর্শে সুগভীর দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তিনি স্বাধীনচেতা, বীর ও নির্ভীক। ক্ষত্রিয় জাতির কর্তব্য বিষয়ে সচেতন পুরু বলেন;—"লোককে কষ্ট হতে মুক্ত করবার জন্যই

ক্ষত্রিয় নামের সৃষ্টি, সেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত বিন্দুমাত্র বহমান থাকাতে কখনোই অত্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে পারবে না।" [৮৪] পুরু তক্ষশীলাকে উদ্দেশ্য করে আরো বলেন;—

> "লোকে সেকন্দর শাকে স্বর্গে তুলেছে, আমার ইচ্ছা যে আমি তাঁকে সেই উচ্চ স্থান হতে নীচে অবতরণ করাব। সেকন্দর শা মনে কচ্ছেন যে, যখন তিনি পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর কি ? তখন তো তিনি পূর্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত করতে পারবেন। কিন্তু কী ভ্রম ! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।" [৮৫]

শুধু বীরত্ব বা নির্ভীকতাই নয়, নাটকে পুরুর ধর্মবোধও সমান উজ্জ্বল। সেকন্দরশার সৈন্য তাঁকে অন্যায় যুদ্ধে আহত করলেও তিনি বলেন;—"যবনগণ অন্যায় যুদ্ধ করুক, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যেন কথার ব্যতিক্রম না ঘটে।" [৮৬] পুরু জানেন, অন্যায় যুদ্ধ তিনি করছেন না। তিনি দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছেন। তাছাড়া স্বদেশ রক্ষার যুদ্ধে ছলনার দ্বারা তুচ্ছ প্রাণ বাঁচাতে কোনরকম বীরত্ব বা ধর্ম নেই। সেজন্য পুরু উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন।

স্বদেশ রক্ষার জন্য ঐলাবিলা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। নাটকের প্রথমেই ঐলবিলা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য কৌশল অবলম্বন করেছেন। তিনি ঘোষণা করেন;—"যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, আমি তাঁরই পানিগ্রহণ করব।" [৮৭] আসলে বিদেশী শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে চাই একতা। এই একতার ক্ষেত্রে কোনরকম আপোষ হলে জাতীয় ক্ষতি। তাই প্রথমে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য। এই ঐক্য রক্ষার জন্য ঐলবিলা উপরোক্ত ঘোষণা করেন। অবশ্য ঐলবিলা পুরুরাজকে ভালবাসে, তার স্থির বিশ্বাস পুরুই শ্রেষ্ঠ বীর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাবে। ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে কোন ব্যাঘাত ঘটবে না, আবার পাশাপাশি জাতীয় ঐক্যও প্রতিষ্ঠা হবে। ঐলবিলার ভাষায়;—"আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমার আন্তরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত রাজকুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন।" [৮৮]

'পুরুবিক্রম'-এর উদাসীনা গায়িকা দেশানুরাগের এক আদর্শ চরিত্র। উদাসীনা গায়িকা জীবনের সব কিছু ত্যাগ করে দেশের সেবায় রত। গায়িকা বলেন;—"...আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি ; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি।" [৮৯] তিনি আরো বলেন;—"আমি 'হোক ভারতের জয়' এই গানটি দেশে-বিদেশে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।" [৯০] গায়িকা দেশসেবায় একনিষ্ঠ কর্মী।

'পুরুবিক্রম' নাটকে দুটি গান আছে। প্রথম গানটি উদাসিনী গায়িকার কণ্ঠের ও দ্বিতীয় গানটি পুরুর কণ্ঠের। এই গান দুটি যেন নাটকের প্রাণ কেন্দ্র। প্রথম গানটি গায়িকার কণ্ঠে গীত হলেও গানটির একটি অন্য ইতিহাস আছে। গানটির গীতিকার সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গানটি গীত হয় হিন্দুমেলায়। উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুমেলায় উপস্থিত শ্রোতার মনে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলা। গানটিতে প্রাচীন ঐতিহ্য, শৌর্য-বীর্যকথা ধ্বনিত হয়েছে। সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান আছে। দ্বিতীয় গানটিতে পুরু স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনীকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করতে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

এবার দেশসেবায় পরোক্ষ নীতি উপদেশের বিষয়ে আলোচনা করব। আমরা লক্ষ করলাম, গায়িকা প্রমুখ চরিত্রের দেশসেবার একনিষ্ঠতার কথা। পুরু বীরের সঙ্গে যুদ্ধ করে মাতৃভূমির সম্মান বর্দ্ধিত করেছেন। নাটকটির রচনাকালে বাঙালী বিদেশী শত্রুর হাতে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ। বহুদিন পূর্বে প্রাচীন যুগে সেকেন্দরশাহ বুঝেছিলেন ভারতবাসীও স্বাধীনতা প্রিয় জাতি। সমকালীন বাঙালী 'পুরুবিক্রমের' দ্বারা স্বদেশীয় বীর পুরুর বীরত্ব, সাহস ও স্বাধীনচেতা মনোভাবে বিস্মিত এবং মুগ্ধ হবে। এই মুগ্ধতা বা বিস্ময় সমকালের কলঙ্কময় জাতীয় জীবনে পরোক্ষ প্রেরণা বা উৎসাহ দেবে একথা বলাই বাহুল্য।

'সরোজিনী' (৩০শে নভেম্বর, ১৮৭৫) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাটক। এই নাটকটিতে আল্লাউদ্দিনের চিতোর আক্রমণের কাহিনী পাওয়া যায়। আমরা এই ঐতিহাসিক নাটকটিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশানুরাগ বিষয়ে আলোচনা করব। আমাদের প্রশ্ন— যদি নাট্যকার দেশানুরাগ প্রকাশ করে থাকেন,—তা পাঠক ও দর্শককে কতখানি অনুপ্রাণিত করে।

'সরোজিনী'-এর স্বাধীন শান্তিপ্রিয় চিতোরের পরাধীনতায় আবদ্ধ হওয়ার বিষাদপূর্ণ কাহিনী পাঠক ও দর্শকের মনে সহানুভূতি ও অনুশোচনা জাগায়। চিতোর জয় করা আলাউদ্দিনের পক্ষে সহজ নয়। কেননা রাজপুতবীর লক্ষ্মণসিংহ, রণধীর ও বিজয় সিংহ চিতোরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য একাত্ম হয়েছেন। আল্লাউদ্দিন এমতাবস্থায় ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। মহম্মদ ভৈরবাচার্যের ছদ্মবেশ নিয়ে রাজপুত বীরবৃন্দের মধ্যে মতান্তর সৃষ্টি করে। এবং চিতোরের সমস্ত সংবাদ বাদশা আল্লাউদ্দিনকে প্রেরণ করে। বাদশা আল্লাউদ্দিন রাজপুত বীরের অনৈক্যের সুযোগে চিতোর আক্রমণ করে। লক্ষ্মণ সিংহ, রণধীর, বিজয়সিংহ প্রমুখ বীরবৃন্দ অপ্রস্তুত অবস্থায় শত্রুর মোকাবিলা করতে গিয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এর পরের দৃশ্য আরো মর্মান্তিক। রাজপুত রমণী তাঁদের সতীত্ব রক্ষার জন্য ও লম্পট বাদশার লোলুপ দৃষ্টি এড়াবার জন্য চিতা সাজিয়ে স্বেচ্ছায় পতঙ্গের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। এ এক মর্মান্তিক পরিণতি।

নাটকের শেষে রামদাসের গানে ভারতের পরাধীনতার বিয়োগান্তক পরিণতিই বড় হয়ে উঠেছে। চিতোরের সর্বত্র চিতা জ্বলছে, ধূম উঠছে, কোন সাড়াশব্দ নেই, বিজয় পতাকা ধূলিলুণ্ঠিত, মাতৃভূমি স্বাধীনতাহীন। এমতাবস্থায় রামদাস ভেবেছে;—

"তবে আর কেন মিছে এ জীবন করিব বহন;
হয়ে পদানত, দাস- ব্রতে রত,
কি সুখে বাঁচিব বল—মরণই জীবন।" (৯১)

—মাতৃভূমি পরাধীনা; অতএব দাসবৃত্তির কলঙ্কিত জীবনের চেয়ে রামদাসের কাছে মৃত্যুই শ্রেষ্ঠ। রামদাসের এই মনোভাবে যেন একটি স্বাধীনচেতা জাতির মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এ পরাধীনতা, সাধারণ পরাধীনতা নয়। দর্শক ও পাঠকের মনেও সুগভীর বেদনা ধ্বনিত হয় ও স্বাধীনতার অমূল্য সম্পদের প্রতি মন আকৃষ্ট হয়।

এ দিকে রাজপুত রমণীবৃন্দ ততক্ষণ জীবিত ছিলেন, যতক্ষণ দেশের স্বাধীনতা ছিল। মাতৃভূমির পরাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রমণী চিতা জ্বালিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। এ সাধারণ আত্মহত্যা নয়। নারীর অমূল্য সম্পদ সতীত্ব রক্ষা করতে আত্মহত্যা। তাঁরা জানেন, সম্রাট বাদশার লেলিহান লোভানলের থেকে, শত্রুর কাছে দাসীবৃত্তি করার চেয়ে প্রাণ ত্যাগ করাই শ্রেষ্ঠ। সেজন্য সমস্ত রাজপুত মহিলা সমস্বরে বলেন;—

"জ্বল, জ্বল, চিতা! দ্বিগুণ, দ্বিগুণ,
অনলে আহুতি দিব এ প্রাণ।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন,
পশিব চিতায় রাখিতে মান।
দেখ্ রে যবন, দেখ্ রে তোরা!
কেমনে এড়াই কলঙ্ক -ফাঁসি,
জ্বলন্ত- অনলে হইব ছাই,
তবু না হইব তোদের দাসী।" (৯২)

—এখানে ভারতীয় নারীর বড় অপমান সতীত্ব নাশ ও দেশের কলঙ্ক দাসীবৃত্তিকে রাজপুত মহিলারা উপেক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত বাদশা আল্লাউদ্দিন বলতে বাধ্য হয়েছে;—"আশ্চর্য! আশ্চর্য! ধন্য হিন্দুমহিলাদের সতীত্ব! হায়! এত কষ্ট করে যে জয়লাভ কল্লেম তা সকলই নিষ্ফল হল।"(৯৩) ভারতীয় নারীর সতীত্ব বা দেহ ও মনের পবিত্রতাটি স্বয়ং বাদশা পর্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন।

'সরোজিনী' নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। রাজা লক্ষ্মণসিংহ একাধারে পিতা ও রাজা। একদিকে সন্তানের জীবন রক্ষা অন্যদিকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা,—এই দুই-এর দ্বন্দ্বে লক্ষ্মণ সিংহ ক্ষতবিক্ষত। তিনি বোঝেন — দেশ রক্ষার মতো বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়া উচিত। কিন্তু তিনি সক্রিয়ভাবে কিছুই করতে পারেন নি। লক্ষ্মণ সিংহের এই দ্বন্দ্ব নাটকটিকে সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছে। তবুও বলা যায়, লক্ষ্মণসিংহ দেশহিতৈষী। কেননা, তাঁর মন যদি ব্যক্তিস্বার্থকে বজায় রাখতে চাইত, তাহলে দেশের স্বার্থকে সহজেই জলাঞ্জলি দিতেন। তাছাড়া লক্ষ্মণসিংহ তখন বিভ্রান্ত। তাঁকে যেভাবে চালিত করা হত তিনি সেভাবেই চলতেন। দেশের প্রতি সুগভীর অনুরাগ ছিল বলেই তিনি স্বাভাবিক থাকতে পারেন নি।

রণধীর সিংহ লক্ষ্মণসিংহের সেনাপতি। আল্লাউদ্দিনের আসন্ন আক্রমণ থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য নিয়ত চিন্তাশীল। দৈববাণীকে বিশ্বাস করে দেবীকে তুষ্ট করতে তিনি ফুলের মত সরোজিনীকে বলি দিয়ে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রাজাকে উৎসাহিত করেছিলেন। রাজা লক্ষ্মণসিংহ কন্যাস্নেহে কাতর হলে রণধীর বলেছেন;—"আমি মানলেম যে, সন্তানের জীবন রক্ষা করা পিতার কর্তব্য। কিন্তু আমি আবার আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি বলুন দেখি, প্রজার প্রতি রাজার কি কর্তব্য ?" (৯৪) রণধীরের কাছে সন্তানের চেয়ে দেশ বড়। অবশ্য দৈববাণী মিথ্যা—পরবর্তীকালে একথা জেনে রণধীর আক্ষেপ করেছেন;—"আমি যে গণনায় ধ্রুব বিশ্বাস করে কেবল স্বদেশের মঙ্গলকামনায় ও কর্তব্যবোধে এতদূর পর্যন্ত করেছিলেম," (৯৫) —এখানে রণধীর চরিত্রে দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে।

বিজয় সিংহ সাহসী ও বীর। দৈবানুগ্রহের চেয়ে বাস্তব কর্মের প্রতি তাঁর আগ্রহ। বিজয়সিংহ বীরের মতো নিজের উপর আস্থা রেখে বলেছেন;—

> "মহারাজ! সর্বদাই দৈবের মুখাপেক্ষো করে থাকলে মনুষ্য দ্বারা কোন মহৎ কার্যই সিদ্ধ হয় না। ...মাতৃভূমির বাক্যই আমাদের একমাত্র দৈববাণী। দেবতারা আমাদের জীবনের একমাত্র হর্তা-কর্তা সত্য, কিন্তু মহারাজ! কীর্তিলাভ আমাদের নিজেদের চেষ্টার উপরেই নির্ভর করে। ...ভৈরবাচার্যের দৈববাণী যাই হউক — না মহারাজ, আমি তাতে কিছুমাত্র ভীত নই।" (৯৬)

এইসব বক্তব্যে বিজয় সিংহ যে নিজের উপর আস্থাবান, তা জানা যায়। বিজয় সিংহ বীর, সাহসী ও নিজের উপর আস্থাবান, সঙ্গে অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক। তাঁর ভাষায়;—"মহারাজ! পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে ? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" (৯৭)

নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র সরোজিনী। মিথ্যা দৈববাণীর জন্য তার জীবন সংকটাপন্ন। লক্ষ্মণসিংহ কন্যাস্নেহে দৈববাণী পালনে সংকুচিত। সরোজিনী পিতার এরূপ অবস্থায় বলে ;—"পিতঃ! আমার জন্যে আপনি কেন তিরস্কারের ভাগী হচ্ছেন ? যদি আমার এই ছার জীবনের বিনিময়ে শত শত কুলবধূ অস্পৃশ্য অপবিত্র যবন-হস্ত হতে নিস্তার পায় তা হলেই আমার এই জীবন সার্থক হবে।[৯৮] কিংবা সরোজিনী আরো বলেছে;—

> "পিতঃ! আপনি কেন আমার জন্যে অপমানের ভাগী হচ্ছেন ? আমার জন্য আপনি কিছু ভাববেন না। এ কথা যেন কেউ না বলতে পারে যে, আমার পিতার জন্যে দেশ দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ হল; বাপ্পা রাওর বিশুদ্ধ বংশ কলঙ্কিত হল;"[৯৯]

সরোজিনীর উল্লিখিত মন্তব্যে প্রাণ রক্ষার মতো সামান্য স্বার্থের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ স্বাধীনতা রক্ষা, বংশমর্যাদা প্রভৃতি বড় হয়ে উঠেছে।

'অশ্রুমতী' (৪ঠা নভেম্বর ১৮৭৯) মহারাণা প্রতাপসিংহের স্বাধীনতা রক্ষার নাটক। স্বাধীনতা নামক রত্নটি হাজারো প্রতিকূল-পরিস্থিতিতে যে হারানোর নয়, জীবনের সবকিছুর বিনিময়ে তাকে আগলে রাখতে হয়, তা প্রতাপসিংহের ক্রিয়াকলাপে স্পষ্ট। মহারাণা চিতোরের পরাধীনতার জন্য গভীরভাবে ব্যথিত। তাঁর ভাষায়;—"সে চিতোর এখন বিধবা—স্বাধীনতার জন্মভূমি—বীরের জননী—সেই চিতোর এখন বিধবা!"[১০০] —এখানে মহারাণা স্বাধীনতাকে চিতোরের পতি বা স্বামী বলে মনে করেন। তিনি রাজপুতদের উদ্দেশ্যে বলেন;—

> "রাজপুতগণ, তরবাল হস্তে এসো আমরা সকলে শপথ করি—যতদিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে পারি—ততদিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাস—সামগ্রী ব্যবহার করব না—রজত ও কাঞ্চন পাত্র—সকল দূরে নিক্ষেপ করে তার পরিবর্তে বৃক্ষপত্র ব্যবহার করব—আমাদের শ্মশ্রুতে আর ক্ষুরস্পর্শ করব না—আর শুষ্ক তৃণশয্যায় আমরা শয়ন করব।"[১০১]

—ভোগ বিলাসে মগ্ন থাকলে জাতির পরাধীনতার কলঙ্ক ঘোচানো সম্ভব নয়; তাছাড়া এই ভোগবিলাসই সমস্ত অমঙ্গলের মূল। প্রতাপসিংহ বলেন;-"বিশেষত বিলাসই আমাদের সর্বনাশের মূল—বিলাসেই আমরা উৎসন্নে যাই—বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই উচিত।"[১০২] প্রতাপ সিংহের এজাতীয় মূল্যায়ন যথেষ্ট যুক্তিসম্মত। বিলাসবহুল জীবনাচরণ সুগভীর ভাবনা বা সৃষ্টিশীল মনোভাবের পরিপন্থী। মহারাণার কাছে স্বাধীনতা ভিন্ন সবই মিথ্যা। তিনি স্ত্রীকে বলেন;—"...মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র, অলংকার ধন ধান্যকেই লক্ষ্মী বলে জ্ঞান কর—কিন্তু তোমরা জান না স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ—স্বাধীনতাই—"[১০৩]

স্বদেশীয়দের মধ্যে যাঁরা স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে শত্রুর দাসত্বকে মেনে নিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে প্রতাপ সম্পর্ক রাখেন না। সেজন্য প্রতাপসিংহ মুঘলের অধীন মানসিংহকে স্বজাতীয় বীর বলে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারেন নি। প্রতাপসিংহ সদর্পে বলেন;—"...যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, যে বোধ হয় এমন— কি তুর্কের সহিত একত্র ভোজন করেছে, তাঁর সহিত সূর্যবংশীয় রাণা একত্র কখনোই আহার-স্থানে উপবেশন করতে পারে না।" (১০৪) মানসিংহ বোঝানোর চেষ্টা করেন মুঘলের বিরোধিতা করার অর্থ চরম ক্ষতিকে ডেকে আনা। প্রতাপসিংহ তার উত্তরে বলেন;—

> "দেখুন মহারাজ মানসিংহ, আমি বরঞ্চ পর্বতে পর্বতে, বনে বনে, অনাহারে ভ্রমণ করে বেড়াব, সকল প্রকার বিপদকে অসংকোচে আলিঙ্গন করব, অদৃষ্টের সকল অত্যাচারই অনায়াসে অক্লেশে সহ্য করব, তথাপি তুর্কের দাসত্ব কখনোই স্বীকার করব না।" (১০৫)

স্বাধীনতাপ্রিয় প্রতাপসিংহ শুধু কথায় নয়, সর্বস্বহারা হয়েও পরাধীন হতে চান নি। এমন কি মৃত্যুশয্যায় এই একটি মাত্র চিন্তা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। মন্ত্রীর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন;—"আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনোই সমর্পিত হবে না—এই আশ্বাসবাক্য তোমাদের মুখে শোনবার জন্যই আমার অন্তরাত্মা দেহ হতে এখনও বেরোতে বিলম্ব কচ্ছে।" (১০৬)

মধ্যযুগের ইতিহাসে স্বদেশীয় রাজার মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার কঠোর সংগ্রাম নাটকটিকে স্বাধীনতা সংগ্রাম মূলক নাটকের মর্যাদা এনে দিতে পারে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

তবুও উনিশ শতকে রচিত এই নাটকটি সম্বন্ধে সমালোচনার সংবাদ পাওয়া যায়। নাট্যকাহিনীতে আছে প্রতাপসিংহের কন্যা অশ্রুমতী বাদশা-পুত্র সেলিমকে ভালোবেসেছিল। সেলিমকে নিয়ে অশ্রুমতী ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখেছিল। যে প্রতাপসিংহ মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণকারী মুঘলকে চরম শত্রু মনে করতেন, এমনকি মুঘলের নিকট যাঁরা দাসত্ব স্বীকার করেছে তাঁদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, সেই মুঘলবাদশাপুত্র সেলিমকে তাঁরই কন্যা অশ্রুমতী ভালোবেসেছে। এই সম্পর্ক প্রতাপসিংহের নিকট ঘৃণ্য হওয়াই স্বাভাবিক। অনেক দর্শক ও পাঠকের নিকট বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর। অবশ্য নাট্যকার এর উত্তরে বলেন;—

> "কেহ কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, রাণা প্রতাপসিংহের অশ্রুমতী নাম্নী কোন কন্যা ছিল কি না এবং অশ্রুমতী ও সেলিমের মধ্যে বাস্তবিকই কোন প্রেমের ব্যাপার ঘটিয়াছিল কি না। ইহার উত্তরে আমার নিবেদন —

রাণা প্রতাপসিংহের একটি কন্যা আরাবল্লি পর্ব্বতের অভ্যন্তরস্থ এক টিন খণির মধ্যে হারাইয়া যায় এবং তত্রত্য ভীলগণ কর্ত্তৃক পরিবর্দ্ধিত ও প্রতিপালিত হয়। এইটুকুই ইহার ঐতিহাসিক কিম্বা কিংবদন্তীমূলক ভিত্তি। বাকী সমস্তই কপোলকল্পিত।" (১০৭)

— আসলে আমরা যদি 'অশ্রুমতী'কে একটি সাহিত্য গ্রন্থ হিসাবে দেখি, তাহলে সেলিম-অশ্রুমতীর প্রেমের চিত্রে কোন অসঙ্গতি পাওয়া যাবে না। কারণ অশ্রুমতী চরিত্রহীনা নয়, সে জানে না মুসলমান হিন্দুর স্বাধীনতা হরণকারী শত্রু। সেই হিসাবে নাটকটি সাহিত্যের বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। তাছাড়া সেলিম-অশ্রুমতী প্রেমে কোনরকম লালসা এসে অপবিত্র করেনি। তবুও এই সংবাদ প্রতাপসিংহের কাছে কলঙ্কের নামান্তর। সেজন্য তিনি অশ্রুমতীকে উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন;—"অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনীব্রতে দীক্ষিত করো—চিরকুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক—মনেও যদি কোনো কলঙ্ক স্পর্শ হয়ে থাকে, তাও অপনীত হবে" (১০৮)

বলা যায় 'অশ্রুমতী' পাঠক ও দর্শককে একাধারে দেশানুরাগী হওয়ার প্রেরণা দান ও সাহিত্যরস দানের একটি বিখ্যাত নাটক।

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর একটি ঐতিহাসিক নাটক 'স্বপ্নময়ী' (২৪শে মার্চ, ১৮৮২)। নাটকটিতে শুভসিংহের বিদ্রোহের কাহিনী আছে। এই বিদ্রোহ হল মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভের জন্য বিদ্রোহ। যদিও নাটকে শুভসিংহের বিদ্রোহে ছলনা বা কৌশলের পরিচয় আছে। শুভসিংহ ছদ্মবেশে, মিথ্যার আশ্রয়ে, মানুষকে ভুলপথে চালিত করে দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। সুরজ শুভসিংহকে বলেন;—

> "—প্রতারণাটা যে বড়ো ভালো কাজ তা আমি বলছি নে—কিন্তু এ ভিন্ন যখন আর—কোনো উপায় নেই, তখন কি করবেন বলুন— মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কখনো কখনো হীন উপায়ও অবলম্বন করতে হয়—তা না করলে চলে কই ?" (১০৯)

শুভসিংহ প্রতারণা করতে গিয়ে বিবেক দংশনগ্রস্ত হতেন। সমস্ত প্রতারণার কথা প্রকাশ করতে চাইতেন; কিন্তু তাতে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এই ভয়ে ও বিশ্বাসে পুনরায় প্রতারণার আশ্রয় নিতেন। তাঁর ভাষায়;—"মা, তোমার শতকোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে ? আমি আপনার অবমাননা করে তোমাকে অবমাননার হাত হতে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপনাকে হীন করে তোমাকে যদি হীনতা হতে উদ্ধার করতে পারি, তবে আমি কেন তা না করব ?" (১১০)(পৃঃ ১৮৩, স্বপ্নময়ী, ঐ)

ছদ্মবেশী শুভসিংহ স্বপ্নময়ীকে দেশজননীর পরাধীনতার যন্ত্রণার কথা বলেন। —যা একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের কথা। তিনি স্বপ্নময়ীকে বোঝাতে চান দেশজননীই হল প্রকৃত জননী। তাঁর ভাষায়;—

"অযুত ভারতবাসী মোর ভাই বোন

একমাত্র মাতৃভূমি মোর পিতামাতা।" (১১১)

জন্মভূমি পরাধীন, অপমানিত ও নিঃস্ব । একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকের নিকট এটা একাধারে লজ্জা ও অপমান। নাটকে স্বদেশের দুরবস্থার বিষয়ে বলা হয়েছে ;—

"...দেবমন্দির সকল

চূর্ণ চূর্ণ করিতেছে ম্লেচ্ছ পদাঘাতে

বেদ মন্ত্র ধর্ম কর্ম করিতেছে লোপ—

গো হত্যা নির্ভয়ে করে রাজপথ মাঝে—

অপমান নয় ? অপমান বলে কারে?" (১১২)

শুভসিংহের এইসব বক্তব্য এক অকৃত্রিম দেশপ্রেমিকের মনের কথা। যদিও শুভসিংহ দেশমাতৃকাকে মুক্ত করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর অন্তরের দেশানুরাগের আবেদন দর্শক ও পাঠকের মনকে অনুপ্রাণিত করে ।

উনিশ শতকে জাতীয়তাবাদের প্রেরণায় রচিত আর্থ-রাজনৈতিক চেতনা সমৃদ্ধ একাধিক নাটক রচিত হয়েছিল। এখানে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) ও উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' (১৮৭১) এবং 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' (১৮৭৫) নাটকের আলোচনা করা হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক শোষণের এক বাস্তব চিত্র দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। নীলকর সাহেবের শোষণের মাত্রা এমন জায়গায় পৌঁছে যায় যে, গ্রামের কৃষকের জীবনধারণ দুর্বিষহ হয়ে দাঁড়ায়। নীলকর সাহেবের অত্যাচারে ধন-সম্পত্তি, ভিটে-মাটি এমনকি পল্লীবাংলার অন্তঃপুরের নারীর সম্মান রক্ষা বিপন্ন হয়ে পড়ে। এবিষয়ে 'সংবাদ-সাময়িক পত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ'-গ্রন্থে অধ্যাপক স্বপন বসু বিবিধার্থ সংগ্রহে 'নীলদর্পণ'-এর সমালোচনার উল্লেখ করেন। যথা;—

> "নীলদর্পণ নাটক। এই নাটক ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে রামচন্দ ভৌমিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কি প্রকারে নীলকরগণ পাষাণহৃদয়ে প্রজাবর্গের সর্ব্বস্বাপহরণ করেন; কিরূপে প্রজার চতুর্দ্দশ পুরুষাধিকৃত ভদ্রাসনে নীলাহল কর্ষিত হয়; কিরূপে পিতা-মাতার একমাত্র আশাস্বরূপ, পতিপ্রাণা কামিনীর সংসার উদ্যানের অনুত্তম সুবর্ণ পুষ্পস্বরূপ, অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণ্যখনির একমাত্র দীপশিখাস্বরূপ কত নবীন যুবক, নীলকরের বিষম নৃশংস অত্যাচারে নিপীড়িত হইয়া অসময়ে আত্মবিনাশে সুস্থ হইয়াছে, কিপ্রকারে কত অচতুরা

গৃহস্থবালা নীলকরহস্তে সতীত্বস্বরূপ বিমল সুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে; কিপ্রকারে নীলকরগণ অম্লানবদনে আবালবৃদ্ধবনিতা পরিপূর্ণ গ্রামে অগ্নি প্রদান করিয়া থাকেন; নীলকরদিগের কর্ম্মচারীরা কেমন ভদ্রলোক ও নীল কৃষিকার্য্যে বঙ্গদেশে কত অনিষ্ট উৎপন্ন হইতেছে; সর্ব্বসাধারণকে তাহা সম্যকরূপে বিদিত করাই নীলদর্পণের উদ্দেশ্য।" (১১৩)

দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে নীলকরের অত্যাচারে বিপন্ন দেশীয় মানুষের কথা বলেছেন। নাটকের সূচনায় নীলকরের অমানবিক অত্যাচারের প্রসঙ্গে প্রতিবেশী সাধুচরণ গোলকনাথ বসুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে;— "আমি তখনি বলেছিলাম, কর্ত্তা মহাশয়, আর এদেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙালের কথা বাসি হলে খাটে।" (১১৪)

'নীলদর্পণ' বিশেষ উদ্দেশ্যে রচিত। দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এর ভূমিকায় সে উদ্দেশ্যের কথা অকপটে স্বীকার করেন। নাট্যকারের ভাষায়;—

"নীলকরনিকরকরে নীল-দর্পণ অর্পণ করিলাম। এক্ষণে তাঁহারা নিজ২ মুখ সন্দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা।"(১১৫)

দীনবন্ধু মিত্র চেয়েছিলেন, এদেশের অসহায় কৃষক সমাজের মুক্তি। সেজন্য তিনি নীলকরের অত্যাচারকে 'নীলদর্পণ' নাটকে কাহিনী করেছেন। সে কাহিনীকে তিনি দর্পণ বলতে চেয়েছেন। দর্পণ যেমন মূলের ছবি তেমনি নীলকরের অমানবিকতার দর্পণ 'নীলদর্পণ'। অর্থাৎ এদেশের নীলকর ও নীলচাষীর বাস্তব চিত্র 'নীলদর্পণ'। এই 'নীলদর্পণ'-এ নীলকরের অমানবিক স্বার্থপরতার চিত্র ধরা পড়েছে। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র আশা করেছেন, নীলকর তাদের অমানবিক চরিত্র দর্শন করে দেশীয় কৃষকের প্রতি অত্যাচার বন্ধ করে। সেজন্য তিনি নাটকের 'ভূমিকা'য় উল্লেখ করতে ভোলেন নি যে—তাহলে 'নীলদর্পণ' নাটক রচনার পরিশ্রম সার্থক হবে। এতে দীনবন্ধু মিত্রের অকৃত্রিম স্বদেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

উপেন্দ্রনাথ দাস ওরফে দুর্গাদাস দাস (১২৫৫-১৩০২) বাংলা নাট্যসাহিত্যে এক স্মরণীয় ব্যক্তি। উপেন্দ্রনাথ দাস বলতেই মনে পড়ে 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর (১৮৭৬) কথা। নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তিত হয় সরকার বিরোধী নাট্য রচনা নিয়ন্ত্রণের জন্য। তাহলে আমাদের মনে হতে পারে, উপেন্দ্রনাথ সরকার বিরোধী বা রাজনৈতিক নাটক লিখেছেন। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে সে অর্থে রাজনৈতিক নাটক বলা যাবে না। এপ্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন;—

"পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় আলোকপ্রাপ্ত নরনারী-সমাজ লইয়া তিনি নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন, সেজন্য একটা স্বতন্ত্র, সংস্কারমুক্ত মনোভাব তাহাদের মধ্যে দেখা গেলেও মাঝে মাঝে তাহাদিগকে যে একটু আড়ষ্ট ও অসামাজিক বোধ হয় তাহাও সত্য। শিক্ষিত যুবক-যুবতীর মধ্যে যে তৎকালে ইংরাজবিদ্বেষী ও স্বদেশহিতৈষী স্বদেশগর্বী ভাব জাগ্রত হইয়াছিল নাট্যকার নাটকে তাহার অবতারণা করিলেন।...'শরৎ সরোজিনী'র কথাই ধরা যাক। এক ইংরাজ সার্জনের সঙ্গে লড়াই করিয়া শরৎ যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় হয়তো দিয়াছে, অথবা কয়েকটি গোরা ডাকাতকে নিপাত করিয়াছে, কিন্তু সেই জন্যই এই কর্মগুলিকে উচ্চধরণের জাতীয়তার অঙ্গ বলা যায় না। সমগ্র নাটকের মধ্যে কোথাও জাতীয় ভাবের অনুকূল পরিবেশ নাই, সেজন্য মাঝে মাঝে তরল জাতীয়তার বহ্বাস্ফোট থাকিলেও ইহাকে জাতীয় ভাবোদ্দীপিত নাটক বলা চলে না।" (১১৬)

তবে নাটকে জাত্যাভিমানী ইংরেজ চরিত্রের যে রূপ চিত্রিত হয়েছে—তা স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিকে আহত করে। 'শরৎ সরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের একাধিক স্থানে জাত্যাভিমানী ইংরেজ চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এবিষয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে সুকুমার সেন 'শরৎ সরোজিনী'র কাহিনী বলতে গিয়ে লিখেছেন;—

"...মতিলাল ডাকাত পাঠাইয়া সুকুমারীকে অপহরণ করিতে চেষ্টা করিল। দুইটা পিস্তল লইয়া শরৎ দেশি ডাকাতদের হঠাইয়া দিল এবং একজন গোরা ডাকাতকে মারিয়া ফেলিল। দ্বিতীয় গোরা শরৎকে কাবু করিলে পর সরোজিনী শরতের হস্তভ্রষ্ট পিস্তল কুড়াইয়া লইল এবং "আর আমি থাকতে পারি নে। আমি স্ত্রীলোক, কিন্তু অনাথের নাথ আমার সহায়! ইংরাজরাক্ষসের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার এ ভিন্ন উপায় নাই", বলিয়া "উল্লিখিত ক্ষুদ্র পিস্তলদ্বারা গুলি করিয়া দ্বিতীয় গোরাকে শমনসদনে প্রেরণ" করিল।" (১১৭)

অনুরূপ বিষয় 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকেও রয়েছে। 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' নাটকের অন্যতম চরিত্র ম্যাজিস্ট্রেট ম্যাক্রেণ্ডেল। ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেবের মনোভাব শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিকে আহত করে। এদেশ যে পরাধীন সে কথা ম্যাক্রেণ্ডেলের মতো জাত্যাভিমানী বিদেশী সাহেব পরোক্ষে মনে করিয়ে দেয়। ম্যাক্রেণ্ডেল সুরেন্দ্রকে বলেছিল;—

"নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমার দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।" (১১৮)

সেকালে সাহেবকে দেখে সম্মান প্রদর্শন করা একটি রীতি ছিল। সুরেন্দ্র ম্যাক্রেণ্ডেল সাহেবকে দেখলেও সৌজন্যমূলক সম্মান জানায় নি। তাতে সাহেব রেগে গিয়ে কৃষ্ণদাসকে বলেছিল;—

"এ সকল সাধারণ উদ্যানে অর্ধসভ্য বাঙ্গালীদিগের প্রবেশ নিষেধের নিমিত্ত একটা বিশেষ রাজনিয়ম বিধিবদ্ধ হওয়া অতি আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। —আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি, উচ্চশিক্ষা বঙ্গ হইতে নির্বাসিত না হইলে, এই সমস্ত অশিষ্টাচারের মূলে কখন কুঠারাঘাত হইবে না।" (১১৯)

বলাবাহুল্য, 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী' ও 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের উল্লিখিত বক্তব্য যে কোন স্বদেশ প্রাণ ব্যক্তির মনে বিজাতীয় ঘৃণা জাগিয়ে তুলবে।

নিজস্ব নাটকের সন্ধানে বাঙালী ঃ

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের একাধিক নতুন প্রকরণের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছিল । উপন্যাস ছোটগল্প, প্রবন্ধ-নিবন্ধের মতো বাংলা নাটকও উনিশ শতকেই রচিত হয় । শুধু নাটকই নয় উনিশ শতকেই বাঙালী সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা নাটক রচনা করার এক সফল উদ্যোগ চোখে পড়ে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে হেরাসিম স্তেফানভিচ্ লেবেডেফ নামক জনৈক রুশ দেশীয় ব্যক্তি 'কাল্পনিকসংবদল' (১৭৯৫) নামক একটি অনুবাদমূলক নাটকের অভিনয় করান। এরপর দীর্ঘদিন বাংলায় নাটক রচনা বা অনুবাদ ও অভিনয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক পরে প্রসন্নকুমার ঠাকুর নাটক অভিনয়ের জন্য হিন্দু থিয়েটার (১৮৩১) নামে একটি রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা করেন। কয়েক বছর পরে নবীন বসু তাঁর বাড়িতে বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় (১৮৩৫) করান। এরপর উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যে নাটক রচনার জোয়ার আসে । জি. সি. গুপ্ত , তারাচরণ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, উমেশচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখ নাট্যকার বাংলা নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দেন । ট্র্যাজিক রস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল চরিত্র, নাটকের মূল ধর্ম দ্বন্দ্বময়তা, আর্থ-সামাজিক -ঐতিহাসিক ঘটনার মতো অভিনব দিকগুলি বাংলা নাট্য সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল । কিন্তু এতসব সমৃদ্ধি আসার পরেও যেন বাংলা নাটক সম্পূর্ণরূপে বাঙালীর নাটক হয় নি । এখন প্রশ্ন হতে পারে,—উল্লিখিত নাট্যকারের রচনায় এমন কিসের অভাব ছিল যাতে বাঙালী-আত্মার সুর ধ্বনিত হয় নি ? এর উত্তর হল, খাঁটি বাঙ্গালিয়ানার অভাব। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার প্রয়োজন অনুভব করে বলেছিলেন;—

"প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘণ্টে অতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন । সামগ্রীটা কি এ ? বহুকষ্টে পিসীমা তাঁহাকে সামগ্রীটা বুঝাইয়া দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ "কেলা

কা ফুল" রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া যায় যে, এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া কেলা কা ফুল বলিতে শিখিয়াছি।...আর যেই কেলা কা ফুল বলুক, ঈশ্বর গুপ্ত মোচা বলেন।"(১২০)

—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী হিসাবে খাঁটি বাংলা কথা শুনতে চেয়েছেন, —যা একান্ত বাঙালীর নিজস্ব। বাঙালীর এই নিজস্বতা ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন;—

> "একদিন বর্ষাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বসিয়াছিলাম।...মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনে তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস্ ভবভূতিও অনেক দূরে।
>
> মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র কাহাতেও তৃপ্তি হইল না। চুপ করিয়া রহিলাম। এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহিতে বাহিতে গায়িতেছে—
>
> "সাধো আছে মা মনে।
> দুর্গা ব'লে প্রাণ ত্যজিব,
> জাহ্নবী- জীবনে।"
>
> তখন প্রাণ জুড়াইল— মনের সুর মিলিল—বাঙ্গালা ভাষায়—বাঙ্গালীর মনের আশা শুনিতে পাইলাম—এ জাহ্নবি - জীবন দুর্গা বলিয়া প্রাণ ত্যজিবারই বটে, তাহা বুঝিলাম। তখন সেই শোভাময়ী জাহ্নবি, সেই সৌন্দর্য্যময় জগৎ, সকলই আপনার বলিয়া বোধ হইল — এতক্ষণ পরের বলিয়া বোধ হইতেছিল।.
>
> সেইরূপ, আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়— হৌক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের— আমাদের নহে।"(১২১)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো অনন্যসাধারণ ব্যক্তির নিকট জানা গেল— ইংরেজী কিংবা সংস্কৃত ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালীর ভাষা-সংস্কৃতির মিল নেই। এমন কি মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ বাঙালী কবির কবিতাতেও তিনি খাঁটি বাঙালিয়ানা খুঁজে পান নি। আর সে জন্য শিক্ষিত বাঙালী কবির কবিতা তাঁকে তৃপ্তি দেয় নি। তৃপ্তি দিয়েছিল নদীবক্ষে জনৈক বাঙালী জেলের গান। এই গানটি কিন্তু কারো সংস্কৃতির সঙ্গে মিল নেই। এ গান—একান্ত বাঙালীর নিজের গান। বাঙালীর নিজস্ব গানই বঙ্কিমকে শান্তি দিয়েছিল। আমাদের বাংলা নাটক সম্বন্ধে একই কথা বলতে পারি। জি. সি. গুপ্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকারের রচিত নাটকে খাঁটি বাঙালিয়ানা খঁজে পাওয়া

মুসকিল। এঁদের রচনায় কখনো পাশ্চাত্যের অনুকরণ, কখনো সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণ। বাঙালীর নিজস্বতা পুরোপুরি পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ অভাব বলতে খাঁটি বাঙালী মনস্কতার অভাবকে নির্দেশ করা হয়েছে। আমরা লক্ষ করব, উনিশ শতকেই বাংলা নাট্য সাহিত্যের উক্ত খাঁটি বাঙালিয়ানার অভাব পুরণে অনেক নাট্যকার এগিয়ে এসেছেন। এখানে নাট্যসাহিত্যের সেই খাঁটি বাঙালিয়ানার অনুসন্ধান করা হবে ।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যময় সংস্কৃতির দ্বারা শিক্ষিত ও সচেতন বাঙালী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন । এ প্রসঙ্গে রাজা রামমোহন রায় থেকে শুরু করে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীর কথা বলা যায় । ভারতবাসী হলেও বহুদিন ধরে ভারতীয় সংস্কৃতিকে সংশোধন ও সংযোজন করে বাঙালী নিজের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে । যেমন বাল্মীকির রামকে বাঙালী কবি কৃত্তিবাস সংশোধন ও সংযোজন করে বাঙালীর রাম করে নিয়েছেন । ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "মূল রামায়ণের বীর রামচরিত্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভক্তের ভগবানে পরিণত হয়েছেন, ক্ষত্রিয়বধূ সীতা হয়েছেন সর্বংসহা বাঙালী কুলবধূ, হনুমানের রঙ্গরস প্রভৃতিও বাঙালী সংস্কৃতিরই পরিচায়ক । এক কথায় কৃত্তিবাস মূল রামায়ণকে অনেকটা বাঙালীর মনঃপ্রকৃতির অনুকূলে সাজিয়েছেন—তাই তাঁর গ্রন্থ বাঙালীর জীবনে এত গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে ।" [১২২]

অর্থাৎ ভারতীয় সংস্কৃতিকে বাঙালী একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজের করে নিয়েছে। আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী সংস্কৃতির তো কোন মিলই নেই। বাংলা নাটক রচনার প্রথম দিকে, বাঙালীর নিজস্ব নাটকের অভাব হেতু পৃথিবীর দুই সমৃদ্ধ সাহিত্য সংস্কৃত ও ইংরেজী নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক অনুবাদিত ও রচিত হয়েছে। এই সময়ের বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডির আদর্শ, পঞ্চমাঙ্ক, গর্ভাঙ্কহীন অঙ্ক, নটনটী, সূত্রধার, কখনো সঙ্গীতের ব্যবহার, কাহিনী হিসাবে আর্থ-সমাজ-ঐতিহাসিক-পৌরাণিক-রাজনৈতিক বিষয় বাংলা নাটককে যথেষ্ট আস্বাদনীয় করে তুলেছে । কিন্তু এর মধ্যে বাঙালীর নিজস্ব প্রাণের ধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় না। ফলে অনেক বাঙালী নাট্যকার নিজস্ব নাটকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ নাট্যকারগণ বাংলা নাটকের আকৃতি ও প্রকৃতি উভয় ক্ষেত্রে নিজস্বতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন ।

আমরা পুর্বেই উল্লেখ করেছি , প্রথম দিকে বাঙালী নাট্যকার নাটক নামক সাহিত্য প্রকরণটির ধারণা সংস্কৃত সাহিত্য ও ইংরেজী সাহিত্য থেকে গ্রহণ করেন । ফলে নাটকের আকৃতি বা গঠনের ক্ষেত্রে সংস্কৃত বা ইংরেজী নাট্যাদর্শ অনুকরণ করা হয়েছে ।এইসব অনুকরণে কিন্তু বাঙালীর নিজস্বতা নেই । বঙ্কিমচন্দ্র অনুকরণ

সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধমত দিয়েছেন। 'অনুকরণ' প্রবন্ধে তিনি অনুকরণের পক্ষে বলেন;—"যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়;—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়," (১২৩) বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে এই কথাটি খাটে । প্রথম দিকে নাটকের অনুকরণ হচ্ছিল কিন্তু বাংলা নাটকের রচনায় অচিরেই বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির ছবি ফুটে উঠে। নাটকের গঠনের ক্ষেত্রে অচিরে বাংলা নাটকে বাঙালী সংস্কৃতির অনুকূল সঙ্গীতের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। মনোমোহন বসু সদর্পে ঘোষণা করলেন, গানছাড়া বাংলা নাটক বাঙালীর নাটক হয় না। গানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে 'সতী' নাটকের ভূমিকায় মনোমোহন বসু বলেন;—

> "ইউরোপে নাটক কাব্যে গান অল্পই থাকে, আমাদের তথাবিদ গ্রন্থে গীতাধিক্যের প্রয়োজন। ইহা জাতীয় রুচিভেদে স্বাভাবিক। যে দেশের বেদ অবধি গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় ধারাপাত পর্যন্ত স্বর সংযোগ ভিন্ন সাধিত হয় না; যে দেশের লোক সঙ্গীতের সাহচর্য বিরহিত পুরাণ পাঠও শ্রবণ করে না; যে দেশের আপামর সাধারণ জনগণ পরাধীনতার জন্য সর্বপ্রকার হীনতা ও দীনতার হস্তে পড়িয়াও পূর্ব গান্ধর্ববিদ্যার উন্নত অঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নানা রঙ্গ অত্র বঙ্গে যাত্রা, কবি পাঁচালী, ফুল ও হাফ আখড়াই, কীর্তন, তর্জা, ভজন প্রভৃতি নিত্য নূতন সঙ্গীতামোদে আবহমান ঘোর আমোদী; অধিক কি যে দেশের দিবাভিক্ষু ও রাতভিকারীও গান না শুনাইলে পর্যাপ্ত ভিক্ষান্ন পাইতে পারে না, সে দেশের দৃশ্যকাব্য যে সঙ্গীতাত্মক হইবে, ইহা বিচিত্র কি ? (১২৪)

—বাংলা নাটককে বাঙালীর নিজস্ব নাটকে পরিণত করতে হলে সঙ্গীত একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, মনোমোহনের অখণ্ডনীয় যুক্তির দ্বারা সেকথাই প্রমাণিত হয়েছে। নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও বাংলা নাটকে সঙ্গীতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "আমাদের সমালোচকেরা বাঙ্গালা নাটক হইতে গান পরিত্যাগ করিতে বলেন; বোঝেন না — অপর ভাষায় গানে নাটক — উপযোগী হৃদয় — ভাব ব্যক্ত করিবার শক্তির অভাব। সেই নিমিত্ত যে সকল ভাষার আদর্শ দিয়া বাঙ্গালা নাটকে গান থাকিলে বিরক্তি প্রকাশ করেন, তাঁহারা জানেন না যে, হিন্দু-সুর-রচয়িতার কতদূর হৃদয়-হারিনী প্রভাব।" (১২৫)

গিরিশচন্দ্র ঘোষও সংগীতের অসম্ভব ক্ষমতার কথা স্বীকার করে বাংলা নাটকে সংগীতের ব্যবহার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এর ফলে বাংলা নাটকে এক অভিনব নাট্যধারার প্রতিষ্ঠা হয়, তা হল গীতাভিনয় । গীতাভিনয় প্রসঙ্গে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে বলেন;—

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেই নূতন যাত্রা শিক্ষিত জনসাধারণের সহানুভূতি হইতে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হইয়াছিল। ইহার প্রধান কারণ ইহার আঙ্গিকের কোন ত্রুটি নহে, ইহার রুচির বিকার। এদিকে কলিকাতার সম্ভ্রান্ত ও ধনী পরিবারের সখের রঙ্গমঞ্চগুলিতে যে সমস্ত নাটক অভিনীত হইতেছিল, তাহাতে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না বলিয়া, কোন নূতন কৌশল অবলম্বন করিয়া জনসাধারণের মধ্যে নাট্যরস পরিবেশন করিবার প্রয়োজনীয়তাও কেহ কেহ অনুভব করিতেছিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, সর্বসাধারণের মধ্যে নাটকের রস পরিবেশন করিবার পক্ষে নূতন যাত্রার আঙ্গিকই সর্বাপেক্ষা উপযোগী, অতএব ইহারই এক উন্নত রূপের ভিতর দিয়া তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ইহার মধ্যে কৃষ্ণযাত্রার ও নূতনযাত্রার গীত অংশকে সংক্ষিপ্ত করিয়া তাহার স্থানে আধুনিক নাটকের অভিনেয় অংশের প্রাধান্য দেওয়া হইল — সেইজন্য ইহার নামকরণ করা হইল গীতাভিনয়।"(১২৬)

অর্থাৎ দেশীয় নৃত্য গীতের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নাটকীয় সংলাপের মিশ্রণের দ্বারা গীতাভিনয়কে বাঙালী নিজের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আমরা পূর্বেই একবার কৃত্তিবাসের কথা বলেছি, মধ্যযুগে ঠিক কৃত্তিবাস যেমন করে বাল্মীকির রামায়ণকে সংশোধন ও সংযোজন করে বাঙালীর রামায়ণে পরিণত করেছিলেন; উনিশ শতকের নাট্যকার মনোমোহন বসু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের অনেক নাটকের বিষয়ে অনুরূপ মন্তব্য করা যায়। উনিশ শতকে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে মনোমোহন বসুর 'রামাভিষেক', 'সতী নাটক', 'হরিশচন্দ্র' প্রভৃতি, গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগমনী', 'মলিনা বিকাশ', 'আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদ্‌সাই', 'আলাদিন বা আশ্চর্য্য প্রদীপ' 'ফণির মণি', 'পারস্য প্রসূন বা পারিসানা', 'দেলদার', 'মায়াতরু' প্রভৃতি, রবীন্দ্রনাথের 'বাল্মীকি প্রতিভা', ও 'মায়ার খেলা' উল্লেখযোগ্য গীতাভিনয়মূলক রচনা। এখানে লক্ষ করা গেল, বাঙালী নাটককে কিভাবে নিজের সংস্কৃতির অন্তর্গত করেছে।

এবার আলোচনা করা হবে, বাংলা নাটকের প্রকৃতি বিষয়ে। বাঙালী তার প্রকৃতি অনুযায়ী নাটককে কেমন করে পরিবর্তিত করল ? একটি বহুল প্রচলিত কথা আছে ভারতবাসী ধর্মপ্রাণ জাতি। গিরিশচন্দ্র ঘোষ মনে করেন "ভারতবর্ষের জাতীয় মর্ম্ম-ধর্ম্ম।" (১২৭) সেজন্য বাঙালী ধর্মের মধ্যেই আত্মার শান্তি পেয়েছে। উনিশ শতকের শেষে ধর্মের মঞ্চেই বাঙালী তার জীবনের যাবতীয় সমস্যা দেখতে চেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত, সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের সঙ্গে নাটকের পার্থক্য আছে। অভিনীত হলেই নাটক রচনা সার্থক বলে বিবেচিত হয়। অভিনয়ের জন্য প্রত্যক্ষ দর্শকের প্রয়োজন। দর্শক যতবেশী হবে নাটকের সাফল্য তত বেশী। অতএব নাটক রচনা করতে গিয়ে নাট্যকার দর্শকের রুচির দিকটি খেয়াল রাখেন। এই সময়ে বাঙালী দর্শক মঞ্চে ধর্মকথা শুনতে ও অভিনয় দেখতে চাইতেন। বাস্তব জীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক

বহু বিচিত্র দ্বন্দ্ব পরিহার করে ধর্মীয়-নাটক রচনা ও অভিনয়ের বাহুল্য চোখে পড়ার মত। এতে অবশ্য যুগবিমুখতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহলে একথা মানতেই হয়, পৌরাণিক বা ধর্মীয় নাটকে এমন একটি শক্তি আছে যা যুগবিমুখ হয়ে বাঁচার বিকল্প রসদ যোগান দিয়েছিল। প্রশ্ন হতে পারে, এমন কি রসদ ছিল ? আমরা লক্ষ করব—ধর্মমূলক নাটকে বাঙালী এক পরম প্রশান্তি পেয়েছিল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ বলেন —

> "দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যত প্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না। ভারত ধার্ম্মিক। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে হলসঞ্চালন করিতেছে, তাহারাও কৃষ্ণনাম জানে, তাহাদেরও মন কৃষ্ণনামে আকৃষ্ট। যদি নাটক সার্ব্বজনিক হওয়া প্রয়োজন হয়, কৃষ্ণ নামেই হইবে। ইংরাজী ভানে, বিদেশীয় ভানে যাহারা সেই ভান করেন (তাঁহারা সেই ভানের মর্ম্ম বোঝেন না) সেই ভানে জাতীয় উন্নতি কখনও হইবে না।" (১২৮)

অর্থাৎ ধর্মের সঙ্গে বাঙালী জীবন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সেই অবিচ্ছেদ্য জীবন মঞ্চে অভিনীত হলে স্বভাবতই জনপ্রিয় হবে। তবে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, উনিশ শতকের শেষে রচিত ধর্মমূলক নাটকে বাঙালী ভারতবাসী হয়েও নিজস্বতার ছাপ রেখেছে। বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্ব থেকে পৌরাণিক নাটক রচিত হয়েছিল। কিন্তু প্রথম দিকের পৌরাণিক নাটকে ভক্তি রসের বাহুল্য নিতান্তই কম ছিল। ভক্তি রসের অপ্রতুলতার জন্য আপামর বাঙালী তা সাদরে গ্রহণ করতে পারে নি। উনিশ শতকের শেষে ভক্তিরসে সমৃদ্ধ নাটকই বাঙালীকে নাট্যরসে তৃপ্ত করেছিল। তাছাড়া নাটকের কাহিনীর ক্ষেত্রেও বাঙালীর নিজস্ব ধর্মীয় বা পৌরাণিক কাহিনী নির্বাচিত হয়েছিল। যেমন;—মঙ্গলকাব্য থেকে 'কমলেকামিনী', গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের থেকে 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস' ইত্যাদি বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী।

উনিশ শতকে সচেতন বাঙালী শাসক-শাসিতের পারস্পরিক বৈষম্যের সম্পর্ককে সহজেই অনুভব করেছিলেন। জাতীয় বঞ্চনার বিষয়টিতে সচেতন বাঙালী আহত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতবাসী সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একদিন শ্রেষ্ঠ ছিল। নাট্যকার প্রাচীন ভারতের গৌরবময় সোনালী দিনগুলি আমাদের পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেন। নাট্যকার তাঁর নাটকের জন্য প্রয়োজনীয় বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য, নারীর মহৎ গুণাবলী পুরাণে খুঁজে পান। উনিশ শতকের বাঙালী সমকালের দুরবস্থার মধ্যেও পুরাণের গৌরবময় বীরত্ব, শৌর্য, মহত্বের মধ্যে শান্তি পেতেন। বাঙালী যুগবিমুখ হয়েও সমকালের জাতির দুরবস্থাকে কিন্তু ভুলতে পারে নি। তা পৌরাণিক নাটক রচনার দ্বারা পরোক্ষে প্রমাণিত। তাছাড়া যুগের সমস্যাকে কাহিনী না করে পৌরাণিক কাহিনী নির্বাচনে বাঙালীর একটি প্রতিবাদী মানসিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। এ প্রতিবাদ যেন সমকালের বৈষম্যের বিরুদ্ধে নীরবে প্রতিবাদ। এ একপ্রকার নবজাতীয়তাবাদ বললে অত্যুক্তি হবে না।

আর একটি কারণের কথা উল্লেখ করতে হবে; ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ড্রামাটিক পারফরম্যান্স অ্যাক্‌ট' চালু হওয়ায় প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শাসক বিরোধী নাটক লেখা নিষিদ্ধ হয়। ফলে বাঙালী নাট্যকার বাধ্য হয়েই 'শরৎসরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'র মতো নাটক রচনা ত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ যদিও বা আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈষম্যমূলক কিছু নাটক রচিত হত, এই আইনের বলে সে সুযোগ রইল না। ফলে বাংলা নাট্যসাহিত্যে ধর্মীয় বা পৌরাণিক নাটক একচ্ছত্র প্রাধান্য পেল।

উনিশ শতকে ধর্মীয় তথা ভক্তিমূলক বা পৌরাণিক নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ সর্বাধিক সফল নাট্যকার। এখানে এইজাতীয় নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর ভাবনার অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের আবির্ভাব বাংলা নাট্যসাহিত্যের নিকট এক যুগান্তকারী ঘটনা। স্বনামধন্য নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশচন্দ্র ঘোষের প্রতিভা সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "গিরিশবাবু যখন নাটক লিখিতেলাগিলেন, তখন আমরা ক্রমশ হটিয়া পড়িতে লাগিলাম। দেখিতে দেখিতে গিরিশবাবুর অসামান্য প্রতিভা নাট্যসাহিত্যে একচ্ছত্র অধিকার বিস্তার করল। আমিও নাটক রচনা যোগ্যতর ব্যক্তির হস্তে ছাড়িয়া দিয়া সাহিত্যসেবার অন্য পন্থা অবলম্বন করিলাম।"(১২৯)

উনিশ শতকে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনা করলে স্বনামধন্য নাট্যকার মধুসূদন ও দীনবন্ধুর পরে গিরিশচন্দ্র ঘোষের আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নিতেই হবে। গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বে ঐতিহাসিক নাটক রচনার দ্বারা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেন। সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর গিরিশচন্দ্রের নাটক রচনার প্রতিভায় মুগ্ধ। গিরিশচন্দ্র ঘোষ অসংখ্য নাটক লিখেছেন। যথা;— 'আগমনী', 'অকালবোধন', 'মায়াতরু', 'রাবণবধ', 'সীতার বনবাস', 'অভিমন্যুবধ', 'সীতার বিবাহ', 'রামের বনবাস', 'দক্ষযজ্ঞ', 'ধ্রুবচরিত্র', 'নল-দময়ন্তী', 'কমলে কামিনী', 'শ্রীবৎসচিন্তা', 'চৈতন্যলীলা', 'নিমাই সন্ন্যাস', 'বিল্বমঙ্গলঠাকুর', 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি', 'জনা', 'কালাপাহাড়', 'পান্ডব গৌরব', 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাসিম', 'শঙ্করাচার্য্য' প্রভৃতি। শুধু তাই নয়— গিরিশচন্দ্র ঘোষ অভিনেতা ও অভিনয়-শিক্ষক হিসাবেও অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

নট-নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে নাটক লিখতেন। সেজন্য নাটককে কিভাবে আরো জনপ্রিয় করা যায়— সেবিষয়ে তাঁর সতর্ক দৃষ্টি ছিল। নাট্যকার হিসাবে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন—বাংলা নাটককে বাঙালী রুচির অনুকূল করলে নাটক জনপ্রিয় হবেই। তিনি শারদীয়া উৎসবে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য প্রথম নাটক রচনা করেন 'আগমনী' (গ্রন্থপ্রকাশ - ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৭৭) তারপর 'অকালবোধন'। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ নাট্যকার দেশানুরাগমূলক নাটক লিখে বেশ জনপ্রিয়

হয়েছেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ নাট্যকার হিসাবে দেশানুরাগমূলক নাটক লিখে আত্মপ্রকাশ করেন নি। বরং তিনি বাংলা নাট্যক্ষেত্রে পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক নাটকের জোয়ার নিয়ে আসেন। শুধু নাটকের বিষয়ের দিক থেকে নয়, বাংলা নাটককে বাঙালীর নিজস্ব নাটক হিসাবে তুলে ধরার জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। তিনি বলেন;—"দেশহিতৈষিতা প্রভৃতি যতপ্রকার কথা আছে, তাহাতে কেহ ভারতের মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারিবেন না।...হিন্দুস্থানের মর্ম্মে মর্ম্মে ধর্ম্ম। মর্ম্মাশ্রয় করিয়া নাটক লিখিতে হইলে ধর্ম্মাশ্রয় করিতে হইবে।" (১৩০) 'নাট্যকার' নামক প্রবন্ধে তিনি নাটককে জাতীয় ভাবের অনুগামী হবার কথা বলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "যিনি নাটক লিখিবেন, তাঁহাকে দেশীয় ভাবে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দেশীয় স্বভাব- শোভা, দেশীয় নায়ক- নায়িকা, দেশীয় অবস্থা, উপস্থিত ক্ষেত্রে দেশীয় মানব-হৃদয়-স্রোত— তাঁহাকে দৃঢ়রূপে মনোমধ্যে অঙ্কিত করিতে হইবে। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু, ধর্ম্মপ্রাণ নাটকেরই স্থায়ী আদর করিবে।" (১৩১)

তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সামাজিক নাটক বা দেশানুরাগ মূলক ঐতিহাসিক নাটকের পক্ষপাতী ছিলেন কি না। এ বিষয়ে তিনি 'পৌরাণিক নাটক' প্রবন্ধে বলেন—ইতিহাসের সঙ্গে বাঙালীর টান ক্ষীণ, পাশাপাশি বঙ্গ সমাজে নিজস্ব বিচিত্রতার অভাব। সেজন্য বাংলায় ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক নাটক রচনার চেয়ে ধর্মীয় নাটক বেশী জনপ্রিয়। ঐতিহাসিক নাটক প্রসঙ্গে বলেন;—"...যদি চরিত্র পাওয়া যাইত, যাহা পুরাণে নাই, তাহা হইলেও কথা ছিল। ...আমরা এক্‌জামিনের খাতিরে ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়িয়াছি;" (১৩২) আবার সামাজিক নাটক সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য;— "দোষ - গুণ লইয়া নাটক রচিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই।" (১৩৩) পাশাপাশি তিনি পৌরাণিক গ্রন্থের সার্বজনীনতার বিষয়ে বলেন; —

> "যত জাতির যত উচ্চ গ্রন্থ আছে, সকলই Mythological অর্থাৎ পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে হোমার; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে ভার্জ্জিল; খৃষ্টীয় পুরাণ অবলম্বনে মিল্‌টন; পৌরাণিক গ্রন্থ অবলম্বনে বাঙ্গালায় মাইকেল। যিনি পৌরাণিক গ্রন্থের বল জানেন না, তিনি কাগজ, কলম ও ছাপাইবার খরচ লইয়া সমালোচনা করেন। মনুষ্য- জীবনের দায়িত্ব তিনি বুঝেন নাই।" (১৩৪)

মনে হবে, উনিশ শতকের মতো আধুনিক যুগে দাঁড়িয়ে গিরিশচন্দ্র উদার মানব ধর্ম ত্যাগ করে বাঙালীকে দৈবানুগ্রহের অন্ধ-বিশ্বাসের রাজ্যে নিয়ে যেতে চেয়েছেন। যদি তাই হয়, তাহলে মানতেই হবে নাট্যকার হিসাবে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব বাঙালী সমাজের জন্য তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। স্বয়ং নাট্যকারের স্বীকৃতি এ প্রসঙ্গে

স্মরণীয়। 'নটের আবেদন' প্রবন্ধে তিনি তাঁর অকৃত্রিম মনোভাব প্রকাশ করে বলেছেন;—

> "আমাদের কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা— কিরূপে সাধারণের আদরভাজন হইব, কিরূপে ধৰ্ম্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা রঙ্গভূমি হইতে সাধারণের প্রীতিকর করিয়া, নাটকের উন্নতি সাধিব, কিরূপে রুচি- মাৰ্জ্জিত করিব—তাহা আমাদের সহৃদয় ব্যক্তিগণ শিখাইয়া দেন।" (১৩৫)

এখানে বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্নয়নের অকৃত্রিম ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এখানে গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি সামাজিক দায়বদ্ধতাও সমান উজ্জ্বল। আমরা জানি— ধর্মশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা মানুষকে পাশবিক জীবনাচরণ থেকে মুক্তি দেয়। অতএব বলা যায় গিরিশচন্দ্র সমাজের পাশবিক মনোভাব পরিবর্তন করার জন্য তাঁর নাটককে ব্যবহার করেছেন। এ তো নাট্যসাহিত্যের মধ্যে দিয়ে একপ্রকার সমাজ সংস্কার। এরপরেও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি — এমন অভিযোগ ঠিক নয়। আসলে তিনি বাংলা নাট্যসাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়ে বাঙালীকে নীতিশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল সর্বস্তরের বাঙালীর নাট্যানুরাগ সৃষ্টি করা। সেজন্য তিনি সমকালীন বাঙালী রুচির দিকে তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। তিনি অনুসন্ধান করে দেখেন — বাঙালী রুচি ছিল ধর্মকেন্দ্রিক। বিশেষত উনিশ শতকের শেষভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাবে এই প্রবণতা ব্যাপক আকার নেয়। সেজন্য দূরদৃষ্টি সম্পন্ন গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক তথা ধর্মীয় বা ভক্তিমূলক নাটক রচনার উপর জোর দিয়েছিলেন।

গিরিশচন্দ্র গঠনগত ও প্রকৃতিগত উভয়ক্ষেত্রে বাঙালী রুচির অনুকূল নাটক লিখেছেন। যেমন 'মলিনা বিকাশ' 'ফণির মণি' ইত্যাদি অসংখ্য গীতিনাট্য লেখেন। আসলে তিনি মনে করেছিলেন গীতিনাট্য বাঙালীর নিকট যথেষ্ট আদরণীয় হবে। আবার পৌরাণিক নাটককে বাঙালীর কাছে আরো জনপ্রিয় করতে বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পৌরাণিক বিষয়কে নাট্যরূপ দেন। এ বিষয়ে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন;—

"গিরিশচন্দ্র ছিলেন যথার্থই বাংলার জাতীয় নাট্যকার। তিনি পৌরাণিক নাটকের ভিতর দিয়া বাংলারই পুরাণ কথা প্রচার করিয়াছেন। বাংলা দেশে চতুঃসীমা অতিক্রম করিয়া তাঁহার দৃষ্টি হিন্দু সংস্কৃতির মৌলিক আদর্শ সন্ধান করিতে যায় নাই। সেইজন্য বাল্মীকির পরিবর্তে কৃত্তিবাস, বেদব্যাসের পরিবর্তে কাশীরামদাস, মুকুন্দরাম, রামেশ্বর, ভারতচন্দ্রই তাঁহার অবলম্বন ছিল। বাংলার নিজস্ব জাতীয় সংস্কৃতির উপর এত সুগভীর মমতা ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর কেহ দেখাইতে পারেন নাই।" (১৩৬)

আমরা এই অধ্যায়ে লক্ষ করলাম—উনিশ শতকেই বাংলা নাটকের উদ্ভব হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের এই নতুন সাহিত্য প্রকরণ শুধু বিলাসী সাহিত্য প্রকরণ হয়েই থাকে নি। এই পর্বের নাটক সমকালের সমাজ

সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, বাঙালীর নিজস্ব সংস্কৃতির প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলা নাটক উনিশ শতকেই রচিত হয়। বাংলা নাট্যসাহিত্যের এই দায়িত্ব বোধকে আমরা উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা বলে অভিহিত করতে পারি।

উল্লেখপঞ্জী

১। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—প্রকাশক ঃ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩, সংশোধিত ও পরিবর্তিতত অষ্টম সংস্করণ, জুন ১৯৯৯, পৃ: ৪।

২। বিজ্ঞাপন, ভদ্রার্জুন, হারানো দিনের নাটক — সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ২১।

৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

৫। ভূমিকা, কীর্তিবিলাস, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ৫৮।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭।

৮। বিজ্ঞাপন, কুলীনকুল সর্বস্ব, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ১৫১।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫১।

১০। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, বেণীসংহার, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ২৩৫।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৫।

১২। বিজ্ঞাপন, রত্নাবলী, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯। পৃ: ২৮৩।

১৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫ পৃ: ১৫৩-১৫৪।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬০।

১৫। মঙ্গলাচরণ, শর্মিষ্ঠা, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ঊনপঞ্চাশ।

১৬। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫ , পৃ: ১৭২।

১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড — ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১১৬-১১৭।

১৮। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ২৯৭।

১৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ৩০৫।

২০। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩৩২।

২১। কুলীনকুলসর্বস্ব, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ১৫৭।

২২। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ:৩১২-৩১৩।

২৩। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১৬১।

২৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১২৩।

২৫। সাহিত্য সাধক চরিমালা, ২য় খণ্ড — ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৬২ ষষ্ঠ সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ: ১৬৮।

২৬। উৎসর্গ পত্র, শাস্তি কি শান্তি, গিরিশ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৪, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ: ৪৯৭

২৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১৩০।

২৮। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ২০৯

২৯। একেই কি বলে সভ্যতা, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ২৪৭-২৪৮।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৮।

৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫১।

৩২। বুড় সালিকের ঘাড়ে, রোঁ, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ২৫৫-২৫৬।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৪।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৯।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৯।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৪।

৩৭। বিয়ে পাগলা বুড়ো, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ জুন, ১৯৭৩, পৃ: ১৪০।

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪।

৩৯। সধবার একাদশী, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ জুন, ১৯৭৩, পৃ: ১৯৯।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৪।

৪১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৮।

৪২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৮।

৪৩। জামাই বারিক, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮ জুন, ১৯৭৩, পৃ: ২৯৩-২৯৪।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৩।

৪৫। বিজ্ঞাপন, কুলীনকুল সর্বস্ব, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ১৫১।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫১।

৪৭। নবনাটক, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৩৭।

৪৮। উপহার, নবনাটক, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৩১।

৪৯। নবনাটক, হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯, পৃ: ৫৩২।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬৫।

৫১। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৩-৭৩৪।

৫২। নটের আবেদন, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয়

মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৭।

৫৩। প্রফুল্ল, গিরিশ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯২, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৯১, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগষ্ট ১৯৯২, পৃ: ৪৮৩।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ, ৪৯২।

৫৫। হারানিধি, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ২২২।

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১১।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১১।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৮।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১০।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৭।

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৯-২৩০।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬৮।

৬৩। মায়াবসান, গিরিশ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, সম্পাদক — ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৪, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ: ৪৪৯।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩১।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১৫।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১০-৪১১।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩০।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৩২।

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৬।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪১২।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৭।

৭২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৮।

৭৩। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিক যুগ)—শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৮৮ (আগষ্ট ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, ১২ নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা-৯, পৃ: ৪৯৯।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬৯।

৭৫। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৪৬৩।

৭৬। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ৩০২।

৭৭। কৃষ্ণকুমারী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪,সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩০৬।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩০৬-৩০৭।

৭৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ১১৭।

৮০। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, ২০০২ সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২০, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ঃ ২০০২, পৃ: ৪৩।

৮১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬।

৮২। পুরুবিক্রম, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১২।

৮৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯।

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

৮৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৮৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫।

৯০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২।

৯১। সরোজিনী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১০৪।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৯।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫।

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৫।

৯৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

৯৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

১০০। অশ্রুমতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১০৭।

১০১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৭।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০-১১১।

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১১।

১০৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।

১০৭। কৈফিয়ৎ, অশ্রুমতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: পঁয়ত্রিশ।

১০৮। অশ্রুমতী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১৬৮।

১০৯। স্বপ্নময়ী, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২, পৃ: ১৭২।

১১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৬।

১১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৫।

১১৩। নূতন পুস্তক ও পত্রের সমালোচনা, সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ১ম খণ্ড, সংকলিত ও সম্পাদিত-স্বপন বসু, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৯এপ্রিল ২০০০, প্রকাশক ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলিকাতা-২০, পৃ: ৩২৫।

১১৪। নীলদর্পণ, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮জুন, ১৯৭৩, পৃ: ৩।

১১৫। ভূমিকা, নীলদর্পণ, দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮জুন, ১৯৭৩, পৃ: ১।

১১৬। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—প্রকাশক ঃ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩, সংশোধিত ও পরিবর্তিতত অষ্টম সংস্করণ, জুন ১৯৯৯, পৃ: ১৪৫।

১১৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৩২৯।

১১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩১।

১১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩১।

১২০। ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ ১৪১১, পৃ: ৭৬৩।

১২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬৩।

১২২। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ন বুক এজেন্সি, নতুন সংস্করর, ১৯৯৫, পৃ: ৪২।

১২৩। অনুকরণ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ ১৪১১, পৃ: ১৭৭।

১২৪। ভূমিকা, 'সতী নাটক', বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৪, পৃ: ৩৫১।

১২৫। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৪-৭৩৫।

১২৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৪, পৃ: ৫৬।

১২৭। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩২।

১২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩২।

১২৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, ২০০২ সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২০, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ঃ ২০০২, পৃ: ৪৯।

১৩০। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩২।

১৩১। নাট্যকার, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৪৭।

১৩২। পৌরাণিক নাটক, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৩।

১৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩৩।

১৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩৩।

১৩৫। নটের আবেদন, গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১, পৃ: ৭৩৭।

১৩৬। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৪, পৃ: ৩৮০-৩৮১।

পঞ্চম অধ্যায়

উনিশ শতকের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যে স্বদেশ ভাবনা

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য এক নতুন সংযোজন। এই ধারার কবি হিসাবে বিখ্যাত নাম — রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন। এছাড়া আরো অনেকে এই শ্রেণীর কাব্য চর্চা করেছিলেন। যথা;— দীননাথ ধর (কংস বিনাশ-১৮৬১), মহেন্দ্রচন্দ্র শর্মা (নিবাতকবচ বধ-১৮৬৯), ভুবনমোহন রায়চৌধুরী (পাণ্ডব চরিতকাব্য-১৮৭৭), বলদেব পালিত (কর্ণার্জুন কাব্য ১৮৭৫), বিহারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (শক্তিসম্ভব কাব্য-১৮৭০), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (দানবদলন কাব্য ১৮৭৩), গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (ভার্গব বিজয়-১২৮৪ বঙ্গাব্দ), হরগোবিন্দ লস্করচৌধুরী (রাবণবধ ১৩০০ বঙ্গাব্দ), যোগীন্দ্রনাথ বসু (পৃথ্বীরাজ-১৩২২ বঙ্গাব্দ ও শিবাজী-১৩২৫ বঙ্গাব্দ)।

বাংলা সাহিত্যের এই প্রকরণটির একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়, তা হল এই ধারার কাব্যচর্চা অর্ধশত বর্ষের বেশী স্থায়ী হয় নি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়ে যার সূচনা মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বারা যার সার্থক সমৃদ্ধি, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্রের পরই সেই কাব্যপ্রবাহের পরিণতি সূচিত হয়ে গেছে। এরপর আর কোন কবি-সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। এমন কি মহাপ্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রকরণে কৃতিত্ব দেখালেও আখ্যানকাব্য বা সাহিত্যিক মহাকাব্য লেখেন নি। তাহলে পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবি কি সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচনার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না? আসলে উনিশ শতকের পরে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচনার পিছনে প্রতিভা কোন সমস্যা নয়, সমস্যা ছিল যুগরুচি। বলা যায়, বাংলা কাব্যধারা অন্য পথে প্রবাহিত হওয়ায় সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচিত হয়নি। বিষয়টি তারাপদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'আধুনিক বাংলা কাব্য' গ্রন্থে স্পষ্ট করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

> "উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জাতি-চরিত্র গঠনের যে সর্ব্বব্যাপী প্রচেষ্টা চলিয়াছিল, জড়তা ও সংস্কারের প্রভাবমুক্ত যে নবজাগ্রত দেশাত্মবোধ দেশের আকাশে বাতাসে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল—সে আবেগ ও উন্মাদনা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন গীতিকবিতা হইতে পারে না; গুরুবস্তুভার-বহনক্ষম আখ্যায়িকা-কাব্যই সে আবেগ ও উন্মাদনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে। গীতিকবিতা সেই যুগেরই সৃষ্টি যে যুগে জাতীয় জীবন শান্ত ও সমাহিত। তাই উনবিংশ শতাব্দীতে গীতিকবিতা রচিত হইলেও এই গীতিকবিতার জন্য সে যুগের জনচিত্ত

যেন প্রস্তুত ছিল না —এই শ্রেণীর কবিতার রস-আত্মা সে যুগের রসিকের কাছে উন্মোচিত হয় নাই। বিহারীলাল এবং তাঁহার অনুগামী কবিগোষ্ঠীর সহিত যেন রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়া দিয়াছেন।...পরিশেষে দেখা গিয়াছে বিহারীলালের কাব্যধারাই জয়ী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার দৃষ্টান্ত।"[১]

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, এই শ্রেণীর কাব্যধারার জন্ম কি বিশেষ কোন প্রয়োজনে ? আমরা লক্ষ করব, এই শ্রেণীর কাব্য সৃষ্টির পিছনে দুটি প্রেরণা কাজ করেছে। প্রথমতঃ সমৃদ্ধ শিল্প হিসাবে বাংলা কাব্যকে প্রতিষ্ঠা করা ও দ্বিতীয়তঃ জাতীয় চেতনা বৃদ্ধির প্রয়াস ।

বলা যায় সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত । এই প্রসঙ্গে 'আধুনিক বাংলা কাব্য'-এ তারাপদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন;—

"১৮৩০ হইতে ১৮৯৬ পর্য্যন্ত এ পর্ব্বের বাংলা কাব্যকে জাতীয় আন্দোলনের কাব্য বলা যাইতে পারে। সৌন্দর্য্যসৃষ্টি এই যুগের কাব্যের প্রধান লক্ষ্য নয়। জাতীয় আদর্শের প্রচারের গুরুদায়িত্ব এই যুগের কাব্যের লক্ষ্যকে ভিন্নমুখী করিয়াছে। কাব্যের গতি সৌন্দর্য্যলোকের দিকে; কিন্তু এ যুগে গুরুবস্তুভার ঝুলাইয়া দিয়া কাব্যকে বাস্তব জগতের দিকে টানিয়া রাখা হইয়াছে। ১৮০০ হইতে ১৮৫৮ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের রসের ভাণ্ডারে যেন তালাচাবি আটকাইয়া কেবল জ্ঞানের ভাণ্ডারটি উন্মুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এই দীর্ঘকালের মধ্যে কেবল ঈশ্বর গুপ্ত কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ রসের উৎস-মুখ অনাবৃতকরিয়াছিলেন, নতুবা গদ্যানুশীলন, পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং নূতনাদর্শের নাটক রচনার ঝোঁকে কাব্যের রসধারাটির উপর সকলে যেন উদাসীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহার পর রঙ্গলাল যখন সেই কাব্যধারার দিকে আবার জনচিত্তকে আকর্ষণ করিলেন, তখন এই কাব্যধারা জাতীয়তাবোধ উদ্দীপনের বাহন হিসাবেই গৃহীত হইয়াছিল এবং এই পরিচয়-ই এই যুগের কাব্যের বিশিষ্ট পরিচয়।" [২]

উক্ত বক্তব্যে আলোচ্য সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্যের উদ্দেশ্যমূলকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যদিও শিল্পসমৃদ্ধ কাব্য সৃষ্টি করবেন বলে মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করেছিলেন । তবুও যেন তাঁর কাব্যটি উদ্দেশ্যমূলকতার গন্ধযুক্ত । 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ কবি লিখেছেন;—

" . . . গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি " [৩]

বাঙালী 'মেঘনাদবধকাব্য' এর রসামৃত পাঠ করে যাতে আনন্দ পান, কবির সেটাই লক্ষ্য ছিল। সে জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে কবি যথাসম্ভব শিল্প সমৃদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করেন। অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়

'মেঘনাদবধ কাব্য' তথা অন্যান্য সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যান কাব্যগুলি রচিত হয়নি । বলা যায়, এইজাতীয় কাব্য রচনার পিছনে রয়েছে দেশানুরাগ । তা বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যই হোক আর জাতির আত্মচেতনার বিকাশ ঘটানোর বিশেষ উদ্দেশ্যই হোক । এই উভয় প্রকার উদ্দেশ্যই দেশানুরাগের অন্তর্ভুক্ত । কেননা বাঙালী কবির নিকট বাংলা ভাষা ও সাহিত্য দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য । মাতৃভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান একজন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তির পরম আদরণীয় বিষয় । আর জাতির আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটানোর প্রসঙ্গ তো সরাসরি স্বদেশ বৎসলতার কথাকেই মনে করিয়ে দেয় । কেননা, জাতির আত্মচেতনার বিকাশ ঘটলে জাতিরই মানব সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। উনিশ শতকে আখ্যানকাব্য বা সাহিত্যিক মহাকাব্য ধারার উদ্ভবের মূলে জাতীয় সম্পদ সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্য বিশেষ ভুমিকা নিয়েছে। যা কখনো মাতৃভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধির মধ্যে আবার কখনো তা মানব সম্পদ সৃষ্টির মহৎ উদ্দেশ্যে সীমাবদ্ধ ।

ধারাবাহিকতার বিচারে প্রথমে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্যের আলোচনা হবে। তারপর মধুসুদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের আখ্যানকাব্য বা সাহিত্যিক মহাকাব্য ক্রমান্বয়ে আলোচিত হবে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১২৩৪-১২৯৪ বঙ্গাব্দ) একটি অকৃত্রিম সম্পর্ক ছিল। তিনি জাতি গঠনের জন্য বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে সাহিত্যবোধেরও গুরুত্ব অনুভব করেছিলেন। তাঁর ভাষায়;—

> "কেবলমাত্র বিজ্ঞানবিদ্যায় বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা সম্পাদন- করণের শিক্ষা-প্রণালীকে সম্পূর্ণ বা সংশুদ্ধ রীতি বলা যাইতে পারে না। বিজ্ঞানবিদ্যা স্বভাবতঃ কঠিন এবং ঔৎসুক্যবিহীন, অতএব চিন্তাকিরণ-করণক ভাবকুসুম-প্রফুল্লকারী পরম-গৌরবভাজন কলা-কলাপের সাহায্য ব্যতীত তাহা প্রিয়ঙ্কর হয় না। বুদ্ধির প্রাখর্য্য সম্পাদনার্থ যেরূপ বিজ্ঞান — বিদ্যার প্রয়োজন, অন্তঃকরণের উৎকর্ষ সম্পাদনার্থ সেইরূপ কাব্যালঙ্কার প্রভৃতি কলা আবশ্যকতা।"[৪]

এদেশে এই দু'টি বিষয়কে যুগোচিত করার জন্য তিনি বলেছিলেন;— 'উভয়বিধ পদার্থেরই শ্রীবৃদ্ধি-সম্পাদন অতি কর্তব্য।"[৫] এখানে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় বিজ্ঞানের প্রতি প্রয়োজনীয় আনুগত্য ও সুগভীর নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। কিন্তু কাব্য সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে জাতির চেতনায় স্বদেশ ভাবনার স্পন্দন এনে দিতে সফল হয়েছিলেন। আগুনের সঙ্গে উত্তাপ যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তেমনি তাঁর সাহিত্যের সঙ্গে জাতির আত্মসচেতনতার ভাবনা নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত ।

বাংলা সাহিত্যের অনান্য প্রকরণেও কবির স্বদেশ ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মূলত আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে পরিচিত হলেও বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণে তাঁর স্বচ্ছন্দ পদচারণা ছিল। এই সব একাধিক প্রকরণেও জাতির চেতনা বিকাশের ভাবনার সন্ধান পাওয়া যায়। আখ্যানকাব্য ছাড়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল;—'কলিকাতা কল্পলতা', (১৩৬৬, গল্পভারতী), 'বঙ্গ বিদ্যার আদ্যবিবরণ' (১২৫৬, এডুকেশন গেজেট), 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' (১৮৫২ বেথুন সভায় পঠিত), 'উৎকল বর্ণন' (১৮৬৩, রহস্য সন্দর্ভ), 'কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্তবাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা' (১৮৬৬, রহস্য সন্দর্ভ), 'দীননাথ দাস' (১৮৬৪), 'উপেন্দ্রভঞ্জ' (১৮৬৪, রহস্য সন্দর্ভ), 'শরীর সাধনী বিদ্যা শিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন' (১৮৬০), 'ইউরোপ ও এস্যা খণ্ডস্থ প্রবাদমালা' (১৮৬৯) প্রভৃতি।

এছাড়া রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে অনুবাদ সাহিত্য রচনাতে হাত বাড়িয়েছিলেন। অনুবাদ সাহিত্য চর্চার পিছনে বিশুদ্ধ সাহিত্য রস আস্বাদন করার প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়া প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করার পরোক্ষ কারণও ছিল। এবিষয়ে কবির অভিমত ছিল এরকম;—

> "আমরা ভিন্নদেশীয়দিগের দ্বারা অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ বিধায় ক্রমে ক্রমে সনাতন রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহারাদি পরিহারপূর্ব্বক বহুরূপীর ন্যায় বহুরূপ ধারণ করিতেছি। আমরা পূর্ব্বে কি ছিলাম, এক্ষণেই বা কি হইয়াছি, ইহার পর্য্যালোচনা করণে স্বদেশহিতৈষীমাত্রেরই মনে বাসনা জন্মে, সেই বাসনা পূর্ণকরণে প্রাচীন গ্রন্থনিকর, বিশেষতঃ স্বদেশীয় পুরাতন কাব্য-কলাপই সবিশেষ শক্তি রাখে।" (৬)

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশবাসীকে ঐতিহ্যশালী সংস্কৃতি স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য 'কুমার-সম্ভব' (১২৭৯ বঙ্গাব্দ), 'মেঘদূত' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), 'ঋতুসংহার' (১৩৬৬ বঙ্গাব্দ), 'নীতিকুসুমাঞ্জলী' (১২৮২ বঙ্গাব্দ), বাংলায় অনুবাদ করেন। রঙ্গলালের সাহিত্য চর্চার দৃষ্টান্ত হিসাবে আরো উল্লেখ করার মতো 'ভেকমুষিকের যুদ্ধ' (১৮৫৮) এবং গান, ছন্দ, অলঙ্কার বিষয়ে বিবিধ রচনা।

এবার আমরা রঙ্গলালের আখ্যানকাব্যে বাঙালী পাঠকের আত্মসচেতনা বিকাশের আলোচনা করব। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আত্মসচেতন স্বদেশ প্রেমিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। কাব্যপ্রেমিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশীয় বাংলা কাব্যের নিন্দাবাদ শুনলে গভীরভাবে মর্মাহত হতেন। তিনি বাংলা কাব্যসাহিত্যকে বিশুদ্ধ সাহিত্যের পদমর্যাদা দানের জন্য কাব্য রচনা করতে কলম ধরেন। তাঁর কাব্যচর্চার সবচেয়ে বড় প্রেরণা স্বদেশীয় সাহিত্যপ্রীতি ও দেশানুপ্রীতি। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর 'ভূমিকায়' তার উল্লেখ আছে। সেসময় কালীচন্দ্র রায়চৌধুরী, সত্যচরণ ঘোষাল প্রমুখ স্বদেশ হিতৈষী 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এর বক্তব্যে আনন্দিত হন; এবং তাঁরা প্রাবন্ধিককে বিশুদ্ধ কাব্য রচনার জন্য উৎসাহ দেন। এবিষয়ে কবি লিখেছেন;—

"এই অভিনয় কাব্যের প্রণয়ন ও প্রকটন সম্বন্ধে আমার কিঞ্চিদ্বক্তব্য আছে। ১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাঙ্গালা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। ...আমি উক্ত মহাশয়দিগের অযুক্তি নিরসন নিমিত্ত ঐ সভায় এক প্রবন্ধ পাঠ করি, ...বাবু কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী উক্ত প্রবন্ধ পাঠান্তে আমাকে যে পত্র লেখেন, তন্মধ্যে এই আক্ষেপোক্তি করিয়াছিলেন, যথা — "আধুনিক যুবাজনে স্বদেশীয় কবিগণে,

ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।

বাঙ্গালীর মনঃ-পদ্ম, কবিতা সুধার-সদ্ম,

এই মাত্র রাখ হে প্রমাণে।।"

... স্বদেশহিত তৎপর সুনির্ম্মল চরিত্র মৃত রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর এতদ্দেশীয় অধিকাংশ ভাষা কাব্যনিচয়ের অশ্লীলতা ও অপবিত্রতা সত্ত্বে সত্তাবৎপাঠে এতদ্দেশীয় বালক, বৃদ্ধ, বণিতা প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার অবস্থায় লোকদিগের প্রগাঢ় অনুরক্তি দর্শনে পরিখেদিতহইয়া আমার প্রতি বিশুদ্ধ প্রণালীতে কোন কাব্য রচনা করণার্থ ভূয়োভূয়ঃ অনুরোধ করেন।" (৭)

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশ হিতৈষী ব্যক্তিগণের অনুপ্রেরণায় এবং স্বদেশীয় কাব্যের উৎকর্ষতা সৃষ্টির একান্ত নিজস্ব আন্তরিক উদ্যোমে প্রভাবিত হয়ে 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮), 'কর্ম্মদেবী' (১৮৬২), 'শূরসুন্দরী' (১৮৬৮) প্রভৃতি আখ্যানকাব্য রচনা করেন। অতএব বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন প্রকরণ আখ্যানকাব্যের সৃষ্টির আড়ালে স্বদেশ ভাবনা কাজ করেছিল, একথা বলা যায় ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু নতুন প্রকরণ সৃষ্টি করে বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে কলম ধরেন নি। তিনি কাব্যের বক্তব্যে কৌশলে পরাধীনতার গ্লানির অনুভূতি এনে পাঠককে আত্মসচেতন করার চেষ্টা করেন। সেজন্য কাব্যের গঠন পরিকল্পনাতে রাজরোষ থেকে মুক্তির আশায় রাজদ্রোহী ভাবনাগুলি তিনি সরাসরি বলেন নি। কাব্যের আলোচনা করতে গিয়ে দেখব, কবি রঙ্গলাল কাব্যের রাজদ্রোহী ভাবনাগুলি কৌশলে কাব্যের কথক, শ্রোতা ও চরিত্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন। কবি বিশ্বাস করেন, কাব্য ঘুমন্ত জাতিকে উজ্জীবিত করার ক্ষমতা রাখে। কাব্য মানবিক মূল্যবোধ গুলিকে আরো সতেজ করতে পারে । অর্থাৎ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্য সৃষ্টির দ্বারা অন্তরের গভীর দেশপ্রেম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে একটি মানবিক মূল্যবোধে সমৃদ্ধ পাঠক শ্রেণী সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর ভূমিকায় রঙ্গলাল তাঁর লক্ষ্যের কথা বলেছেন। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যচর্চার উদ্দেশ্য গুলির তালিকা সংক্ষেপে এইরকম;—

১। বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্যরচনা করে বাংলা কাব্যকে যথার্থ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করা,

২। পরাধীন জাতির মনে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলা,

৩। কাব্যের দ্বারা পাঠকের মনে মানবিক অনুভূতিগুলিকে আরো সতেজ করা,

৪। অশ্লীল কাব্যপ্রীতির পরিবর্তে প্রকৃত কাব্যরস আস্বাদনের জন্য পাঠককে অনুপ্রাণিত করা,

এইসব উদ্দেশ্যগুলি কবি মনের বিশুদ্ধস্বদেশ প্রেম থেকে উৎসারিত বললে অযৌক্তিক মন্তব্য করা হবে না। আমরা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানকাব্যগুলি আলোচনা করে কবি মনের ভাবনাকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

পদ্মিনী উপাখ্যান (১৮৫৮)ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)। কবি-মনের স্বদেশ চেতনার সার্থক সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত 'পদ্মিনী উপাখ্যান'। কাব্যের উৎস থেকে বিষয় পর্যন্ত স্বদেশ ভাবনা কানায় কানায় পরিপূর্ণ। সেসময় বাংলা ভাষায় আধুনিক মনের উপযোগী কাব্য সৃষ্টির জন্যই যেন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এর অবতারণা। সেজন্য বাংলা কাব্যের চিরাচরিত জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে বিশুদ্ধ প্রণালীতে কাব্য রচনার জন্য কবির সক্রিয়তা প্রকাশ পেয়েছে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য পড়লে পাঠকের মানবিক অনুভূতি সতেজতা প্রাপ্ত হয়। যে মানবিক অনুভূতি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জাতির প্রতি শ্রদ্ধাবান হতে সাহায্য করে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন, এদেশের পুরাণগুলি অলৌকিকতায় পূর্ণ কিন্তু রাজপুতদের ইতিহাস বীর-করুণরসে পরিপূর্ণ। এদেশের মানুষ স্বাধীনতাকে যে স্বর্গসুখ মনে করত। আত্মসচেতন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়টি রাজপুত জাতির ইতিহাসে দেখতে পেয়েছেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে যাঁরা আত্মবিস্মৃত হয়ে স্বাধীনতা কি তা ভুলে গিয়েছিলেন, 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে কৌশলে তাঁদের আত্মচেতনা ফেরানোর চেষ্টা দেখা যায়। বিধর্মী সম্রাট আলাউদ্দিনের মেবারের রূপবতী রাণী পদ্মিনীর প্রতি কামানলের আকর্ষণ রাজা ভীমসিংহের করুণ পরিণতি ডেকে আনে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' এর করুণ কাহিনী পাঠকের অন্তরে রাজপুত জাতি তথা স্বজাতীয়দের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগিয়ে জাতির দুর্দশা মোচনের জন্য সহানুভূতি আদায় করতে যথেষ্ট সহায়ক। কবি কাব্যের ভূমিকায় বলেছেন;—" স্বদেশীয় লোকের গরিমা-প্রতিপাদ্য পদ্য পাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস, অবলম্বনপুর্ব্বক রচিত করিলাম।" (৮)

'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে ভ্রমণ পিপাসু এক পর্যটকের সঙ্গে দেশীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞ এক ব্রাহ্মণের সাক্ষাত হয়। উক্ত ব্রাহ্মণ, ভ্রমণ পিপাসু পর্যটককে পদ্মিনীর কাহিনী শোনায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যটি ব্রাহ্মণের পদ্মিনীর কাহিনী শোনানোর ছলে রচিত হয়েছে। কাব্যটিতে সমকালের পরাধীন ভারতের পরাধীনতার

মর্মজ্বালা পরোক্ষে প্রকাশ পেয়েছে। কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কাব্যের বক্তব্য প্রকাশে কৌশল অবলম্বন করেছেন। কবি এখানে কৌতূহলী পর্যটকের সঙ্গে একাত্ম হয়ে প্রাচীন স্বাধীন ভারতের স্মৃতি রোমন্থন করে বলেন;—

" মানসে করেন চিন্তা কোথায় সেদিন;
যে দিনে ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন। "(৯)

—পরক্ষণেই নিঃস্ব পরাধীন ভারতের কথা স্মরণ করে বলেন;—

"এখন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধীনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী ।।" (১০)

মধ্যযুগের বাদশাদের ধর্মান্ধতায় ধর্মপ্রাণ ভারতীয়দের দুর্ভোগের চিত্র কবি ফুটিয়ে তুলেছেন এইভাবে—

"সয়তানি বেদমন্ত্র বিনাশিব তূর্ণ।
তোর একলিঙ্গ শিবে করিব রে চূর্ণ।।" (১১)

—এটি হল রাণা ভীমসিংহের প্রতি সম্রাট আলাউদ্দিনের বক্তব্য।

'পুত্রদিগের সহিত পরামর্শ' নামক কাব্যাংশে জাতির সম্মান রক্ষায়-জীবন তুচ্ছ-এই বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে এইভাবে;—

"কুল-ধর্ম রাখিতে জীবন যদি যায়।
জীবনের সার্থকতা, ক্ষতি কিবা তায়?" (১২)

ভারতের জাতীয় সংহতির যথেষ্ট অভাব কবিকে আহত করেছিল। এই অনৈক্যের বিষয়টি 'বাদশাহের সমর- বিজয়' নামক কাব্যাংশে প্রকাশিত হয়েছে;—

"একতায় হিন্দু-রাজগণ,
সুখেতে ছিলেন অনুক্ষণ।
সে ভাব থাকিত যদি, পার হয়ে সিন্ধু নদী,
আসিতে কি পারিত যবন ?" (১৩)

'ক্ষত্রিয় দিগের প্রতি রাজার উৎসাহবাক্য' নামক কাব্যাংশে কবি ভীমসিংহের মুখ দিয়ে স্বাধীনতার প্রসঙ্গে বলেন;—

" স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।
কোটি কল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা, স্বর্গ-সুখ তায় হে,
স্বর্গ-সুখ তায়! (১৪)

— এই কাব্যাংশ সমকালের আত্মচেতনাপ্রাপ্ত বাঙালীকে পরাধীনতার জন্য গভীর ভাবে ভাবিয়ে তুলবে— সেকথা বলাই বাহুল্য । কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় চরম নৈরাশ্যবাদীর মতো নিরাশার মধ্যে কাব্যের সমাপ্তি ঘোষণা করেন নি । কাব্যের শেষে তিনি শুনিয়েছেন,— ভারতের চরম দুর্ভাগ্যের রাত্রি ভোর হয়ে এসেছে । সামনেই সুদিন আসার প্রবল সম্ভাবনা, তাই ভারতবাসীকে জাগতে হবে । কারণ উদার ইংরেজদের কৃপায় ভারতবাসী উনিশ শতকে পাশ্চাত্যের জ্ঞানালোকের অধিকারী হয়েছে, – এটা কবির কাছে মহৎ পাওনা বলেই বিবেচিত । তিনি বলেন;—

"ভারতের ভাগ্য জোর, দুঃখ-বিভাবরী ভোর ,
ঘুম-ঘোর থাকিবে কি আর ?
ইংরেজের কৃপাবলে, মানস-উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার ।।" (১৫)

কাব্যের শেষে কবি আত্মবিস্মৃত স্বজাতিকে জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য উৎসাহ দেন । কেননা, জাতীয় সম্মান রক্ষার দিন এখন আসন্ন প্রায় ।

কর্ম্মদেবী (১৮৬২) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত দ্বিতীয় আখ্যান কাব্য 'কর্ম্মদেবী'। এই কাব্যের কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেন রাজস্থানের ইতিহাস থেকে। বাংলায় সমৃদ্ধ কাব্য সৃষ্টি ও জাতির আত্মজাগরণ ঘটানোর মতো মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । সে বিষয়ে সফল হওয়ায় কবি আনন্দিত। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে কবি আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য 'কর্ম্মদেবী' কাব্যের প্রণয়ন করেন। 'কর্ম্মদেবী' কাব্যের ভূমিকায় কবি লিখেছেন—

> "সাহস পূর্ব্বক বলিতে পারি পদ্মিনী - প্রকাশের পর গত বৎসর-ত্রয়-মধ্যে আমাদিগের দেশীয় ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দর দায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে;" (১৬)

তিনি বাংলা কাব্যের আরো উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বলেন;— "সম্প্রতি বিশুদ্ধ গদ্যগ্রন্থ লিখনের যেরূপ উদ্যোগ হইতেছে, সেইরূপ সৎকবিতা জননার্থ যথাযোগ্য উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য।" (১৭) মধুসূদনের পূর্বে বাংলা কাব্য সম্বন্ধে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুচিন্তিত ভাবনা যথেষ্ট মূল্যবান। এজাতীয় সুচিন্তিত মতামতের জন্য রঙ্গ লাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের চিন্তানায়ক বলে দাবী করা যায় ।

'কর্ম্মদেবী' কাব্যটি ব্রাহ্মণ কথক ও কৌতূহলী শ্রোতার কথোপকথনের দ্বারা রচিত । কাব্যটির মূল

আখ্যান বীরশ্রেষ্ঠ যুবরাজ সাধুর সঙ্গে রাজকন্যার কর্ম্মদেবীর প্রণয় কাহিনী । 'কর্ম্মদেবী' কাব্যে কবি বিদেশী বণিকদের ভারতবর্ষে বাণিজ্য করার বিষয়টিকে কেন্দ্র করে স্বদেশবাসীর মনে স্বাজাত্যপ্রীতির উদ্বোধন করতে ইন্ধন যুগিয়েছেন ।

'কর্ম্মদেবী'কাব্যে প্রাচীন ভারতের গৌরবের নানা বিষয় ও সমকালের ভারতবর্ষের দুর্দশার লজ্জাজনক নানা চিত্র বর্ণনা কবির স্বদেশপ্রেম বিষয়ক মনোভাবের পরিচয় বহন করে। যেমন —

"হায় কোথা সেই দিন ,   ভেবে হয় তনু ক্ষীণ ,
এ যে কাল পড়্যেছে বিষম ।

— — —

কবে পুনঃ বীর-রসে ,   জগৎ ভরিবে যশে ,
ভারত ভাস্বর হবে পুনঃ ?" (১৮)

এই কাব্যের প্রথম সর্গে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য করতে না দেওয়ায় যে মানসিকতা নায়ক সাধুর মধ্যে প্রকাশিত, তা যেন উনিশ শতকের আত্মসচেতন অনেক শিক্ষিত বাঙালীরই মনের কথা। কেননা, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সচেতন বাঙালীরা বুঝতে পেরেছিলেন, মাতৃভূমি দীর্ঘদিন ধরে বহু বিদেশী বণিকের দ্বারা শোষিত, লজ্জিত ও পরাজিত। তাই যুবরাজ সাধু সমস্ত বিদেশী বণিকদের ষড়যন্ত্রকারী ও বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করেন। বণিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন;—

"হাজার মঙ্গলাব্রতে হয়ে এস ব্রতী।
বিশ্বাস না হবে আর তোমাদের প্রতি।।
এরূপ বাণিজ্যচ্ছলে কত জাতি এসে।
করিলেক প্রভুত্ব-স্থাপন নানাদেশে।।" (১৯)

সাধু বলেন — মাতৃভূমি ভারতবর্ষ নানা ধন-ঐশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ, বিদেশীদের এমন কিছু নেই — যা ভারতবর্ষকে দিতে পারে। কবির ভাষায়;—

"ভারতে না জন্মে যাহা, না জন্মে জগতে ।"(২০)

কিংবা,

"কি ছার বাণিজ্য-দ্রব্য এ দেশে এনেছ ?"(২১)

—পরিশেষে পরবর্তীকালের স্বদেশী ভাবধারায় বিশ্বাসী চরিত্রের মত কাব্যের নায়ক সাধু বলেন;—

"অন্য দেশে গতি বিধি প্রয়োজন নাই।
স্বধনে স্বদেশ ধনী হোক, এই চাই।।"(২২)

—এবং বিদেশী বণিকদের তাড়িয়ে দিয়ে বলেন —

"ধন আশে পুনঃ আর এস না এ দেশে।
যদি এস প্রতিফল পাবে তার শেষে।।" (২৩)

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্য-সাহিত্যের উৎকর্ষ সৃষ্টি করার অভিপ্রায়ের কথা মনে রেখেও এই সব বক্তব্য পাঠ করার পর বলতে হয়, 'কর্ম্মদেবী' কাব্যটি কবির স্বদেশ ভাবনারই কাব্যিক রূপ।

শূরসুন্দরী (১৮৬৮) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত তৃতীয় আখ্যান কাব্য 'শূরসুন্দরী'। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' ও 'কর্ম্মদেবী' কাব্য দু'টির দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করা ও কাব্যের আবেদনে স্বজাত্য বোধ জাগিয়ে তোলার সাফল্য কবিকে 'শূরসুন্দরী' কাব্য রচনায় উৎসাহিত করে। উদ্দেশ্য প্রণোদিত কাব্য 'শূরসুন্দরী' রচনা কার্যে সফল হওয়ার জন্য কাব্যের 'মঙ্গলাচরণ' নামক অংশে কবি কবিতাশক্তির প্রতি তথা কাব্যদেবীর প্রতি বন্দনা করেন। কবি কাব্যদেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেন;—

"করিয়াছ মম প্রতি কৃপা বারদ্বয়।
এবারেও যেন মম লজ্জারক্ষা হয়।।" (২৪)

—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিপূর্বে 'বিশুদ্ধ প্রণালী' তে কাব্য রচনা করে ও কাব্যের আবেদনে স্বদেশ ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সফল হয়েছেন। কবি কাব্যদেবীর নিকট প্রার্থনা করেন, ওই বিশেষ উদ্দেশ্যে যেন 'শূরসুন্দরী'কাব্যও সফল হয়; নইলে তাঁর লজ্জার পরিসীমা থাকবে না। লজ্জা রক্ষা করার জন্য আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। এই কাব্যের প্রধান চরিত্র শূরসুন্দরী, রাজস্থানের এক বীরাঙ্গনা। আকবর বাদশাহের নোংরা রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়ে 'শূরসুন্দরী' কিভাবে তার সতীত্ব রক্ষা করল ও স্বজাতীয় নারীর প্রতি বাদশাহের মানবিক মর্যাদা প্রদানের প্রতিজ্ঞাপত্র আদায় করল — এই বিশেষ কাহিনী এখানে চিত্রিত হয়েছে। বাদশাহ আকবর রাজপুত রমণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবেন, এই প্রতিজ্ঞা বীরাঙ্গনা শূরসুন্দরী আদায় করেছেন। কবির ভাষায়;—

"শান্ত হয়ে সতী কহে "তবে ক্ষমি আমি।
যদি এক প্রতিজ্ঞা করহ ক্ষিতিস্বামী।।
সত্য কর কোরাণ শরীফ শিরে ধরি।
লিখে দেহ নিজ পঞ্জা দস্তখৎ করি।।
যদবধি তুমি কিংবা তব বংশধর।
ভারতের সিংহাসনে থাকিবা ঈশ্বর।।
ছলে বলে কি কৌশলে দিল্লী-অধিকারী।
না আনিবে নিজপুরে রাজপুতনারী।।[২৫]

—'শূরসুন্দরী' কাব্যে দেশীয় নারী শূরসুন্দরীর গৌরব বর্ণিত হয়েছে।

কাঞ্চী কাবেরী (১৮৭৯) ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর একটি আখ্যান কাব্য 'কাঞ্চীকাবেরী'। কাব্যের কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে প্রতিবেশী প্রদেশ উৎকল থেকে। কবি ভারতের যেখানেই বীররসাত্মক গৌরবময় কাহিনীর সন্ধান পেয়েছেন, তাকেই কাব্যরূপ দিয়ে কাব্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে দেশানুরাগের অবেদন জানিয়েছেন। এই কাব্যের উৎসের মূলে আর একটি কারণ আছে, তা হল উৎকল দেশ সম্বন্ধে যারা অবজ্ঞা করত , তাদের মনের ভ্রমকে সঠিক পথে নির্দেশ করা। কবি বলেছেন;— "বস্তুতঃ উৎকলদেশ ঘৃণার্হ দেশ নহে!"[২৬] কবি যেন বলতে চেয়েছেন, এই উৎকল দেশের এক সময়কার প্রাচীন ঐতিহ্য ভারতবর্ষের যে কোনো প্রদেশের মানুষের গৌরব করার মতো বিষয়। এই কাব্যটিকে বলা যায়, ভারতের জাতীয় সংহতির কাব্য।

'কাঞ্চী কাবেরী' রচনা করার সময়ও কবি 'বিশুদ্ধ' সাহিত্য রচনার বিষয়টি ভুলে যান নি। এখানে আধুনিক রুচিবান ও ভাববাদী উভয় শ্রেণীর বাঙালী পাঠকের প্রতি কবির সমান দৃষ্টি ছিল। কবি ভূমিকায় স্বীকার করেছেন কাব্যটির অনেক স্থানে অলৌকিকতার সন্ধান পাওয়া যাবে, যা আধুনিক রুচিবান পাঠক-মনের অনুপযুক্ত। তবে দু'টি ভিন্ন রুচির উপযুক্ত করে কাব্যটি রচনা করার দিকে কবি লক্ষ রেখেছেন। তিনি বলেন, যাঁরা সাত্ত্বিক হিন্দু তাঁরা ভগবান জগন্নাথের আলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডে বিশ্বাস করতে পারেন; আর যারা আধুনিক যুক্তিবাদী তাঁরা জগন্নাথের আলৌকিক বিষয়টিকে বুদ্ধিমান রাজার সৈন্যদের মনোবল বাড়ানোর একটি রাজকীয় কৌশল বলে গ্রহণ করতে পারেন। এছাড়া নারী স্বাধীনতা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে একেশ্বরবাদের পরিচয় পাওয়া যায় , যা উনিশ শতকের মনের ফসল। যেমন, কবি পাশ্চাত্যের নারীর অবমাননাকে প্রকাশ করেছেন এই ভাবে;—

"সভ্য-শিরোমণি ফ্রান্স বিখ্যাত ভূতল ।
প্রজাতন্ত্রে তিরস্কৃত প্রমদামণ্ডল।।" (২৭)

এখানে ফ্রান্সের নারীদের পরাধীনতাকে কবি সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার শিক্ষিত শ্রেণীর একব্রহ্মে বিশ্বাসকে কবি ফুটিয়ে তোলেন এই ভাবে;—

"সকল দেবতা মাত্র কল্পনার ফল ।।
যিনি হরি , তিনি হর , তিনি প্রজাপ্রতি।
তিনি লক্ষ্মী সরস্বতী তিনিই পার্ব্বতী।।
পুনঃ পুনঃ উপদেশ দেয় চতুর্ব্বেদ।
পামর পাষণ্ডগণ করে সব ভেদ।।" (২৮)

এখানে বেদের এক ব্রহ্মকেই কবি উনিশ শতকের সচেতন মনের উপযুক্ত করে প্রকাশ করেছেন। ভারতের জাতীয় সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাশীল কবি আধুনিক যুক্তিবাদী ও ভাববাদীদের কাউকেই নিরাশ না করে মধ্যমপন্থীর মতো এখানে বলেন; — "এই উভয়বিধ বিশ্বাসের প্রতি আমার কিছুই বক্তব্য নাই।" (২৯) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'কাঞ্চী কাবেরী' রচনা কালে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করে কাব্যটি পরিবেশন করেন।

'কাঞ্চী কাবেরী' কাব্য রচনায় কবি প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে স্বদেশ ভাবনা প্রচার করতে ভোলেন নি।প্রথম সর্গে উড়িষ্যার নানা ঐতিহ্যের বর্ণনা করেন। হিন্দু জাতির গৌরবের কীর্তি ইংরেজ সরকারের লোভে ধ্বংস হওয়ার বিষয়টি স্মরণ করে বলেন;—

" হায় রে ইংরাজ রাজ , করিলি গর্হিত কাজ,
তোরা নাকি কীর্ত্তির প্রহরী ?
তবে কেন করি চূর, সেই বারোবাটীপুর ,
হিন্দুর গরিমা নিলে হরি ?" (৩০)

এখানে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজদের অন্যায় আচরণকে স্বদেশ প্রেমিকের মতো সমালোচনা করতে ছাড়েন নি। 'কাঞ্চীকাবেরী'র উৎকল প্রদেশের বীরত্বমূলক কাহিনী ঘুমন্ত জাতিকে জাগিয়ে স্বাধীনতার জন্য গর্জে ওঠার আহ্বানমূলক কাব্য হিসাবে গণ্য ।

মধুসূদন দত্ত

উনিশ শতকে স্বদেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধান চোখে পড়ার মতো। বাঙালী ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি ও জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সংস্কারের দ্বারা প্রগতি এনেছে। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) সাহিত্যকেই জীবনের ধ্যান-জ্ঞান করেছিলেন এবং তিনি নিজ প্রতিভা ও সাহিত্যজ্ঞান মিশ্রিত করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বলা যায়, বিদ্যাসাগরের সঙ্গে যেমন সমাজসংস্কার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে যেমন ধর্মসংস্কার অবিছিন্ন, বাংলা সাহিত্যের উৎকর্ষতার সঙ্গে তেমনি মধুসূদন দত্ত একটি উল্লেখযোগ্য নাম । বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যই যেন তাঁর আবির্ভাব। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন — "রাজা রামমোহন রায় ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধে যে বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, বাঙ্গালা কবিতা সম্বন্ধে মধুসূদন সেইরূপ করিয়াছিলেন, বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।" [৩১]

শিক্ষা জীবনের প্রথমে 'রামায়ণ', 'মহাভারত'-এর কাব্যরসে মধুসূদন মুগ্ধ হলেও হিন্দু কলেজে পড়তে এসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুরাগী হন। কবির এই সময়ের মনোভাব প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার বলেন;—"হিন্দু কলেজে পাঠের সময়, তিনি, বাঙ্গালা ভাষার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য, কখনও কখনও যে বলিতেন, যে "বাঙ্গালা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল";" [৩২] আসলে মধুসূদন ছিলেন সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তি। হিন্দু কলেজের পাশ্চাত্য সাহিত্য শিক্ষা তাঁর সহিত্যরস তৃষ্ণাকে তৃপ্তি এনে দিয়েছিল। তিনি তার প্রতিদান স্বরূপ ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। এই সময় থেকেই মধুসূদন স্বপ্ন দেখলেন ইংরেজী সাহিত্যে একজন বড় কবি হবেন। সেজন্য ইংরেজ-সংস্কৃতিকে অনুকরণ করলেন। যদিও সে অনুকরণ তাঁর অসংযমী জীবনাচরণকে প্রকাশ করেছিল । মধুসূদন সুরাপান প্রভৃতি ভোগবিলাসগ্রস্ত হয়ে অনেকটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। এই অবস্থায় তাঁর মনে হয়েছিল ইংরেজী ভাষায় কবি হওয়া বা ইংল্যাণ্ডে গমন করার পক্ষে হিন্দু সংস্কৃতি অন্তরায় হতে পারে। এভাবেই মধুসূদন বাঙালীর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরেজ সাজলেন। বিদেশিনীকে বিয়ে করতে দ্বিধা করলেন না। ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন;—

> "খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি মধুসূদনের আস্থা ছিল কিন্তু বিশেষ কোন টান ছিল না, বরং দেশের ধর্মানুষ্ঠানের প্রতি তাঁহার সহৃদয় অনুকূলতাই ছিল । শুধু সাহেব হইবেন এবং বিলাত যাওয়া সহজ হইবে এই ভাবিয়াই তিনি ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন।" [৩৩]

মাদ্রাজে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কবি হওয়ার স্বপ্নকে সার্থক করলেন 'Captive Ladie, Visions of the Past' লিখে। কিন্তু মধুসূদন যতখানি প্রশংসা আশা করেছিলেন তা তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। এই সময় বেথুন সাহেবের মত ব্যক্তি তাঁকে মাতৃভাষা চর্চার জন্য উপদেশ দেন। বন্ধু গৌরদাস বসাক বাংলা সাহিত্য অনুশীলনের

জন্য তাঁকে সব সময়ই পরামর্শ দিতেন। 'Captive Ladie, Visions of the Past'-এর অনাদর, বেথুন সাহেব ও বন্ধু গৌরদাসের বাংলা ভাষা চর্চার অনুরোধ ও প্রেরণা মধুসূদনকে বেশ ভাবিয়েছিল। যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন; — " 'ক্যাপটিভ লেডী' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ইংরাজী সাহিত্যেরই অনুশীলন দ্বারা তিনি অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিতে পারিবেন; কিন্তু এখন হইতে তাঁহার সে ভ্রম দূরীভূত হইল।"(৩৪) এমন সময় বন্ধু গৌরদাস বসাক তাঁকে কলকাতায় ফেরার পরামর্শ দেন। কলকাতায় এলে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রমুখ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির সহযোগিতা মধুসূদনের বাংলা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে বেশ কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিল। বেলগাছিয়া রঙ্গমঞ্চ কর্তৃপক্ষের অনুরোধে 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজী অনুবাদ করতে গিয়ে বাংলা সাহিত্যের অনুৎকর্ষতা তাঁকে আহত করে। তাঁর প্রথম নাটক 'শর্মিষ্ঠা'র (১৮৫৯) প্রস্তাবনা (অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়ে, বঙ্গে(৩৫))-য় এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাংলা নাট্য সাহিত্যের অনুৎকর্ষতা দেখে মধুসূদন বাংলায় শিল্প সমৃদ্ধ নাটক লেখার পরিকল্পনা করেন। কিছু দিনের মধ্যেই লেখেন শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন দত্তের এভাবেই পদার্পণ ঘটে। সময় থাকতেই মধুসূদন বিদেশী ভাষায় অমর আসন লাভ করার বাসনা ত্যাগ করেন। প্রথম জীবনে মাতৃভাষার প্রতি অনাদরের জন্য 'বঙ্গভাষা' কবিতা (হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;—(৩৬))-য় তিনি অনেক অনুশোচনাও করেছিলেন।

কবি দেখলেন, বঙ্গভাষার ভাণ্ডারে 'বিবিধ রতন' আছে, কিন্তু 'রতন' কে সমৃদ্ধ সাহিত্যে উন্নীত করার মতো প্রকৃত শিল্পীর অভাব। বাংলার নাট্য সাহিত্যের দুর্দশা মোচনের জন্য কলম ধরার পরেই তার মনে হয়েছে বিশ্বসাহিত্যের আঙিনায় বাংলা সাহিত্য খুবই দরিদ্র। বাংলা কাব্যের দরিদ্র-দশা মোচনের জন্য তিনি একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেন। কাব্যানুরাগী যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা করার সময় মধুসূদন বলেছিলেন বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করা জরুরি। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাংলা ভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রয়োগের ব্যাপারে কিঞ্চিৎ সন্দেহ করলে মধুসূদন বলেন—

> "আমাদিগের ভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ প্রবর্ত্তিত হইতে পারে কি না, আমি আপনাকে তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখাইতে প্রস্তুত আছি। যদি আমি স্বয়ং অমিত্রচ্ছন্দ কোন গ্রন্থ রচনা করিয়া আপনাকে দেখাই, তাহা হইলে আপনি কি করিবেন?" (৩৭)

ডঃ সুকুমার সেনের মতে;— "যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে যেন বাজি রাখিয়া মধুসূদন বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ চালাইতে ঝোঁক ধরিয়াছিলেন। এই ঝোঁকের ফল বাঙ্গালা কবিতায় যুগান্তর-সংঘঠন।" (৩৮) কিছুদিনের মধ্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে "তিলোত্তমা সম্ভব" (১৮৬০) নামক একখানি কাব্যগ্রন্থ লিখে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে

উপহার দিয়ে বলেন;— "... আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই উপস্থিত হইবে, যখন এদেশের সর্ব্বসাধারণ জনগণ, ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে, মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়া, চরিতার্থ হইবেন।[৩৯] আজন্ম সাহিত্যের রসিক, সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মধুসূদনের এই ধারণা ব্যর্থ হয় নি। তাঁর জীবনীকার লিখেছেন;— "'তিলোত্তমাসম্ভব' হইতে বাস্তবিকই বাঙ্গালা সাহিত্যে এক উন্নততর যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।"[৪০] বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নই মধুসূদনের লক্ষ্য, তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ এরকম মনোভাবের পরিচয় পাওয়া য়ায়। মধুসূদন কাব্যদেবীকে বলেছেন;—

"কিন্তু, হে সারদে , দেবি বিশ্ববিনোদিনি,
তব বলে বলী যে , মা, কি অসাধ্য তার
এ জগতে ? উর তবে, উর পদ্মালয়া
বীণাপাণি! কবির হৃদয়-পদ্মাসনে
অধিষ্ঠান কর উরি ! কল্পনা-সুন্দরী—

হৈমবতী কিঙ্করী তোমার, শ্বেতভুজে ,
আন সঙ্গে ,শশিকলা কৌমুদী যেমতি ।
এ দাসেরে বর যদি দেহ গো, বরদে ,
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, এ ভারতভূমি
শুনিবে, আনন্দার্ণবে ভাসি নিরবধি ,
এ মম সঙ্গীতধ্বনি মধু হেন মানি!" [৪১]

—এ যেন কাব্যলক্ষ্মীর নিকট কবির প্রার্থনা-সঙ্গীত । কবি কাব্যলক্ষ্মীর করুণা লাভ করতে চেয়েছেন। কবির প্রতি কাব্যলক্ষ্মীর করুণা বর্ষিত হলে মাতৃভাষা সমৃদ্ধ হবে, তাতে দেশবাসী বিশুদ্ধ কাব্যরস পানের সুযোগ পাবে। মাতৃভাষায় সমৃদ্ধ কাব্য রচনার বাসনা মধুসূদনের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মেঘনাদবধকাব্য' গ্রন্থেও লক্ষ করা যায়।প্রথম সর্গে কাব্যের বিষয় ও উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে ।

"গাইব, মা, বীররসে ভাসি,
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।
—তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন- মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র," [৪২]

—মধুসূদন বীররসে কাব্য লিখতে চেয়েছেন, যা অভিনব না হলেও পুরাতন নয়। কেননা, ইতিপূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) -এ বীররসের অবতারণা হয়েছিল। তাছাড়া বাঙালীকে প্রচলিত কাব্যরস থেকে অব্যাহতি দিয়ে অভিনব রসে অভিনব সাহিত্য হিসাবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'কে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান দিতে চেয়েছেন। কবি স্পষ্ট করেই বলেছেন— বাঙালীকে বিশুদ্ধ সাহিত্যরস দানের জন্য 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচিত হয়েছে। মধুসূদনের ভাষায়;—

"গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" (৪৩)

—এই কাব্যাংশটির দ্বারা সে কথাই প্রমাণিত হয়। মধুসূদন ভারতবাসীর চির পরিচিত 'রামায়ণ' থেকে কাব্যের কাহিনী সংগ্রহ করলেও তাঁর কবি প্রতিভার দ্বারা অভিনবত্ব আনতে সক্ষম হয়েছেন। দেশী বিদেশী সাহিত্যে অভিজ্ঞ মধুসূদন কাব্যটিতে বিদেশী শত্রুর আক্রমণে বিপর্যস্ত রাবণের করুণ চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের দ্বারা কাব্যটির ভাবের গভীরতা সৃষ্টি হয়েছে ।

মধুসুদনের বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করার মনোভাবটি আরো স্পষ্ট করতে হলে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'বীরাঙ্গনা কাব্য', (১৮৬২) ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র উল্লেখ করতে হবে। 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' গীতিকাব্য নামক অধ্যায়ে আলোচনা করায় এখানে বীরাঙ্গনা কাব্যটির আলোচনা করা হবে। 'বীরাঙ্গনা কাব্য' রচনার রীতি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। এই কাব্যে 'দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা', 'সোমের প্রতি তারা', 'দ্বারকনাথের প্রতি রুক্মিণী', 'দশরথের প্রতি কেকয়ী', 'লক্ষ্মণের প্রতি শূর্পনখা', 'অজুর্নের প্রতি দ্রৌপদী', 'দুর্যোধনের প্রতি ভানুমত্রী', 'জয়দ্রথের প্রতি দুঃশলা', 'শান্তনুর প্রতি জাহ্নবী', 'পুরুরবার প্রতি উর্বশী', 'নীলধ্বজের প্রতি জনা'পত্র লিখেছে। এই এগারো জন নায়িকার তাদের স্বামী, প্রেমিক বা প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে রচিত পত্রও যে কাব্য হতে পারে, তা সে দিনের বাঙালী পাঠকের কাছে বিস্ময়। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন;— "সুপ্রসিদ্ধ রোমক কবি ওভিদের (Ovid) বীরপত্রাবলীর (Heroic Epistles) আদর্শে মধুসূদন তাঁহার 'বীরাঙ্গনা-কাব্য' প্রণয়ন করিয়াছেন।" (৪৪)

মধুসূদন দত্তের 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' ও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর কাহিনী স্বদেশের স্বাধীনতার লড়াই, তবুও তাঁর সমকালে তিনি খুব জনপ্রিয় কবি ছিলেন না। কাব্যগ্রন্থ দু'টির কাহিনীর সমকালের পাঠকের মনে পরাধীনতার গ্লানি জাগিয়ে তোলার সম্ভাবনা ছিল। যদিও তা সমকালে সার্থকতা পায়নি । মধুসূদনের কাব্যে বিদেশী কাব্যের প্রভাব, কবির খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও বিজাতীয় সংস্কৃতি অনুকরণের মত বিষয়গুলি অনেক পাঠকের মনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল । সজনীকান্ত দাস বলেন;— "বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া বিবেচিত

ইইয়া থাকে, কাহারও কাহারও মতে শাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য হিসাবে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপরেও ইহার স্থান।"[৪৫] এখানে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্যকে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর উপরে স্থান দেওয়ার কারণ হল মধু কবির বিদেশী সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতি সমর্থন।

কিন্তু মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' তথা তাঁর অন্যান্য রচনায় কেবল স্বদেশের প্রতি অবজ্ঞা ও বিদেশীর আচার সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগই প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। মধুসূদন-সাহিত্যের আলোচনা করলে কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়ার যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, মধুসূদন বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য কলম ধরেছিলেন। সাহিত্য অধ্যয়ন ও অনুশীলন ব্যতীত তাঁর জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এরকম একজন সাহিত্য-পিপাসু মানুষ প্রথম জীবনেই ইংরেজী তথা বিদেশী সাহিত্য রস আস্বাদন করে তৃপ্ত হয়েছিলেন। এবং স্বপ্ন দেখেছিলেন —এই তৃপ্তিদায়ক ইংরেজী সাহিত্যে তিনি অমর আসন লাভ করবেন। কিন্তু তাঁর স্বপ্ন যে সার্থক হবার নয়,— সেকথা বুঝতে পেরে তিনি মাতৃভাষা অনুশীলনে মগ্ন হন। মাতৃভাষাকে ভাবের গভীরতা, রসের বৈচিত্র্য ও প্রকরণে অভিনবত্ব এনে বাংলা সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্তন করেন। —এ তো বাংলা সাহিত্যের জগতে এক বিরাট পাওনা। মধুসূদনের কাব্যের বিষয়ও স্বদেশীয় ভাবনার অনুকূল। উনিশ শতকের প্রকৃত শিক্ষার চেতনা বাঙালীকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরাধীনতার গ্লানি বাঙালীকে আহত করত। এরকম একটি পটভূমিতে 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'-এ দেবরাজ ইন্দ্রের স্বাধীনতার জন্য লড়াই পরাধীন পাঠককে উৎসাহ দেবে। 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর ক্ষেত্রেও ওই একই যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়। যদিও 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর কাহিনী চিরাচরিত ভারতীয় বিশ্বাসকে আঘাত হেনেছে। অর্থাৎ যে রাম, লক্ষ্মণ দেবতা হিসাবে পরিচিত সেই রাম, লক্ষ্মণকে মধুসূদন কাপুরুষ, স্বাধীনতা হরণকারী হিসাবে অঙ্কন করেছেন। অন্যদিকে রাবণ ও মেঘনাদকে বীর ও দেশপ্রেমিক চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করেন। সেদিনের অনেক পাঠক মধুসূদনের এরকম কাহিনী ভালো মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। আমরা এসব বিতর্কে না গিয়ে বলতে পারি — মধুসূদন কিন্তু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সমৃদ্ধ সাহিত্য হিসাবে 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর আবেদন স্বীকার করতেই হবে। কবি রাবণের জীবনের ট্র্যাজিক পরিণতি অঙ্কন করতে চেয়েছেন। একদা সৌভাগ্যশালী রাবণ নিয়তির ষড়যন্ত্রে ধীরে ধীরে সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়ার আবেদনই কাব্যটির মূল আকর্ষণ। এখানে বিদেশী সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক মধুসূদন, বিধর্মী কবি মধুসূদন, ভারতীয় চিরাচরিত বিশ্বাসে আঘাতকারী মধুসূদনের কথা ভুলে সাহিত্যরস পিপাসু মন নিয়ে কাব্যটি পাঠ করলে আমাদের মনে হবে 'মেঘনাদবধকাব্য'-এর কবি বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্যই এরকম অভিনব কাব্য সৃষ্টি করেছিলেন। তাছাড়া কবি সীতা হরণের মতো পাপাচারকে মেনে নেন নি। চিত্রাঙ্গদা স্বামী রাবণের এই পাপাচারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে;—

"কিন্তু ভেবে দেখ , নাথ , কোথা লঙ্কা তব;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন্ লোভে, কহ , রাজা , এসেছে এ দেশে
রাঘব ?" (৪৬)

—রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের মতো ঘৃণ্য কাজের নিন্দা করা হয়েছে । এবং বলা হয়েছে রামচন্দ্র সেজন্যই রাবণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। আসলে মধুসূদন যুদ্ধের মূল কারণকে গৌণ করে স্বদেশ রক্ষায় রাবণের ট্র্যাজিক পরিণতিকে মুখ্য করেছেন । 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর অনেক অংশে দেশপ্রেমের স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। —যা অনেক সময় কবি মনের দেশানুরাগকেই প্রকাশ করে। যেমন --

"জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়; শতধিক্ তারে!"(৪৭)

—জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করা একটি পবিত্রতম কাজ । এখানে জন্মভূমি রক্ষা করতে গিয়ে প্রাণ ত্যাগ করার জয়গান গাওয়া হয়েছে । এবং যে ব্যক্তি এই মহৎ কর্মে বিরত হয় তাকে মুর্খের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । কিংবা দেশ যখন বিপন্ন , বিদেশী শত্রু দেশের স্বাধীনতা হরণ করতে তৎপর তখন কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক ভোগবিলাসে মগ্ন থাকতে পারে না । ইন্দ্রজিত বলেন;—

"হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা , হেথা আমি বামাদল মাঝে ?" (৪৮)

—ইন্দ্রজিতের শিক্ষা বা চেতনা নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে। কেননা স্বদেশ আক্রান্ত; —এ সময় তাঁর মত বীরপুরুষের ভোগবিলাসে মগ্ন থাকাটা নৈতিক ভাবে অন্যায় । 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এ দেশপ্রেমের আরো সুগভীর ভাবনা রয়েছে ষষ্ঠ সর্গে ইন্দ্রজিতের বক্তব্যে । যে বক্তব্য গুলি শুধুমাত্র ইন্দ্রজিতের বক্তব্য মনে হবে না, সেই বক্তব্য যেন স্বয়ং কবি মধুসূদনের। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর মেঘনাদ চরিত্র কে একটি আদর্শ চরিত্র হিসেবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। সে জন্য চরিত্রটির প্রতি তাঁর সহানুভূতি বা শ্রদ্ধার অভাব ছিল না । কবি এই চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ভেবেছেন । এর সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য মধুসূদনেরই লেখা কয়েকটি চিঠির উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা এই চিঠিতে কবি মধুসূদন ইন্দ্রজিৎকে তাঁর আন্তরিক চরিত্র হিসাবেই উল্লেখ করেছেন । "...I am going to celebrate the death of my fevourite Indrajit" (৪৯) কিংবা রাজনারায়ণ বসুকে লেখা আরেকটি চিঠিতে মেঘনাদ ও কবির একাত্ম হওয়ার কথা

জানা যায় —

> "A few hours after we parted, I got a severe attack of fever and was laid up for six or seven days. It was a struggle whether Meghanad will finish me or I finish him. Thank Heaven. I have triumphed. He is dead, that is to say, I have finished the VI Books in about 750 lines. It cost me many a tear to kill him."(৫০)

অতএব মেঘনাদ চরিত্রটি কবির প্রিয় চরিত্র। এই প্রিয় চরিত্রের কোন রকম কলুষতা থাকতে পারে না। মেঘনাদ এমন কোন কাজ করবে না যা কবির অপছন্দ। অর্থাৎ মেঘনাদের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ কবি মধুসূদনের স্বীকৃত। মেঘনাদ স্বদেশকে ভালবেসেছিল, এই স্বদেশ-বৎসলতাও কিন্তু মধুসূদনের অনুমোদন প্রাপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক । মেঘনাদ যখন বিভীষণকে উদ্দেশ্য করে বলে;—

" ধর্মপথগামী ,
হে রাক্ষসরাজানুজ , বিখ্যাত জগতে
তুমি;— কোন্ ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, -এসকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পরজন, গুনহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা!" (৫১)

—এই বক্তব্যে মেঘনাদের স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বসমাজের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে মেঘনাদ চরিত্রের মুখ দিয়ে কবি নিজের মনের কথাটিই যেন বলেছেন। কবির এই মনের গোপনতম সংবাদটি যেকোন দেশের যে কোন কালের মানুষকে দেশানুরাগের মহৎ মন্ত্রে উজ্জীবিত করবে ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের বা মহাকাব্যের কবি হিসাবে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৩৮ -১৯০৩)। তাঁর এই শ্রেণীর বিখ্যাত দুটি কাব্যগ্রন্থ 'বীরবাহু' (১৮৬৪) ও 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড ১৮৭৫, ২য় খণ্ড ১৮৭৭) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে। 'চিন্তাতরঙ্গিনী' (১৮৬১) লিখে ইতিমধ্যে কাব্য চর্চায় হাত পাকিয়েছেন। এরপর একে একে 'বীরবাহু' (১৮৬৪), 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড ১৮৭৫ ও ২য় খণ্ড ১৮৭৭), 'আশাকানন'

(১৮৭৬), 'দশমহাবিদ্যা' (১৮৮২) এছাড়া অনুবাদ কাব্য — 'ছায়াময়ী' (১৮৮০), 'নলিনী বসন্ত' (১৮৭০), 'রোমিও জুলিয়েত' (১৮৯৫) রচনা করেন এবং হেমচন্দ্র তাঁর প্রতিভার দ্বারা আরো বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন— 'কবিতাবলী' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ১৮৭০, ১৮৮০) দুই খণ্ডে এবং 'চিত্তবিকাশ' (১৮৯৮) নামে গীতিকাব্য গ্রন্থ রচনার দ্বারা।

এখানে হেমচন্দ্রের রচিত কয়েকটি আখ্যানকাব্যের আলোচনা করে বাঙালীর আত্মবিকাশে সেগুলির গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট করা হবে ।

বীরবাহু ঃ

সমগ্র মধ্যযুগ তো বটে, এমন কি আধুনিক যুগেও বহুদিন এই বীরভূমি ভারতবর্ষ পরাধীন। অথচ প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষের শৌর্য বীর্য ভুবন-বিখ্যাত ছিল। এদেশে আধুনিক ভাবধারা প্রচারে স্বজাতির ঐতিহ্যে গর্বিত ইতিহাস সচেতন কবি হেমচন্দ্র প্রাচীনকালে হিন্দু বীরের একটি কল্পিত কাহিনীকে কাব্যরূপ দিতে চেয়েছিলেন। কাব্যের বিজ্ঞাপনে তিনি স্বীকার করেন; —"পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কেবল তাহারই দৃষ্টান্তস্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।" (৫২) 'বিজ্ঞাপন' থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়— আত্মভোলা বাঙালীকে জাতির প্রাচীন ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলাই ছিল কাব্যটি রচনার উদ্দেশ্য।

কাব্যটির কাহিনী দেশানুরাগ মূলক। বীরবাহু আত্মভোলা হয়ে যাবতীয় সুখভোগে রত ।এক সন্ন্যাসিনী এসে তাঁকে কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সচেতন করে। ইতিমধ্যে বিদেশী 'ম্লেচ্ছ' তাঁর রাজ্য দখল করার জন্য এগিয়ে আসে। অকস্মাৎ সচেতন বীরবাহু বিদেশীদের হাতে হারায় রাজ্য, রাজধানী এমন কি পত্নী হেমলতাকেও। এরকম চরম বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে বীরের মতো যুদ্ধ করার জন্য বীরবাহু দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

তাঁর ভাষায়—

> "যত দিন ম্লেচ্ছহীন না হইবে দেশ
> তত দিন না ছাড়িব সংগ্রামের বেশ।।" (৫৩)

স্বদেশভূমি পরাধীন, এ যন্ত্রণা তাঁকে দগ্ধ করে। সে জন্য স্বদেশ প্রাণ বীরবাহু দেশমাতৃকার উদ্দেশ্যে বলেন;—

"মা গো ও মা জন্মভূমি! আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবন দল, বল আর কত কাল ,
নিদয় নিষ্ঠুর মনে নিপীড়ন করিবে ।।" (৫৪)

—বীরবাহুর অকৃত্রিম দেশপ্রেম ও দেশোদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত বাস্তব রূপ পায়। বীরবাহু বীরের মতো যুদ্ধ করে দেশের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ।

'বীরবাহু' কাব্যের এই কাহিনী পাঠ করে আমাদের বুঝতে এতটুকু অসুবিধা হয় না, কাব্যটি উনিশ শতকের আত্মবিস্মৃত জাতির হারানো গৌরব উদ্ধারের মহৎ প্রেরণার কথা ।

বৃত্রসংহার কাব্য (১৮৭৫, ১৮৭৭)ঃ

এহমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' বাংলা সাহিত্যের আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য ধারার ইতিহাসে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্য হিসাবে পরিচিত। কাব্যটি প্রসঙ্গে সজনীকান্ত দাস বলেন;—

"ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে মধুসূদন, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাহিনী কাব্যগুলি লইয়া বিস্তর বাক্‌বিতণ্ডা ও তর্কজালের সৃষ্টি হইয়াছিল; আজ অর্ধশতাব্দীরও অধিককাল পরে সাময়িকপত্র ও সমালোচনাগ্রন্থের বিপুল বাক্যোচ্ছ্বাস হইতে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিতে পারি যে, সাময়িক ভাবে হেমচন্দ্রের কবি-যশ সর্বগ্রাসী হইয়া উঠিয়াছিল এবং তিনি বঙ্গের শ্রেষ্ঠ মহাকবিরূপে প্রতীত হইয়াছিলেন।" (৫৫)

একথা ঠিক সাময়িক ভাবে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রেষ্ঠ কবির মর্যাদা পেয়েছিলেন। আমরা আলোচনা করব যে বৃত্রসংহার কাব্যটির মূল বিষয়বস্তু।এবিষয়ে তারাপদ মুখোপাধ্যায় সুচিন্তিত মতামত দিয়েছেন।তাঁর ভাষায়;—

"বৃত্রসংহার হেমচন্দ্রের কবি-জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিপতাকা। মধুসূদনের মেঘনাদ-বধ কাব্যের ক্লাসিক কল্পনার সিংহদ্বার যাহারা উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই, এই কাব্যের বজ্র-গম্ভীর ও ললিত মধুর শব্দমন্ত্র এবং উদাত্ত সঙ্গীত ধর্ম্ম যাহাদের হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে পারে নাই, তাহারা বৃত্র-সংহারের বাহ্যাড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়াছে। বৃত্র-সংহার যেন মেঘনাদ-বধ কাব্যের শিশু সংস্করণ। তাই রস ও রুচি যাহাদের খুব সূক্ষ্ম নয়, তেমন রসিকেরাই বৃত্র-সংহারের ন্যায় কৃত্রিম আড়ষ্ট কাব্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছে।" (৫৬)

তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের উক্ত সিদ্ধান্ত যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মধুসূদন দত্তকে অতিক্রম করতে পারেন নি। বরং প্রতি পদক্ষেপে অনুকরণ করেছেন। যেখানে অনুসরণ করেন নি সেখানেই তাঁর দুর্বলতা ও মৌলিকতা। এবিষয়ে তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন;—

> "মেঘনাদ-বধ কাব্যের যে অংশটুকু গ্রহণ করিলে যুগমনের নিকট হইতে বাহবা পাওয়া যাইবে, তিনি কেবল সেই বাহ্য কাব্য-কৌশলটুকু গ্রহণ করিলেন। ...ইহাতে মেঘনাদ-বধের উত্তাপ আছে, কিন্তু আদর্শ নাই; ইহা মেঘনাদ-বধের যুগোপযোগী বাঙ্গালী সংস্করণ। সে যুগ এই কাব্য কঙ্কালকে সমাদরের সহিত অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে। কিন্তু ইহা প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়। হেমচন্দ্র তাঁহার যুগের কাছে নিজের আসন উচ্চ করিতে গিয়া মধুসূদনকে প্রতারণা করিয়াছেন;" (৫৭)

সেদিনের পাঠকের একটি অংশ মধুসূদনের শৃঙ্খলাহীন জীবনকে মেনে নেয় নি। মধুসূদনের পরেই আবির্ভাব হেমচন্দ্রের। সেজন্য যেখানে হেমচন্দ্রের দুর্বলতা ও মৌলিকতা ঠিক সেই বিষয়গুলি পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়েছে। তারা বিদেশী সংস্কৃতি ঘেষা মধুসূদনের পাশে দেশীয় সংস্কৃতি অনুরাগী কবির আবির্ভাবে পুলকিত। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ পাঠকের ভাল লাগার বিষয়গুলি হল ; -

১। কাহিনী নির্বাচন

২। জাতীয় ভাবাবেগের প্রতি কবির শ্রদ্ধা

৩। পরাধীনতার গ্লানি

৪। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য মত ও পথের অবতারণা।

ভারতের অধিকাংশ মানুষ হিন্দুধর্মাবলম্বী। তারা পুরাণে জেনেছেন — ভারতবর্ষ দেবভূমি। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এর বিষয় পরাধীন দেবভূমির স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা ও সাফল্য। নায়ক ইন্দ্র, তিনি সিংহাসনচ্যুত। ইন্দ্রসহ সমস্ত দেবতার কঠোর পরিশ্রমে পুনরায় স্বর্গভূমি উদ্ধার হয়। হেমচন্দ্রের এই জাতীয় কাহিনী সমকালে অধিকাংশ পাঠকের নিকট আদরণীয় হয়। তাঁরা যেন এই কাহিনীর মধ্যে তাঁদের স্বভূমি ভারতবর্ষের পরাধীনতাকে অনুভব করেন। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ এই কাহিনী উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের অনুকূল।

হেমচন্দ্র যখন বৃত্রসংহার কাব্য লিখছিলেন, তখন স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি সচেতন বাঙালী অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। ধর্ম, সাহিত্য, দর্শন ও নানামুখী জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের

শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত। সচেতন বাঙালী আর যাই হোক প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্যকে পরশমণির মতো ভাবতেন। ইতিপূর্বে- 'মেঘনাদবধ কাব্য '-এ মধুসূদন বাঙালীর তথা ভারতের প্রাণের সামগ্রী রামচন্দ্রকে বর্বর কাপুরুষ চরিত্র রূপে সৃষ্টি করেন; কিন্তু হেমচন্দ্র মধুসূদনের পথে না গিয়ে ইন্দ্র ও দেব চরিত্রের মহিমাকে স্বীকৃতি দেন। পাঠকের কাছে কবির এজাতীয় চিন্তা চেতনা যথেষ্ট সমাদর পেয়েছে। আসলে হেমচন্দ্র ধর্মের জয় বা জাতীয় ভাবাবেগে আস্থা দেখিয়েছেন। মধুসূদনের মত কাব্য শিল্প সমৃদ্ধির স্বার্থে নতুন কোন জীবনদর্শন উপস্থাপন করেননি । মধুসূদনের থেকে এখানেই তাঁর মৌলিকতা বা দুর্বলতা যা তাঁকে সমকালে বিখ্যাত করেছিল ।

একটি জাতির স্বাধীনতা বা পরাধীনতার বিষয় নির্ভর করে জাতীয় চেতনার উপর। বাস্তবিক কোন জাতি পরাধীন হয়েও যদি পরাধীনতার গ্লানি জাতির মনে দানা না বাঁধে, তবে সেই জাতির স্বাধীনতা দূর অস্তমিত। পরাধীনতার গ্লানি অনুভবের অর্থ জাতির রাজনৈতিক সচেতনতা। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এর দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গের সিংহাসন থেকে বিতাড়িত। তিনি সুমেরু প্রদেশ স্বভূমি উদ্ধারের চিন্তায় মগ্ন। সেখানে নিয়তি দেবীকে পূজায় তুষ্ট করে কি উপায়ে মাতৃভূমি উদ্ধার করা যায় তা জানতে চাইলেন। ইন্দ্র বলেন—

" কহ শুদ্ধ কি উপায়ে হইবে নিহত
দৈত্যকুলপতি বৃত্র; কত দিনে পুনঃ
সুরবৃন্দ সহ ইন্দ্র স্বর্গে প্রবেশিবে ,
কত দিনে পূর্ণ হ'বে দেবের দুর্গতি?" [৫৮]

ইন্দ্র পরাধীনতার যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন । সে জন্য এই পরাধীনতা থেকে মুক্তির উপায় জানার জন্য তিনি ব্যাকুল। এদিকে সূর্যদেব বৃত্রের কাছে দেবতাদের পরাজয়কে এক চরম অপমান মনে করেন। তার ভাষায়—

" ধিক্ লজ্জা ! অমরের এ বীর্য্য থাকিতে ,
নিষ্কন্টকে স্বর্গভোগ করে বৃত্রাসুর !
সুখে নিদ্রা যায় নিত্য দেবে উপেক্ষিয়া,—
স্বর্গ-বিরহিত দেব চিন্তায় ব্যাকুল!" [৫৯]

সমস্ত দেবদেবী স্বর্গ থেকে বিতাড়িত। দেবদেবীহীন স্বর্গের সুখভোগের অধিকারী বৃত্র ও তার দলবল। ইন্দ্র পত্নী শচীদেবী দানব দলের স্বর্গভোগের চিন্তায় ব্যথিত। বিশেষত তাঁর শয়নাগারের প্রসঙ্গে তিনি বলেন; —

"হায় লজ্জা ! চপলা রে, আমার শয়নাগারে ;
অমর পরশে নাহি যাহা ,
ইন্দ্র বিনা সে শয়ন, না ছুঁইলা কোন জন ,
বৃত্রাসুর পরশিলা তাহা !
ধিক্ লজ্জা ধিক্ ধিক্ , কি আর কব অধিক ,
এ পীড়ন সহি লো এ প্রাণে ! " (৬০)

শচীদেবীর এ পীড়ন পরাধীনতার গ্লানিরই নামান্তর ।

কোন বৃহৎ ও মহৎ কাজ করতে হলে চাই একনিষ্ঠতা ও ত্যাগ। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ এই দু'টি বিষয়ই স্পষ্ট। কি উপায়ে পুনরায় স্বভূমি উদ্ধার করা সম্ভব তা জানার জন্য দেবরাজ ইন্দ্র 'কুমেরু শিখরে ধ্যানে মগ্ন। বহুকাল অতিবাহিত হওয়ার পরেও নিয়তিদেবীর সাক্ষাৎ না পেলেও তিনি হতাশ হন নি। তাঁর ভাষায়;—

" অন্য চিন্তা, আশা, ইচ্ছা, সব পরিহরি,
বৃত্রের বিনাশ কিসে জানিব নিশ্চিত ।"(৬১)

—সুগভীর একনিষ্ঠতা থাকলে সাফল্য আসতে বাধ্য । কবি বলেন ; —

"এত কহি আয়োজন করে পুরন্দর
বসিতে পূজায় পুনঃ ; নিয়তি তখন
আবির্ভাব হৈলা আসি সম্মুখে তাঁহার " (৬২)

দেবরাজ পুত্র জয়ন্ত যুদ্ধের কষ্টকে মূল্য দিতে চান না। তিনি স্বর্গ উদ্ধার ও বন্দী মাকে মুক্তির জন্য যুদ্ধ করে চলেছেন। দৈত্য বিনাশে তিনি একনিষ্ঠ। শচীদেবী বলেন —

"জননী, ছাড়িব তোমা ? যাতনার ভয় ?
চিন্তা দূর কর, স্থির হও গো জননী ;
আশীর্ব্বাদ কর পুত্রে বাসবঘরণি ;
পারিব ধরিতে বক্ষে আরো লক্ষবার
তব আশীর্ব্বাদে শিবত্রিশূলপ্রহার !' (৬৩)

—জয়ন্তের কাছে শিবের ভয়ঙ্কর ত্রিশূলের যন্ত্রণাও তুচ্ছ হয়ে উঠেছে।

পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্য চাই অনেক ত্যাগ। পরহিতে ত্যাগ একটি পবিত্রতম কাজ। 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ দেবরাজ ইন্দ্রের স্বভূমি উদ্ধারের জন্য ঋষি দধীচিকে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। দধীচি জানেন, পরহিতে ত্যাগ একটি শুভ কাজ। তাঁর দেহত্যাগের প্রশ্নে শিষ্য মণ্ডলী কাতর হলে, তিনি বলেন;—

"কি কারণ-,
হে বৎসমণ্ডলি, হেন সৌভাগ্যে আমার
কর সবে অশ্রুপাত ? এ ভব-মণ্ডলে
পরহিতে প্রাণ দিতে পায় কত জন !
হিতব্রত সাধনেতে হৃদয়ে বেদনা ?
হায় রে অবোধ প্রাণী—এ নশ্বর দেহ
না ত্যাজিলে পরহিতে কিসে নিয়োজিবে?
লভি জন্ম নরকুলে কি ফল হে তবে?" (৬৪)

দধীচি তাঁর শিষ্যদের পরহিতে উৎসাহিত করেছেন। এখানে পরহিতে ত্যাগ ধর্মের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। অর্থাৎ 'বৃত্রসংহার কাব্য'-এ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য একনিষ্ঠতা ও ত্যাগের বিষয়টি স্বীকৃত।

উনিশ শতকের সচেতন অনেক বাঙালী জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত। তাঁরা পরাধীনতার যন্ত্রণায় ব্যথিত। ঠিক এমন সময় পরাধীনতাকে বিষয় করে, সচেতন পাঠককে পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়ে মুক্তির জন্য একনিষ্ঠ ও ত্যাগী হওয়ার আহ্বান জানিয়ে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিনের বাঙালীর মনের কথাটি বলেছেন। সমকালের অধীনতার নাগপাশ থেকে যা মুক্ত হওয়ার প্রেরণার জোগান দিয়েছিল।

'বীরবাহু' ও 'বৃত্রসংহার কাব্য' নামক বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ দু'টি ছাড়া অনান্য আখ্যান কাব্যেও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ, দেশ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে গঠনমূলক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। 'চিন্তাতরঙ্গিনী' কাব্যের নায়ক নরসখা চিন্তাতরঙ্গে আকুল। নরসখার মনে একটি অনুভূতি কাজ করে চলেছে। সে বাস্তব সংসারে দেখছে নানাবিধ অনাচার , দুরাচার, হিংসা — যা মানবতার পরিপন্থী। নরসখা অভিযোগের সুরে বলেছে;—

"কেন ভগবান হেন পৃথিবী রচিল।
কলুষ পাথারে পরে কেন ডুবাইল ।।" (৬৫)

নরসখা দেখছে — দেশাচার হরণ, স্বদেশের দুঃখ মোচন, সমাজে প্রেম-প্রীতি প্রচারের মত একাধিক

মহৎ কাজ বাকি আছে। বন্ধু কমলকে বলেছে ;—

"আমার সংসারে আর থাকি কিবা ফল ।
কি হবে থাকিয়া হেথা, প্রাণের কমল।।" (৬৬)

উনিশ শতকে উক্ত সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন। নরসখা যেন এঁদেরই একজন। কিন্তু সে সমাজের জটিলতাকে মেনে নিতে পারেন নি। নরসখা প্রাণকে তুচ্ছ মনে করে আত্মহত্যার পথকে বেছে নিয়েছে। কাব্যটি পাঠ করার পর মনে হয় — এ যেন আত্মহত্যা নয়। বরং দেশ, সমাজ ও মানবতার অপমানে ব্যথিত এক দেশপ্রেমিকের আত্মবলিদান।

'আশাকানন' কাব্যকে বলা হয় — জগৎ ও জীবনের কাব্য। 'আশাকানন' এর প্রকাশক শ্রী উমাকালী মুখোপাধ্যায় বলেন;— "আশাকানন একখানি সাঙ্গরূপক কাব্য। মানবজাতির প্রকৃতিগত প্রবৃত্তি সকলকে প্রত্যক্ষীভূত করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য।" (৬৭) তবুও এই কাব্যে হেমচন্দ্র স্বদেশকে এড়িয়ে যাননি। 'আশাকানন' এর 'ভূমিকা'-য় সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বলেন ;—

"তিনি মানবের কাব্য, জগতের কাব্য লিখিতে চাহিলেন।'আশাকানন' সেই ইচ্ছার ফল। তবু তিনি স্বদেশকে সম্পূর্ণ ভুলিতে পারেন নাই, বাল্মীকির সাক্ষাতে দেশমাতার দুঃখ নিবেদন করিয়াছেন।" (৬৮)

ব্যাস, কালিদাস, ভারবি, শংকর প্রমুখ ঋষি, কবি, নাট্যকার ও দার্শনিকের পর বাল্মীকির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। কবিতার ভাষায় ;-

দিল পদধূলি স্বদেশী জানিয়া
আশু শিরঘ্রাণ লৈয়ে ;
জিজ্ঞাসিল ত্বরা অযোধ্যা-বারতা
কেবা রাজ্য করে তায়;
ভারতীর পুত্র কেবা আর্য্যভূমে
তাঁহার বীণা বাজায়; (৬৯)

বাল্মীকি স্বদেশীকে দেখে স্বদেশের সংবাদ পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হন। ঋষি বাল্মীকি স্বদেশের সুসংবাদ শুনে মনকে তৃপ্ত করতে চেয়েছিলেন। স্বদেশী ব্যক্তিটি কিন্তু দেশের গৌরবময় বার্তা শোনাতে পারেন নি। কবি লিখেছেন;—

"কহিনু তখন কি বলিব ঋষি
কি দিব সম্বাদ তার –
তোমার অযোধ্যা তোমার কোশল
সে আর্য্য নাহিক আর ;
ডুবেছে এখন কঙ্কাল সলিলে
নিবিড় তমাসা তায় ;" (৭০)

'আশা কানন'-এর উক্ত কবিতাংশে অযোধ্যা তথা দেশের দুরবস্থার বিষয়টি স্পষ্ট। তবে কাব্যটি শেষ পর্যন্ত নিরাশার কাব্য হয়ে থাকে নি। ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করবে তার ইঙ্গিত আছে । কবির ভাষায়;—

" তুলিয়া দর্পণ আশা কহে "ইথে
চাহি দেখ আর্য্যকুল;
দেখরে দর্পণে ভবিষ্যতে পুনঃ
ভারত কিরূপ বেশ;
দেখে একবার প্রাণের বেদনা
ঘুচা রে মনের ক্লেশ"।
দেখিলাম চাহি যেন পূর্ব্ব দিক্
জ্বলিছে কিরণময়,
ভারতমণ্ডল সে কিরণে যেন
প্রদীপ্ত হইয়া রয় ;
ভারত-জননী যেন পুনর্ব্বার
বসিয়াছে সিংহাসনে;" (৭১)

সমকালীন পরাধীন ভারতের পটভূমিতে কবি হেমচন্দ্রের এজাতীয় বার্তা পাঠককে অনুপ্রাণিত করবে এমন দাবি করা যায়। আমরা আলোচনা শেষে সিদ্ধান্তে পৌছোতে পারি — কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আখ্যানকাব্য রচনা করতে গিয়ে বাঙালীর আত্মচেতনার বিকাশে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন ।

নবীনচন্দ্র সেন

নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে পরিচিত যদিও 'অবকাশরঞ্জিনী' (১ম খণ্ড ১৮৭১, ২য় খণ্ড ১৮৭৮) নামে গীতিকাব্য, খৃষ্ট (১৮৯১) অমিতাভ (১৮৯৫) ও অমৃতাভে (১৯০৯) নামে তিনখানি জীবনী কাব্য, 'আমার জীবন' নামে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) গদ্যে নিজ জীবনী গ্রন্থ, 'ভানুমতী' (১২০৭ বঙ্গাব্দে) নামে একটি উপন্যাস এবং কবির প্রথম গদ্য রচনা 'প্রবাসের পত্র' (১৮৯২) বাংলা সাহিত্যের একাধিক প্রকরণকে সমৃদ্ধ করেছে। এখানে আমরা নবীনচন্দ্র সেনের আখ্যানকাব্যের আলোচনা করব। কবির এই আখ্যানকাব্যগুলি বাঙালীর আত্মবিকাশে কিরূপ ভূমিকা পালন করেছে —তারই অনুসন্ধান করা হবে । কবি নবীনচন্দ্র সেনের এই শ্রেণীর কাব্যগুলি হল--'পলাশির যুদ্ধ' (১৮৭৫), 'রঙ্গমতী' (১৮৮০), 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭) ও 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩), 'প্রভাস' (১৮৯৬) নামকত্রয়ী কাব্য।

পলাশির যুদ্ধ ১৮৭৫ ঃ

'পলাশির যুদ্ধ' ঐতিহাসিক বিষয় নিয়ে রচিত। বলা চলে, পরাধীনতার যন্ত্রণা অনুভব মূলক কাব্য 'পলাশির যুদ্ধ'। এই কাব্যে বাঙালীর পরাধীনতার দু'টি রূপ পাওয়া যায়। যথা;—দীর্ঘ পরাধীনতার যন্ত্রণা ও যবনের হাত থেকে ইংরেজের নিকট বাঙালীর পরাধীনতার হস্তান্তরের বৃত্তান্ত ।

পলাশির যুদ্ধকে বাঙালীর প্রথম স্বাধীনতা হারানোর যুদ্ধ বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে, বাঙালী দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ শত বছর পূর্বে স্বাধীনতা নামক অমূল্য রত্নটি হারায়। দেশীয় প্রজাসাধারণের বা বাঙালীর দীর্ঘদিনের পরাধীনতার গ্লানি কাব্যটিতে বিশেষ মাত্রা পেয়েছে । মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন;—

"কিন্তু কি করিবে সখে! বিধাতা বিমুখ
অভাগিনী বঙ্গ প্রতি। বলিতে না পারি
লিখেছেন বিধি হায়! কত যে কি দুখ
কপালে তাহার—চির-অভাগিনী নারী!
সেনকুল-কুলাঙ্গার, গৌড়-অধিপতি,
সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরকের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে!
সেই দিন হ'তে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
পড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্যসুত-বল" (৭২)

— এখানে কবি বাঙালীর দীর্ঘ পরাধীনতার কালকে নির্দেশ করেছেন। পলাশির যুদ্ধের প্রথম সর্গে কৃষ্ণচন্দ্র, জগৎশেঠ প্রমুখ নবাব সিরাজের অত্যাচার থেকে নিজেদের ও সমগ্র বাঙালীর মুক্তির জন্য সিরাজের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করেন। কেননা, সিরাজের অধীনে থাকার অর্থ ধর্ম, মান ও জীবনের অনিশ্চয়তা । রাজবল্লভ বলেন;—

"বোধ হয় পাপিষ্ঠের অত্যাচার যত;
নর-প্রকৃতিতে নাহি সম্ভবে কখন ।
মনুষ্য-হৃদয় নহে পাপাসক্ত এত ।
— — —
কিছুদিন আর ,
সতীত্ব-রতন এই বঙ্গের ভাণ্ডারে
থাকিবে না, – থাকিবে না কুলশীলমান "(৭৩)

—অতএব এই ভয়ঙ্কর অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তির উপায় ইংরেজদের দ্বারা সিরাজকে ক্ষমতাচ্যুত করা। কিন্তু বঙ্গলক্ষ্মী বা বঙ্গমাতার ইচ্ছা বাঙালী নিজ বাহুবলে স্বাধীন হোক। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে তিনি বলেন;—

" আমার কি মত? তবে শুন মহারাজ !
অসহ্য দাসত্ব যদি , নিস্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর-সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখরণে; যেন পূর্ণ শশী ,
বঙ্গ-স্বাধীনতা - ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন্ বঙ্গবাসী-রক্ত ধমনী-ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর? আমি যে রমণী,
বহিছে বিদ্যুৎ-বেগে আমার ধমনী।" (৭৪)

বঙ্গমাতা কৃষ্ণচন্দ্র প্রমুখ সন্তানকে ষড়যন্ত্র থেকে বিরত হওয়ার আহ্বান করেন । তিনি তাদের আরো সাবধান করে বলেন;—

"ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি এতাধিক হন অত্যাচারী,
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে ?
— — —
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্বে ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্বস্থাপন ।" (৭৫)

বরং বাঙালী এ অবস্থায় অনেক ভালো আছে। কেননা, মুসলমান নবাব-বাদশাহ খুবই দুর্বল। তাদের পতন সময়ের অপেক্ষা। বঙ্গমাতা বলেন;—

" বিশেষ তাদের এই পতন-সময় ;
কি পাতশাহ , কি নবাব , আমাদের করে
পুতুলের মত , — — —
আমাদের করে রাজ্য-শাসনের ভার ।
কিবা সৈন্য, রাজকোষ , রাজমন্ত্রণায়,
কোথায় না হিন্দুদের আছে অধিকার ?
সমরে , শিবিরে , হিন্দু প্রধান সহায় ।
অচিরে যবন-রাজ্য টলিবে নিশ্চয়;
উপস্থিত ভারতের উদ্ধার সময়।" (৭৬)

প্রায় সাড়ে পাঁচশত বছরের পরাধীনতার অবসান আসন্ন প্রায় ।এ মুহূর্তে ইংরেজের মতো দুর্ধর্ষ জাতিকে রাজতন্ত্র হস্তান্তর করার কোন মানে হয় না। আসলে 'পলাশির যুদ্ধ' কাব্যটি পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করিয়ে পাঠককে স্বাধীনতার জন্য উৎসাহিত করে। কবি নবীনচন্দ্র সেন পাঠককে বলেছেন ; —

"পরাধীন স্বর্গবাস হতে গরীয়সী
স্বাধীন নরকবাস, অথবা নির্ভীক
স্বাধীন ভিক্ষুক ওই তরুতলে বসি,
অধীন ভূপতি হতে সুখী সমধিক।" (৭৭)

স্বাধীনতা অমূল্য সম্পদ। পরাধীন স্বর্গের চেয়ে স্বাধীন নরক কিংবা ক্ষমতাহীন ভূপতির থেকে ভিখারী হওয়াও ভালো, সমকালের শিক্ষিত ও সচেতন অথচ পরাধীন বাঙালীকে এইসব বক্তব্য যথেষ্ট ভাবাবে — একথা বলাই বাহুল্য ।

রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস ঃ

নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' (১৮৮৭), 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) ও 'প্রভাস' (১৮৯৬) কাব্যগ্রন্থ তিনটিকে একত্রে 'ত্রয়ীকাব্য' বলা হয়। কাব্য গ্রন্থগুলির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে 'মহাভারত' থেকে। কাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ অনাচারী ধর্মকে নিষ্কাম ধর্মে, জাতি বর্ণভেদেপরিপূর্ণ সমাজকে উদার মানবতায় ও ছিন্ন খণ্ড ভারতমাতাকে অখণ্ড দেশমাতৃকা হিসাবে গড়ে তোলেন। সমকালের ছিন্ন খণ্ড , বর্ণভেদে পরিপূর্ণ , অধর্মে আক্রান্ত ভারতের জন্য যা অনুসরণযোগ্য ।

রৈবতক , কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস আপাত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত । তিনটি খণ্ডের তিনটি আলাদা কাহিনীও রয়েছে। 'রৈবতক'-এ আছে সুভদ্রা হরণের কাহিনী, 'কুরুক্ষেত্র'-এ বালক অভিমুন্যর বীরত্বে ভরা মৃত্যুর কাহিনী ও 'প্রভাস'-এ কৃষ্ণ সহ যদু বংশ ধ্বংসের কাহিনী। এই তিনটি কাহিনী আপাত বিচ্ছিন্ন , সম্পর্ক তেমন নেই । বিচ্ছিন্নভাবে কাব্যগুলি পাঠ করলে কাব্যের মূল আবেদন অনুভব করা কঠিন হবে। তাতে একাধারে কবির উদ্দেশ্য ও পরিপূর্ণ কাব্যরস থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এর কারণ কি? বলা যায়, এর কারণ কবি নবীনচন্দ্র সেনের অভিনব মহাভারত পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় তিনটি কাব্যকে 'ত্রয়ী' কাব্যরূপে রসোত্তীর্ণ করেছে । আমরা কাব্য তিনটি আলোচনা করলে বুঝতে পারব, —'রৈবতক'-এ মহাভারত গঠনের মহৎ পরিকল্পনা আছে, 'কুরুক্ষেত্র'-এ সেই পরিকল্পনা বাস্তব রূপ প্রাপ্তির জন্য কর্মপ্রয়াস এবং 'প্রভাস'-এ তার পরিপূর্ণ বাস্তব রূপ প্রাপ্তি ঘটেছে ।

'রৈবতক' কাব্যের প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ ধর্মীয় অনাচারের সমালোচনা করেন । তৃতীয় সর্গে কৃষ্ণ , ব্যাস ও অর্জুন দেশের দুরবস্থা নিয়ে কথা বলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন— জাতিভেদ, হিংসা অনাচারী ধর্ম প্রভৃতির দ্বারা ভারত আক্রান্ত । ব্যাসদেব সমর্থন করেন;—

"সত্য, বাসুদেব,
বড় শোচনীয় দশা আজি ভারতের।" (৭৮)

—শ্রীকৃষ্ণ প্রস্তাব দেন এক ধর্ম, এক জাতি, এক সিংহাসন স্থাপনের জন্য ।

দ্বাদশ সর্গে এই মহৎ কাজ করার জন্য ব্যাস ও অর্জুনকে শপথ করতে দেখা যায়। সপ্তদশ সর্গে অর্জুন

নরসংহারক যুদ্ধে আপত্তি করলে কৃষ্ণ বলেন — সমাজ শরীরকে সুস্থ করতে অশুভ শক্তি বিনাশের জন্য রক্ত ঝরালে পাপ হয় না ।

অতএব তৃতীয় সর্গ, দ্বাদশ সর্গ ও সপ্তদশ সর্গে কৃষ্ণের নব-ভারত গঠনের যে পরিকল্পনা ব্যক্ত হয়, তা কাহিনীকে কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধ পর্যন্ত প্রসারিত করে ।

'কুরুক্ষেত্র' কাব্যের প্রথমেই ব্যাসদেব তাঁর শিষ্যকে বুঝিয়েছেন,—কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ধ্বংসের যুদ্ধ নয়; ধর্মরক্ষার যুদ্ধ। নবম সর্গে ভীষ্মদেব ধর্মযুদ্ধের বিষয়টি মেনে নেন এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্যকে অনুভব করেন । সেজন্য ষোড়শ সর্গে বীর বালক অভিমুন্যর মৃত্যুর শোক মহাভারত গঠনের প্রয়াসে বাধা হয় নি ।

কুরুক্ষেত্রের ধর্ম যুদ্ধ শেষ হলেও মহাভারত গঠন বা আদর্শ দেশ গঠনের কাজ তখনও শেষ হয়নি । হয়নি আর্য অনার্যের মিলন, ব্রাহ্মণের অহংকার তখনও রয়েছে, উচ্ছৃঙ্খল যদুকুল তখনও বিরাজমান, সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য তখনও সম্পূর্ণ প্রচার পায়নি। এগুলির পরিপূর্ণতা 'প্রভাস' কাব্যে । চতুর্থ সর্গে অনার্যরাজ বাসুকি স্বীকার করেন— কৃষ্ণ নাম প্রচারে অনার্যভুমি হয়েছে আনন্দভূমি । পঞ্চম সর্গে কৃষ্ণ-প্রেমে আর্য-অনার্য ভেদ মুছে গিয়েছে। নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন;—

" আর্য্য কি অনার্য্য নাহি কিছু জ্ঞান ,
গাহিছে নাচিছে গলাগলি করি ,
করিতেছে কৃষ্ণপ্রেমামৃত পান।" (৭৯)

কৃষ্ণ চেয়েছিলেন মহামিলন। এই কাব্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিনিধি দুর্ব্বাশা, অনার্যরাজ বাসুকি সকলেই কৃষ্ণ প্রেমের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন।পরিশেষে খণ্ডতা, ষড়যন্ত্র, হিংসা-প্রতিহিংসা ভুলে গিয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, অনার্য বর্ণ-নির্বিশেষে নিষ্কাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের মহাভারত পরিকল্পনা সার্থকরূপ লাভ করে ।

আমরা এক মহাভারত গঠনের অখণ্ড কাহিনীর কথা জানলাম। এখন প্রশ্ন হতে পারে, কবির উদ্দেশ্য কি এপর্যন্তই ? নবীনচন্দ্র সেন তিনটি কাব্যের মধ্যে একটি ভাববস্তুকে ধরতে চেয়েছিলেন । তা হল হিংসা, ষড়যন্ত্র, বিভেদ, খণ্ডতা মুছে দিয়ে এক ধর্ম, একজাতি ও এক রাষ্ট্রের ভারত গঠন। আসলে কবি উনিশ শতকের ভারতের সঙ্গে মহাভারতের যুগের ভারতের সাদৃশ্য অনুভব করেন । তিনি ভারতের দুই যুগের সমস্যাকে অভিন্ন করে দেখিয়েছেন । ত্রয়ী কাব্যকে আমরা উদ্দেশ্যমূলক বলব । কবির এই কাব্য লেখার পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য রয়েছে।

এক । এই কাব্যের দ্বারা নবীনচন্দ্র সেন তাঁর হৃদয়ের ভক্তিভাবকে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর প্রথম ভক্তিভাব জাগে পুরীতে। 'আমার জীবন'-এ কবি লিখেছেন;—"সেখানে বসিয়াই আমি ভাগবতের ব্রজলীলা এক নূতন আলোকে দেখিতে লাগিলাম, এবং সেখানে আমার হৃদয়ে প্রথম কৃষ্ণভক্তি অঙ্কুরিত হইল । উৎসবে অসংখ্য যাত্রীর ভক্তির প্রবাহে আমার পাষাণ হৃদয় কৃষ্ণ ভক্তিতে আর্দ্র হইল।"(৮০) এবং ত্রয়ী কাব্য সৃষ্টির বিষয়ে বলেন;— "আমি এই আত্মহারা ভাবে কি এক অচিন্তনীয় আবেগের অধীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ কি রূপে খণ্ড ভারতে মহাভারত স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা কাব্যাকারে দেখাইতে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিন খানি কাব্যে প্রস্তাবনা লিখিলাম —'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' ও প্রভাস।" (৮১) 'প্রভাস'-এর শেষে নবীনচন্দ্র গীতিকবির মত মনের কথাটি প্রকাশ করেন। কবির ভাষায় ;—

"চতুর্দ্দশ বর্ষ মা গো! এরূপে বসিয়া ধ্যানে ,
দেখিয়াছি কৃষ্ণলীলা , এরূপে বিমুগ্ধ প্রাণে ।
পাইয়াছি শোকে শান্তি ; পাইয়াছি দুঃখ সুখ ।
প্রেমে ঝরিয়াছে নেত্র ; প্রেমে ভরিয়াছে বুক ।"(৮২)

—এ যেন গীতিকবির হৃদয়ের ঝংকার ।

দুই । কবি নবীনচন্দ্র সেন মহাভারতের সমস্যাকে সমকালের সমস্যার সঙ্গে অভিন্ন করে বাঙালীর আত্মবিকাশের ধারাকে গতিদান। আমরা ত্রয়ী কাব্যে দেখব শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম , সমাজ , রাজনীতির সংস্কার করেছেন। ধর্মের নামে অনাচার ও সামাজিক রীতি আচারের নামে ব্যভিচারকে অস্বীকার করা হয়েছে। ইন্দ্রপূজা বা সূর্য পূজা কিংবা যাগযজ্ঞের চাইতে মানবসেবা কিংবা জীবসেবাকে বড় করে দেখা হয়েছে। উনিশ শতকের ধর্ম সংস্কারকের মতো শ্রীকৃষ্ণ মানবের মাহাত্ম্যকে প্রতিষ্ঠ করতে চেয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেন;—

"মানব! চেতনাযুক্ত , বিবেকী , স্বাধীন ,
জড় ওই সূর্য্য হ'তে কত শ্রেষ্ঠতর।" (৮৩)

— সূর্যপূজার মতো বিষয়গুলো যে অবাঞ্ছিত তা শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন । তিনি বলেন, মানুষের উচিত এই বিশ্ব চরাচরের একমাত্র অধীশ্বরকে উপাসনা করা । সাধারণ পূজা অর্চনা বা যাগযজ্ঞকে ধর্ম বলে মনে করার কোন ভিত্তি নেই। কৃষ্ণের ভাষায়;—

"নহে পূর্ণ ধর্ম্ম , যদি না হয় নিষ্কাম ;
যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, ধর্ম্ম-জ্ঞানের সোপান।" (৮৪)

ধর্ম বলতে বোঝানো হয়েছে, নিঃস্বার্থভাবে সর্বভূতে হিত করা । কেননা, ঈশ্বর সর্বভূতে অবস্থান করেন। কৃষ্ণ বলেন —

" বিষ্ণুশক্তি জগন্মাতা ,
পঞ্চভূতে অধিষ্ঠিতা ,
পঞ্চভূতময় সৃষ্টি,— সর্ব্বত্র সমান
দেখ মহাশক্তিরূপে বিষ্ণু অধিষ্ঠান ।
পার্থ! সর্ব্ব-ভূত-হিত
যাহাতে হয় সাধিত,
নিষ্কাম সে কর্ম্ম, ধর্ম্ম ; পূণ্যফল তার
হয় সর্ব্বভূত-আত্মা বিষ্ণুতে সঞ্চার ।" (৮৫)

—কামনা বাসনা রহিত করে সমস্ত জীব জগতের মঙ্গল করে যাওয়াই ধর্ম। — এ ধর্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের 'গীতোক্ত' বাণী— যা কবি প্রচার করেছেন। জাতিভেদ প্রথাকে শ্রীকৃষ্ণ মানেন নি । তিনি বর্ণবৈষম্যের অবসান চেয়েছিলেন । অর্জুনকে বলেন;—

" দেখ ধনঞ্জয়!
ব্রাহ্মণের অত্যাচার । কথায় কথায়
অভিশাপ; অভিমান অঙ্গের ভূষণ।
শার্দ্দূল যেমন ভাবে, প্রাণী মাত্র সব
সৃজিত তাহার ভক্ষ্য ; তেমনি ইহারা
ভাবে — অন্য তিন জাতি ভক্ষ্য ইহাদের ।" (৮৬)

—ক্ষত্রিয় , বৈশ্য ও শূদ্রের উপর ব্রাহ্মণের নিষ্ঠুর অত্যাচারের কথা কৃষ্ণ বলেছেন; যা সুস্থ সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। তিনি চেয়েছেন জাতির সংমিশ্রণ। সেজন্য অনার্য সম্প্রদায়—উচ্ছৃঙ্খল যাদবদের আক্রমণ করলে বা যাদব-রমণী হরণ করলে কৃষ্ণ বাধা দেন নি । কেননা তিনি বলেন —

" নহে যাদবের , আমি মানবের স্বামী!" (৮৭)

শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছৃঙ্খল যাদবদের অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি। 'যাদবী' হরণে আর্য-অনার্যের রক্তের মিলন হোক এও তাঁর বাসনা। ব্যাসদেব বলেন;—

"গাণ্ডীবীর পরাভব, যাদবী হরণ,—

সকলই তাঁহার লীলা! ...

যাদবী হরণে আশু হইয়া মিশ্রিত

রক্ত আর্য্য অনার্য্যের, ব্যাপিয়া ভারত

কিছুদিন পরে হবে কি শান্তি স্থাপিত

ধর্ম্মরাজ্য—ছায়াতলে! আলোকি জগৎ

দর্শনের বিজ্ঞানের নক্ষত্র অমর

শান্তির আকাশে কত উঠিবে ভাসিয়া!

শিল্প বাণিজ্যের কুঞ্জে পিক মধুকর

সাহিত্যের, সঙ্গীতের, উঠিবে গাইয়া।

আর্য্য অনার্য্যের রক্ত হইয়া মিশ্রিত

কত নব জাতি, কত সাম্রাজ্য মহান্

করিবে সৃজন পার্থ!" (৮৮)

নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস'-এ অনার্যের যাদব আক্রমণ ও যাদবী হরণ যেন আর্য-অনার্যের সংস্কৃতির মিলনকেই বাস্তবায়িত করার ইঙ্গিত দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের এটাই অভিপ্রেত, কেননা জাতিগত ভেদাভেদ তাঁর কাছে অবাঞ্ছিত।

রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ভিন্ন ভারতের মুক্তি নেই। কৃষ্ণ সেজন্যই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মত রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে আগ্রহী। তাঁর ভাষায়;—

"যত দিন খণ্ড রাজ্য

রহিবে ভারতে, আর্য্য—

জাতি খণ্ড খণ্ড পার্থ—রহিবে নিশ্চয়,

রহিবে সমাজ-ভেদে ধর্ম্ম ভেদময়।

ফল ফুল ভিন্ন যথা,

তরু ভিন্ন হবে তথা,

প্রকৃতির এই নীতি; ক্ষুদ্র ভিন্নতায়

করে ধর্ম্ম-বিভিন্নতা যথায় তথায়।

এক ধর্ম্ম, এক জাতি,

একমাত্র রাজনীতি,
একই সাম্রাজ্য নাহি হইলে স্থাপিত,
জননীর খণ্ড দেহ হবে না মিলিত।
ততদিন হিংসানল,
হায়! এই হলাহল,
নিবিবে না, আত্মঘাতী হইবে ভারত;" [৮৯]

—রাষ্ট্রীয় ঐক্য জাতীয় স্বার্থেই প্রয়োজন। নইলে মুক্তি অসম্ভব । এখানে শ্রীকৃষ্ণ জাতির স্বার্থে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা সৃষ্টির জন্য সক্রিয়। কিন্তু জাতিগত বৈষম্য হীনতা, ধর্মীয় বিশুদ্ধ মত ও পথ ও রাজনৈতিক একতার জন্য প্রয়োজন 'ধর্মযুদ্ধ'। যুদ্ধ মানেই তো রক্ত ঝরানোর কাজ । অর্জুন নরহত্যার মতো নৃশংস কাজে সম্মতি দিতে চান নি। তিনি বলেন;—

" ধর্ম্ম তবে বলি কারে ?
নরহত্যা ধর্ম্ম ? [৯০]

—এর উত্তরে কৃষ্ণ বলেন ; -

" সমর সর্ব্বত্র পাপ নহে, ধনঞ্জয়!
রক্ষিতে দশের ধর্ম্ম,
নহে পার্থ , পাপ কর্ম্ম
একের বিনাশ। পার্থ! নিষ্কাম সমর,—
নাহি ততোধিক আর পূণ্য শ্রেষ্ঠতর ।" [৯১]

—মহৎ উদ্দেশ্যে রক্ত ঝরালে পাপ হয় না। বরং স্বার্থশূন্য মন নিয়ে দশের সুখের পথে প্রতিবন্ধক ব্যক্তিকে হত্যা করায় পূণ্য আছে ।

কবি নবীনচন্দ্র সেন সমসাময়িক কালের দেশবাসীকে মহৎ আদর্শে দীক্ষিত করার জন্য একম একটি বৃহৎ কাব্য রচনা করেন। 'আমার জীবন'-এ তিনি সেই উদ্দেশ্যের কথাই শুনিয়েছেন। তাঁর ভাষায়;— "অন্তর্বিদ্বেষ ও অন্তর্বিদ্রোহে খণ্ডিত ভারতের আত্মহত্যা নিবারণ করিয়া ভ গবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমগ্র ভারতে যে মহাসাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই নাম মাহাভারত।"[৯২] কবি উনিশ শতকের দেশবাসীকে মহাভারতের আদর্শ অনুসরণ করতে বলেন। 'আমার জীবন'-এ বলেন ; — " বুঝিলাম , তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ না করিলে

ভারতে আবার সেরূপ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইবে না । বুঝিলাম, তিনি এবং তাঁহার শ্রীমুখের গীতোক্ত ধর্ম্ম ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের আশা নাই।"[৯৩] কবি স্পষ্টতই শ্রীকৃষ্ণকে অনুসরণ করার কথা বলেন । সমাজ, ধর্ম, জাতি, রাষ্ট্র সম্বন্ধে তাঁর ভাবনা উনিশ শতকের অবক্ষয়িত সমাজ ও ধর্মে, জাতিগত বৈষম্যে এবং রাষ্ট্রীয় খণ্ডতার প্রতিকারে বিশল্যকরণীর মত কাজ দেবে।এছাড়া জাতির মুক্তির অন্য কোন পথ নেই । উনিশ শতকের শেষে জাতীয় জীবনের জাগরণের সময়ে এই কাব্যটি বাঙালীর আত্মবিকাশের প্রেরণায় ঐতিহাসিক সাক্ষী।

এই অধ্যায়ের মূল আলচনায় প্রবেশের প্রথমেই আমরা বলেছি, মাতৃভাষার সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্য ও সমকালের জাতীয়তাবাদী মনোভাবের পটভূমিকে আরো গতিদানের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রেরণার জন্য আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্য ধারার সৃষ্টি হয়েছিল। যদিও সর্বাগ্রে বলতে হয়, উনিশ শতকে মাতৃভাষায় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার আগ্রহ ও জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উদ্বোধনের গোড়ার কথা হল—ইংরেজী সাহিত্য এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার আলো।

আখ্যান কাব্যধারার প্রথম কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার বাসনা নিয়েই কলম ধরেছেন। কেননা, ১৮৫২ সালে বেথুন সোসাইটিতে মাতৃভাষা ও সাহিত্যের যে অপবাদ শুনতে হয়েছিল, তাতে তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করেন । এই অপমানের প্রতিশোধ নেন দুভাবে — 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' লিখে সাময়িক বিরোধিতা করে এবং বাংলা সাহিত্যের অনুৎকর্ষতা মোচনের জন্য 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এর মতো একাধিক কাব্য রচনার দ্বারা। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাসে যা রসগত ও প্রকরণগত দিক থেকে অভিনব। অন্যদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত তো বাংলা সাহিত্যের মানোন্নয়নের জন্য কলম ধরেছিলেন। আর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রকরণ আখ্যান কাব্যে জাতীয় দুরবস্থার চিত্র ও তা থেকে সমাধান লাভের পথ নির্দেশ করেন ।

আমাদের মনে হযেছে, বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পাশাপাশি রঙ্গলাল , মধুসূদন , হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের রচনার বিষয়বস্তুতে সংযোজিত হয়েছে দেশীয় ভাবনা , পরাধীনতার গ্লানি , জাতীয়তাবোধ প্রকাশের সহায়ক ব্যক্তি চরিত্র ও দৃষ্টিভঙ্গী । তাই কখনো পুরাণ , কখনো প্রাচীন মহাকাব্য , কখনো ইতহাস থেকে দেশানুগত্যের সাক্ষ্যবাহী সব চরিত্র তুলে এনে পাঠককে সচেতন করে তোলার প্রয়াস দেখা যায়। যাকে আমরা দেশের মানব সম্পদ সৃষ্টির মহৎ উদ্যোগ বলে অভিহিত করতে পারি । কেননা, উনিশ শতকের আখ্যানকাব্য বা মহাকাব্যগুলি সমকালের আত্মবিস্মৃত পাঠকের মনে পরাধীনতার অনুভূতি সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১। আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম পর্ব (শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, দশম মুদ্রণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, পৃ: ৫-৭।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬-৭।

৩। প্রথম সর্গ, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩৫।

৪। ভূমিকা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৪০।

৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪০।

৬। বিজ্ঞাপন, কুমারসম্ভব, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৩১১।

৭। ভূমিকা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৩৭।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৮।

৯। পদ্মিনী উপাখ্যান, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৪২।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৩।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৩।

১৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫৯।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪-১৬৫।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

১৬। ভূমিকা, কর্ম্মদেবী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৭৪।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৪।

১৮। কর্ম্মদেবী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৭৭।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮১।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮০।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮১।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮১।

২৪। শূরসুন্দরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২১৪।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩৬।

২৬। ভূমিকা, কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৪১।

২৭। কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২৭৭।

২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৮।

২৯। ভূমিকা, কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২৪৪।

৩০। কাঞ্চীকাবেরী, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ২৫০।

৩১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩,দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩, প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ২০৩।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৬।

৩৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৭৩।

৩৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১১৫।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

৩৬। মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৩৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১৮০।

৩৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৭৩।

৩৯। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ১৮৩।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

৪১। তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১০।

৪২। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৩৫।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

৪৪। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ৩৪৫।

৪৫। ভূমিকা, বৃত্রসংহার কাব্য, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক — শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৺৹

৪৬। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৪০।

৪৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৯।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

৪৯। LETTERS, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৫২৪।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩৫।

৫১। মেঘনাদবধ কাব্য, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ৮৮।

৫২। বিজ্ঞাপন, বীরবাহু, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৩।

৫৩। বীরবাহু, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৭২।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৬।

৫৫। ভূমিকা, বৃত্রসংহার কাব্য হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: √/.

৫৬। আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম পর্ব (শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, দশম মুদ্রণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১, পৃ: ১৭০-১৭১।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৪-১৬৫।

৫৮। বৃত্রসংহার কাব্য ১ম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৬৬।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩।

৬১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪।

৬৪। বৃত্রসংহারকাব্য — ২য় খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ১৪০-১৪১।

৬৫। চিন্তাতরঙ্গিনী, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক — শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৮।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৫।

৬৭। প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন, আশাকানন, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, খিদিরপুর , ১লা মে ১৮৭৬ , সম্পাদক —সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ২।

৬৮। ভূমিকা, আশাকানন, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, খিদিরপুর , ১লা মে ১৮৭৬ , সম্পাদক — সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ:

৬৯। আশাকানন, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, খিদিরপুর, ১লা মে ১৮৭৬, সম্পাদক — সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, পৃ: ৫১।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫২।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩।

৭২। পলাশির যুদ্ধ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪ম খণ্ড,— নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক — সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬, পৃ: ১৯।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪-১৫।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৩।

৭৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৬-২৭।

৭৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০।

ষষ্ঠঅধ্যায়

উনিশ শতকের গীতিকাব্যে স্বদেশ ভাবনা

বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা একটি সমৃদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য প্রকরণ। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি স্পষ্ট করতে হলে গীতিকবিতা নামক প্রকরণটির আলোচনা অপরিহার্য। এই শতকে সচেতন বাঙালীকে জাতীয় দুরবস্থার ভাবনা বেশ আহত করেছিল। এই সময়েই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতিকবির এই মহৎ কর্ম প্রয়াসকে স্বাগত জানিয়ে বলেন;—

"কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান ।
বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার ।
অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট। এ দৈন্যমাঝারে, কবি,
একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি ।" (১)

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানুষের চেতনাকে সুপথে চালিত করতে কবির এক বড় ভূমিকা রয়েছে। কবি দরিদ্রতা, সংকীর্ণতা, দুর্বলতা সর্বোপরি সুস্থ, সমৃদ্ধ ও সচেতনভাবে বাঁচার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ দিতে পারেন। শুধু নীতি-উপদেশই নয়, জাতীয় জীবনের প্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে কবির এক বড় ভূমিকা রয়েছে। আমরা লক্ষ করব উনিশ শতকের গীতিকবিকে এই বিশেষ ভাবনা বেশ প্রভাবিত করেছিল ।

উনিশ শতকেই বাংলা গীতিকাব্য নামক বিভাগটি বেশ সমৃদ্ধ হয় । ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ উনিশ শতকের স্বনামধন্য গীতিকবি। অবশ্য বাংলা সাহিত্যে গীতিকবিতা রচনার প্রয়াস নতুন নয়। 'চর্যাপদ', 'বৈষ্ণবপদ', 'শাক্তপদ' এর মতো গীতিধর্মী কাব্য প্রাচীন ও মধ্যযুগে রচিত হয়েছিল। যদিও আধুনিক গীতিকবিতার সঙ্গে প্রাচীন বা মধ্যযুগে রচিত গীতিকবিতার পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। আধুনিক গীতিকাব্যে কবির ব্যক্তিক

অনুভূতিই প্রধান। কিন্তু আধুনিক গীতিকবিতার পূর্বে রচিত গীতিকবিতায় কবির ব্যক্তিক অনুভূতির চাইতে ধর্মীয় অনুভূতির প্রাধান্য দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবি হিসাবে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের একাধিক কবিকে নির্বাচন করেছেন। তিনি বলেছেন;—

> "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।" (২)

আধুনিক কবি মধুসূদন দত্ত প্রমুখ কবির সঙ্গে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসকেও গীতিকবি বলা হয়েছে। তবে এখানে উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংস্পর্শে যেসব কবি এসেছিলেন, সেই আধুনিক কবিদের গীতিকবিতার আলোচনা করা হয়েছে। গীতিকবিতায় প্রকাশিত স্বদেশ ভাবনার বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য অধ্যায়টিকে চারটি ভাগ করা হয়েছে।

ক) উনিশ শতকে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে স্বদেশ ভাবনা।

খ) জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকাব্যের চর্চা ও স্বদেশ ভাবনা।

গ) গীতিকবিতার আস্বাদ ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা।

ঘ) বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা।

উনিশ শতকে আধুনিক গীতিকবিতার প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে কবিগান ও ঈশ্বরগুপ্ত, জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকাব্যের চর্চায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন, গীতিকবিতার আস্বাদ পর্বে মধুসূদন দত্ত এবং বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা নামক পর্বে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা আলোচিত হবে। কারণ কবিগানে বা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা আধুনিক মনের উপযোগী বিশুদ্ধ গীতিকবিতা নয়। সেজন্যই এইসব গীতিকবিতাগুলি আধুনিক গীতিকবিতার প্রস্তুতি পর্ব বা প্রথম পর্ব বলা যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন একাধিক বিষয়ে কবিতা লিখলেও যেহেতু দুই কবির জাতীয়তাবাদী মনোভাবের ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল সেই জন্য তাঁদের রচিত খণ্ড কবিতা বা গীতিকবিতাগুলি জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকবিতার চর্চা নামক অংশে আলোচনা করা হয়েছে। মধুসূদন দত্তের কবিতায় প্রথম ব্যক্তিক অনুভূতির শিল্পরূপ পাওয়া যায়, সেজন্য তাঁর কবিতাকে বলা হয়েছে গীতিকবিতার আস্বাদ যুক্ত কবিতা। এই শতকে মধুসূদনের পরে বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা গীতিকবিতাকে বিশুদ্ধ শিল্পরূপ প্রদান করেন, সেজন্য বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ কবির রচনাকে বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা বলা হয়েছে।

উনিশ শতকেআধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে স্বদেশভাবনা ঃ

উনিশ শতকের পূর্বে বিশুদ্ধ ব্যক্তিক অনুভূতিপ্রবণ গীতিকবিতা ছিল না। মাইকেল মধুসূদন দত্তই প্রথম বিশুদ্ধ গীতিকবিতা লেখেন। এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন;—"মধুসূদনের অন্যান্য কবিতার মধ্যে 'আত্ম-বিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। নবীন বাঙ্গালা কাব্যে কবি-আত্মকথা আত্ম-বিলাপেই প্রথম শোনা গেল।" (৩) অর্থাৎ সুকুমার সেন মনে করেন, 'আত্মবিলাপ' (১৮৬২) কবিতাতেই প্রথম বিশুদ্ধ গীতিকবিতার লক্ষণ উপস্থিত। এই প্রসঙ্গটি 'আধুনিক সাহিত্যের উপক্রম' নামক আলোচনায়ও পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন;—

> "ইংরেজী শিক্ষার গুণে শহরবাসী ভদ্র বাঙ্গালীর যে মানসিক পরিবর্তন শুরু হইল তাহাতে প্রথমে জাগিল প্রতিক্রিয়া আত্মরক্ষার চেষ্টা, যাহা সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রচনায় ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের ব্যঙ্গ-কবিতায় বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের প্রতি ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। ...অনতিবিলম্বে মাথা তুলিল সমাজ-চেতনা। ...তাহার পর জাগিল ব্যক্তি-চেতনা। তাহা সর্বপ্রথম মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে দেখা দিল। তাঁহার অগ্রগামীদের রচনার আলিখিত ভূমিকায় ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ছিল না। ...চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোন কোনটিতে আবার ব্যক্তিচেতনার উপরে আত্মচেতনারও প্রতিবিম্বন হইয়াছে।" (৪)

অর্থাৎ ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় আধুনিকতার কিঞ্চিৎ লক্ষণ থাকলেও মধুসূদনের হাতেই বাংলা গীতিকবিতার প্রথম সূচনা। কিন্তু প্রশ্ন জাগতে পারে, উনিশ শতকে ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বে কি কোন গীতিকবিতার সন্ধান পাওয়া যাবে না? অবশ্য ঈশ্বর গুপ্তের পূর্ববর্তী ও সমকালে গীতিকবিতার লক্ষণ যুক্ত কিছু গানের সন্ধান পাওয়া যায়। এই গানগুলি বৃটিশ শাসিত কলকাতার নাগরিক সাহিত্য। যার পোষাকী নাম 'কবিগান'। রচয়িতাদের বলা হয় কবিওয়ালা।

কবিওয়ালাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন;—রামবসু, এন্টনী ফিরিঙ্গী, নিধুবাবু, দাশরথী রায় প্রমুখ। এছাড়া গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, রামু ও নৃসিংহ, কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার ওরফে কেষ্টা মুচি, নিতাই বৈরাগী, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা প্রমুখ কবিওয়ালা এই বিশেষ সাহিত্য শাখায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। এই কবিওয়ালা রচিত কবিগানে উনিশ শতকের আত্মচেতনা নির্ভর স্বদেশ ভাবনার অনুসন্ধান করা পণ্ডশ্রম। এইসব কবিওয়ালাদের না ছিল কোন শিক্ষা, না ছিল সচেতনতা। অতএব এঁদের আদর্শ বাঙালী জীবনে প্রগতি এনে দেবে এমন আশা না করাই ভাল। অবশ্য এঁদের রুচিহীন গানের পাশে আকস্মিকভাবে ধূমকেতুর মতো নীতিবোধ যুক্ত গানের পরিচয় পাওয়া যাবে। বিশেষ করে উল্লেখ করার মতো এন্টনি ফিরিঙ্গীর অসাম্প্রদায়িক মনোভাব, যা আজও অনুসরণযোগ্য।

এণ্টনি ফিরিঙ্গী বলেন —

"খৃষ্টে আর কৃষ্টে কিন্তু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই।।
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে
ঐ দেখ শ্যাম দাঁড়িয়ে আছে
আমার মানবজনম সফল হবে যদি রাঙা চরণ পাই।।" (৫)

আর এক বিখ্যাত কবিওয়ালা রামনিধি গুপ্ত বা নিধুবাবু (১১৪৮-১২৪৫ বঙ্গাব্দ)। নিধুবাবুর গান মানবীয় ঘটনা কেন্দ্রিক। তাঁর বিরুদ্ধে রুচিহীন গান রচনার অভিযোগ থাকলেও দু-একটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ধর্মী গানের সন্ধান পাওয়া যায়। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনেক আগে একমাত্র নিধুবাবুই মাতৃভাষার গৌরব গান গেয়েছেন। নিধুবাবুর ভাষায়—

"নানান দেশের নানান ভাষা।
বিনে স্বদেশী ভাষে পুরে কি আশা।
কত নদী সরোবর, কি বা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘোচে কি তৃষা" (৬)

মাতৃভাষাকে ধারা জলের সঙ্গে তুলনা করে আধুনিক শিক্ষা বর্জিত নিধুবাবু যেন ভাষাবিজ্ঞানীর মতো এক সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্বের অবতারণা করেন, যা শ্রোতার মনে মাতৃভাষা প্রীতি জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট।

তবুও শেষে বলা যায় — উনিশ শতকের কবিগানে গীতিকবিতার লক্ষণ থাকলেও সমাজ বা দেশের এমন কি সাহিত্যের পক্ষে এমন গঠনমূলক ভূমিকা নিতে পারেনি, যার জন্য কবিগান আমাদের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। উনিশ শতকে গীতিকবিতা নামক প্রকরণের সমৃদ্ধি ও বাঙালীর আত্মবিকাশের অনুসন্ধানের জন্য আমাদের ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথের কাব্যকবিতা শরণাপন্ন হতে হবে।

উনিশ শতকে আধুনিক গীতিকাব্যের প্রথম পর্ব বা প্রস্তুতি পর্বে আমরা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আলোচনা করব। কেননা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে একমাত্র কবি ও স্বনামধন্য সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯)। আধুনিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮) ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' (১৮৫৯) প্রকাশের পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই বাংলায় কাব্য চর্চা

করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রামমোহন রায়, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ চিন্তানায়ক বাংলা গদ্য চর্চার ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। সেই সময় কেবল ঈশ্বর গুপ্তই বাংলায় কাব্য চর্চায় মগ্ন। তিনি শুধু কবিতা লিখেই ক্ষান্ত থাকেন নি, —তিনি প্রাচীন কবিদের কাব্য ও জীবনী সংগ্রহ এবং আধুনিক কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখকে কাব্য চর্চায় উৎসাহ দিতেন। এবিষয়ে ডঃ সুকুমার সেন বলেন—

> "ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যসাধনায় আধুনিকতার প্রকাশ তাঁহার ইতিহাস চেতনায় প্রতিবিম্বিত। ...এই ইতিহাস চেতনায়ই তাঁহাকে রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্র প্রভৃতি কবির এবং লালু-নন্দলাল প্রভৃতি কবিওয়ালার জীবনী ও রচনা সংগ্রহে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গবেষণার প্রথম প্রচেষ্টাও এই প্রথম।...
>
> ঈশ্বর গুপ্তের এই ইতিহাস চেতনার মূলে ছিল তাঁহার অবিসংবাদিত দেশপ্রেম। সেই সঙ্গে ছিল মজ্জাগত কবিতাপ্রীতি। যে প্রেরণায় তিনি প্রাচীন কবিদের পুনরুজ্জীবন করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন, তাহারই বশে তিনি নবীন কবিদের তৈয়ারি করিতে চাহিয়াছিলেন।" (৭)

প্রাচীন কাব্য ও কবিদের বিষয়ে ১৫ই জুলাই, ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় 'এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয় পূর্ব্বক নিবেদন'এ ঈশ্বর গুপ্ত বলেন—

> "এতদ্দেশীয় যে সকল প্রাচীন কবি মহাশয়েরা বঙ্গভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রণীত পুরাতন কবিতা ও সংগীত সকল এবং সেই সেই পুরুষের জীবন বৃত্তান্ত লিখিয়া যিনি আমাদিগের নিকট প্রেরণ করিবেন, আমরা মহোপকার স্বীকার পূর্ব্বক যাবজ্জীবন তাঁহার স্থানে কৃতজ্ঞতা ঋণে বদ্ধ রহিব, এবং তাঁহাকে দেশহিতৈষিদলের প্রধান শ্রেণী মধ্যে গণ্য করিব।" (৮)

ঈশ্বর গুপ্তের এই স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায় প্রাচীন কাব্য ও কবির রচনা ও জীবনী সংগ্রহে তিনি ছিলেন অকৃত্রিম অনুরাগী।

ঈশ্বর গুপ্তের আরেকটি উল্লেখযোগ্য কর্মপ্রয়াস হল 'সংবাদ প্রভাকর' (১৮৩১) এর মতো সংবাদপত্র সম্পাদনা। এবিষয়ে ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—

> "তিনি সাধারণ অর্থে শিক্ষিত ছিলেন না, ইংরেজী কিছুই জানতেন না, অথচ কোন কোন ব্যাপারে, বিশেষতঃ পত্রিকা সম্পাদনার ব্যাপারে বিস্ময়কর প্রগতিশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। অত্যন্ত জনপ্রিয়তার জন্য 'সংবাদ প্রভাকর' দ্বি-সাপ্তাহিক, মাসিক ও দৈনিক আকারেও প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদ, রাজনৈতিক মন্তব্য, ইংরেজ শাসনে সমালোচনায় ও আধুনিক শিক্ষা প্রচারে ঈশ্বর গুপ্ত যথেষ্ট মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। বাংলাদেশ, সমাজ, সাহিত্য সংক্রান্ত বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা তাঁর পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়। তাই তাঁকে বাংলা বার্তাজীবীদের গুরু বলা হয়।" (৯)

এদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নতুন শাসন ব্যবস্থা, কলকাতায় নতুন নাগরিকের অভিনব জীবনাচরণ, মানুষের মনে পাশ্চাত্য শিক্ষার মোহ, ইয়ংবেঙ্গলের উচ্ছৃঙ্খলত, প্রাচীনপন্থীর সংকীর্ণ মনোভাব, উদার ও মানবতাবাদী রাজা রামমোহন রায় প্রমুখের নানা সংস্কারমুখী কার্যকলাপ সচেতন ও নাগরিক মনকে প্রভাবিত করেছিল। ঈশ্বর গুপ্ত এমন একটি ভাঙ্গাগড়ার সময়ে আবির্ভূত হয়ে স্বজাতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এখানে আলোচনা করা হবে সমকালের উত্তাল ভাব-তরঙ্গের পটভূমিতে ঈশ্বর গুপ্ত রচিত কবিতাগুলি কোনরকম ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল কি না।

ঈশ্বর গুপ্ত যুদ্ধ বিষয়ক, অধ্যাত্মবিষয়ক, সংস্কৃতি বিষয়ক, নীতি বিষয়ক, প্রকৃতি বিষয়ক, প্রেম বিষয়ক, স্বদেশ বিষয়ক প্রভৃতি নানামুখী কবিতা লিখেছেন। তাঁর অধিকাংশ কবিতাগুলি যেন লোকশিক্ষার জন্য রচিত। ধরা যাক 'শীক সংগ্রাম', 'কাবুলের যুদ্ধ', 'ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম'-এর মতো যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলির কথা। এই কবিতাগুলি ইংরেজ শাসন-স্তুতি বিষয়ক কবিতা। আমাদের আলোচনার বিষয় বাংলা রচনায় স্বদেশ ভাবনা। কিন্তু উল্লিখিত যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলি স্বদেশ প্রেমভাবের বিরোধী। তাহলে কবি লিখিত যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলিকে দেশবিরোধী কবিতা বলতে হয়। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে দেশানুরাগের প্রতিকূল বিষয় থাকলেও পরোক্ষে দেশের প্রতি ভালোবাসাই প্রকাশ পেয়েছে। উদ্ভূত বিরোধাভাসের সমস্যাটির সমাধান পাওয়া যাবে কবির সুগভীর স্বদেশ প্রেম ভাবনার মধ্যে। মধ্যযুগের বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটে ইংরেজের শাসনভার গ্রহণের ফলে। তাঁরা মধ্যযুগের তুলনায় এদেশে অনেক বেশী সুখ ও স্বাচ্ছন্দ এনে দিতে পেরেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত নানাসাহেব, শীক, লক্ষ্মীবাঈ প্রমুখ স্বদেশীয়দের বিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধাচরণের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। সেজন্য তিনি একাধিক যুদ্ধ বিষয়ক কবিতায় স্বদেশীয়দের পরাজয় কামনা করেন। যেমন;—'কানপুরের যুদ্ধ', 'শীক সংগ্রাম', 'মুদকির যুদ্ধ', 'কাবুলের যুদ্ধ' প্রভৃতি কবিতায় ইংরেজের বিজয়ে কবি উল্লসিত হয়েছেন এবং ইংরেজ পরাজয়ে গভীরভাবে মর্মাহত হতেন। 'শীক সংগ্রাম'এর 'যুদ্ধের জয়' কবিতায় কবি ঈশ্বর গুপ্ত ইংরেজের জয়ে দুশ্চিন্তা মুক্ত হয়েছেন। এদেশের জনসাধারণের প্রতি তিনি আবেদন জানিয়েছেন;—

"এ দেশের প্রজা সব, ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল গীত, গান কর মুখে।।
ধন্য চিপ কমাণ্ডার, ধন্য দেও লর্ডে।
ইংরেজের ব্যাঙ্ক বাড়ে, থ্যাঙ্ক দেও গডে।।

— — —

সদর সমরকল্পে, বিভু দয়াময়।
গেল বিপক্ষের ভয়, গেল বিপক্ষের ভয়।। (১০)

'দ্বিতীয় যুদ্ধ'-এ কবি প্রায় একই আবেদন করেন;—

"ভারতের অবোধ, দুর্বল লোক যত।
ডাল্ ভাত মাছ্ খেয়ে, নিদ্রা যাবে কত?
পেটে খেলে পিটে সয়, এইবাক্য ধর।
রাজার সাহায্য হেতু, রণসজ্জা কর।।
লাহোরের শীক সেনা, শক্ত অতিশয়।
এখন, আলস্য করা, সমুচিত নয়।।" (১১)

হয়ত এর একটি কারণ থাকতে পারে। সমকালের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন বা ইংরেজ প্রশাসক পরাজিত হলে মধ্যযুগের অরাজক শাসন প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত ডঃ সুকুমার সেনের সুচিন্তিত মতামতের উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন —

> "মিউটিনিতে বাঙ্গালী যোগ দেয় নাই, তাহার কারণ বাঙ্গালী-সিপাহী বলিতে কিছু ছিল না এবং সিপাহীদের ষড়যন্ত্রে অ-সিপাহী বাঙ্গালীর যোগ দিবার কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উপলক্ষ্যও ছিল না। সত্য বটে যে শিক্ষিত বাঙ্গালী সিপাহী বিদ্রোহে উল্লসিত হয় নাই, শঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে লজ্জার কিছু নাই। সিপাহী বিদ্রোহের একটা প্রধান কারণ ছিল সমাজ-সংস্কার বিমুখতা। ইংরেজ বিধবাবিবাহ আইন পাস করিয়াছে, সে আমাদের ইংরেজী শিখাইয়া বিদেশিভাবাপন্ন করিতেছে, সে আমাদের জাতিপাঁতিতেও হাত দিতে উদ্যত—এইসব ধারণাই উত্তর পশ্চিম ভারতে সিপাহীদের, লুঠেরাদের ও গুণ্ডাদের এবং অশিক্ষিত জনসাধারণের একটা বড় অংশকে এবং অধিকারচ্যুত ভূস্বামীদের উত্তেজিত করিয়াছিল। তাহাদের পিছনে ক্ষমতাস্পৃহ মতলববাজেরা তো ছিলই। সিপাহীদের জয়লাভ মানে আবার জরাজীর্ণ মোগল আমলের দস্যুরাজত্বে প্রত্যাবর্তন এবং প্রায় শতাব্দীব্যাপী প্রগতির অত্যন্ত প্রতিষেধ। শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে এ চিন্তা অবশ্যই অসহ ছিল।" (১২)

আসলে ঈশ্বর গুপ্তের কাছে মধ্যযুগীয় শাসনের চাইতে সুশৃঙ্খল শাসন অনেক আদরণীয়। কিন্তু তাই বলে তিনি নিজেকে ইংরেজের দাস ভেবে পুলকিত হতেন বা এদেশ অনন্তকাল পরাধীন থাকুক এমন কামনা করেন নি। বরং তাঁর মনে পরাধীনতার জন্য গ্লানিবোধ ছিল। 'আচারভ্রংশ' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত সে বেদনা

ব্যক্ত করেন এইভাবে;—

"ওহে কাল কালরূপ, করালবদন।
তোমার রদনযুক্ত, মরালবাহন।।
দেব দেবী কত তুমি, করিয়া সংহার।
ভারতের স্বাধীনতা, করিলে আহার।।"
কিছু বুঝি নাহি পাও, চারি দিক চেয়ে।
এখন ভরাবে পেট, হিন্দুধর্ম্ম খেয়ে? (১৩)

এখানে স্বদেশের পরাধীনতার জন্য কবি গভীরভাবে ব্যথিত। অতএব যুদ্ধ বিষয়ক কবিতায় স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধাচরণ করলেও তিনি কোন প্রকারেই দেশবিরোধী নন। বরং দেশের সুদূরপ্রসারী মঙ্গলের জন্যই স্বদেশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিষয়ক কবিতাগুলি লিখেছেন।

লক্ষ করা যাবে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা লোকশিক্ষার গুণে সমৃদ্ধ। লোকশিক্ষার মধ্য দিয়ে বাঙালীকে শিক্ষিত ও সচেতন করতে পারলে সমাজ ও দেশের মঙ্গল। সেজন্য তিনি কবিতায় কখনো রঙ্গব্যঙ্গ বা সমালোচনা করতেন, কখনো নীতি উপদেশ দিতেন, কখনো অধ্যাত্ম শিক্ষার দ্বারা বাঙালীর জাতীয় সংস্কৃতিকে আগলে রাখার প্রয়াস করতেন, আবার কখনো বা কবি ঈশ্বর গুপ্ত দেশীয় বিষয়ের উপর প্রত্যক্ষ অনুরাগ মূলক কবিতা লিখে বাঙালীকে দেশানুরাগের প্রেরণা দিয়েছিলেন।

রঙ্গব্যঙ্গমূলক কবিতায় ঈশ্বর গুপ্তের রসিকতা বোধ ও সমালোচক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই জাতীয় কবিতায় তিনি ব্যঙ্গ বা সমালোচনার দ্বারা বাঙালীর ভুল শুধরে দিতে চেয়েছেন। মানুষের একপেশে রক্ষণশীল বা উগ্র আধুনিক মানসিকতায় সমাজের উন্নতি হয় না। অতএব ন্যায় ও নিরপেক্ষ মতাদর্শে সমাজকে এগিয়ে না নিলে মুক্তি অসম্ভব। ঈশ্বর গুপ্ত নিরপেক্ষ একথা প্রমাণ করা অসম্ভব; কিন্তু দেশের কল্যাণের জন্য অনেক অপ্রয়োজনীয় বা অবাঞ্ছিত বিষয়ের প্রতি ব্যঙ্গ বা সমালোচনা করতেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রাদুর্ভাব এদেশে ইংরেজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ঘটে। কিন্তু বাঙালীর এই বিদেশী সংস্কৃতি অনুকরণ যে হাস্যকর ও অসঙ্গত সে কথা পরোক্ষে 'ইংরেজী নববর্ষ' কবিতায় বলা হয়েছে। যেমন;—

"ধন্যরে বোতলবাসি, ধন্য লাল জল।
ধন্য ধন্য বিলাতের, সভ্যতার বল।।" (১৪)

কিংবা,

"গোরার দঙ্গলে গিয়া, কথা কহ হেসে।
ঠেস মেরে বসো গিয়া, বিবিদের ঘেঁসে।।" (১৫)

এরকমই বিষয় নিয়ে 'বড়দিন' কবিতাটি রচিত। এখানেও বাঙালীর 'ইংলিস ফ্যাসন'কে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। কবি রসিকতা করে বলেছেন, বড়দিনের উৎসবের লোভে নিজের হিন্দুত্বকে বর্জন করতে ইচ্ছা করে। কেননা;—

"হোটেল মন্দিরে ঢুকে, দেখিয়া বাহার।
ইচ্ছা হয় হিঁদুয়ানি, রাখিব না আর।।
জেতে আর কাজ নাই; ঈশু-গুণ গাই।
খানাসহ নানা সুখে, বিবি যদি পাই।।
চারিদিকে দেখ মন, অতি বেড়ে বেড়ে।
তোতে মোতে থাকি আয়, হিঁদুয়ানি ছেড়ে।।" (১৬)

'দুর্ভিক্ষ' ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা মূলক কবিতা। পাশ্চাত্য বা ইংরেজী শিক্ষা ও সংস্কৃতির গুণে এদেশে ইয়ংবেঙ্গল নামে একটি শ্রেণীর উদ্ভব হয়। বাংলা ভাষায় এঁদের অবজ্ঞা, দেশীয় ধর্মে এঁদের ঘৃণা, দেশীয় সংস্কৃতির বিলোপ করতে এঁরা বদ্ধ পরিকর। কবির ভাষায়;—

"স্বোণার বাঙাল, করে কাঙাল,
ইয়ং বাঙাল যত জনা ।
সদা কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে,
কাণে লাগায় ফোঁস ফোঁসনা।।
এরা, না "হিঁদু", না "মোছোলমান",
ধর্মধনের ধার ধারে না।" (১৭)

ঈশ্বর গুপ্ত খ্রীষ্টান মিশনারিদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবে মর্মপীড়িত। কবির ভাষায়;—

"যত মিশনরি এদেশেতে,
এসে করে কি কারখানা।
তারা ঈশুমন্ত্র কাণে ফুঁকে,
শিশুকে দেয় কুমন্ত্রণা!
ফেরে হাটে, ঘাটে, বাটে, মাঠে,
নানা ঠাটে, ফন্দি নানা।
বলে দিশি কৃষ্ণ ছেড়ে তোরা,
ঈশুখ্রীষ্ট কর ভজনা!" (১৮)

কবি সমকালের মেয়েদের ইংরেজী শিক্ষা ও বিধবার বিবাহকে সুনজরে দেখেন নি। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করতেন এতে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি আক্রান্ত হবে। এসব বিষয়ে ঈশ্বর গুপ্তের ধারণা কতখানি সমর্থনযোগ্য— সে বিতর্কে না গিয়ে বরং বলা চলে নারী বিষয়ে রক্ষণশীল মানসিকতার পিছনে তাঁর মনে দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিলোপের আশঙ্কা ছিল। সমকালে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এদেশের তরুণরা এলে যে ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী তৈরী হয়, তাদের মাত্রাতিরিক্ত বেপোরোয়া মানসিকতা দেখে ঈশ্বর গুপ্ত চান নি মেয়েদের সমাজ থেকে ইয়ংবেঙ্গলের মত দেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দলনকারী একটি সমাজ তৈরী হোক। সেজন্য তিনি বলেছিলেন;—

"আগে মেয়ে গুলো, ছিল ভালো;
ব্রত ধর্ম কোর্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে, শেষ কোরেছে,
আর কি তাদের তেমন পাবে ?

— — —

ও ভাই! আর কিছু দিন, বেঁচে থাকলে,
পাবেই পাবেই দেখতে পাবে।
এরা আপন হাতে হাঁকিয়ে বগী,
গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।।" [১৯]

কিংবা বিধবার বিয়ে প্রসঙ্গে বলেন;—

"ঘোর পাপে ভরা, হোলো ধরা,
রাঁড়ের বিয়ের হুকুম যবে।" [২০]

ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সমালোচনা মূলক আর একটি কবিতা হল 'নীলকর' (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, গীত)। উনিশ শতকে নীলকরদের অত্যাচারে কৃষকের দুরবস্থার অন্ত ছিল না। নীলকরের অত্যাচার বৃটিশ শাসনের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। নীল একটি অর্থকরি ফসল। এদেশে নীল চাষ ছিল না। এই উনিশ শতকের প্রথম থেকে এদেশে নীল চাষ শুরু হয়। ক্রমে নীলকর সাহেব নানারকম কৌশল অবলম্বন করে শোষণের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। নীলকর সাহেবের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে এদেশের চাষীরা বিদ্রোহী হয়, যা নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯) নামে পরিচিত। সে সময়ের নীলকর সাহেবের মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, কবি-সাহিত্যিক গর্জে উঠেছিলেন। কবি ঈশ্বরগুপ্ত কবিতার দ্বারা দেশীয় প্রজাসাধারণের দুর্বিষহ যন্ত্রণার দিক

ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত 'নীলকর' কবিতায় মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে বলেন;—

"মা তোমার ভারতবর্ষে, সুখো আর নাহি পর্ষে,
প্রজারা নহে হর্ষে, সবাই বিমর্ষে"।[২১]

শাসন ব্যবস্থা যে ত্রুটিপূর্ণ, কবি তার উল্লেখ করে বলেন;—

"এ দেশের দুর্দশা এমন,
হয়নিকো আর হবেনাকো।।
কুটিয়ালের মেজেষ্টরি,
লাঠিয়ালের রেজেষ্টরি,
এ আইন হয়েছে জারি
মার্তে আমাদের।"[২২]

অসাধু ব্যবসায়ী ও নীলকর সাহেবের শোষণ প্রজাসাধারণের আর্থিক ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে দিয়েছে। কবির ভাষায়;—

"চার্ টাকা মণ দর্ উঠেছে, নূতন চেলে।
আর কত চল্‌বো নূতন চেলে ?[২৩]

কবি এরকম অপশাসন নিবারণের জন্য মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে অনুরোধ জানান। কবি বলেন;—

"ভারতের ভার দিবে যারে,
এই কথাটী বোলো তারে, মা গো!
যেন ঈশ্বরেতে দৃষ্টি রেখে,
কার্য করে কুতূহলে।"[২৪]

ঈশ্বর গুপ্ত সমাজের মানুষকে সচেতন করতে অনেক নীতিমূলক কবিতা লিখেছেন। যেমন, পৃথিবীতে বিষয়-আশয়, অহংকার, সুন্দরী নারী প্রভৃতির প্রতি আসক্তি অনেক সময় জীবনে অধঃপতন ডেকে আনে। কবি তাই 'সব হ্যায় ফাক্' কবিতায় বলেন;—

"দুনিয়ার মাঝে বাবা সব হ্যায় ফাক্, বাবা সব হ্যায় ফাক্।
ধনের গৌরবে কেন মিছা কর জাঁক, বাবা মিছা কর জাঁক।।"[২৫]

এ যেন ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক শঙ্করাচার্যের 'মায়াবাদ'-এর বাংলা কবিতা রূপ। অবশ্য তাই বলে মানুষ একে বারে নিরুৎসাহী হলে জগৎ সংসার অচল হবে। সেজন্য কবি বলেন—এই পৃথিবীর অনেক বিষয়ের সঙ্গে ভারসাম্য রেখে ভোগ করলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়। সেজন্য 'সব ভরপূর' কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত নেতিবাচক ভাবনার পরিবর্তে তাঁর রসিক মনের পরিচয় দেন। যেমন;—

"দুনিয়ার মাঝে বাবা সব ভরপূর, বাবা সব ভরপূর।
পরিমাণে ধনদানে গৌরব প্রচুর, বাবা গৌরব প্রচুর।।
পেয়েছ উত্তম দেহ, যোগ-পথে মন দেহ,
পরিহরি মোহ স্নেহ চল সুরপুর।" (২৬)

এখানে দান, দয়া প্রভৃতি নীতিধর্মের কথা বলা হয়েছে। এরকম আর একটি নীতি মূলক কবিতা 'কিছু কিছু নয়'। এই কবিতায় ঈশ্বর গুপ্ত মানুষকে শুধু আসক্ত হয়ে থাকতে যেমন বারণ করেছেন তেমনি প্রয়োজনে নিরাসক্ত হতেও বারণ করেন। সেজন্য তিনি উপদেশ দিয়ে বলেন;—

"ধন বল জন বল, সহায় সম্পদ বল,
পদ্মদলগত জল, চিহ্ন নাহি রয়।
— — —
তব-ভ্রম পরিহরি, মুখে বল হরি হরি,
কৃতান্তকুঞ্জর হরি, হরি দয়াময়।।
দুনিয়ার মাঝে বাবা কিছু কিছু নয়।
নয়ন মুদিলে সব অন্ধকারময়।।" (২৭)

'সাম্য' একটি উৎকৃষ্ট নীতি-উপদেশ মূলক কবিতা। এতে পৃথিবীর সব জীবকে সমান ভাবার জন্য আবেদন আছে। কেননা 'সর্বভূতে' ঈশ্বর থাকেন। নীতিকথার একটি পংক্তি এরকম;—

"সকলেরে জ্ঞান কর, আপনার সম।
তাহাতেই সিদ্ধ হবে, দম আর শম।।" (২৮)

'শরীর অনিত্য' ঈশ্বর গুপ্তের লেখা নীতিমূলক কবিতার আরো একটি দৃষ্টান্ত। কবি পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেন;—

"জীবন জীবনবিম্ব স্থায়ী কভু নয়।
নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই কখন কি হয়।।" (২৯)

জীবনকে পরিপূর্ণতা এনে দিতে পারে; —

"দ্বেষ হিংসা পরিহর, বিবেকের সঙ্গ ধর
সকলের প্রতি কর, সরল প্রণয়।" (৩০)

ধর্ম বিশ্বাসী ভারতবাসী তথা বাঙালীর নিকট বড় সম্পদ ঈশ্বরের কৃপা লাভ। এদেশের মানুষ জীবনে পরম শান্তি লাভের জন্য ঈশ্বরের সেবা করে দিন কাটিয়ে দিতে চান। কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্বধর্মে আস্থা রেখে আনন্দময় পুরুষ ঈশ্বরের বন্দনামূলক বা তাঁর তত্ত্বরূপকে বিষয় করে কিছু কবিতা লিখেছেন। যেমন—'নির্গুণ ঈশ্বর', 'বিষয়ে সুখ নাই', 'তত্ত্ব', 'পরমার্থ', 'শ্রীমদ্ভাগবত' ইত্যাদি। এই সব কবিতায় তিনি ঈশ্বরের গুণাবলী ও নানা তত্ত্বকথার প্রকাশ করেন। উনিশ শতকের অনেক আস্থাহীন মানুষের নিকট এই কবিতাগুলি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত প্রকাশ্যে মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির বন্দনা করেছেন। তিনি 'স্বদেশ' কবিতায় জন্মভূমিকে পবিত্র শিবধাম বলে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়;—

"ইন্দ্রের অমরাবতী, ভোগেতে না হয় মতি,
স্বর্গভোগ উপসর্গ সার।
শিবের কৈলাসধাম, শিবপূর্ণ বটে নাম,
শিবধাম স্বদেশ তোমার।।" (৩১)

স্বদেশবাসী প্রসঙ্গে তাঁর সুগভীর অনুরাগ এরকম;—

"ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসীগণে,
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।।" (৩২)

মাতৃভাষা ঈশ্বর গুপ্তের নিকট অমৃত তুল্য। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে কবির ভাবনা আধুনিক শিক্ষাবিদের মতো। কবির ভাষায়;—

"যে ভাষায় হোয়ে প্রীতি, পরমেশ-গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃ সম মাতৃভাষা, পূরালে তোমার আশা,
তুমি তায় সেবা কর সুখে।।" (৩৩)

'স্বদেশ' ও 'মাতৃভাষা' বিষয়ে কবির সুগভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে।

উনিশ শতকে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-মধুসূদন দত্ত-হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-নবীনচন্দ্র সেন-বিহারীলাল চক্রবর্তী-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ আধুনিক কবির আবির্ভাবের পূর্বে একমাত্র ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা কাব্যচর্চা করতে গিয়ে স্বদেশ, মাতৃভাষা, দেশীয় সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা কবিতায় অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন। এই বিশেষ কৃতিত্বের জন্য ঈশ্বর গুপ্ত আমাদের নিকট শ্রদ্ধার পাত্র।

জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকাব্যের চর্চা ও স্বদেশ ভাবনা ঃ

বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেনের অধিকাংশ কাব্যের আবেদন প্রায় সমধর্মী। উভয়েই বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের কবি হিসেবেই বিখ্যাত। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' (১ম খণ্ড, ১৮৭৫, ২য় খণ্ড, ১৮৭৭) ও নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' (১৮৮৬) 'কুরুক্ষেত্র' (১৮৯৩) 'প্রভাস' (১৮৯৬) নামে 'ত্রয়ীকাব্য' বাংলা আখ্যানকাব্যের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। এই দুই কবি আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবে পরিচিত হলেও গীতিকাব্যের লক্ষণ যুক্ত কিছু কিছু খণ্ড কবিতা লিখেছিলেন।

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের আর একটি ক্ষেত্রে যথেষ্ট মিল রয়েছে। দুই কবিই সমকালের যুগরুচির দ্বারা প্রভাবিত। ইতিমধ্যে সিপাহিবিদ্রোহ (১৮৫৭) ও নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯) সংঘঠিত হয়। ইংরেজ শাসনের প্রতি সর্বস্তরের মানুষ ক্রমশ আস্থা হারাতে থাকে। সবচাইতে বড় কথা হল শাসকের বিমাতৃসুলভ ভাব শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিকে আহত করেছিল। বিষয়টি আমরা পূর্বের 'উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা' ও 'উনিশ শতকের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যে স্বদেশ ভাবনা' অধ্যায়ে জাতীয়তাবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছি। একদা রামমোহন-প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বাঙালীর নিকট বিদেশী শাসন ছিল স্বপ্নের মতো। এই পর্বে সেই স্বপ্নের পরিবর্তন হয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭), 'ভারত সভা' (১৮৭৬) প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সভা সমিতি গঠিত হয়। এই সময় হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র কবিতা লেখেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্যের আবেদন বিষয়ে বলেন;—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যরচনায়, হেমচন্দ্র, রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির উদ্দীপনাময় কবিতায় একদিকে যেমন দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি তাহা হিন্দুদের মনে পৃথক জাতীয়তা ভাবের ইন্ধন যোগাইতেছিল।" (৩৪)

হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেন যখন কবিতা চর্চা শুরু করলেন তখন শিক্ষিত বাঙালীর মনে ক্রমশ জাতীয়তাবোধ জেগে উঠছিল। নিজ দেশের পরাধীনতা আত্মসচেতন বাঙালীকে আহত করত। কিন্তু উপায় ছিলনা, দেশ তখনও স্বাধীনতা লাভের উপযুক্ত হয়ে উঠেনি। কিন্তু সেজন্য দেশহিতৈষী চিন্তানায়কগণ আত্ম বিশ্বাসের মতো জনসচেতনতা সৃষ্টি করার মহৎ কাজ থেকে পিছিয়ে থাকে নি। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন স্বদেশের

মঙ্গলের জন্য কবিতার দ্বারা জনচেতনা বৃদ্ধির কাজ করেছিলেন। আমরা লক্ষ করব তাঁদের গীতিকবিতায় কখনো কখনো স্বদেশের দুরবস্থার জন্য বিলাপ, কখনো ভারতের ঐতিহ্যের প্রতি গৌরব কথা, আবার কখনো দুরবস্থা মোচনের জন্য আত্মবিশ্বাস জাগানোর মহৎ প্রেরণার কথা শোনা যায়।

প্রথমে কবি হেমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৯০৩) খণ্ড কবিতা বা গীতিকবিতার আলোচনা করা হবে। হেমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের সূচনা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগে মোটামুটি সত্তরের দশক থেকে। এই সময়ে যুগভাবনা তাঁর গীতিকবিতা 'কবিতাবলী' (প্রথম খণ্ড ১৮৭০ ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৮৮০) ও 'চিত্তবিকাশ'-এ (১৮৯৮) যথেষ্ট সক্রিয়। অবশ্য গ্রন্থাকারে স্থান পায়নি এমন অনেক কবিতাতেও সমকালীন যুগভাবনা রয়েছে। হেমচন্দ্র প্রকৃতি, প্রেম, স্বদেশ প্রভৃতি বিষয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন। তবে স্বদেশ বিষয়ক কবিতাগুলিতে ব্যক্তি হেমচন্দ্রের অনুভূতি অত্যন্ত প্রখর। এই জাতীয় কবিতা পাঠ করলেই বোঝা যাবে কবি কৃত্রিম ভাবরাজ্য থেকে কবিতার ভাববস্তু সংগ্রহ করেন নি। বলা যায়, এরকম কবিতা কবি হেমচন্দ্রের একান্ত নিজস্ব সামগ্রী। এতে দেশ, জাতি ও জাতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে কবির অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ পেয়েছে। সমকালের দুরবস্থা বর্ণন, অনেকক্ষেত্রে তা থেকে মুক্তির উপায়, জাতীয় গৌরবে গৌরব বোধ সর্বোপরি জাতিকে উৎসাহ প্রদানের মতো বিষয় দেশের প্রতি কবি হেমচন্দ্রের দায়বদ্ধতার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'কবিতাবলী' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড, 'চিত্তবিকাশ'-এর বিভিন্ন কবিতা এবং 'কবিতাবলী' ও 'চিত্তবিকাস'-এর গ্রন্থভুক্ত নয় এমন কয়েকটি কবিতা থেকে দেশের প্রতি কবির দায়বদ্ধতার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। ঐতিহ্যের স্মৃতিতেপূর্ণ ভারতবর্ষ উনিশ শতকে পুনরায় গৌরব অর্জনে প্রয়াসী হয়। 'কালচক্র' কবিতায় ফ্রান্স, আমেরিকা, রাশিয়া, ইতালি ও ইংল্যাণ্ডের চরম উন্নতির প্রসঙ্গ রয়েছে। সঙ্গে ভারতের চরম অবনতির কথাও প্রকাশ পেয়েছে। কবির ভাষায়;—

"অই দেখ অগ্রে তার
পরিয়া মহিমা-হার
চলেছে ফরাসী জাতি ধরা স্তব্ধ করিয়া।

— — —

আমেরিকা-বাসীগণ,
নদ, গিরি, প্রস্রবণ,
জলনিধি, উপকূল লৌহজালে বাঁধিয়া।
অই শোন্ ঘোর নাদে

পূরাতে মনের সাধে
পুরুষিয়া মল্লবেশে উঠিতেছে গর্জ্জিয়া
বিনতা-নন্দন-সম
ধ'রে নিজ পরাক্রম
দেখ্ রে আসিছে রুষ্ বসুমতী গ্রাসিয়া।

ইতালি উতলা হ'য়ে
স্বকিরীট শিরে ল'য়ে
আবার জাগিছে দেখ্ হুহুঙ্কার ছাড়িয়া
বিস্তারিয়া তেজোরাশি
দেখ্ রে বৃটনবাসী
আচ্ছন্ন করেছে ধরা,
মরু দ্বীপ সসাগরা,
যত দূর প্রভাকর-কর আছে ব্যাপিয়া।"(৩৫)

এই কবিতায় সমকালীন ভারতবাসীর চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। কবি হেমচন্দ্র স্বদেশের কথা ভেবে অত্যন্ত ব্যথিত। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি যখন উন্নতির চরম শিখরে বিরাজ করছে—তখন ভারতবাসী নিস্তেজ। কবি অভিযোগের সুরে বলেন;—

"তবুও বারেক কি রে দেখিবি না চাহিয়া—
হতভাগ্য হিন্দুজাতি!—
— — —
সে আশা হইল দূর,
নীরব ভারতপুর,
একজন (ও) কাঁদে না রে পূর্ব্বকথা ভাবিয়া।" (৩৬)

সুদূর মধ্যযুগ থেকে সমসাময়িক কালেও ভারতবাসী পরাধীন। কবি এজন্য ব্যথিত। 'ভারত-বিলাপ' কবিতায় হেমচন্দ্র পাঠান, মোগল ও ইংরেজদের নিকট দেশের পরাধীনতার জন্য বিলাপ করেছেন। কবির

ভাষায়;—

"কি হবে বিলাপ করিলে এখন,
স্বাধীনতা-ধন গিয়াছে যখন,
মনের মাহাত্ম্য হয়েছে নিধন
তখনি সে সাধ ঘুচে গিয়াছে।
সাজে না এখন অভিলাষ করা,
আমাদের কাজ শুধু পায়ে ধরা,
মস্তকে করিয়া দাসত্বের ভরা
ছুটিতে হইবে ওদেরি পাছে!
হায় বসুন্ধরা তোমার কপালে
এই কি ছিল মা, পড়ে কালে কালে
বিদেশীর পদে জীবন গোঁয়ালে,
পূরাতে নারিলে মনের আশা।
— — —
হায় রে বিধাতা, কেন দিয়াছিলি
হেন অলঙ্কার? কেন না গঠিলি
মরুভূমি ক'রে,—অরণ্যে রাখিলি,
এ হেন যাতনা হতো না তায়।
তা হ'লে এখানে করিত না গতি
পাঠান, মোগল, পারস্য দুর্ম্মতি,
হরিতে ভারত-কিরীটের ভাতি,
অভাগা হিন্দুরে দলিতে পায়।"(৩৭)

জাতির পরাধীনতায় মর্মাহত কবি 'ভারতসঙ্গীত' কবিতায় স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীকে উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন;—

"আরব্য, মিসর, পারস্য, তুরকী,
তাতার, তিব্বত, অন্য কব কি,
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।"(৩৮)

কবি হেমচন্দ্র বলেন—একদা বীর প্রসবিনী ভারতমায়ের সমকালের দুরবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় আছে। কবির ভাষায়;—

"একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে,
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা-ধ্বজা।" (৩৯)

এখানে যেন জাতীয় মুক্তির সঙ্গীত ধ্বনিত হয়েছে। সে মুক্তি প্রত্যেক ভারতবাসীর একতার মধ্যেই নিহীত।

'মন্ত্রসাধন' কবিতায় কবি ইংরেজ জাতির শৌর্য বীর্যের কীর্তন গেয়েছেন। কবি বলেন স্বাজাত্যবোধ, সাহস, মনোবল, একতা, গণআন্দোলন প্রভৃতি ইংরেজ জাতির মন্ত্রশক্তি। ভারতবর্ষের দুরবস্থা নিরসনের জন্য এই মন্ত্রশক্তির প্রয়োজন। আশাবাদী কবি উৎসাহ দিয়ে বলেন;—

"না হৈও নিরাশ—ভারত-সন্তান,"(৪০)

দেশের মানুষের সুখবরে কিংবা জাতির গৌরবে কবি আনন্দিত হতেন। তাঁর 'জয়মঙ্গল গীত' ও 'বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে' কবিতা দুটিতে হেমচন্দ্র অকৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করেছেন। 'জয়মঙ্গল গীত' কবিতায় স্বদেশ হিতৈষী রমেশচন্দ্র দত্তের হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতি হওয়ার গৌরবময় বিষয় নিয়ে রচিত। কবি স্বদেশববাসীর এরকম সম্মানীয় পদ লাভে আনন্দ প্রকাশ করেছেন এইভাবে;—

"বংশী বাজিছে রমেশের জয়
আজ রে হৃদয়ে বড় সুখোদয়—
— — —
উজল আজি হে বাঙালির নাম
উজল ভারতভূমি।
বঙ্গের প্রধান বিচার আসনে
আজি হে প্রধান তুমি।।"(৪১)

দেশের নারীর অধিকার হীনতা কবিকে আহত করত। 'বিধবা রমণী' কবিতায় এদেশের বিধবাদের যন্ত্রণাময় বারোমাস্যার কথা সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে। 'ভারত-কামিনী' কবিতাতেও নারী নির্যাতনের

চিত্র ফুটে উঠেছে যেমন;—

"অরে কুলঙ্গার হিন্দু দুরাচার—
এই কি তোদের দয়া, সদাচার?
হয়ে আর্য্যবংশ - অবনীর সার
রমণী বধিছ পিশাচ হয়ে!
এখনও ফিরিয়া দেখ না চাহিয়া
জগতের গতি ভ্রমেতে ডুবিয়া—
চরণে দলিয়া মাতা, সুতা, জায়া,
এখনো রয়েছ উন্মত্ত হয়ে?" (৪২)

'ভারতকামিনী' কবিতায় হিন্দুসমাজে কুসংস্কারের প্রভাবে ভারতীয় নারীদের নির্যাতন, অত্যাচার ও লাঞ্ছনার একশেষ ব্যক্ত হয়েছে। কবি স্বপ্ন দেখেন-পাশ্চাত্যের নারীর মতো এদেশের নারীও সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান জেনে জীবনকে উন্নত করবে। নারীর জীবন যাত্রার উন্নয়ন না হলে দেশের উন্নতি অসম্ভব। সেজন্য কবি প্রাচীন ভারতের সীতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, লীলাবতী প্রমুখ নারীর উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়;—

"আর কি ভারতে ওরূপে আবার
হবে রে অঙ্গনা-মহিমা প্রচার?—
পেয়ে নিজ মান, পরে নিজ বেশ
জ্ঞান, দম্ভ, তেজে পূরে নিজ দেশ,—
বীর - বংশাবলী - প্রসূতি হবে?" (৪৩)

সম্ভবত সেই কারণেই চন্দ্রমুখী বসু ও কাদম্বিনী বসু নামক দুই রমণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করলে কবি আনন্দে "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে" কবিতাটি রচনা করেন। কবি লিখেছেন;—

"এত দিনে জাগিল রে জীবনে বিশ্বাস,
ঘুচিল হৃদয় হ'তে কালের হতাশ।।
বাঙালির কামিনীর হৃদয়-কমলে
পাশ্চাত্য সাহিত্য-রূপ দিনমণি জ্বলে।।" (৪৪)

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় স্বপ্নের ভারতবর্ষ গঠনের জন্য জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর সম্মিলিত প্রয়াসের কথা বলেন। জাগরণের বার্তা ধ্বনিত করেছেন। কবি বলেন—ভারত গঠনে মুসলমানদেরও

ইতিবাচক ভূমিকা প্রয়োজন। 'রীপন উৎসব-ভারতের নিদ্রাভঙ্গ' নামক কবিতায় হেমচন্দ্র অসাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রকাশ করেন। তাঁর ভাষায়;—

"একা বঙ্গ নয় হিমালয় হ'তে

কুমারীর প্রান্ত যেখানে শেষ,

আজি এক প্রাণ হিন্দু-মুসলমান;—

জাগাতে তোমায় জেগেছে দেশ।" (৪৫)

কবি তাই আসন্ন সুদিনের প্রসঙ্গে দেশমাতাকে প্রশ্ন করেন;—

"ভাঙিল কি তবে— এতদিন পরে—

ভাঙিল কি ঘুম ভারত মাতা ?"(৪৬)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন কবি হেমচন্দ্র হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের উন্নতির লক্ষে এরকম কবিতা লেখেন। 'রাখিবন্ধন' কবিতায় দেশের জাগ্রত মূর্তি কবিকে আনন্দিত করেছে। কবি বলেন;—

"কি আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে—

ভারতজননী জাগিল!"(৪৭)

অভেদ ভারত চেতনা লক্ষ করে কবি আত্মহারা। কবি হেমচন্দ্র লিখেছেন;—

"জীবন সার্থক আজিরে আমার

এ রাখি বন্ধন ভারত মাঝার

দেখিনু নয়নে— দেখিনু রে আজ" (৪৮)

বঙ্গমায়ের সন্তান কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশ প্রেমের আবেগে রঞ্জিত 'জন্মভূমি' নামক কবিতাটি উল্লেখ করার মত। কবি বলেন—গুরুত্ব ও গৌরবে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এই বঙ্গভূমি। তাঁর মতে;—

"এই ত আমার, জগতের সার,

স্মৃতি সুখকর জনম-ঠাঁই।

— — —

জগতে জননী জনম-ভুবন,

গুরুত্ব-গৌরবে দুই অতুলন,

স্বরগ (ও) নিকৃষ্ট দুয়ের (ই) কাছে।" (৪৯)

কবি সেজন্যই পরম আরাধ্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন—বাঙালী পৃথিবীর অন্য প্রান্তে যতই সম্মান ও সুখ পাক না কেন, স্বদেশের প্রতি তাঁদের অনুরাগ যেন হারিয়ে না যায়। কবির ভাষায়;—

" হে জগৎপতি, এ-দাস-মিনতি,
রেখো এই দয়া বঙ্গ মাতা প্রতি,
বঙ্গবাসী যেন কখন (ও) কেহ,
যেখানেই থাক্ যেখানেই যাক,
যতই সম্মান যেখানেই পাক,
না ভুলে স্বদেশ ভকতি স্নেহ।" (৫০)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার প্রভাবে বাঙালী যখন দেশ বিদেশের পটভূমিতে স্থান লাভ করতে চলেছে, ঠিক তখন হেমচন্দ্রের এ জাতীয় বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। যা কবির অকৃত্রিম দেশানুরাগের কথাকেই মনে করিয়ে দেয়।

বলা যায় উনিশ শতকের জাতীয় উদ্দীপনার আঁচ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীতিকবিতায় ফুটে উঠেছে। কবির দেশ ও জাতির গৌরবে গৌরব বোধ এবং দুর্দিনে বেদনা বোধ, জাতীয় দুরবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কবির সদাসতর্ক দৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়গুলি থেকে প্রমাণিত হয় কবি হেমচন্দ্র একজন খাঁটি দেশানুরাগী কবি।

এবার নবীনচন্দ্র সেনের গীতিকবিতা বা খণ্ডকবিতার আলোচনা করে তাঁর দেশানুরাগের পরিচয় নেওয়া হবে। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে নবীনচন্দ্র সেন আখ্যান কাব্যের কবি হিসাবেই সর্বাধিক পরিচিত। তবুও অনেক সময় প্রকৃতি স্বদেশ প্রভৃতি বিষয় কবি-মনে যে ভাবের জন্ম দিত, তাতে কবির লেখনী নীরব থাকে নি। 'অবকাশ রঞ্জিনী' (প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, ১৮৭১ ও ১৮৭৮) নামে কাব্যগ্রন্থটি প্রকৃতি চেতনা, প্রেম চেতনা, স্বদেশ ভাবনা প্রভৃতি বিষয়ে রচিত গীতিকবিতা বা খণ্ডকবিতার সংকলন গ্রন্থ। নবীনচন্দ্র সেন কলেজ জীবন থেকেই স্বদেশ ভাবনা বিষয়ক কবিতা রচনা করেন। 'আমার জীবন' এর প্রথম খণ্ডে 'অবকাশ রঞ্জিনী' নামক অংশে নবীনচন্দ্র সেন বলেন;—"স্বদেশ-প্রেম কলেজে অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, ...আমি পদ্যে 'এডুকেশন গেজেটে' প্রথম স্বদেশের দুরবস্থায় অশ্রুবর্ষণ করি" (৫১)

'অবকাশরঞ্জিনী' '১ম ও ২য় ভাগে কবির স্বদেশ বিষয়ক কবিতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল;— 'চট্টোগ্রামের সৌভাগ্য', 'সায়ংচিন্তা', 'শশাঙ্ক দূত', 'মুমূর্ষুশয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক', 'অবলা বান্ধব', 'মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক্ অফ্ এডিন্‌বরার প্রতি', 'আর্য্যদর্শন', 'বাঙালীর বিষপান', 'অনন্ত দুঃখ', 'চিহ্নিত সুহৃদ',

'অনন্ত শয্যা', 'শবসাধন', 'ভারত উচ্ছ্বাস', 'রাজা কালীনারায়ণ রায়বাহাদুর', 'ভুবনমোহিনী প্রতিভা', 'আবাহন' প্রভৃতি। উক্ত কবিতাগুলিতে নবীনচন্দ্র সেনের স্বদেশ ভাবনা বিষয়ক যে মানসিকতা প্রকাশিত হয় তা এইরকম,— কোনো কোনো কবিতায় স্বদেশের ঐতিহ্যের প্রকাশ ঘটেছে, কোনো কোনো কবিতায় পরাধীনতার গ্লানির প্রকাশ ঘটেছে, কোনো কোনো কবিতায় স্বদেশের করুণ দুরবস্থা প্রকাশিত হয়েছে, আবার কোনো কোনো কবিতায় পরাধীনতার কারণে শিক্ষিত মনের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও স্বদেশের নারী জাতির প্রতি দরদ এবং স্বদেশের আশু রেনেসাঁসের কথাও 'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো কবিতায় ফুটে উঠেছে।

'অবকাশ রঞ্জিনী' কাব্যগ্রন্থের ১ম ভাগ ও ২য় ভাগের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কবিতার দ্বারা কবিমনের স্বদেশ ভাবনাকে প্রকাশ করা হচ্ছে।

'চট্টোগ্রামের সৌভাগ্য' কবিতায় কবি স্বদেশ চেতনার আলোক-রশ্মি দেখতে পেয়েছেন। কবির ভাষায়;—

"উঠ উঠ জন্মভূমি উঠ এক বার !
বসি অবনত মুখে, মজিয়া মনের দুখে,
বিরস বদনে মাতা কেঁদো না ক আর।
কি দুঃখে কাঁদিছ এত বল না আমায়,—
তব মুখ দেখি, বুক বিদরিয়া যায়।" (৫২)

মাতৃভূমির অবনত ও মলিন মুখ কবিকে আহত করে। জন্মভূমি মাকে কবি দুঃখ করতে বারণ করেন। কেননা, আধুনিক শিক্ষার আলো স্বদেশকে ক্রমশ আলোকিত করছে। কবি বলেন;—

"বিগলিত অশ্রুধারা কর সম্বরণ;
মাথা তোল জন্মভূমি, বল মা! আমায় তুমি,
এমন মলিন বেশ কিসের কারণ?" (৫৩)

আর সেই সঙ্গে দেশে কুসংস্কার, অচেতনতা দূর হবার পথে। কবিতার ভাষায় বলা যায়;—

"জননি! সমস্ত বঙ্গে, তব যশঃধ্বনি
হইতেছে প্রতিমুখে, তুমি কেন মনোদুখে,
কাঁদিতেছ একাকিনী দিবসরজনী।
জনরবে শত মুখে তব গুণ কয়,
বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষে মা! তোমার জয়।" (৫৪)

উক্ত পংক্তিতে কবি নবীনচন্দ্র সেন আসন্ন রেনেসাঁস বা নবজাগরণের কথা অত্যন্ত দরদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন।

'সায়ংচিন্তা' কবিতায় শিক্ষিত মনের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে। শিক্ষার আলোকরশ্মির জন্য কবি ভারতের প্রাচীন গৌরবময় ইতিহাস জেনে কষ্ট পাচ্ছেন। কেননা, সমকালে ভারতের দশা অত্যন্ত করুণ। কিন্তু একদিন ভারতের ইতিহাস ছিল ঐতিহ্যশালী। কবি বলেছেন;—

"ভারতের ইতিহাস, শোকের সাগর,
কেন পড়িলাম; আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়; আর্য্যবংশ-কীর্ত্তিচয়
কেন দেখিলাম, আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর?" (৫৫)

তাই কবি বলেন — শিশুকালই সবচাইতে ভাল ছিল। কবির ভাষায়;—

"শিশুমতি এ সকল নাহি কিছু জ্ঞান,
নাহি ভাবে কিসে হবে দেশের মঙ্গল," (৫৬)

দেশের করুণ দুর্দশা প্রত্যক্ষ করে একজন শিক্ষিত ও সচেতন মানুষের যে মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে, তারই কাব্যরূপ হল 'সায়ংচিন্তা' নামক কবিতাটি।

'মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক' কবিতায় নবীনচন্দ্র সেন ব্যঙ্গ করে বলেন বাঙালীর মৃত্যুই ভাল। আত্মসচেতন কবি নবীনচন্দ্র সেন বলেন—যে ইংরেজ জাতি কিছু দিন পূর্বেও বর্বর ছিল, তারাই প্রাচীন সভ্য ভারতের ভাগ্য নিয়ন্তা। কবির ভাষায়;—

" সে দিনের ইংলণ্ড, কি ছার বড়াই!" (৫৭)

—এখন শিক্ষিত বাঙালী ইংরেজের চোখের বালি। রাজপদে বাঙালীর অধিকার নেই। বাঙালীকে এখনও শুধুই কেরানির চাকুরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। সেজন্যই কবি মনে করেন;—

রাজপদে আমাদের নাহি অধিকার,
রাজচিন্তা আমাদের উন্মাদস্বপন,
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি সভা অদৃষ্ট আগার,
আমাদের পক্ষে যেন নন্দন-কানন।

কেবল কেরানিগিরি বাঙ্গালী-জীবন,
বর্ণ বিনে, বিদ্যা বুদ্ধি সকলি বিফল,
অধীনতা হায়! এই দুঃখের কারণ,
সাধে বলি বাঙ্গালীর মরণ মঙ্গল!"[৫৮]

—কিন্তু কবির মনে হয়েছে দীর্ঘদিন পরাধীন এই জাতি সময় ও সুযোগ পেলেই স্বমূর্তি ধারণ করবে। কবিতার ভাষায়;— "... তেমনি সবল,
ধরিবে সতেজ মূর্ত্তি পাইলে সময়।"[৫৯]

—কবিতাটিতে অসহ্য পরাধীনতার যন্ত্রণা-কথার শিল্পসম্মত কাব্যরূপ পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে। যাকে স্বদেশ ভাবনা বললে অত্যুক্তি হয় না।

'মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ্ এডিন্বরার প্রতি' কবিতায় যুবরাজকে উদ্দেশ্য করে জন্মভুমির করুণ দুর্দশার কথা বলা হয়েছে। এক সময় এদেশ যবন দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিল। আর এখন এদেশ কিছু স্বার্থপর ইংরেজের শাসন ও শোষণে নিঃস্ব। যুবরাজকে উদ্দেশ্য করে দেশমাতা যেন অভিযোগের সুরে বলে;—

"এখন আসিয়া কত সামান্য ইংরাজ,
বড় বড় রাজপদে হয় প্রতিষ্ঠিত,
আপনার স্বার্থসিদ্ধি একমাত্র কাজ,
আমার সন্তানে করে চরণে দলিত

— — —

সুশিক্ষিত সহৃদয় যতেক বাঙ্গালী,
ইহাদের চক্ষুশূল নয়নের বালি।" [৬০]

'অবলা বান্ধব' পত্রিকার প্রকাশ উপলক্ষে এদেশের নারী জাতির প্রতি কবি মনের সুগভীর দরদ প্রকাশ পেয়েছে। অবলা নারীদের সুখদুঃখ অবলাদের ভাষাতেই প্রকাশ হওয়া উচিত। পত্রিকার এই বিশেষ উদ্দেশ্যটি কবিকে আনন্দিত করেছে। কেননা তাতে স্বদেশীয় নারীর উপকার হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা। হয়ত সেজন্যই কবি পুলকিত হয়ে বলেন বহুদিন পরে অবলা নারীদের সুদিন আসতে চলেছে। কবির ভাষায় ;—

" বঙ্গের অবলাগণ। এত দিন পরে,
পোহাইল আমাদের বিষাদ-শর্ব্বরী ;
কি সুখের স্রোত আজি বহি'ছে অন্তরে,
পুলকে কোমল অঙ্গ উঠি'ছে শিহরি'
ঘুচাইতে অবলার দুরদৃষ্ট সব,
মিলাইল বিধি এই অবলা-বান্ধব।"[৬১]

যোগেশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ কর্তৃক বিখ্যাত 'আর্য্যদর্শন' (১২৮১ বঙ্গাব্দ) পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই উপলক্ষে 'আর্য্যদর্শন' কবিতাটির সৃষ্টি। সূচনায় কবি বলেছেন 'আর্য্য' নাম কেন উচ্চারণ করা হল। একসময় যে আর্যজাতির গৌরব পৃথিবী খ্যাত ছিল, সেই আর্য জাতি এখন নিস্তেজ। কবি লিখেছেন;—

এই নহে আর্য্যাবর্ত্ত;
আমরাও নহি সেই আর্য্যের কুমার ;"[৬২]

—কবি নবীনচন্দ্র সেন সমকালের আর্যজাতির দুরবস্থার জন্য বেদনা বোধ করেছেন। কবি হতাশ হয়ে বলেন —

" কি দোষে না জানি , হায়!
বিধাতার কাছে দোষী আমরা সকল,
তেজোহীন, বীর্য্যহীন;
ততোধিক পরাধীন;—
আমাদের-হায়! কোন্ পাপের এ ফল ?
করে ভিক্ষা-পাত্র,—কণ্ঠে দাসত্ব-শৃঙ্খল।"[৬৩]

"মাইকেল মধুসূদন দত্ত' কবিতাটি বাংলার অমর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তকে নিয়ে রচিত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসসূদন দত্তের পরলোক গমনের বিষয়টি কবি নবীনচন্দ্র সেন মেনে নিতে পারেন নি। মধুসূদনের অসহায়ভাবে মৃত্যুতে নবীনচন্দ্র মর্মাহত। তিনি দুঃখ করে বলেন;—

"হা অদৃষ্ট ! —কবিবর! এই কি তোমার
ছিল হে কপালে ?
— — —
দাতব্য চিকিৎসালয়ে তোমার মরণ ?"[৬৪]

মধুসূদন দত্ত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের কবি মধুসূদনের মৃত্যুতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি হবে। দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষতি হবে এই বিষয়টি নবীনচন্দ্রকে আহত করেছিল। কবি লিখেছেন ;—

"শূন্য হ'ল আজি বঙ্গ-কবি-সিংহাসন,
মুদিল নয়ন
বঙ্গের অনন্য কবি, কল্পনা-সরোজ-রবি,
বঙ্গের কবিতা-মধু হরিল শমন।"[৬৫]

—পরিশেষে কবি নবীনচন্দ্র সেন সুগভীর শ্রদ্ধা সহকারে কবি মধুসূদনের উদ্দেশ্যে বলেন;—

"যাও তবে, কবিবর! কীর্ত্তিরথে চড়ি'
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি, ব্যাস ভবভূতি, কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।
যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া,
কবিতা-ভাণ্ডারে;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়-মন-মধুকরে
পান করি', করিবেক যশস্বী তোমারে।"(৬৬)

স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ মাত্রই জানেন মদ্যপান বিষপানের তুল্য। উনিশ শতকে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে অনেকে মদ্যপানে আসক্ত ছিল। বাঙালীর মদ্যপানকে কেন্দ্র করে কবি নবীনচন্দ্র সেন 'বাঙ্গালীর বিষপান' কবিতা রচনা করেন। মদ্যপান বাঙালীর জীবনে বিষপানের তুল্য—কবি সেকথা বলতে ভোলেন নি। তাঁর মতে—জ্ঞান, বুদ্ধি, নীতি, ধর্ম, লজ্জাবোধ, জাতীয় গৌরব সবই এই বিষের তেজে বিনাশ হয়। কবির ভাষায়;—

"জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম্ম, সত্য, জাতীয় গৌরব,
এই বিষ-তেজে হইবে বিনাশ!
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব!"(৬৭)

—'বাঙ্গালীর বিষপান' কবিতায় নবীনচন্দ্র সেন রঙ্গব্যঙ্গের পরিচয় রেখেছেন। কবি এখানে ইঙ্গিতে পরাধীনতার গ্লানিকে প্রকাশ করেন। তাঁর মতে বাঙালীর দুঃখের সীমা নেই, এই দুঃখ ভুলতে হলে মদ্যপান একান্ত প্রয়োজন। কবি বলেন;—

"অধীনতা-দুঃখ করিতে বিনাশ,
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার;
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস!"(৬৮)

—এখানে মদ্যপানকে কেন্দ্র করে কবি নবীনচন্দ্র সেন বাঙালীর পরাধীনতাকে কৌশলে প্রকাশ করেছেন।

বঙ্গমাতার অনন্ত দুঃখের বিষয় নিয়ে কবি নবীনচন্দ্র সেন 'অনন্ত দুঃখ' কবিতাটি লেখেন। তিনি এই কবিতায় বিধাতার বিরুদ্ধে অভিযোগ বলেন;—

"রে বিধাতা! নির্দ্দয় হৃদয়!
বাঙ্গালীর এত দুঃখ— এত যন্ত্রণায়,—
পূরিল না তথাপি কি উদর তোমার?"(৬৯)

কবি বলেছেন— ব্যাধি, দুর্যোগ, রাজনৈতিক পরাধীনতার যন্ত্রণা নিয়েও বঙ্গমাতা কৃতি সন্তানকে বুকে আগলে দিন কাটাত। কিন্তু বিধাতার এতেও নজর পড়ে। বিধাতা বঙ্গমায়ের কৃতি সন্তান মধুসূদন, কিশোরী চাঁদ ও দীনবন্ধুকে হরণ করে। বঙ্গমায়ের এর চেয়েও অধিক দুঃখ আর কিছু নেই।

দেশীয় কৃষকের কল্যাণের জন্য নীলকরের বিরুদ্ধে দীনবন্ধু মিত্রের গর্জে ওঠা লেখনী, তাঁর বাংলা সাহিত্যের উন্নয়ন প্রভৃতি কৃতকর্মের কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। কবি বঙ্গমায়ের অনন্ত দুঃখে হতাশ হয়ে বলেন;—

"আর কত দিন এই দুঃখের অনল
র'বে প্রজ্বলিত বঙ্গে ? শুনিয়াছি ভবে
সকলের শেষ আছে, সকলেই মরে বাঁচে,
ধরাতলে কিছু নাহি চিরদিন রবে;"(৭০)

এখানে কবি নবীনচন্দ্র সেন মাতৃভূমির চিরদুঃখের জন্য গভীর বিলাপ করেছেন। পরিশেষে কবি প্রকৃতির উত্থান-পতনের অমোঘ নিয়মের মধ্যেই স্বদেশের অনন্ত দুঃখের অবসান দেখতে পেয়েছেন। আর সেজন্যই নবীনচন্দ্র সেন প্রশ্ন করেন;—

"বঙ্গের কি দুঃখ, আহা! অনন্ত কেবল?" (৭১)

উচ্চ-শিক্ষার জন্য যারা বিদেশ গিয়ে সুশিক্ষা লাভের পরিবর্তে অনুকরণকেই অপরিহার্য বলে মনে করে, তাদের বাণবিদ্ধ করে 'চিহ্নিত সুহৃদ' কবিতাটি রচিত। বন্ধু বিদেশের শিক্ষা শেষ করে ফিরলে কবি বলেন—তুমি বঙ্গমায়ের জন্য কি মহামূল্য ধন বিদেশ থেকে এনেছ ? নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায়;—

"অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি',
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া;
জগত-জীবন ইউরোপে ভ্রমি',
আসিয়াছ, সখে! কি ফল লভিয়া?" (৭২)

—কবি অনুকরণপ্রিয়তায় আহত। দেশমাতৃকাকে সেবা করার মতো তার শিক্ষা বা চেতনা বন্ধুর নেই। কবি লিখেছেন;—

"ইংরাজের শ্মশ্রু, ইংরাজের কেশ,
ইংরাজি আহার— প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ, সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য্য-বল?
কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জ্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?"(৭৩)

কবি চেয়েছেন— বিদেশে গিয়ে অনুকরণ নয় বরং বিদেশীদের অন্তর্সম্পদ সাহস, শৌর্য, বীর্যের মতো শিক্ষা লাভ করলে স্বদেশের মঙ্গল। বন্ধুর মধ্যে এসব কিছু দেখতে না পেয়ে কবি বলেন;—

"সিংহচর্ম্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ!"(৭৪)

কিংবা,

"হ'য়েছ "চিহ্নিত"! — কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে, হায়! কলঙ্ক কেবল,
সেই চিহ্নে, সখে! হইবে না ছিন্ন
দীনা ভারতের অদৃষ্ট-শৃঙ্খল!" (৭৫)

ভাবী ভারতেশ্বর যুবরাজ এডোয়ার্ড-এর ভারত আগমন উপলক্ষে ভারতবাসীর উচ্ছ্বাসকে বিষয় করে 'ভারত উচ্ছ্বাস' কবিতাটি রচিত। কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রশ্ন করেন,— যুবরাজ কেন ভারতে আসবেন? —

"হায়! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়!
পতিতা ভারতে তব আগমন?
ভারতের কীর্ত্তি এবে স্বপ্নপ্রায়;" (৭৬)

আসলে প্রাচীন ভারতের যে গৌরবময় কীর্তি বা ঐতিহ্য ছিল — তা স্বপ্নপ্রায়। সমকালের সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প সবই পাশ্চাত্যের প্রভাবযুক্ত। কবি দুঃখ করে বলেন, এই ভারত বস্ত্র শিল্পে একসময় জগৎ বিখ্যাত ছিল, অথচ আজ ভারতবাসী লজ্জা নিবারণ করে মেনচেষ্টার থেকে আনা কাপড় দিয়ে। এদেশে লবণ সম্পদ প্রচুর অথচ লবণ সংগ্রহ করা হয় 'লিবরপুল' থেকে। তাই কবি বলেন;—

"হায়! যুবরাজ, এই পরিণাম
শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্ত্তি, নাম,
চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া?"[৭৭]

মহাভারতের বীর্যবান জাতির বিভীষিকাময় যুদ্ধের কথা, রাজপুত রাণার বিক্রমের ইতিহাস ও সিপাহী বিদ্রোহে ইংরেজের আতঙ্ক, বীর প্রসবিনী পাঞ্জাব প্রভৃতি আজ শুধু ইতিহাসের স্মৃতিতে। বাস্তবে এখন আর কিছুই নেই। কবির ভাষায়;—

"আজি সে জাতির ভস্মরাশি হায়!
সিন্ধু-জাহ্নবীর নর্ম্মদার তীরে
পড়ে আছে; ক্রমে বিধির ইচ্ছায়
হইবে বিলীন কালসিন্ধু-নীরে।" [৭৮]

এইসব বক্তব্যে স্বদেশের দুরবস্থার জন্য কবিমনের বেদনা ধ্বনিত হয়েছে।

'অবকাশরঞ্জিনী'র প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগে বাংলা তথা ভারতের উন্নতির জন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন নানাভাবে প্রেরণা বা উৎসাহ দিয়েছেন। যা তাঁকে অকৃত্রিম দেশানুরাগী কবি হিসাবে পরিচিত হতে সাহায্য করে।

৩। গীতিকবিতার আস্বাদ ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা ঃ

বাংলা গীতিকবিতার প্রথম শিল্পরূপ দানের বিশেষ কৃতিত্বের জন্য 'উনিশ শতকের গীতিকাব্যে স্বদেশ ভাবনা' অধ্যায়ের গীতিকবিতার আস্বাদ ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা নামক পর্বে পৃথকভাবে মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) গীতিকবিতা আলোচিত হচ্ছে। মধুসূদন দত্তের হাতে প্রথম আধুনিক বাংলা গীতিকবিতার প্রাণ ও দেহ শিল্পরূপ লাভ করে। তাঁর কবিতায় আমরা প্রথম সুতীব্র ব্যক্তিক অনুভূতি লক্ষ করি। প্রসঙ্গত— 'বঙ্গভাষা' কবিতার কথা বলতে পারি—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!
— — —
কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমলকানন!" [৭৯]

এই কবিতায় কবি মনের অনুশোচনার এক সুগভীর অনুভূতি কাব্যরূপ লাভ করেছে। আর আধুনিক গীতিকবিতার গঠন বিষয়ে মধুসূদন দত্তই প্রথম স্পষ্ট ধারণা দেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে তাঁর রচিত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'বঙ্গভাষা', 'কপোতাক্ষ নদ', 'কালিদাস'-এর মতো একাধিক সনেটের কথা বলতে পারি।

আমরা লক্ষ করব মধুসূদন গীতিকবিতা নামক প্রকরণে বাঙালিয়ানাকে অকৃত্রিম ভাবে প্রকাশ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে যতই তিনি বিদেশী সংস্কৃতিতে অনুরক্ত হন না কেন তাঁর গীতিকবিতাগুলি পাঠ করলে তাঁকে বাঙালী কবি বলেই মনে হবে। মধুসূদনের রচিত গীতিকাব্যের আলোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। এখানে ধারাবাহিকভাবে 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' (১৮৬১), 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) ও কোনো কাব্যগ্রন্থ ভুক্ত হয় নি এমন কয়েকটি কবিতার আলোচনা করা হয়েছে।

'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' (১৮৬১)

মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'টিকে 'ওড' বলে জানিয়েছেন। কবি স্বীকৃতি ও কবিতাগুলির কানায় কানায় 'ওড'-এর সুর ধ্বনিত হওয়ায় 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'টিকে গীতিকাব্যের প্রকরণে অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

'ব্রজাঙ্গনাকাব্য'-এর বিষয় হল কৃষ্ণ প্রেমে পাগলিনী ব্রজের শ্রীমতী রাধার বিরহের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন। স্বভাবতই একটি প্রশ্ন জাগতে পারে মধুসূদন দত্ত গ্রীক, ইংরেজী প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্যরস-আস্বাদন করার পরেও কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে আদি-মধুর রস নির্ভর 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' রচনা করলেন। আমরা জানি, প্রথম জীবনে মধুসূদন ভিন্ন মত পোষণ করলেও পরবর্তীকালে স্বদেশীয় ভাষা-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। যার সাহিত্যিক দৃষ্টান্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র অধিকাংশ কবিতা। এখানে নিজ দেশের কবি, কাব্য, মনীষী, সংস্কৃতি, জাতীয় ঐতিহ্য প্রভৃতির প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে। বৈষ্ণব সাহিত্য বাঙালীর প্রাণের সামগ্রী। মধুসূদন বাঙালীর জাতীয় সামগ্রীকে এড়াতে পারেন নি। আদি মধুররস প্রধান বিষয়কে কাব্য রূপ দিয়ে পক্ষান্তরে তিনি জাতীয় ভাবধারা প্রধান সাহিত্য চর্চা করেন। তবে মধুসূদন যুগস্রষ্টা কবি। প্রাচীনের যথাযথ অনুকরণকারী প্রতিভা তাঁর নয়, তিনি বাঙালীর বৈষ্ণব সাহিত্যের চিরাচরিত রাধার সংস্কার করে বৈষ্ণব সাহিত্যকে যুগমানসের উপযোগী করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর বৈষ্ণব কাব্য 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য' থেকে ধর্ম ও তত্ত্বকে সরিয়ে মানবী রাধার কৃষ্ণ প্রেমের স্বরূপ ফুটিয়ে তোলেন। এ বিষয়ে মধুসূদন-জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথ বসু বলেন;—

> "জয়দেব অথবা বিদ্যাপতি, শ্রীরাধিকাকে যে ভাবে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, 'ব্রজাঙ্গনা'য় সে ভাব নাই। মধুসূদনের রাধা ভক্ত বৈষ্ণবের পরমাপ্রকৃতি রাধা নহেন; বিরহ-বিধুরা রমণীমাত্র। তাঁহার বৃন্দাবন অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন নহে, সুরম্য উপবন মাত্র। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ নহেন, প্রেমিক মনুষ্য মাত্র।" (৮০)

বৈষ্ণব কবিগণ মধ্যযুগ থেকে ধর্ম ও তত্ত্বের আবরণে রাধা-কৃষ্ণের যে প্রেম কাহিনীর ছবি অঙ্কন করেন, মধুসূদন দত্ত সেই চিরাচরিত ছবির সংস্কার করেন। মধুসূদন দত্তের এরকম মহৎ কর্ম একাধারে তাঁর দেশীয় সাহিত্য প্রীতি ও সাহিত্যের মানোন্নয়নের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' (১৮৬৬) ও সমধর্মী অন্যান্য কয়েকটি কবিতা ঃ

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' পাঠ করতে গিয়ে মধুসূদনের শিক্ষা, রুচি, আভিজাত্য এবং এই কাব্যের কয়েক জন বিদেশী ব্যক্তিকে নিয়ে রচিত কবিতার কথা ছেড়ে দিলে কবিকে বাংলার খাঁটি বাঙালী কবি বলেই মনে হবে। কবি এখানে যা বলেছেন তা একেবারে তাঁর নির্ভেজাল মনের কথা। এই মনের কথার অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুর হল স্বদেশ ভাবনা। একদা দেশমাতৃকার অঞ্চল ছেড়ে কবি বিশ্বমায়ের কোলে সম্মানের সঙ্গে ঠাঁই পেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিফল হয়ে কবি মধুসূদন পুনরায় ফিরে এসেছেন অনুতাপের সুর নিয়ে বঙ্গভারতীর কোলে। আর এজন্যই বিদেশে অবস্থানকালে লেখা এই কবিতাগুলিতে ঠাঁই পেয়েছে বঙ্গভারতীর যাবতীয় বিষয়ের প্রতি কবি-হৃদয়ের প্রগাঢ় ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' ও সমধর্মী কিছু কবিতায় কবি মধুসূদন দত্ত প্রকাশ করেছেন মাতৃভাষা, জন্মভূমি, বাংলা সাহিত্যের কবি, কাব্য, বিখ্যাত কিছু চরিত্র, সংস্কৃত সাহিত্যের কবি, কাব্য, কাব্যের বিষয়, বিখ্যাত চরিত্র, ভাষা, দেশীয় দেব-দেবী ও উৎসবের গুরুত্ব, দেশের প্রকৃতি এবং সমকালের দেশহিতৈষী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতা। উল্লিখিত বিষয়গুলি নিম্নে আলোচিত হয়েছে।

মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা ও মমতার কবিতা ঃ

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মাতৃভাষা বন্দনামূলক কবিতা 'বঙ্গভাষা' নামক সনেটটি। কবি বঙ্গভাষার বিবিধ রতন ছেড়ে বিজাতীয় ভাষার সেবা করে অতুল সম্মানের অধিকারী হতে চেয়ে যে ভুল করেছেন, সে বিষয়ে কবির গভীর অনুশোচনা প্রকাশিত হয়েছে। আমরা পূর্বেই একবার উল্লেখ করেছি, প্রসঙ্গত পুনরায় উল্লিখিত হল। কবি লিখেছেন;—

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন;-
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশ, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহু দিন সুখ পরিহরি!

— — —

কেলিনু শৈবালে; ভুলি কমলকানন!" (৮১)

এছাড়া অন্যান্য গীতিকবিতাগুলির মধ্যে 'কবি মাতৃভাষা' মধুসূদনের বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতায়ও মাতৃভাষা ছেড়ে কবির বিদেশী ভাষা প্রীতির জন্য অনুশোচনা ব্যক্ত হয়েছে। কবির ভাষায়;—

"নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য; তা সবে আমি অবহেলা করি," (৮২)

মাতৃভূমি বিষয়ক ঃ

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মধ্যে 'সমাপ্তে' সনেটটি মাতৃভূমির প্রতি কবির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও মমতা প্রকাশ পেয়েছে। কবি জন্মভূমির প্রতি অনুশোচনার সুরে বলেন;—

"নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;"(৮৩)

—কবি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছেন;—

"এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে,—
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ-ভারত-রতনে!"(৮৪)

'ভারত-ভূমি' কবিতাটিও এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। একদা ঐশ্বর্যময়ী ভারতমাতার বর্তমান ভিখারী দশা কবিকে ব্যথিত করে তোলে —

"কার শাপে তোর তরে, ওলো অভাগিনি,
চন্দন হইল বিষ; সুধা তিত অতি?"(৮৫)

—এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত নয় এমন কিছু কবিতাতেও মাতৃভূমির প্রতি দরদ প্রকাশ পেয়েছে। যেমন 'বঙ্গভূমির প্রতি' এবং 'আত্মবিলাপ' কবিতা দু'টি। 'বঙ্গভূমির প্রতি' কবিতায় কবি মধুসূদন বঙ্গমায়ের একটুখানি স্নেহ বা ভালোবাসা প্রার্থনা করেছেন। কবি বলেন;—

"রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।
সাধিতে মনের সাদ,
ঘটে যদি পরমাদ,
মধুহীন করো না গো তব মনঃকোকনদে।"(৮৬)

—'আত্মবিলাপ' কবিতায়ও কবি প্রথম জীবনের নীচ কর্মের জন্য অনুশোচনা বা বিলাপ করেছেন। কবি বলেন;—

"আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়,
তাই ভাবি মনে?
জীবন-প্রবাহ বহি কাল-সিন্ধু পানে যায়
ফিরাব কেমনে ?

— — —

যশোলাভ লোভে আয়ু, কত যে ব্যয়িলি হায়,
কব তা কাহারে?" (৮৭)

কেননা পরবর্তীকালে কবি বুঝতে পেরেছেন জন্মভূমি ও জন্মভূমির অনেক বিষয়ের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে তিনি মহাভুল করেছেন। এই গর্হিত কাজটি কবিকে ব্যথিত করে তোলে, যার ফলে 'আত্মবিলাপ' কবিতাটি রচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে কবি, কাব্য ও বিখ্যাত কিছু চরিত্র ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যরস উপলব্ধি করলেও বাংলা সাহিত্যকে কতখানি আন্তরিক শ্রদ্ধা করতেন তার দৃষ্টান্ত 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র বাংলা সাহিত্যের কবি, কাব্য ও চরিত্রকে নিয়ে রচিত সনেটগুলি।

'কৃত্তিবাস' সনেটে বাংলা রামায়ণের কবি কৃত্তিবাস সম্বন্ধে মধুসূদন বলেন;—

"যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে," (৮৮)

'কাশীরাম দাস' সনেটে বাংলা সাহিত্যে মহাভারতের কবি কাশীরাম দাস সম্বন্ধে কবি মধুসূদন বলেন;—

"হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।।" (৮৯)

বাংলা মঙ্গল কাব্যের এক বিখ্যাত কবি মুকুন্দ চক্রবর্তী সম্বন্ধে কবির বক্তব্য;—

"শ্রীকবিকঙ্কণ,
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ-সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী!" (৯০)

বাংলা কাব্য বিষয়ে মধুসূদন কয়েকটি সনেট লিখেছেন। যেমন 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের অংশ নিয়ে 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি'। এই সনেটে কবি লিখেছেন;—

"...অন্নদামঙ্গল—

যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাণ্ডারে,

রাখে যথা সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে।।" [৯১]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অংশ নিয়ে 'কমলে কামিনী' সনেটটি মধুসূদন রচনা করেন। 'চণ্ডীমঙ্গল' তথা 'কমলে কামিনী'র বঙ্গদেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তাকে কবি প্রকাশ করেন এই ভাবে—

"বঙ্গ-হৃদ-হ্রদে চণ্ডী কমলে কামিনী'।। [৯২]

বাংলা কাব্যের চরিত্রও মধুসূদনের মনকে প্রভাবিত করেছিল। তার সার্থক উদাহরণ 'ঈশ্বরী পাটনী' ও 'শ্রীমন্তের টোপর' নামক সনেট দু'টি।

সংস্কৃত সাহিত্যের কবি, কাব্য, বিষয়, কিছু চরিত্র ও সংস্কৃত ভাষা ঃ

সংস্কৃত সাহিত্যের বিখ্যাত কবি বাল্মীকি, কালিদাস প্রমুখ কবিকে নিয়ে মধুসূদন দত্ত সনেট রচনা করেন। তাঁর 'বাল্মীকি' সনেটে রামায়ণের মহাকবি বাল্মীকিকে এদেশের 'কবি-কুল-পতি' [৯৩] রূপে বরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে কালিদাস সম্পর্কে মধুসূদন বলেন;—

"কবিতা-নিকুঞ্জে তুমি পিককুল-পতি!" [৯৪]

কবি আরো বলেন;— "সঙ্গীত-তরঙ্গ তব উথলি ভারতে

(পুণ্যভূমি!) হে কবীন্দ্র, সুধা বরিষণে," [৯৫]

সংস্কৃত সাহিত্যের রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলার বিখ্যাত কবি জয়দেব সম্বন্ধে অনুরূপ বন্দনা করেন 'জয়দেব' নামক সনেটটিতে।

সংস্কৃত কাব্য বললে এদেশের মানুষের প্রথমে মনে আসে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' নামক মহাকাব্য দু'টির কথা। কবি মধুসূদন অসাধারণ প্রতিভার বলে জাতীয় মহাকাব্য দু'টিকে সনেটের রূপে ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপ দান করে মহাকাব্য দু'টির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

সংস্কৃত কাব্যের বিষয়ও কবিকে প্রভাবিত করেছে। যেমন দুর্যোধন ও ভীমের বিখ্যাত গদাযুদ্ধকে নিয়ে

'গদাযুদ্ধ', কৌরব পাণ্ডবের বিভীষিকাময় যুদ্ধের বিষয়কে নিয়ে 'কুরুক্ষেত্র' সনেট দু'টি রচিত হয়।

গদাযুদ্ধের কথা বললেই মনে পড়ে মহাভারতে দুই বীর গদাধারী দুর্যোধন ও ভীমের কাহিনী। কবি মধুসূদন এদেশের এরকম একটি অবিস্মরণীয় বিষয় নিয়ে সনেট রচনা করেন।

মহাভারতের ভ্রাতৃঘাতী কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধও এদেশে চিরস্মরণীয়। কবি এরকম একটি স্মরণীয় বিষয়কে নিয়ে সনেট লিখবেন না — তা ঠিক নয়। মহাভারতের অন্যতম একটি শোকাতুর বিষয় বালক অভিমন্যু বধের কাহিনী। মধুসূদন বিষাদময় অভিমন্যু বধের বিষয়কে 'কুরুক্ষেত্র' নামক সনেটে স্থান দিয়েছেন। এছাড়া বাঙালী তথা ভারতবাসীর হৃদয় হরণ করেছে এমন কিছু বিষয়কে নিয়েও মধুসূদন দত্ত সনেট লিখেছেন। যেমন—'সুভদ্রা-হরণ', 'সীতা-বনবাস' প্রভৃতি।

সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি থেকে কবি মধুসূদন দত্ত বিশেষ কিছু চরিত্রকে নিয়ে সনেট লিখেছেন। যেমন—'সুভদ্রা', 'উর্বশী', 'দুঃশাসন' 'হিড়িম্বা', 'শকুন্তলা' প্রভৃতি। এইসব চরিত্র বাঙালী তথা এদেশবাসীর মনে স্থায়ী দাগ কেটে আছে।

মধুসূদন দত্ত সংস্কৃত ভাষাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। কবির এই শ্রদ্ধাবোধ 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র 'সংস্কৃত' নামক সনেটে প্রকাশিত। কবি আশা করেন সংস্কৃত ভাষার গৌরবময় দিনগুলি ফিরে আসুক। কবির ভাষায়;— "... পূর্ব-রূপধরি,

ফোট পুনঃ পূর্বরূপে, পুনঃ পূর্ব-রসে!" (৯৬)

দেশীয় দেব-দেবী ও উৎসবঃ

মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে দেব-দেবী ও উৎসব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য সনেটগুলি হল—'সরস্বতী', 'শ্রীপঞ্চমী', 'দেবদোল', 'বিজয়াদশমী', 'কোজাগর লক্ষ্মীপূজা' দেবীদুর্গার পূজা উপলক্ষে 'আশ্বিন মাস' প্রভৃতি সনেট। এইসব সনেটে দেশীয় দেব-দেবী ও উৎসবই মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

সমকালের দেশহিতৈষী ব্যক্তি বিষয়েঃ

এই পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য সনেট দু'টি হল 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' ও 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর'। 'সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর' কবিতায় বাংলা মায়ের কৃতি সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশাল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কথা বড় হয়ে উঠেছে। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর' নামক সনেটটিতে বিদ্যাসাগরের 'সহৃদয় হৃদয়সংবাদী' দিকটি উজ্জ্বল হয়ে

উঠেছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়;—

"বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!" (৯৭)

স্বদেশের প্রকৃতি ঃ

কবি মধুসূদন দত্ত বাংলাদেশের প্রকৃতিকে তাঁর সনেটে স্থান দিয়ে। যেমন—'কপোতাক্ষ নদ', 'বটবৃক্ষ' প্রভৃতি।

'কপোতাক্ষ নদ' পূর্ব বঙ্গের একটি ছোট নদী। এই নদীটির সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ছেলেবেলা থেকে। বহুদিন পরে বিদেশে অবস্থানকালে কবির স্মৃতিতে এই ছোট নদীটি সনেটের আকার পেয়ে অমরতা লাভ করে। কবির ভাষায়—

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে;"(৯৮)

'বটবৃক্ষ' সনেটটিতে বটবৃক্ষ এদেশের মানুষের জীবনে কতখানি প্রভাব বিস্তার করে তারই চিত্র ফুটে উঠেছে। কবির ভাষায় ;—

"দেব-অবতার ভাবি বন্দে যে তোমারে,
নাহি চাহে মনঃ মোর তাহে নিন্দা করি,
তরুরাজ! প্রত্যক্ষতঃ ভারত-সংসারে,
বিধির করুণা তুমি তরু-রূপ ধরি!
জীবকুল-হিতৈষিণী, ছায়া সু-সুন্দরী,

— — —

দেব নহ; কিন্তু গুণে দেবতার মত।" (৯৯)

—অতএব মধুসূদন দত্তের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যেন বাংলা ভাষায় বাংলা দেশেরই কবিতা। যার মূল সুর স্বদেশের প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রতি কবির আন্তরিক মমতা ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মধ্যে নিহীত।

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক ভাবধারার প্রবর্তন করতে গিয়ে মধুসূদন স্বদেশ, স্বসমাজকে ভুলে যান নি। এই বিশেষ তথ্যটি তাঁর অন্যান্য রচনার মতো গীতিকাব্যতেও প্রকট। বলা যায় — যা মধুসূদনের মনের স্বদেশ ভাবনাকেই ফুটিয়ে তোলে।

বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও বাঙালীর স্বদেশভাবনা ঃ

মধুসূদন দত্তের দ্বারা গীতিকবিতায় ব্যক্তিক অনুভূতি যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা শিল্প সার্থকতা লাভ করে বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সেই গীতিকবিতার প্রাণ ছন্দোময় বা আরো ঐশ্বর্যে মণ্ডিত হয়েছিল। বাংলা গীতিকাব্যে এবার কল্পনা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতের সার্থক মেলবন্ধন হল। শুধু তাই নয়, গীতিকবিতার গঠন কত বিচিত্র হতে পারে তা রবীন্দ্রনাথের রচিত গীতিকবিতায় লক্ষ করা যায়। বিহারীলাল চক্রবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের হাতে উনিশ শতকে বাংলা গীতিকবিতার বিশুদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয়—এমন মন্তব্য করলে অত্যুক্তি হবে না। আমরা উনিশ শতকের বিশুদ্ধ বাংলা গীতিকবিতায় স্বদেশ ভাবনা বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতা ও বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা নামক পর্বে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের গীতিকবিতা আলোচনা করব।

বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মধুসূদন দত্তের পরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঐশ্বর্যপূর্ণ কাব্যসম্ভারের পূর্বে গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে বিহারীলাল চক্রবর্তী এক অবশ্য স্মরণীয় নাম। বিহারীলাল চক্রবর্তী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন এই রকম;—

> "সে প্রত্যুষে লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুমিষ্ট সুন্দর সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের। ...আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় কবির নিজের সুর শুনিলাম।" (১০০)

যখন বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার অভাব, ঠিক সেই সময় বিহারীলাল চক্রবর্তী বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গীতিকবিতার ভোরে সুমিষ্ট সুরে গান গেয়ে বাঙালীর গীতিকবিতাকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। বিহারীলাল তাঁর 'সারদামঙ্গল' কাব্যের সম্বন্ধে 'শ্রীযুক্তবাবু অনাথবন্ধু রায়'কে 'কবির একখানি পত্র'-এ বলেন;— "মৈত্রী বিরহ, প্রীতি বিরহ, সরস্বতী বিরহ যুগপৎ ত্রিবিধ বিরহে উন্মত্তবৎ হইয়া আমি সারদামঙ্গল রচনা করি।"(১০১) এবং কাব্যের উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গে বলেন;—"...আমি কোন উদ্দেশ্যেই সরদামঙ্গল লিখি নাই।" (১০২) —কবির এরকম ঘোষণার পিছনে তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সমকালের কাব্য সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা দেন;—

> "বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায়—নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না— তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন। তাঁহার সেই স্বগত উক্তিতে বিশ্বহিত দেশহিত অথবা সভামনোরঞ্জনের কোনো উদ্দেশ্য দেখা গেল না।" (১০৩)

'সারদামঙ্গল' কাব্যের বিষয়বস্তু অবশ্য কোন প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্যের কথা বলে না। অর্থাৎ সমকালের যুগের দাবী মতো কোন উদ্দেশ্য 'সারদামঙ্গল'-এ না থাকায় হয়ত কবি স্বয়ং কাব্যটিকে উদ্দেশ্য-বহির্ভূত কাব্যগ্রন্থ বলে মন্তব্য করেন। কবির এই মন্তব্য 'সঙ্গীত শতক' (১৮৬২), 'বঙ্গসুন্দরী' (১৮৭০), 'নিসর্গ সন্দর্শন' (১৮৭০), 'বন্ধুবিয়োগ' (১৮৭০), প্রভৃতি একাধিক কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। বিহারীলালের কাব্যচর্চায় প্রত্যক্ষ দেশপ্রেম বা সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য না থাকলেও কাব্যচর্চার দ্বারা পরোক্ষে বাংলা গীতিকাব্য সংস্কার করার মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। বিহারীলালের হাতেই বাংলা গীতিকবিতা প্রথম বিশুদ্ধতা পেয়েছে। আর সেজন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে বিহারীলাল চক্রবর্তী 'উদ্দেশ্য'হীন কবিতা লিখতে গিয়ে কি কোনদিনও সমকালের উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করেন নি? সমকালের জাতীয় উত্তেজনা কি কবি মনকে কোন দিনও আন্দোলিত করে নি ? কবির সমগ্র রচনাবলী পাঠ করলে এরকম মনে হবে না। 'স্বপ্নদর্শন' নামক গদ্যরচনায় কবিমনের দেশানুরাগ ধ্বনিত হয়েছে। কবি স্বপ্ন দেখেছেন, স্নেহময়ী বঙ্গমাতা বাঙালীর আসন্ন বিপদের কথা জেনে উদ্বিগ্ন। এতে কবি মর্মাহত;—

> "হা আমার প্রিয় জন্মভূমি! তোমার এ কি দশা হইয়াছে? হা আমার স্বদেশীয় ভ্রাতা সকল! তোমরা কোথায় গমন করিয়াছ ? যে আমি তোমাদের সহিত একস্থানে জন্মিয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি, যে আমি তোমাদের সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি, কতই হাস্য করিয়াছি; হা! সেই আমাকে তোমাদের কঙ্কালমাত্র পতিত দেখিতে হইতেছে! হা কঠিন হৃদয়! কেন বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না ? হা তাত! হা মাতঃ! হা ভ্রাতঃ! হা অধিদেবতে! তোমরা কোথায়? ....এই প্রকার খেদ করিতে করিতে আমার শোকাবেগ অত্যন্ত প্রবল হইয়া যেন হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অমনি চমকিয়া উঠিয়া দেখি, গত রজনীতে শয্যায় শয়ন করিয়াছিলাম, সেই শয্যায়ই পতিত রহিয়াছি।" [১০৪]

বঙ্গমায়ের দুর্দশা যে কবিমনে ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছিল 'স্বপ্নদর্শন'-এর উল্লিখিত রচনাংশে তা প্রমাণিত।

বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল গীতিকবি হিসাবেই পরিচিত। আমরা অনুসন্ধান করব তাঁর কবিতায় কোনরকম দেশানুরাগ ধ্বনিত হয়েছে কি না। 'শরৎকাল' কাব্যের 'নিশীথসঙ্গীত'-এ কবি বিহারীলাল স্বদেশীয়

কাব্য সাহিত্যের প্রতি গভীর মমতা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

"এখন ভারতে ভাই,
কবিতার জন্ম নাই,
গোরে বোসে অট্টহাসে কে রে কার ছায়া ?
হা ধিক! ফেরঙ্গ বেশে
এই বাল্মীকির দেশে
কে তোরা বেড়াস্ সব উল্কি-মুখী আয়া?" (১০৫)

—দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের তুলনায় সমকালের কাব্য সাহিত্যের অপ্রতুলতা বা অনুৎকর্ষতা কবিকে ব্যথিত করেছে। একজন কবি যখন মাতৃভাষা তথা স্বদেশীয় কাব্য সাহিত্যের দুর্দশার চিত্র উপলব্ধি করবেন, তখন তিনি সেই দুর্দশার অবসান ঘটাতে চাইবেন না—তা কিন্তু হতে পারে না। উল্লিখিত পংক্তি দ্বারা প্রমাণিত হয় কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী পরোক্ষে বাংলা কাব্যের উন্নয়নে যত্নবান ছিলেন। 'নিসর্গসন্দর্শন' নামক কাব্যের 'চিন্তা' ও 'সমুদ্রদর্শন' কবিতায় কবির দেশানুরাগ স্পষ্ট। 'চিন্তা' কবিতায় সমকালের পরাধীনতার জন্য কবি উদ্বিগ্ন। কবি বলেন;—

"যখন জনমভূমি ছিলেন স্বাধীন,
কেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁহার বদন!
এখন হয়েছে মা'র সেমুখ মলিন!
মন-দুখে পরেছেন তিমির বসন!"(১০৬)

—পরাধীনতার জন্য কবি বিহারীলালের অকৃত্রিম যন্ত্রণার অনুরূপ প্রকাশ এই কাব্য গ্রন্থেরই 'সমুদ্রদর্শন' নামক কবিতাটি। সমুদ্রের রূপ দেখতে দেখতে কবির দেশমাতৃকার কথা মনে হয়েছে। তাঁর ভাষায় ;—

"হা হা মাত, আমরা অসার কুসন্তান,
কোন্ প্রাণে ভুলে আছি তোমার যন্ত্রণা!
শত্রুগণ ঘেরে সদা করে অপমান,
বিষাদে মলিনমুখী সজল নয়না!" (১০৭)

—এখানে কবি দেশমাতৃকার যন্ত্রণাকে উপলব্ধি করেছেন। দেশমাতৃকার যন্ত্রণার জন্য তিনি নিজেদের দায়ী করেন। কেননা উপযুক্ত সন্তানের কর্তব্য মাতৃভূমির যন্ত্রণার অবসান ঘটানো। কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর

এজাতীয় রচনা তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম দেশানুরাগের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

অতএব বিহারীলালও স্বদেশের দুর্দশায় মর্মাহত ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বদেশ ভাবনার অমর কবি নন। তিনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ গীতিকবিতার স্রষ্টা হিসাবেই বিখ্যাত। তাঁর কাব্যকে আদর্শ করে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার (১৮৩৮-৭৮) অক্ষয় কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯) এমন কি প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ গীতিকবি কাব্য চর্চা করেছিলেন। সেজন্যই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিহারীলালকে কাব্যগুরুর মর্যাদা দিয়েছেন।

এই পর্বের বিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১)। রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবন অতি দীর্ঘ। এই দীর্ঘ কাব্য জীবনে বার বার 'পালাবদল' হয়েছে। আমাদের আলোচনার সীমারেখা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময়ে রবীন্দ্রকাব্য শৈশব, কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পড়েছে। আমরা দেখব — রবীন্দ্রনাথ সমকালের জাতীয় সমস্যা সম্বন্ধে গভীরভাবে ভেবেছেন। সাহিত্য রস-সাধনার সঙ্গে দেশ ও জাতির চেতনাহীনতা, দরিদ্রতা, পরাধীনতা, ভীরুতা, অনুকরণপ্রিয়তার মতো নানা সমস্যা কবিকে ভাবিয়েছে। অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ উক্ত সমস্যার সমাধানের পথ নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর উনিশ শতকের গীতিকবিতায় দেশের দৈন্যাবস্থা, বাঙালীর লক্ষহীন স্তব্ধ জীবনের সমালোচনা, সত্য ও সুন্দরকে গ্রহণ করে জীবনের উৎকর্ষতা সৃষ্টিতে উৎসাহ, বাংলা কাব্যকে সমৃদ্ধ করতে আন্তরিক প্রয়াস, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি অন্যতম বিষয়। আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল প্রয়োজনে ঔপনিষদিক পরিবারের সদস্য ঋষি রবীন্দ্রনাথ জাতীয় সমস্যা সমাধানে মঙ্গলময় বা আনন্দময় পরমপুরুষ ঈশ্বরের দারস্থ হয়েছেন। বলাই বাহুল্য অধ্যাত্মজাতীয় কবিতা রবীন্দ্রনাথকে নোবেল পুরস্কার (১৯১৩) এনে দিয়েছিল। বলা যায়, তার সূচনা উনিশ শতকের 'নৈবেদ্য' (রচনাকাল ১৩০৪ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থে। প্রসঙ্গত উলেখ্য, পরবর্তীকালে রচিত ইংরেজী 'Song Offerings' কাব্যগ্রন্থটিতে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের অনেক কবিতা স্থান পেয়েছে।

উনিশ শতকের গীতিকবিদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাফল্যের শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিলেন। তাঁর কবিতাগুলি কল্পনা, সৌন্দর্য ও সঙ্গীতে সমৃদ্ধ। পাঠক রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতাতে দেশানুরাগের একটি স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন ধারণা এবং অন্তরছোঁয়া আবেদন অনুভব করে। উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের স্বীকৃত কাব্যগ্রন্থগুলি হল— 'সন্ধ্যাসঙ্গীত' (১৮৮২), 'প্রভাতসঙ্গীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান' (১৮৮৪), 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪), 'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬), 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬), 'চৈতালি' (১৮৯৬), 'কথা' (১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'ক্ষণিকা' (১৯০০), 'কল্পনা' (১৯০০), 'কণিকা' (১৯০০), 'নৈবেদ্য' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)।

পরিবারের বাংলা ভাষা অনুরাগের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

> "বাংলা ভাষাটাকে তখন শিক্ষিতসমাজ অন্দরে মেয়েমহলে ঠেলে রেখেছিলেন; সদরে ব্যবহার হত ইংরেজি — চিঠিপত্রে, লেখাপড়ায়, এমন — কি, মুখের কথায়। আমাদের বাড়িতে এই বিকৃতি ঘটতে পারে নি। সেখানে বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ছিল সুগভীর, তার ব্যবহার ছিল সকল কাজেই।"(১০৮)

ঠাকুরবাড়ীর বাংলা ভাষাপ্রীতির পরিবেশে বালক রবীন্দ্রনাথ লালিতপালিত হয়েছিলেন। প্রথাগত বিদ্যাচর্চা তাঁর কাছে বিরক্তিকর বা অসহ্য হয়ে উঠলে, সেই অবসরে বাংলা কবিতা রচনার নেশা তাঁকে পেয়ে বসে। কবি বলেন;—

> "পয়ার-ত্রিপদী মহলে আপন অবাধ অধিকারবোধের অক্লান্ত উৎসাহে লেখায় মাতলুম। আট অক্ষর দশ অক্ষরের চৌকো-চৌকো কত রকম শব্দভাগ নিয়ে চলল ঘরের কোণে আমার ছন্দ-ভাঙাগড়ার খেলা। ক্রমে প্রকাশ পেল দশজনের সামনে।" (১০৯)

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ কবি জীবনে বিভিন্ন স্বাদের অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। প্রথম জীবনে রচিত অনেক লেখাকে তিনি নিজেই স্বীকৃতি দিতে চান নি। আবার স্বীকৃতি দিলেও বার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন স্বীকৃতির পিছনে সাহিত্য গুণ নয়, অন্য কারণের কথা। তবে হিন্দুমেলার মতো স্বদেশীয় আবহাওয়ায় বেড়ে উঠায় বালক কবির কবিতায় সমকালের জাতীয় ভাবনার উত্তাপের ছবি পাওয়া যায়। কবি রচিত অনেক কবিতা রয়েছে — যা পরবর্তীকালে কোন গ্রন্থে স্থান পায় নি। কবিতাগুলি যে রবীন্দ্রনাথের তা সজনীকান্ত দাস, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ রবীন্দ্রানুরাগী ও গবেষক প্রমাণ করেন। এই সময়ের কবিতায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্বতা বা গভীর সাহিত্যগুণের সন্ধান বৃথা। তবে সাহিত্য সৃষ্টিতে যে অনাবিল আনন্দ আছে তা রবীন্দ্রনাথ এই বালক বয়সেই অনুভব করেন। এই প্রথম জীবনের রচনাগুলি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের বৃহৎ ও সমৃদ্ধ সাহিত্যসম্ভারের অঙ্কুর হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। প্রথম জীবনে বালক রবীন্দ্রনাথ মূলত বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ কবির আদর্শে 'ভারতী','বালক', 'বান্ধব','জ্ঞানাঙ্কুর' 'প্রতিবিম্ব','তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি পত্রিকায় লিখতেন।

এসব পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু কবিতার বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশের দুরবস্থা বর্ণনা, দেশজননীর দুঃখমোচনে উৎসাহ দেওয়া বা সমজাতীয় ভাবনা। প্রসঙ্গত — 'হোক ভারতের জয়', 'হিন্দুমেলার উপহার', 'জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুণ দ্বিগুণ', 'দিল্লি দরবার' প্রভৃতি কবিতার কথা বলা যায়। 'দিল্লি দরবার' কবিতায়

রবীন্দ্রনাথ দেশের পরাধীনতায় লজ্জাবোধ করেন। কবির ভাষায়;—

"তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি—কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?" (১১০)

অথচ এদেশের অনেকেই বৃটিশ-শৃঙ্খলের বন্ধনে উল্লসিত। কবি তাদের উদ্দেশ্যে বলেন;—

"হা রে হতভাগ্য ভারতভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ-রাজের বিজয়রবে?
ব্রিটিশ-বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক'জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।"(১১১)

—এখানে ঔপনিষদিক পরিবারের সদস্য বালক কবি রবীন্দ্রনাথ পরিবারের স্বদেশীয় আবহমণ্ডলে প্রভাবিত হয়ে দেশের পরাধীনতার গ্লানিমূলক কবিতা লিখেছেন । রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত প্রাক্ 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থগুলি হল 'সন্ধ্যা সংগীত', 'প্রভাতসংগীত', 'ছবি ও গান' এবং 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) কবির বাংলা কাব্যানুরাগের স্বীকৃত প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কবি কাব্যগ্রন্থটিকে 'কচি আমের গুটির' সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর ভাষায়;— "কিন্তু সেই কবিতাই প্রথম স্বকীয় রূপ দেখিয়ে আমাকে আনন্দ দিয়েছিল।" (১১২) এই বাংলা কাব্য প্রেমে কবির অকৃত্রিম আনন্দ লাভ বাংলা সাহিত্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথকেই সুগম করেছে। 'সন্ধ্যাসংগীত'-এর মতো 'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩), 'ছবি ও গান'(১৮৮৪) কাব্যগ্রন্থ দুটি বালক কবির বিশেষ মুহূর্তের ভাবের ফসল, যাকে কবি বাংলা কবিতায় ব্যক্ত করেন। অনেক পরে রবীন্দ্রনাথ বলেন;—"প্রভাতসংগীত' এ-সমস্ত লেখার আর-কোনো মূল্য যদি থাকে, সে ষোলো-আনা সাহিত্যিক মূল্য নয়।" (১১৩) পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছিল—ঠাকুর পরিবারে ভাষা ও সাহিত্য অনুরাগ ছিল

প্রবল। এই অনুরাগের ফলে বালক কবি রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে অনায়াসে কাব্যচর্চা করেছিলেন। সে সময় অক্ষয়চন্দ্র সরকার কর্তৃক বৈষ্ণব পদাবলী প্রাকাশিত হয়েছিল। বালক রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব পদাবলীর রসিক পাঠক ছিলেন। এই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল প্রবল। বিশেষত ব্রজবুলি ভাষার শব্দ-ঝংকার কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। কবির বৈষ্ণবপদ ও ব্রজবুলি ভাষা প্রেম থেকে জন্ম নেয় 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (১৮৮৪)।

'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)

রবীন্দ্রনাথ 'কবির মন্তব্য' নামক ভূমিকায় স্বীকার করেছেন যে,—কাব্যগ্রন্থটি নবযৌবনের সময়ে রচিত। তিনি বলেন— আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ তখন উপলব্ধি করেছিলাম। মনের তখন উদ্বেল অবস্থা। এই অবস্থায় কবির মনে হয়েছে রূপে, রসে, বর্ণে, গন্ধে জীবনকে সার্থক করতে। কবি মানুষের নিকট প্রার্থনা করেছেন;—

"মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই,
— — —
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সংগীতের কুসুম ফুটাই।"(১১৪)

—বৃহত্তর মানব সংসারে আনন্দদান করাকে যিনি জীবনের অন্যতম লক্ষ বলেছেন, সেই কবি জাতীয় জীবনের দৈন্যাবস্থায় মর্মপীড়িত হবেন এটাই স্বাভাবিক। 'বঙ্গভূমির প্রতি' ও 'বঙ্গবাসীর প্রতি' কবিতা দু'টিতে বঙ্গমাতার করুণ দিকটি ফুটেছে। বঙ্গমায়ের সেই করুণ অবস্থার পিছনে বাঙলী জাতিই দায়ী। কবি বঙ্গমায়ের উদ্দেশ্যে বলেন;—

"মনের বেদনা রাখো, মা, মনে,
নয়নবারি নিবারো নয়নে,
মুখ লুকাও, মা ধূলিশয়নে—
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।" (১১৫)

নব যুবক রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর দেশ সেবার অনীহায় হতাশ, তাঁর ভাষায়;—

"কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ—
কাতরে কাঁদিবে, মা'র পায়ে দিবে
সকল প্রাণের কামনা।" (১১৬)

'মানসী' (১৮৯০)

মানসীতে রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবের বা কাব্যরসের গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে ছন্দের নানান শিল্প-রূপ দেখা যায়। কবি বলেছেন—"আমার গানে আমি বলেছি, আমি সুদূরের পিয়াসী। পরিচিত সংসার থেকে এখানে আমি সেই দূরত্বের দ্বারা বেষ্টিত হলুম, অভ্যাসের স্থূলহস্তাবলেপ দূর হবামাত্র মুক্তি এলো মনোরাজ্যে।"[১১৭] সাহিত্যরস সৃষ্টি করতে গিয়ে সুদূরের প্রতি আকৃষ্ট হয়েও কবি ভুলে যান নি সমকালের দেশকে, দেশের মানুষকে। 'মানসী' কাব্যে স্বদেশের কিছু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর জীবন যাত্রাকে ব্যঙ্গ করে একাধিক কবিতা রচিত হয়েছে। যথা;—'দেশের উন্নতি' ও 'বঙ্গবীর'।

উনিশ শতকের শেষের দিকে বাঙালী বিশ্বের পটভূমিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর সময় কিছু যশপ্রত্যাশী ও সুখবিলাসী মানুষের রূপ চিত্রিত হয়েছে 'দেশের উন্নতি' কবিতায়। এই সময় সচেতন বাঙালী উন্নতির লক্ষ্যে বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি আত্ম-উন্মোচনের প্রতিটি শাখায় বিরাজ করেছিল। কিন্তু কিছু ভণ্ড দেশপ্রেমিক গালভরা দেশপ্রেম কথা, দলাদলি, মিথ্যা অহংকার নিয়ে ব্যস্ত। কবি বলেন—এসব উন্নতির লক্ষণ নয়। দেশের প্রকৃত উন্নতি চাইলে প্রথমে সর্বসাধারণের উন্নতি প্রয়োজন। কবি তাঁর বক্তব্যকে কাব্য রূপ দিয়ে বলেন;—

"সবাই বড়ো হইলে তবে
স্বদেশ বড়ো হবে,
যে কাজে মোরা লাগাব হাত
সিদ্ধ হবে তবে।"[১১৮]

—দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজন:—

"করিব কাজ নীরবে থেকে,
মরণ যবে লইবে ডেকে
জীবনরাশী যাইব রেখে
ভবের উপকূলে।"[১১৯]

—এই কাব্য গ্রন্থে স্বদেশ ভাবনামূলক আর একটি কবিতা হল 'বঙ্গবীর'। উনিশ শতকে অনেকে শুধু গ্রন্থগত বিদ্যায় শিক্ষিত ছিল। কবি বাঙালীর এই প্রবণতাকে ব্যঙ্গ করেছেন। 'নিমাই', 'নেপাল', 'ভুতো'র মতো বঙ্গবীরগণ দেশ-বিদেশের ইতিহাস ও সাহিত্য পাঠ করে গর্বিত। কিন্তু এদের মুখস্থ করা বিদ্যা জাতীয় জীবনে কোন কাজে আসবে না। কেননা এতে পাঠকের সচেতনতা আসে না। উনিশ শতকে শিক্ষার ব্যাপক

প্রসারে এজাতীয় কিছু শিক্ষিত ব্যক্তির সৃষ্টি হয়েছিল। কবি এদের বিদ্যা চর্চার আগ্রহে অভিভূত হয়ে ব্যঙ্গ করে 'বঙ্গবীর' বলে অভিহিত করেছেন।

'সোনারতরী' (১৮৯৪)

'সোনার তরী' রচনা কালে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতি ও পল্লী জীবনের খুব কাছাকাছি এসেছিলেন। নিসর্গপ্রীতি, জীবনদেবতা তত্ত্ব, ভাব ও রসের গভীরতা প্রভৃতি কাব্যটিকে উৎকর্ষতা এনে দিয়েছে। এরকম একটি উৎকর্ষ কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের নীতি-বিষয়ক কবিতার সন্ধান মেলে। 'আকাশের চাঁদ' কবিতা কাব্যগুণ ও নৈতিকতা পাঠকের মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। অসম্ভব ও অবাস্তব বস্তুকে কামনার ফলে কিভাবে তিলে তিলে সর্বনাশ নেমে আসে তারই নীতি কথা 'আকাশের চাঁদ' কবিতাটি। 'সোনার তরী' কাব্যের আরো কয়েকটি কবিতায় নীতি কথার আভাস পাওয়া যায়। উনিশ শতকে বাঙালীর আত্মপ্রতিষ্ঠার যুগে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদের দর্শন অনেক চিন্তানায়কের নিকট আদরণীয় ছিল না। কবি রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

"লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিতপ্রখরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বসি গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববসুন্ধরা
গ্রহতারাময় সৃষ্টি অনন্ত গগনে।" (১২০)

পৃথিবীর সবকিছুই মায়া—কবির নিকট এই দর্শন ভ্রান্ত বলে মনে হয়েছে। কবি উনিশ শতকে বাঙালী জীবনের উত্তরণের কথা ভেবে শঙ্করাচার্যের মায়াবাদ দর্শনের প্রতিবাদ করেছেন 'মায়াবাদ' নামক সনেটে। কবি সেজন্য 'খেলা' নামক সনেটে উৎসাহ দিয়ে বলেন;—

"হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।" (১২১)

কেননা, মানুষের মত বাঁচতে হলে কর্মময় পৃথিবীর খেলায় যোগ দিতে হবে। কবি লিখেছেন;—

"থেকো না অকালবৃদ্ধ বসিয়া একেলা—
কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা!" (১২২)

কবি বলেছেন এই আনন্দময় পৃথিবীর কর্মে যোগ দিলে যদি কোন ক্ষতি হয় তো হবে। সে ক্ষতি তিনি সবার সঙ্গে ভাগ করে নিতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;—

"চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর,
লক্ষকোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর।" (১২৩)

'বন্ধন' সনেটে কবি পৃথিবীর সমস্ত বন্ধনে আবদ্ধ হতে চেয়েছেন। কেননা, তিনি স্বার্থপরের মতো নিজের মুক্তি চান না। পৃথিবীর সব সুখ দুঃখ আনন্দের মাঝে কবি থাকতে চান। কবির প্রশ্ন;—

"বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বসে রব মুক্তি-সমাধিতে?" (১২৪)

এই 'ধরণী' দুঃখ মোচনে অক্ষম । সবাইকে আনন্দ দেওয়া তার সম্ভব নয়। 'অক্ষমা' কবিতায় কবি তবুও বলেন;—

"সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়—
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!" (১২৫)

'আত্মসমর্পণ' সনেটে কবি ঘোষণা করেন—

"জন্মেছি যে মর্ত-কোলে ঘৃণা করি তারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি খুঁজিবারে।" (১২৬)

রবীন্দ্রনাথ কর্মবিমুখ হয়ে থাকতে চান নি, তিনি চেয়েছেন;—

তোমার আনন্দগানে আমি দিব সুর
যাহা জানি দু একটি প্রীতিসুমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা; ...
...কুসুমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তে ভালে; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি, প্রমোদসিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে তানে।" (১২৭)

'সোনার তরী' কাব্যের শিল্প সমৃদ্ধ এই সনেটগুলি দেশের মানুষের স্তব্ধ জীবন থেকে মুক্তি এনে দিতে ও সচেতন করতে যথেষ্ট নীতিকথা-সম্পদে সমৃদ্ধ ।

'চিত্রা' (১৮৯৬)

চিত্রা কাব্যের সৌন্দর্য চেতনা, জীবনদেবতা তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় কাব্যটিকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থের মর্যাদা এনে দিয়েছে । রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার দ্বারা 'চিত্রা'কে উৎকর্ষতা এনে দিতে গিয়ে জগৎ ও জীবনের কথা বলতে ভোলেন নি। প্রতিভার এই উৎকর্ষ লগ্নে তিনি জীবনকে সমৃদ্ধ করার মন্ত্র শুনিয়েছেন। 'স্বর্গ হইতে

বিদায়' এ বিষয়ের একটি প্রতিনিধিমূলক কবিতা। যেখানে শুধুই সুখ, প্রেম নেই এরকম স্বর্গে কবি থাকতে চান নি। 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতায় সুখের ঐশ্বর্য ভরা জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ ধূলিমাখা মর্তের সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জগতে আসতে চেয়েছেন। কেননা মর্তে আছে প্রেম। কবির ভাষায়;—

"স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্তে থাক্ সুখে দুঃখে অনন্তমিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি।" (১২৮)

অর্থাৎ শুধুই সুখের ঐশ্বর্যে ভরা জগৎ থেকে বেরিয়ে এসে সুখ দুঃখে ভরা জীবনকে কবি বরণ করতে চেয়েছেন। কবি একে 'মাতৃভূমি' বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এই 'মাতৃভূমি'-কে স্বার্থপর শোষক শ্রেণী অন্যায় অত্যাচারের পীঠস্থান করে তুললে কবি বলেন;— 'এবার ফিরাও মোরে'। কবি ফিরতে চান সেখানে, যেখানে হচ্ছে অন্যায়, অত্যাচার। কারণ এই অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। এই কবিতাটিও একটি নীতিমূলক কবিতার উদাহরণ। কবি স্বার্থ সর্বস্বতাকে দূরে ফেলে দিয়ে বলেন;—

"কী গাহিবে, কী শুনাবে! বলো, মিথ্যা আপনার সুখ,
মিথ্যা আপনার দুঃখ। স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।" (১২৯)

স্বার্থশূন্য পরহিতৈষী হয়ে বাঁচলে চরম শান্তি পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ চারদিকে তাকিয়ে দেখেন—অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারে ছেয়ে গেছে সমগ্র সমাজ। কবি তাই সংসারের সীমায় ফিরতে চেয়েছেন;—

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী!" (১৩০)

কেননা এই বাস্তব সংসার অসহায়। এর থেকে মুক্তির উপায় একমাত্র কবি বলে দিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথ আসন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য সাধারণ মানুষের প্রতি বিশ্বাস রেখে বলেন;—

"এই-সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা—এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা—ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে," (১৩১)

অর্থাৎ নিপীড়িত অসহায় মানুষের মুখে ভাষা দিতে হবে, বুকে দিতে হবে আশা, দিতে হবে সাহস এবং একতার মন্ত্র — তবেই মুক্তি সম্ভব। এতে আবহমান কালের উঁচু নীচু শ্রেণীর বৈষম্য থেকে মুক্তির একটি পথ নির্দেশ আছে, যা কবি প্রতিভার স্পর্শে পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে।

'চৈতালি' (১৮৯৬)

অপ্রত্যাশিত ক্ষণজন্মার মতো রবীন্দ্রকাব্য সাহিত্যে 'চৈতালি'র জন্ম। এই সময় শিক্ষিত-সচেতন ব্যক্তি দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতেন। শিক্ষিত মনের এই মানসিকতা 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে লক্ষ করা যায়। শুধু তাই নয় বাঙালী জীবনের উন্নয়নে প্রতিকূল নানা বিষয়েরও সমালোচনা 'চৈতালি'তে পাওয়া যায়। 'চৈতালি' কাব্যগ্রন্থে স্বদেশ ভাবনা মূলক কবিতাগুলির দু'টি ভাগ যথা —

ক) সমসাময়িক বাঙালীর জীবনকেন্দ্রিক কবিতা।

খ) প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগমূলক কিছু কবিতা।

বাঙালীর জীবন কেন্দ্রিক কবিতা 'স্নেহগ্রাস' ও 'বঙ্গমাতা'। কবিতা দুটিতে দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। 'স্নেহগ্রাস' কবিতায় কবি বঙ্গমায়ের অত্যধিক স্নেহে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। কবি মনে করেন বঙ্গমাতা এভাবে স্নেহের ডোরে বাঁধলে বাঙালী কোনদিনই মাথা তুলে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে না। অযথা স্নেহ দেখিয়ে বঙ্গমাতা তার সন্তানকে ঘরকুণো করে তুলছে। কবি বঙ্গ জননীকে শুনিয়ে বলেন;—

"নিজের সে, বিশ্বের সে, বিশ্বদেবতার—
সন্তান নহে গো মাতঃ, সম্পত্তি তোমার।" (১৩২)

উনিশ শতকের বাঙালীর বিশ্বজয়ের পটভূমিতে কবির এরকম মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এবং 'বঙ্গ মাতা' কবিতায় কবি বলেন যার যেখানে স্থান তাকে তা গ্রহণ করতে দেওয়া হোক। নইলে বাঙালী কোন দিনও মানুষ হবে না। তাই বঙ্গমায়ের উদ্দেশ্যে কবি বলেন;—

"সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ কর নি।"(১৩৩)

—এছাড়া 'পরবেশ', 'দুই উপমা', 'অভিমান' প্রভৃতি কবিতা বাঙালীর পরনির্ভরতা, মানসিক জড়ত্ব প্রভৃতিকে ব্যঙ্গ করে রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে প্রমথনাথ বিশী বলেন;—

"একদিকে এই সাতকোটি বাঙালী কেমন ভাবে আপন জড়ত্বে ও তন্ত্রমন্ত্রসংহিতায় আবদ্ধ, অন্যদিকে বৃথা আস্ফালনে ও পরবেশে নিজের সেই অভ্যন্তরিক দৈন্য কি রকম করিয়া ঢাকিতে চাহিতেছে—এই বিষয়ে কবি তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছেন।" (১৩৪)

রবীন্দ্রনাথ সমকালীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির চেয়ে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনেক ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মনে করতেন। তাঁর 'সভ্যতার প্রতি', 'প্রাচীন ভারত', 'তপোবন', 'বন' প্রভৃতি কবিতায় এরকম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। 'সভ্যতার প্রতি' কবিতায় সমকালীন নগর সভ্যতায় বিরক্ত কবি বলেন;—

"দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর,
লও যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নবসভ্যতা! হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন পুণ্যচ্ছায়ারাশি,
গ্লানিহীন দিনগুলি," (১৩৫)

কবি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার শান্ত ও সৌম্য পরিবেশে মুগ্ধ। সেজন্য তিনি প্রাচীন সভ্যতার গুণকীর্তন করেছেন। কবি বলেন আমাদের প্রাচীন ভারতের—তপোবন, গোচারণ, সন্ধ্যাস্নান, গ্লানিহীন দিন, সামগান, বল্কল বসন, সুগভীর মহাতত্ত্ব আলোচনা ফিরিয়ে দাও। কবি রবীন্দ্রনাথ এই আবেদনের দ্বারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ প্রকাশ করেছেন।

'কণিকা' (১৩০৬/৪ঠা অগ্রহায়ণ)

'কণিকা'য় জীবনের কিছু ধ্রুব সত্যকে কবি সংক্ষেপে ব্যক্ত করেন। আমাদের মনে হয়—রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিভার স্পর্শে কিছু ধ্রুব সত্যকে কাব্যরূপ দিয়েছেন। যা পাঠকের নীতি বোধ ও চেতনার উদ্বোধন ঘটাতে সাহায্য করবে। যেমন—'স্বদেশদ্বেষী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

"কেঁচো কয়, নীচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ ক'রে বলে, চুপ চুপ!
তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ!" (১৩৬)

যারা স্বদেশকে পদে পদে নিন্দা বা অবজ্ঞা করে, তাদের সেই মানসিকতাকে আঘাত করতে ও নীতিবোধ জাগিয়ে তুলতে 'স্বদেশদ্বেষী' কবিতার বক্তব্য যথেষ্ট।

'কথা ও কাহিনী' (১৯০০)

'কথা ও কাহিনী' উনিশ শতকের শেষ দশকে রচিত হয়। প্রথমে 'কথা' ও 'কাহিনী' দু'টি ভিন্ন গ্রন্থ ছিল। রবীন্দ্ররচনাবলীর চতুর্থ খণ্ডের 'গ্রন্থ পরিচয়' অংশে বলা হয়েছে;—'ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস হইতে স্বতন্ত্রভাবে 'কথা ও কাহিনী' নামে পুস্তক প্রকাশিত হয়।" (১৩৭) 'কথা' উপহার দেওয়া হয়েছে দেশমাতৃকার যোগ্যতম সন্তান বিজ্ঞানের সাধক জগদীশচন্দ্র বসুকে। জগদীশচন্দ্র বসু যেন প্রাচীন ভারতের ঋষির মত। তিনি মাতৃভূমিকে অতুল সম্মান এনে দিয়েছেন। কবি 'উৎসর্গ' পত্রে দু'লাইনে বলেন;—

"সত্য রত্ন তুমি দিলে, পরিবর্তে তার
কথা ও কল্পনামাত্র দিনু উপহার।" (১৩৮)

'উৎসর্গ' পত্রের ভাববস্তু থেকে অনুমান করা যায় কাব্যগ্রন্থটি স্বদেশ ভাবনায় সমৃদ্ধ। 'কথা' কাব্যের বিজ্ঞাপনে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—কাব্যের উপাদান ভারতীয়, এখানে স্থান পেয়েছে বৌদ্ধকথা, রাজপুত কাহিনী, শিখ জাতির কাহিনী, বৈষ্ণব গল্প। তিনি অবশ্য স্বীকার করেন মূলের সঙ্গে কিছুটা ব্যতিক্রমও আছে।

'কথা' কাব্যগ্রন্থের প্রথমে কবি অতীতকে কথা বলার জন্য আবেদন জানান। কবি আত্মবিস্মৃত জাতিকে গৌরবময় স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য অতীতকে বলেন;—

"যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী
স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে হে মুনি অতীত,
কথা কও, কথা কও।" (১৩৯)

'কথা' কাব্যের ভূমিকামূলক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের সুগভীর আকুতি প্রকাশ পেয়েছে। কবি এখানে স্বদেশের অতীত গৌরব তথা ঐতিহ্যকে প্রকাশ করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস করেন। 'কথা' কাব্যের 'শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা', 'পূজারিণী' 'সামান্য ক্ষতি', 'গুরুগোবিন্দ', 'শেষ শিক্ষা', 'বিবাহ' প্রভৃতি প্রতিটি কবিতাতেই স্বদেশের গৌরব বৌদ্ধ-কথা, শিখ-কথা, বৈষ্ণব-কথায় পরিপূর্ণ।

'কাহিনী' কাব্যের ভূমিকা মূলক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ 'স্মৃতি অবগাহিনী' এর স্মরণাপন্ন হয়েছেন।

ছোটখাটো নানা ঘটনার কাহিনী রচনা করে 'স্মৃতি অবগাহিনী'। 'কাহিনী' কাব্যের অন্তর্ভূক্ত 'দীনদান', 'বিসর্জন', 'দুই বিঘা জমি', 'পুরাতন ভৃত্য' প্রভৃতি কবিতায় রবীন্দ্রনাথ নানান ছোটখাটো অথচ মহৎ ত্যাগ, শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি ঘটনাকে নিয়ে কাহিনী রচনা করেন।

'কল্পনা' (১৩০৭ বঙ্গাব্দ)

উনিশ শতকের একেবারে শেষে 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। শিক্ষিত বাঙালীর মনে তখন আত্মচেতনাবোধ জেগেছে। কবিমন এই আত্মচেতনা বোধ থেকে দূরে ছিল না, তার প্রমাণ এই কাব্য গ্রন্থের 'বঙ্গলক্ষ্মী', 'ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ', 'সে আমার জননী রে', 'উন্নতির লক্ষণ', 'জগদীশচন্দ্র বসু' প্রভৃতি কবিতা। উল্লিখিত কবিতা গুলিতে বঙ্গজননীর দুর্দশার ছবি ও বাঙালীর অকর্মণ্যতা, পরানুকরণপ্রিয়তা প্রভৃতি বর্ণনা পাঠককে সচেতন করার পক্ষে যথেষ্ট। যেমন 'বঙ্গলক্ষ্মী' কবিতায় বঙ্গজননীর দুর্দশা, বাঙালীর অকর্মণ্যতা প্রভৃতি সুন্দরভাবে ফুটেছে। কবি লিখেছেন;—

"রয়েছ, মা, ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্যভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।" (১৪০)

বাঙালীর দুর্বলতা ও অকর্মণ্যতার ফলে জাতীয় স্বাধীনতা বিপর্যস্ত। এই পরাধীনতার গ্লানি পাঠককে গভীরভাবে ব্যথিত করে তোলে। পাশাপাশি শুধু সমালোচনাই নয়, বঙ্গ সন্তানের বৃহৎ সাফল্যে কবি গৌরববোধ করেন। যেমন 'জগদীশচন্দ্র বসু' কবিতায় কবি বলেন—বঙ্গ সন্তান জগদীশচন্দ্র বসু গবেষণা দ্বারা বিজ্ঞানের নতুন আবিষ্কারের জন্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের নিকট স্বীকৃতি পেয়েছেন। এই স্বীকৃতি লাভের আনন্দে কবি আনন্দিত। কেননা আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারের দ্বারা জগদীশচন্দ্র বসু বিশ্বজননীর নিকট বঙ্গজননীকে সম্মানিত করেছেন।

'ক্ষণিকা' (১৯০০)

'ক্ষণিকা' কাব্যগ্রন্থে জানা যায় কবি গান গাইতে চেয়েছেন। 'উদ্‌বোধন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

" যারা আসে যায়, হাসে আর চায়,
পশ্চাতে যারা ফিরে না তাকায়,
নেচে ছুটে ধায়, কথা না শুধায়,
ফুটে আর টুটে পলকে —
তাহাদেরি গান গা রে আজি প্রাণ
ক্ষণিক দিনের আলোকে।" (১৪১)

প্রাণের স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দনের বন্দনা গান গাইতে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ নৈতিকতা, প্রাচীন গৌরব কথা ভুলে যান নি। 'বোঝাপড়া' কবিতায় কবি উপদেশ দিয়েছেন—জীবনের নানারকম পরিস্থিতিতে সত্যকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে হবে। কবির ভাষায়;—

"মনেরে আজ কহ যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যের লও সহজে।"(১৪২)

'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' কবিতায় বাঙালীর ঘরকুনো মানসিকতার বিপরীত ভাববস্তু প্রকাশ পেয়েছে। কবি যেন বোঝাতে চেয়েছেন—ঘর না ছাড়লে জীবন সমৃদ্ধ হবে না। তাই কবি বাণিজ্য করতে বাইরে যেতে চেয়েছেন। কবির ভাষায়;—

"কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।
দুয়ার জুড়ে কাঙাল বেশে
ছায়ার মতো চরণদেশে
কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে
আর বসে না রইব—
এটা আমি স্থির বুঝেছি
ভিক্ষা নৈব নৈব।" (১৪৩)

'শেষ' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জগৎ ও জীবনের প্রতি গভীর আসক্তি প্রকাশ করেন। এযেন আমাদের স্বদেশের দার্শনিক ভাবনা 'জগৎ মায়াময়'-এর এর প্রতিবাদমূলক কবিতা। জগৎটাকে মিথ্যা বা মায়া ভেবে বসে থাকলে অধঃপতন অনিবার্য। কবি এই সত্যকে আবিষ্কার করে বলেন;—

"জ্ঞানের চক্ষু স্বর্গে গিয়ে
যায় যদি যাক খুলি,
মর্তে যেন না ভেঙ্গে যায়
মিথ্যা মায়াগুলি।"(১৪৪)

আলোচিত 'বোঝাপড়া', 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ', 'শেষ' কবিতা তিনটিতে কবির ভাবনা বাঙালীর জীবনকে সমৃদ্ধ করতে রচিত হয়েছে—এ কথা জোর দিয়ে বলা যায়। আবার এই কাব্য গ্রন্থেরই 'সেকাল' কবিতায় প্রাচীন ভারতের শান্তিময় পরিবেশের কথা প্রকাশ পেয়েছে। যার আবেদন পাঠককে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত করে তোলে। এ রকমই আর একটি কবিতা 'জন্মান্তর'। কবি এখানে ভারতে শান্ত-স্নিগ্ধ-মোহমাখা জীবনকথাকে কাব্যরূপ দেন। রবীন্দ্রনাথ সমকালের সভ্যতার সঙ্গে তুলনা করে লিখেছেন;—

"আমি ছেড়েই দিতে রাজি আছি
সুসভ্যতার আলোক,
আমি চাই না হতে নববঙ্গে
নব যুগের চালক।
আমি নাই বা গেলেম বিলাত,
নাই বা পেলেম রাজার খিলাত;
যদি পরজন্মে পাই রে হতে
ব্রজের রাখাল বালক
তবে নিবিয়ে দেব নিজের ঘরে
সুসভ্যতার আলোক।" (১৪৫)

—এখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সুখভোগের চেয়ে প্রাচীন ভারতের স্নিগ্ধ, শান্ত, সৌম্য ও সমৃদ্ধ সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হয়েছে। যা পাঠককে দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগী করতে সাহায্য করে।

'নৈবেদ্য' (১৩০৮ বঙ্গাব্দ)

রবীন্দ্রনাথ যে অধ্যাত্মবাদের জন্য ভুবনবিখ্যাত তার সূচনা এই 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থে। কাব্যগ্রন্থখানি তিনি উৎসর্গ করেন পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। যিনি উনিশ শতকের অধ্যাত্মবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবাদ পুরুষ। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা উচিত যে রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' ১৩০৮ বঙ্গাব্দে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পেলেও কবিতাগুলি ১৩০৪ ও ১৩০৭ বঙ্গাব্দে রচিত হয়। সেজন্য 'নৈবেদ্য'কে উনিশ শতকের কাব্যগ্রন্থ হিসাবে মনে করলে খুব একটা ভুল হয় না।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতাগুলি সবই প্রার্থনা মূলক। জগৎকর্তা-পরমপুরুষ-আনন্দময় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে কবি অন্তরের গাঢ় ভক্তি মিশ্রিত প্রার্থনা 'নৈবেদ্য'। আশ্চর্যের বিষয় সেই আনন্দময় পরম পুরুষের নিকট রবীন্দ্রনাথ স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেন। '৪৮' নং কবিতায় কবি প্রার্থনা করেছেন;—

"এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে হে মঙ্গলময়,
দূর করে দাও তুমি সর্ব তুচ্ছ ভয়—
লোকভয়, রাজভয়, মৃত্যুভয় আর।" (১৪৬)

—কবি নির্ভীক ও সাহসী জাতির কামনা করেন, যারা কাপুরুষতা ও ভয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে মাথা তুলে দাঁড়াবে। '৭২' নং কবিতায় রবীন্দ্রনাথ জাতিকে সমৃদ্ধ ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের পথ বলে দিয়েছেন। কবি জানেন নির্ভীকতা, মুক্তজ্ঞান, উদারমনস্কতা, অকৃত্রিম মনোভাব, নিরপেক্ষতার মতো কিছু শর্ত পালন করলে বাঙালী জীবন সমৃদ্ধ হবে। তাই তিনি দয়াময় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেন উল্লিখিত ইতিবাচক গুণাবলী বাঙালীর জীবনে এনে দিতে। তাহলে বাঙালী সমৃদ্ধ ও শান্তির সন্ধান পাবে। কবি বলেন;—

"ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।" (১৪৭)

সমজাতীয় ভাবনা 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের '৯৩' নং '৯৪' নং ও '৯৫' নং কবিতায়ও পাওয়া যায়।

'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থটি আর একটি কারণে স্মরণীয়। তা হল এখানেই রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মিকতার পূর্ণাঙ্গ সুর প্রথম উচ্চারিত হয়। এই অধ্যাত্মিক সম্পদে ভারত সমৃদ্ধ যা কবি কাব্যাকারে বিশ্বপাঠকের নিকট আস্বাদনীয় করে তুলেছেন। ফল স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এ রকম একটি খাঁটি ভারতীয় মহৎ ভাবনা কবি মনে উনিশ শতকের শেষে জেগে উঠেছে। অতএব ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে 'Song Offerings' এর দ্বারা অনেক পরে সাহিত্য ক্ষেত্রে বাঙালীর বিশ্ব জয় হলেও উনিশ শতকের শেষে

এই একই ভাবনায় সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল। যা বিশ্ব পাঠকের নিকট অভিনব, বিস্ময়কর ও আশ্চর্য বলে মনে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য 'Song Offerings' ইংরেজী কাব্য গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যের একাধিক কবিতা ।

রবীন্দ্রনাথ কাব্য, নাটক, উপন্যাস, ছোটগল্প, প্রবন্ধ, নিবন্ধের দ্বারা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিলেন। এখানে শুধুমাত্র উনিশ শতকের গীতিকবিতায় কবির স্বদেশ, স্বজাতি সর্বোপরি মানব কল্যাণের বিষয়টি আলোচিত হল। আমরা তাঁর উনিশ শতকের গীতিকবিতার আবেদন উপলব্ধি করে বলতে পারি, কবি উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা সৃষ্টিতে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

এবার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের উনিশ শতকের গীতিকবিতায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হবে। বাংলা সাহিত্যের স্বনাম ধন্য কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২)। ডঃ সুকুমার সেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত সম্বন্ধে লিখেছেন;—

> "সত্যেন্দ্রনাথের কবিপ্রকৃতির মধ্যে বিজ্ঞানী বুদ্ধির অংশ প্রবল ছিল।...মানব-সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রায় সকল সামগ্রীর প্রতিই তাঁহার যে সজাগ কৌতূহল ছিল, তাহার পরিচয় তাঁহার কাব্যে প্রায় সর্বদা লভ্য, তা সে প্রাচীন ইতিহাস হোক আর আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানই হোক। কবিতারচনার জন্য জ্ঞানের সঞ্চয় প্রচেষ্টা আধুনিককালে আমাদের দেশে সত্যেন্দ্রনাথের রচনাতেই প্রথম প্রকটিত।
>
> সত্যেন্দ্রনাথের কবিমানসের বহিঃপ্রকাশ স্বদেশপ্রীতিতে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রিয়তায়।" (১৪৮)

অর্থাৎ সুকুমার সেন মনে করেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা কাব্য সাহিত্যে 'জ্ঞান-বিজ্ঞানপ্রিয়তা' ও স্বদেশ প্রেমের প্রচারে বিশেষ অবদান রেখেছেন। আমরা কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যে স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি আলোচনা করব। প্রসঙ্গত স্মরণীয় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত মূলত বিশ শতকে কাব্য চর্চা করলেও উনিশ শতকেও কিছু কবিতা লিখেছেন। আমরা কবির উনিশ শতকীয় গীতিকাব্যে স্বদেশ ভাবনার বিষয়টি স্পষ্ট করব। এই শতকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের প্রকাশিত একমাত্র কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা' (১৯০০)। অবশ্য এই শতকেই তিনি 'স্বর্গাদপি গরীয়সী'র (রচনা- ১৩০০ বঙ্গাব্দ) মতো একাধিক কবিতা লিখেছেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্গভূমিকে স্বর্গের চেয়েও শ্রেষ্ঠ বলেন। তাঁর ভাষায়;—

"স্বর্গ হতে গরীয়সী জন্মভূমি মোর," (১৪৯)

— কিন্তু প্রিয় বঙ্গভূমির সমকালীন দুরবস্থা দেখে আহত কবি জন্মভূমিকে প্রশ্ন করেন;—

"এ স্বর্গে দেবতা কই? দেখায়ে দে ত্বরা।
বল্ মোরে, কোন্ হেতু, সুপ্ত আজি তারা?
অথবা, মগন কোনো তপস্যায় ঘোর ?
কবে ধ্যান ভাঙিবে গো,— নিশি হবে ভোর?
কবে,মা, ঘুচিবে তোর নয়নের ধারা?

অসুরে ঘিরেছে, হায়, কল্প তরুবরে,
দেবতার কামধেনু দানবে দুহিছে!
আজি হতে অন্বেষি' ফিরিব ঘরে, ঘরে,
কোথা ইন্দ্র?— ব'লে দেগো, কাঁদিসনে মিছে।" (১৫০)

—'স্বর্গাদপি গরীয়সী' কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেন বঙ্গভূমির পরাধীনতার কথা গভীর দুঃখের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন।

'সবিতা' (১৯০০) কাব্যেও সুগভীর দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। 'সবিতা'র 'সূচনা'য় সত্যেন্দ্রনাথ সমকালের দেশের অধঃপতনে গভীর বেদনা প্রকাশ করেছেন। দেশের অধঃদশা থেকে উত্তরণের জন্য কবি সুচিন্তিত মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন;—

"প্রাচ্যের বৈদিক ঋষি এবং প্রতীচ্যের বৈজ্ঞানিক উভয়ের চক্ষেই সবিতা জ্ঞানের আধার—প্রাণের আধার।... তাই আমাদের প্রাণহীন জাতিকে অতীত ও বর্তমান স্মরণ করাইয়া দিবার নিমিত্ত আজি ঐ প্রাণময় অমিততেজা বিশ্বজ্ঞানরূপী সবিতার মূর্তি অঙ্কিত করিবার প্রয়াস। জীবনে উৎসাহ চাই, মনে তেজ চাই, কর্মে আনন্দ চাই, হৃদয়ে স্ফূর্তি চাই। দর্শনের অবসাদ ঔদাস্য যথেষ্ট হইয়াছে।...সত্য বটে দর্শনই বিজ্ঞানের ভিত্তি, তাহা হইলেও অভিব্যক্তি হিসাবে বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।...এখনও সময় আছে। পূর্ব প্রতিভার অঙ্গারে এখনও অনল আছে। কে বলিল উৎসুক ফুৎকারে জ্বলিয়া উঠিবে না? ভারত দর্শনের শ্রেষ্ঠ, বিজ্ঞানে না হইবে কেন" (১৫১)

আসলে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত জানতেন জাতির দুরবস্থা মোচনের জন্য চাই পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান শিক্ষা। বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে দূরে থাকলে বাংলা তথা ভারতের মুক্তি আসবে না। 'সবিতা' কাব্যে জ্ঞানের প্রার্থনা লক্ষ করা

যায়। যে প্রার্থনা জাতিকে সমৃদ্ধ করার পক্ষেই রায় দেবে। কবি 'সবিতা'কে সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী হিসাবে কল্পনা করেন। সেই 'সবিতা'র বন্দনা করতে গিয়ে কবি লিখেছেন;—

"তিমির রূপিণী নিশা,—হে বিশ্ব-সবিতা!
তুমি দেব, নির্মল-কিরণ!
আলোকের আলিঙ্গনে রমিত তিমির,
ফুল্ল উষা—অপূর্ব মিলন।
পুষ্পময়ী বসুন্ধরা,
দ্যুলোক আলোক ভরা,
জনয়িতা—সবিতা—সবার!
বরণীয়—রমণীয়—নিত্য— জ্ঞানাধার !" (১৫২)

—এই জ্ঞানের অনুশীলন বা চর্চা করে প্রাচীন যুগেই ভারতবর্ষ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল। কবির ভাষায়;—

"চেতনা জাগিল জড়ে,—তরু, পশু, নর,
আর্য জাতি বিকাশ চরম!
উজলিল সিন্ধু-গিরি, কক্ষ-গিরি শির,
আর্যদেরি প্রতিভা পরম।
সে আলোকে আত্মহারা—
ভাসিল পুলকে ধরা,
বিশ্ববাসী লভিল পরান,—
ভারত তুলিল যবে জ্ঞানের নিশান!" (১৫৩)

— কিন্তু সমকালের ভারতে অবস্থা খুবই করুণ। কবি বলেন ;—

"ভারত,— ভারত-মাতা, জননী আমার,
আজি কেন তোমার সন্তান—
অলস, অবশ হেন—প্রাণহীনসম?
হারায়েছে সে পূর্ব সম্মান।
কোথা সে উৎসাহ, বল,—
লঙ্ঘিল যে বিন্ধ্যাচল,
কোথা আজি—কোথা আজি, হায়,
সে প্রতিভা, জ্ঞান-প্রভা, বিশ্ব মুগ্ধ যা'য়।" (১৫৪)

কিংবা এককালে অতীত ঐতিহ্য থাকার পরেও সমকালের দুরবস্থায় কবি মর্মপীড়িত হয়েছেন।—

"তাদেরি সন্তান সব, তবে কেন হায়,
সেই তেজ, সে উৎসাহ নাই?
তারা যেন জ্ঞান-যজ্ঞে দীপ্ত হুতাশন,—
অবশেষে মোরা শুধু ছাই।" (১৫৫)

কবি বিজ্ঞানের জয়গান গেয়েছেন। তিনি বিজ্ঞানের বৃহৎ শক্তিতেও মুগ্ধ। তাঁর ভাষায়;—

বিজ্ঞান! বিজ্ঞান! আজি তোমার মহিমা—
কলগীতি তুলেছে জগতে," (১৫৬)

সবিতার শেষে সেজন্য কবি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে 'সবিতা'কে বলেন;—

"হে, সবিতা জ্ঞানের কিরণ,—
আরো আলো—আরো আলো কর বিতরণ!" (১৫৭)

এই অধ্যায়ে আমরা লক্ষ করেছি, উনিশ শতকে ক্রমশ আত্মচেতনার যুগে বাঙালী গীতিকবি যথাক্রমে ঈশ্বরগুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ স্তব্ধ জাতীয় জীবনে স্বতঃস্ফূর্ত স্পন্দন দানের জন্য উৎসাহ ও প্রেরণা দিয়েছিলেন। অতএব বলা যায়, উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনা নামক অনুভূতিটি বাংলা গীতিকাব্যকে প্রভাবিত করেছিল।

উল্লেখপঞ্জী

১। এবার ফিরাও মোরে, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ:১৪২।

২। গীতিকাব্য, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১৬৫।

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড— ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৮৭।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২।

৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৮৫, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ২১৭।

৬। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪০, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৭৫, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৯৮, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ফাল্গুন ১৪০৭, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ আষাঢ় ১৪১০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৫১৮।

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৫৮।

৮। এতদ্দেশীয় সর্ব্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি বিনয়পূর্ব্বক নিবেদন, ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী, (১ম খণ্ড)—সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, দত্ত, চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা, পৃ: ১।

৯। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী, নতুন সংস্করণ ঃ ১৯৯৫, পৃ: ২৯৬।

১০। যুদ্ধের জয়, শীক সংগ্রাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ১৬৯।

১১। দ্বিতীয় যুদ্ধ, যুদ্ধের জয়, শিক সংগ্রাম, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ১৬৯।

১২। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড— ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ২৩২-২৩৩।

১৩। আচারভ্রংশ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ৯৯।

১৪। ইংরেজী নববর্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ৫৪।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩।

১৬। বড়দিন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ৭৩।

১৭। দুর্ভিক্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ৯৬।

১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৩।

১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

২১। নীলকর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ৭৪।

২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮২।

২৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৯।

২৫। সব হ্যায় ফাক্, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ১।

২৬। ভরপূর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২।

২৭। কিছু কিছু নয়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ৪-৫।

২৮। সাম্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ১৬।

২৯। শরীর অনিত্য, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২০।

৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

৩১। স্বদেশ, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২১৩।

৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২১৩।

৩৩। মাতৃভাষা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫, পৃ: ২১২।

৩৪। বাংলা দেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিকযুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮৮, (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ, পৃ: ৫৩৩।

৩৫। কালচক্র, কবিতাবলী, ১ম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কবিতাবলী-১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ১০৮-১০৯।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯-১১০।

৩৭। ভারত বিলাপ, কবিতাবলী, ১ম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কবিতাবলী-১ম খণ্ড, সম্পাদক - শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ২৪-২৫।

৩৮। ভারত সঙ্গীত, কবিতাবলী, প্রথম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, কবিতাবলী-১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ১১৬।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৯-১২০।

৪০। মন্ত্র সাধন, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৩৪।

৪১। জয় মঙ্গল গীত, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৩৮-১৩৯।

৪২। ভারতকামিনী, কবিতাবলী, প্রথম খণ্ড, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, কবিতাবলী ১ম খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮, পৃ: ৪৭।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০-৫১

৪৪। বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গরমণীর উপাধিপ্রাপ্তি উপলক্ষে, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৪০।

৪৫। রীপণ-উৎসব - ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ৭১।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১।

৪৭। রাখিবন্ধন, বিবিধ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ১৬৫।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৮।

৪৯। জন্মভূমি, চিত্তবিকাশ, হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক—শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৬০, পৃ: ২৯-৩০।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২-৩৩।

৫১। আমার জীবন, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৩২৫-৩২৬।

৫২। চট্টোগ্রামের সৌভাগ্য উৎসব, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৬৪।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪।

৫৫। সায়ংচিন্তা, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৯৭।

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৪।

৫৭। মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক, অবকাশ রঞ্জিনী-প্রথম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১০৭।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯-১১০।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৮।

৬০। মহরাণীর দ্বিতীয়পুত্র ডিউকঅফ্ এডিন্‌বরার প্রতি, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী. ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১২৬।

৬১। অবলাবান্ধব, অবকাশ রঞ্জিনী-১ম ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১১৭।

৬২। আর্য্যদর্শন, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৭৭।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭৮।

৬৪। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৮৪।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৫।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।

৬৭। বাঙ্গালীর বিষপান, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৯৩।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯৩।

৬৯। অনন্ত দুঃখ, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ১৯৬।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০১।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০১।

৭২। চিহ্নিত সুহৃদ্, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ২০৬।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৭।

৭৬। ভারত উচ্ছ্বাস, অবকাশ রঞ্জিনী-২য় ভাগ, নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পৃ: ৩৩৯।

৭৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪০।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪২।

৭৯। বঙ্গভাষা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৮০। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫, পৃ: ২৯৪।

৮১। বঙ্গভাষা, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৮২। কবি-মাতৃভাষা, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৯৪।

৮৩। সমাপ্তে, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮৩।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৩।

৮৫। ভারত-ভূমি, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮০।

৮৬। বঙ্গভূমির প্রতি, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮৬।

৮৭। আত্মবিলাপ, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮৬।

৮৮। কৃত্তিবাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৮৯। কাশীরাম দাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৯০। কমলে কামিনী, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৫৯।

৯১। অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৯২। কমলে কামিনী, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬০।

৯৩। বাল্মীকি, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৮১।

৯৪। কালিদাস, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬১।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬১।

৯৬। সংস্কৃত, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৭৯।

৯৭। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ : জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৭৯।

৯৮। কপোতাক্ষ নদ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক — ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬৬।

৯৯। বটবৃক্ষ, চতুর্দশপদী কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক— ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪, পৃ: ১৬৫।

১০০। বিহারীলাল, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ পৌষ ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫৩৯,

১০১। কবির একখানি পত্র, সারদামঙ্গল, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ২০৩।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩।

১০৩। বিহারীলাল, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ পৌষ ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫৩৯।

১০৪। স্বপ্নদর্শন, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ৬১২।

১০৫। নিশীথসঙ্গীত, শরৎকাল, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ২৯১।

১০৬। চিন্তা, নিসর্গসন্দর্শন, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ৪৫০।

১০৭। সমুদ্রদর্শন, নিসর্গসন্দর্শন, বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২, পৃ: ৪৫৮।

১০৮। অবতরণিকা, রবীন্দ্ররচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৫।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬।

১১০। রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৫।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৫।

১১২। সূচনা, সন্ধ্যাসংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫।

১১৩। সূচনা, প্রভাত সংগীত, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৪৫।

১১৪। প্রাণ, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৬১।

১১৫। বঙ্গভূমির প্রতি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২১৮।

১১৬। বঙ্গবাসীর প্রতি, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২১৮।

১১৭। সূচনা, মানসী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৭।

১১৮। দেশের উন্নতি, মানসী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৯৫।

১১৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯৫।

১২০। মায়াবাদ, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৬-১০৭।

১২১। খেলা, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৭।

১২২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৭।

১২৩। গতি, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৮।

১২৪। মুক্তি, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৮।

১২৫। অক্ষমা, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১০৯।

১২৬। আত্মসমর্পণ, সোনার তরী, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১১০।

১২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

১২৮। স্বর্গ হইতে বিদায়, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৮১।

১২৯। এবার ফিরাও মোরে, চিত্রা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৪৩।

~~১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।~~

১৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪২।

১৩২। স্নেহগ্রাস, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮।

১৩৩। বঙ্গমাতা, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮।

১৩৪। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ—প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অখণ্ড সংস্করণ, দশম মুদ্রণ ঃ শ্রাবণ ১৪০৭, পৃ: ৯৮।

১৩৫। সভ্যতার প্রতি, চৈতালি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৮।

১৩৬। স্বদেসদ্বেষী, কণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৬০।

১৩৭। গ্রন্থপরিচয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৭৩১।

১৩৮। উৎসর্গ, কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১১।

১৩৯। কথা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৬।

১৪০। বঙ্গলক্ষ্মী, কল্পনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১২১।

১৪১। উদ্‌বোধন, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৭১।

১৪২। বোঝাপড়া, ক্ষরিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৮৩।

১৪৩। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২০৯।

১৪৪। শেষ, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫০।

১৪৫। জন্মান্তর, ক্ষণিকা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২০৪।

১৪৬। ৪৮, নৈবেদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮৯।

১৪৭। ৭২, নৈবেদ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩০০।

১৪৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৮, ৪র্থ সংস্করণ ঃ ১৯৭৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মে ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগস্ট ২০০৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৯৩।

১৪৯। বেনু ও বীণা, কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ৩৩, কলেজ রোড, কলি, ১ম প্রাঃ, ভাদ্র, ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ: ৫৬।

১৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭।

১৫১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৮, ৪র্থ সংস্করণ ঃ ১৯৭৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মে ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগস্ট ২০০৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৯৩।

১৫২। সবিতা, কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ, ৩৩, কলেজ রোড, কলি, ১ম প্রঃ, ভাদ্র, ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭১, পৃ: ৯৯

১৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৪।

১৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

১৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১৫৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১০।

১৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৪।

সপ্তম অধ্যায়

উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে (উপন্যাস ও ছোটগল্প) স্বদেশ ভাবনা

কথাসাহিত্য বলতে উপন্যাস ও ছোটগল্পকে বোঝায়। উনিশ শতকেই প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ বাংলা কথাসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটিয়েছেন। উনিশ শতকের উপন্যাস ও ছোটগল্প বাঙালীর আত্মচেতনার বিকাশে কতখানি ভূমিকা পালন করেছিল, এই অধ্যায়ে সেই বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ধারাবাহিকতার বিচারে প্রথমে উপন্যাসের কথা আসবে। উপন্যাস প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে লিখেছেন;—

> "ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের দেশে যে সব নূতন ধরনের সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার মধ্যে উপন্যাসই প্রধানতম। এই উপন্যাসের অনুরূপ কোন বস্তু আমাদের পুরাতন সাহিত্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"[১]

অর্থাৎ উনিশ শতকের পূর্বে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অস্তিত্ব ছিল না। এই শতকেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮), 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮৪), 'দেবীচৌধুরাণী' (১৮৮৪), 'রাধারাণী' (১৮৮৬) ও 'সীতারাম' (১৮৮৭), রমেশচন্দ্র দত্তের 'বঙ্গবিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবীকঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' (১৮৭৮), 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৮৯), 'সংসার কথা' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪), তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৭৪), প্রভৃতি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে যথেষ্ট সমৃদ্ধি এনে দিয়েছিল। তাছাড়া সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৩৪—১৮৮৯) 'জালপ্রতাপ চাঁদ' (১৮৮৩), 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' (১৮৭৭), 'কণ্ঠমালা' (১৮৭৭), 'মাধবীলতা'(১৮৮৫), প্রতাপচন্দ্র ঘোষের (?—১৯২১) 'বঙ্গাধীপ পরাজয়' (১৮৬৯—১৮৮৪), শিবনাথ শাস্ত্রীর (১৮৪৮—১৯১৯) 'মেজবৌ' (১৮৭৯), 'নয়নতারা' (১৮৮৯); 'যুগান্তর' (১৮৯৫), স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-

-১৯৩২) 'দীপনির্বাণ' (১৮৭৬), 'মালতী' (১৮৮০), 'স্নেহলতা' (১৮৯২), 'কাহাকে' (১৮৯৮), ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৪৯—১৯১১) 'কল্পতরু' (১৮৭৪), যোগেশচন্দ্র বসুর (১৮৫৪—১৯০৫) 'মডেল ভগিনী' (১৮৮৬-১৮৮৮), চিনিবাসচরিতামৃত (১৮৮৬) কালাচাঁদ (১৮৮৯-১৯৯০), ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের (১৮৫৭-১৯১৯) 'কঙ্কাবতী' (১৮৯২), ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

উল্লিখিত উপন্যাসগুলির কাহিনী সংগৃহীত হয়েছে কখনো ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে আবার কখনো সমাজ থেকে। কখনো বা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে রঙ্গব্যঙ্গ। কাহিনীর রসের ক্ষেত্রে এরকম বৈচিত্র্য থাকলেও উপন্যাসের আবেদনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। এই সময়ের লেখক উপন্যাসের শিল্পরূপ সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করতেন এবং দেশ ও সমাজের মঙ্গলের জন্য নীতি-উপদেশও দিয়েছেন। অর্থাৎ উপন্যাস লেখার পিছনে ছিল লেখকের মহৎ উদ্দেশ্য। আমরা লেখকের উপন্যাস লেখার পিছনে বাঙালীর আত্মচেতনাবিকাশের একটি ভূমিকা লক্ষ করব। এই অধ্যায়ে উপন্যাসের আলোচনাকে তিনটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ বাংলা উপন্যাসকে সাহিত্যের একটি সমৃদ্ধ প্রকরণ হিসাবে প্রতিষ্ঠা দানের ইতিকথা, দ্বিতীয়তঃ সমাজে সুস্থভাবে বাঁচার জন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ও তৃতীয়তঃ জাতীয়তাবোধের প্রচার।

প্রথমে সাহিত্য প্রকরণ হিসাবে বাংলা উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা লাভের পরিচয় নেওয়া যাক। উনিশ শতকে উপন্যাস নামক সাহিত্য প্রকরণটি সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙালীর অসম্ভব আগ্রহ ছিল। এই সময় অনেক শিক্ষিত বাঙালীকে মাতৃভাষায় উপন্যাস রচনার নেশা পেয়ে বসে। উনিশ শতকে অনেক লেখকের এই নেশা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এবিষয়ে প্রথমেই প্যারীচাঁদ মিত্রের কথা বলতে হবে। তিনি বাংলায় উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন। এবিষয়ে তাঁর স্বীকৃতি উল্লেখ করা হল। তিনি 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বলেন;—"The above original Novel in Bengali being the first work of the kind, is now submitted to the public with considerable diffidence"[(২)] কিংবা 'ভূমিকা'য় বলেন;—

> "অন্যান্য পুস্তকাদি অপেক্ষা উপন্যাসাদি পাঠ করিতে প্রায় সকল লোকেরই মনে স্বভাবতঃ অনুরাগ জন্মিয়া থাকে এবং যে স্থলে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোক কোন পুস্তক পাঠ করিয়া সময় ক্ষেপণ করিতে রত নহে সে স্থলে উক্ত প্রকার গ্রন্থের অধিক আবশ্যক, এতদ্বিবেচনায় এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি রচিত হইল। ...এ প্রকার পুস্তক লেখনের প্রণালী এতদ্দেশ মধ্যে বড় প্রচলিত নাই, ইহাতে প্রথমোদ্যমে অবশ্য সদোষ হইবার সম্ভাবনা, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া ঐ দোষ ক্ষমা করিবেন।"[(৩)]

'PREFACE' ও 'ভূমিকা' থেকে জানা যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে বাংলার 'প্রথম উপন্যাস' বলতে চেয়েছেন। এই 'আলালের ঘরের দুলাল' লিখে বাংলা সাহিত্যের প্রকরণগত বৈচিত্র্য এনে প্যারীচাঁদ মিত্র বাঙালীর রসপিপাসাকে তৃপ্তি দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তাঁর এই লেখা বাংলা উপন্যাস উদ্ভবের ক্ষেত্রে বা উপন্যাসের প্রথম শিল্পরূপ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। এবিষয়ে হরিনাথ মজুমদার নামক একজন লেখকের কথা স্মরণ করব। তিনি লিখেছিলেন 'বিজয় বসন্ত' (১৮৫৯)। এতে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন, তা এখানে বিচার্য নয়। বাংলা উপন্যাস উদ্ভবের প্রথম দিকে উপন্যাসকে শিল্প সম্মত করার উদ্যোগের বিশেষ তথ্যটি আমাদের কাছে অনেক মূল্যবান। 'বিজয় বসন্ত'র ভূমিকায় হরিনাথ মজুমদার বলেছিলেন;—

> "বালকেরা ব্যাকরণ, পদার্থবিদ্যা, ভূগোলাদি সর্ব্বদা অধ্যয়ন করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হয়। এজন্য Novel অর্থাৎ রূপক ইতিহাস পড়িতে ইচ্ছুক হইয়া থাকে। এক্ষণে কামিনীকুমার, রসিকরঞ্জন, চাহারদরবেশ, বাহারদানেশ প্রভৃতি যে সমুদায় রূপক ইতিহাস প্রচারিত আছে, সে সমুদায়ই অশ্লীল ভাব ও রসে পরিপূর্ণ। তৎপাঠে উপকার না হইয়া বরং সর্ব্বতোভাবে অনর্থের উৎপত্তি হয়। এই সমুদায় অবলোকনে বালকদিগের রূপক পাঠের নিমিত্ত কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে আমি বিজয় বসন্ত নামক এই গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হই।"[৪]

হরিনাথ মজুমদার 'বিজয় বসন্ত'-এ নতুন রসের অবতরণা করতে চেয়েছেন। এবং তাঁর রচনাকে তিনি উপন্যাস হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। তাতে হয়ত তিনি ব্যর্থই হয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিম -পূর্বে উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে হরিনাথ মজুমদারের একটি উদ্যোগ ছিল। এই বিশেষ সংবাদটি আমাদের নিকট তাৎপর্যপূর্ণ। বঙ্কিম -পূর্বে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি সফল উদ্যোগ আছে। বিখ্যাত সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—"ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথম আবির্ভাব ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' (১৮৫৭) দ্বারা নিশ্চিতভাবে সূচিত হইয়াছে।"[৫] বাংলা উপন্যাসের প্রথম দিকে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছেন। তিনি 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' এর ভূমিকায় লেখেন;—

> "গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয়, ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। ইহাতে দুইটি স্বতন্ত্র উপন্যাস সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহার প্রথমটির সহিত দ্বিতীয়টির কোন সম্বন্ধ নাই। উভয় উপন্যাসেই রাজ্যসম্বন্ধীয় যে সকল কথা আছে, তাহা প্রকৃত ইতিহাসমূলক। অপরাপর যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহারও কোন কোন অংশ মাত্র ইতিবৃত্তে পাওয়া যায়,...।"[৬]

এই সব তথ্যের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিম-পূর্বে বাংলা উপন্যাস রচনার একটি উদ্যোগ ছিল। এবার আমরা ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের সংবাদটির সন্ধান করব। রাজা রামমোহনের পরলোকগমনের (১৮৩৩) প্রায় পাঁচ বছর পর বঙ্কিমের জন্ম (১৮৩৮)। এই সময় পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও স্বদেশীয় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিকে স্বদেশগঠনে যুগচিন্তা নায়কগণ পাথেয় করেন। বঙ্কিমচন্দ্র এই যুগ পরিবেশে মানুষ হন। তিনি আধুনিক শিক্ষা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য প্রেমে ক্রমশ আকৃষ্ট হন। হুগলী কলেজে পড়ার সময় কবিতা চর্চায় হাত পাকিয়েছিলেন। পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে ইংরেজীতে 'Rajmohan's Wife' (১৮৬৪) নামে একটি উপন্যাস লেখেন। ইতিপূর্বে B.A. (১৮৫৮) ডিগ্রি লাভের বিরল সম্মান পেয়েছেন। ঠিক এই সময় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যের উন্নয়নের জন্য কলম ধরেন। বঙ্কিমচন্দ্রও বিখ্যাত ঔপন্যাসিক স্যার ওয়াল্টার স্কটের প্রভাবে বাংলায় উপন্যাস রচনার পরিকল্পনা করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) ও 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) উপন্যাস দুটি রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সফল ঔপন্যাসিক হিসাবে অত্মপ্রকাশ করেন। জীবনের এই বিশেষ সময়টিতে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে ভাল লেখা উপহার দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। যোগেশচন্দ্র বাগল বলেন; —

> " 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা সাহিত্যে ভাষা ও ভাবের নবযুগ প্রবর্তন করিয়াছিল। কিন্তু প্রকাশের পূর্বে এখানির উৎকর্ষাপকর্ষ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তেমন স্থিরনিশ্চয় হইতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের সাধারণতএই রীতি ছিল যে, তাঁহার কোনও পুস্তক প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাহাকেও পড়িয়া শুনাইতেন না, অথবা সহোদর ভিন্ন কাহাকেও পাণ্ডুলিপি স্পর্শ করিতে পর্যন্ত দিতেন না। কিন্তু এই প্রথম উপন্যাসখানি সম্বন্ধে তাঁহার এ রীতির ব্যতিক্রম দেখিতে পাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হইবার পূর্বে কাঁটালপাড়ার বাটীতে অনেককে ইহা পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।"[৭]

যোগেশচন্দ্র বাগল পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যের উল্লেখ করে লিখেছেন —

> "বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম হইতে ধারণা ছিল যে, 'দুর্গেশনন্দিনী'র ভাষা ব্যাকরণ-দোষে দূষিত। সেজন্য তিনি গল্প পাঠ শেষ হইলে উপস্থিত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভাষার ব্যাকরণ দোষ আছে—উহা কি লক্ষ্য করিয়াছেন?"[৮]

এই প্রসঙ্গে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম-জীবনী' গ্রন্থে 'উপন্যাস পরিচয়' নামক অংশে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আলোচনায় বলা হয়েছে;—

> "অনেকেই অবগত আছেন, দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস। যখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর, তখন তিনি এই গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করেন। বোধহয় ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে গ্রন্থ লেখা শেষ হয়।

> তখন তিনি খুলনায়। রচনা শেষ করিয়া তিনি বুঝিতে পারিলেন না, উপন্যাসখানি প্রকাশের যোগ্য হইয়াছে কিনা। তিনি পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া তাঁহার অগ্রজ ভ্রাতৃদ্বয় শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্রকে আদ্যন্ত শুনাইয়াছিলেন। ভ্রাতৃদ্বয় পুস্তকখানি প্রকাশের অযোগ্য বিবেচনা করিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বিমর্ষ ও কাতর হইয়া পড়িলেন। তখনও তাঁহার আত্মনির্ভরতা জন্মায় নাই—তখনও তিনি তাঁহার সত্য বুঝিতে পারেন নাই। ...অবশেষে ভ্রাতৃদ্বয়ের ভুল ভাঙ্গিল। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের কর্ম্মস্থলের অভিমুখে ধাবিত হইলেন; এবং দুর্গেশনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া দ্বিতীয়বার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ফল এই দাঁড়াইল, সঞ্জীবচন্দ্র, দুর্গেনন্দিনীর পাণ্ডুলিপি লইয়া কাঁটাল পাড়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং মুদ্রাযন্ত্রের শরণ লইয়া অচিরে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ করিলেন।"[৯]

এসব যুক্তি ও তথ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে সদা সতর্ক ছিলেন। এই পরিস্থিতিতে তিনি পাঠকের প্রতি নীতি উপদেশ বা বিতর্কিত কোন বিষয়কে সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলেছিলেন। কেননা, ভাল লিখে স্বীকৃতি আদায় তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। এই কঠিন অগ্নি পরীক্ষায় সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়াই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তিনি জানতেন "লেখা ভাল হইলে যশ আপনি আসিবে।"[১০] দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) রচনা করার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের নজর ছিল লেখাটিকে বিতর্কহীন করে তোলার দিকে। কেননা, তখনও তিনি প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক হন নি। সেজন্য 'কপালকুণ্ডলা'র পরিকল্পনা ঠিক আছে কিনা তা যাচাই করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের পরামর্শ চেয়েছিলেন। পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ জানা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন;—

> "যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়, পরে সেই স্ত্রীলোকটিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজসংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে, এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারে অন্তর্হিত হইবে ?"[১১]

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেন — কিছু দিন সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকলেও পরে সন্তান সন্ততি হলে মেয়েটির মন থেকে কাপালিকের প্রভাব মুছে যাবে। আমাদের বক্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের দ্বিতীয় বাংলা উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখাটিকে ভাল করার জন্য বারবার ভাবতে বাধ্য হয়েছিলেন। ঠিক এমন সময় দীনবন্ধুর মতো বাংলার বিখ্যাত নাট্যকারের সান্নিধ্য পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমস্যা উপস্থাপন করেন। এতে তাঁর উপন্যাস লিখতে গিয়ে অতি সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দিকে বাংলা উপন্যাস রচনা করতে তাঁর অতি সতর্ক পদসঞ্চার

তাঁকে সাহিত্য- গুণসমৃদ্ধ উপন্যাস রচনায় সাফল্য এনে দিয়েছিল। 'কপালকুণ্ডলা' প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন;—"এখানে বঙ্কিমের প্রতিভা নিজ স্বরূপের পরিচয় পাইয়াছে, এবং সমস্ত অনুকরণ ত্যাগ করিয়া নিজের জন্য একটি সম্পূর্ণ নূতন পথ বাহির করিয়া লইয়াছে।"(১২)

'কপালকুণ্ডলা'র সাফল্যের পর বঙ্কিমচন্দ্র আর থেমে থাকেন নি। উপন্যাসের পাতায় ক্রমশ তাঁর ব্যক্তিক অনুভূতি, ভাললাগা, মন্দলাগা প্রকাশ করেন। সমাজ বা দেশের মঙ্গলের জন্য বিতর্কিত এমন বিষয়কেও ক্রমশ তিনি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। কেননা, ততদিনে তিনি প্রতিষ্ঠিত ঔপন্যাসিক। বাঙালী পাঠক তাঁর লেখাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। 'কপালকুণ্ডলা'র ঠিক পরের দুটি উপন্যাস 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ও 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে। 'মৃণালিনী'তে প্রচলিত বাঙালীর কাপুরুষতার কলঙ্ককে বঙ্কিম মেনে নেন নি। মিনহাজউদ্দীনের লেখা ১৭ জন অশ্বারোহির দ্বারা লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের ইতিহাস—তাঁর সন্দেহের ঊর্ধ্বে নয়। এবিষয়ে তিনি উপন্যাসে স্পষ্ট করে বলেন;—

> "ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।
>
> ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজ্উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্ত্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই।"(১৩)

এই জাতীয় ভালোলাগা মন্দলাগার বক্তব্য প্রথম দু'টি উপন্যাসে নেই।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বিধবা বিবাহের মতো একটি বিতর্কিত বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। বিধবা কুন্দনন্দিনীর বিয়েতে লেখকের সমর্থন ছিল না। তিনি মনে করেন এ বিয়ে বৃহত্তর আদর্শে নয়, নগেন্দ্র কুন্দনন্দিনীর অসংযমতাই উপন্যাসের বিধবা বিবাহকে ত্বরান্বিত করেছে। কুন্দনন্দিনী একান্তে ভেবেছে;—"কেহ নাই—মনের সাধে নাম করি। ন-নগ-নগেন্দ্র! নগেন্দ্র, নগেন্দ্র... আচ্ছা-সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো—দূর হউক ডুবেই মরি।"(১৪) নগেন্দ্র কুন্দকে বলেছে;— "আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে — আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"(১৫) এখানে নগেন্দ্র-বিধবা কুন্দের পারস্পরিক রূপমোহের আকাঙ্ক্ষা বিবাহকে বাস্তবায়িত করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নারীর মানবিক মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দেন। বিদ্যাসাগরের এই মহৎ ও পবিত্র উদ্যোগকে সেসময় প্রগতিশীল গোষ্ঠী সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসটি বিধবার বিয়েকে সমর্থন করে রচিত হয় নি। 'সাম্য' নামক প্রবন্ধে তিনি বলেন;—

"কেহ যদি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, স্ত্রীশিক্ষা ভাল কি মন্দ? সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিত হওয়া উচিত কি না, আমরা তখনই উত্তর দিব, স্ত্রীশিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকর; সকল স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হওয়া উচিত; কিন্তু বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে আমাদিগকে কেহ সেরূপ প্রশ্ন করিলে আমরা সেরূপ উত্তর দিব না।"(১৬)

বঙ্কিমচন্দ্র বিধবার বিয়েকে নির্বিচারে সমর্থন করেন নি। আর তাই বিদ্যাসাগরের মত মহৎ পণ্ডিত ব্যক্তির বিধবা বিবাহের ব্যাপক আন্দোলনের পরেও বঙ্কিম বলেছিলেন;—

"সকল বিধবার বিবাহ কদাচ ভাল নহে,...এখানে জিজ্ঞাসা হইতে পারে "যদি" পুরুষ পুনর্ব্বিবাহে অধিকারী হয়, তবেই স্ত্রী অধিকারিণী, কিন্তু পুরুষেরই কি স্ত্রীবিয়োগান্তে দ্বিতীয় বার বিবাহ উচিত ? উচিত, অনুচিত স্বতন্ত্র কথা; ইহাতে ঔচিত্যানৌচিত্য কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্য্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে।"(১৭)

বঙ্কিমচন্দ্র বলেন — পুরুষ কিংবা নারীকে যদি দ্বিতীয় বিবাহ করতেই হয়, তাহলে লক্ষ রাখতে হবে সে বিয়ে যেন অন্য কারো অন্যায়ের কারণ না হয়। অথচ 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে, সমকালের আইনের বলে ক্ষমতাবান ব্যক্তি নগেন্দ্রের রূপমোহ বা সম্ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করার দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের দ্বারা বলতে চেয়েছেন, প্রগতিশীল গোষ্ঠীর নির্বিচারে বিধবা বিবাহের সমর্থন নগেন্দ্র-সূর্য্যমুখীর মতো অনেক সুখী সমৃদ্ধ সংসার নষ্ট করে দিচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র যেন সূর্য্যমুখীর মুখ দিয়ে বিধবা বিবাহের আন্দোলনকে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করেন। সূর্য্যমুখী বলেছে—'ঈশ্বর বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মুর্খ কে ?"(১৮)

আমরা লক্ষ করলাম, 'মৃণালিনী' বা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিতর্কিত বিষয়কে স্থান দিয়েছেন। অথচ লেখক, ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে কোনরকম সমালোচনা বা বিতর্কিত বা প্রত্যক্ষ নীতি-উপদেশের মতো বিষয়কে সহজেই এড়িয়ে যান। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমিকের প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা পরিচয় প্রথম উপন্যাস দু'টিতে নেই বললেই চলে। তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পরেই বিতর্কিত বিষয়, দেশপ্রেম বা সমাজকল্যাণের মতো বিষয়কে উপন্যাসের সঙ্গে অভেদ করে তুলেছেন।

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৮৪৩-১৮৯১) সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'। উপন্যাসের অনেকাংশ রাজসাহীর শ্রীকৃষ্ণদাস সম্পাদিত 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রে প্রথম বর্ষের ১২৭৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন থেকে ১২৮০ বঙ্গাব্দের ভাদ্র পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'স্বর্ণলতা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে। ইতিমধ্যে

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় একাধিক উপন্যাস লিখে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে রোমান্সের অতিরঞ্জন চোখে পড়ার মতো। প্রসঙ্গত ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—

> "বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি স্থূলতঃ দুইভাগে বিভক্ত—এক শ্রেণী সম্পূর্ণ বাস্তব, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় শ্রেণী ঐতিহাসিক বা অসাধারণ ঘটনাবলীর উপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ উপন্যাসে 'novel ও 'romance' বলিয়া যে দুইটি প্রধান বিভাগ আছে, বঙ্কিমের উপন্যাসেও সেই দুইটি বিভাগ বর্তমান।"[১৯]

রোমান্স ও সামাজিক উপন্যাসের তুলনা প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন;—

> "তবে সামাজিক উপন্যাসের সঙ্গে ইহার একমাত্র প্রভেদ যে, বাস্তবতার বন্ধন ইহাকে একেবারে নাগপাশের মত সুদৃঢ়ভাবে জড়াইয়া ধরে নাই, ইহার মধ্যে বিচিত্র ও অসাধারণ ব্যাপারের অপেক্ষাকৃত অধিক অবসর আছে। সাধারণ উপন্যাসের ন্যায় রোমান্সের ক্ষেত্রে বাস্তবতার দাবি এত প্রবল বা সর্বগ্রাসী নহে।"[২০]

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আপত্তি — বাস্তব সম্মত সামাজিক উপন্যাসের পরিবর্তে বাংলা সাহিত্যে রোমান্স মূলক উপন্যাসের বাহুল্যে। কেননা, সে সময়ে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্সমূলক উপন্যাসই লিখছিলেন। 'স্বর্ণলতা'র পূর্বে বাঙালী পাঠক উপন্যাসের রোমান্স রসে বিভোর ছিলেন। যদিও 'স্বর্ণলতা'র সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রেরই দু'টি সামাজিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। তবুও 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) ও 'ইন্দিরা' (১৮৭৩) রোমান্সহীন নয়। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন;—

> "বঙ্কিম সামাজিক উপন্যাসেরও রোমান্সের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই—তাঁহার সামাজিক উপন্যাসগুলিও অনেকটা রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত। 'রজনী'তে এই অতি প্রাকৃত ও অসাধারণের স্পর্শ খুব সুস্পষ্ট;—'বিষবৃক্ষ'- এও একটা সাংকেতিকতার আভাস বর্তমান; 'ইন্দিরা' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই প্রভাব হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক মুক্তিলাভ করিয়াছে।"[২১]

এই সূত্রে বলা যায়—'স্বর্ণলতা'র পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি যথাক্রমে 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬), 'মৃণালিনী' (১৮৬৯), 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) রোমান্সধর্মী উপন্যাস। বাংলা উপন্যাসের এই একমুখী পথচলা রোধ করতে বা পাঠককে প্রকৃত বাস্তব সামাজিক রসের আস্বাদন দিতে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলম ধরেন। প্রথম উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'য় তিনি এবিষয়ে আশাতীত সাফল্য পান। সমসাময়িক কালের আর এক

বিখ্যাত লেখক ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বর্ণলতা' বিষয়ে লেখক তারকনাথকে একটি পত্রে লেখেন;—

> "নামের ভার নাই, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর নাই, তবু তোমার "স্বর্ণলতা" চতুর্থবার মুদ্রিত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এখনকার অবস্থায় ইহা সামান্য শ্লাঘার কথা নয়। তাহার উপর ইংরেজী ধরনের প্রণয়-লীলা, চোর-ডাকাইতের অদ্ভুত খেলা, আকস্মিক বিচ্ছেদ, অভাবনীয় মিলন—এসকল প্রসঙ্গের ছায়াপাত বর্জ্জিত হইয়াও যে গ্রন্থ এত আদরের সামগ্রী, তাহার অসাধারণ কোন গুণ আছে, ইহা কে না স্বীকার করিবে?"[২২]

—এখানে উপন্যাস হিসাবে 'স্বর্ণলতা'র শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। উপন্যাসটির সম্পাদনা করতে গিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্তদাস বলেছেন;—" 'স্বর্ণলতা'র প্রথম কয়েকটি সংস্করণে গ্রন্থকার স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই।"[২৩] আমাদের মনে হয়, গ্রন্থকার তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মনে একটা আশঙ্কা ছিল, বাঙালী পাঠক তাঁর ব্যতিক্রমী উপন্যাসটি আদৌ গ্রহণ করবে কি না। সেজন্যই তিনি তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত গ্রন্থকার হিসাবে নিজের নাম গোপন রাখেন। অবশ্য উপন্যাসটির জনপ্রিয়তার শীর্ষলগ্নে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়েরই লিখিত একটি পরিচিতি পত্রের দ্বারা তিনি ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রকাশ্যে আত্মপ্রকাশ করেন।

ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের রোমান্স বিমুখ মনোভাবের তথ্যটি 'স্বর্ণলতা' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পাওয়া যায়। লেখক বলেন;—

> "গ্রন্থকারেরা লোকের মনের কথা টের পান এবং ইচ্ছা হইলে সকল স্থানেই গমনাগমন করিতে পারেন। নহিলে সুন্দর বকুলতলায় বসিয়া কি ভাবিতেছিলেন, ভারতচন্দ্র রায় তাহা কি প্রকারে জানিতে পারিলেন; এবং মাইকেলই বা কি প্রকারে পরলোকের বৃত্তান্ত অবগত হইলেন? এবং তদপেক্ষাও দুর্গম যে মুসলমানের অন্তঃপুর, বঙ্কিম বাবু কি প্রকারে তথায় উপস্থিত হইয়া ওসমান ও আয়েসার কথোপকথন শুনিতে পাইলেন? এ ভিন্ন গ্রন্থকারদিগের আরও একটি শক্তি আছে, অর্থাৎ ইচ্ছা হইলেই অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারেন। এটি বড় সাধারণ শক্তি নহে। এ শক্তি না থাকিলে অনেক গ্রন্থকার মারা যাইতেন। ...এই শক্তির প্রভাবেই বঙ্কিম বাবু আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে এক যবন-তনয়ার মুখ হইতে অধুনাতন ইউরোপীয় সুসভ্য জাতীয় কামিনীগণের ভাষা অবলীলাক্রমে নির্গত করাইয়াছেন। এ কথা আমাদিগের বলিবার প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থে উত্তরোত্তর যে সকল বিষয় বর্ণনা করিব—তাহা, হে পাঠকবর্গ! আপনাদিগের পার্থিব কর্ণ ও চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হইলেও অমূলক নহে।"[২৪]

গ্রন্থকারের অতিকাল্পনিকতাকে তীব্র ভাষায় ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা যে, অতি কাল্পনিকতার দোষে দুষ্ট, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তা গোপন রাখেন নি। উপন্যাসের ক্ষেত্রে রোমান্স প্রবণতা বা কল্পনার অতিরঞ্জনের একমুখী পথ চলা অবসানের জন্য যে তাঁর গ্রন্থ রচনার উদ্যোগ, এখানে সেকথাও লেখক স্বীকার করেন। লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয় নি। বাংলা সাহিত্য এর ফলে যে সমৃদ্ধ হয়েছিল এই তথ্যটি আমরা ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের ভাষায় বলতে পারি;—"সাহিত্য সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রকে হিসাব হইতে বাদ দিলে, স্বদেশ ও স্ব-সমাজ হইতে উপকরণ লইয়া প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার কৃতিত্ব তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের। তাঁহার পর আরও অনেকে মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালী সমাজের চিত্র সাফল্যের সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন, কিন্তু 'স্বর্ণলতা'র গৌরবকে কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারেন নাই।

তারকনাথ বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ভূয়োদর্শন হইতেই 'স্বর্ণলতা' রচনা করিয়াছিলেন।"[২৫] বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রথম দিকে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা উপন্যাসের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার মহৎ উদ্যোগ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করার মতো।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাংলা সাহিত্যের নানা প্রকরণে প্রতিভার ছাপ রেখেছিলেন। 'মানসী' (১৮৯০), 'সোনারতরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা' (১৮৯৬) ও 'চৈতালি' (১৮৯৬)-এর মতো কাব্যগ্রন্থ, 'চিত্রাঙ্গদা' (১৮৯২), 'বিদায় অভিশাপ' (১৮৯৪), 'কাহিনী' (১৯০০), 'রাজা ও রাণী' (১৮৮৯), 'বিসর্জন' (১৮৯০), 'মালিনী' (১৮৯৬)-এর মতো নাটকজাতীয় রচনা ও নাটক, তাছাড়া হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার' প্রভৃতি গল্পে তাঁর প্রতিভা বিস্ময়কর। 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রকরণে প্রতিভা প্রকাশের প্রাথমিক রূপ। অবশ্য লেখক 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি'র মতো উপন্যাসকে 'কাঁচাবয়সের' রচনা বললেও এর মূল্যকে অস্বীকার করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসকে আদর্শ করে রবীন্দ্রনাথ 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) লেখেন। এখানে লেখক বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টিতে যত্নশীল হন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে নিষ্ঠুর, অবিবেচক-হিংস্র চরিত্র হিসাবেই গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে উপন্যাস লিখতে গিয়ে তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ হয়ত কৃতিত্বের সঙ্গে সাফল্য পান নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক রস সৃষ্টিতে তাঁর অংশগ্রহণ উপন্যাস নামক প্রকরণটির উন্নতির কথাই মনে করিয়ে দেয়। শুধুমাত্র স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনাপূর্ণ সাহিত্য সৃষ্টি না করে সাহিত্যের মান উন্নয়নের জন্য নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টির প্রয়াস 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' উপন্যাসে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটির সূচনায় বলেন;—

"এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময় বাংলাদেশের আদর্শ বীরচরিত্ররূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনো তার নিবৃত্তি হয় নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা-কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস-লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনো তাঁর পূজা প্রচলিত হয় নি।"(২৬)

রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যের উপর দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক রস সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। দেশপ্রেমের উত্তেজনার চেয়ে নিরপেক্ষ তথ্য পরিবেশনের দ্বারা সাহিত্যরস সৃষ্টি করা তাঁর কাছে শ্রেয় মনে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই উপন্যাসটির প্রশংসা করলে সেদিনের তরুণ লেখক অত্যন্ত উৎসাহিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকদিন পরে বলেন;—

"বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দা করেন নি। ...তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"(২৭)

আমরা লক্ষ করব, এই উৎসাহ বাংলা সাহিত্যকে ভবিষ্যতে সমৃদ্ধ করার পক্ষেই রায় দিয়েছে। 'বালক' পত্রিকার তরুণ লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর 'বালক' পত্রের দাবী ছিল গল্পের জোগান দেওয়া। পত্রিকার এই দাবী রবীন্দ্রনাথকে সবসময় তাড়া করে বেড়াত। অবশ্য লিখে বাঙালী পাঠককে রসতৃপ্ত করার বাসনাও তাঁর ছিল। লেখকের ভাষায়;—

"বালক পত্রের সম্পাদিকা আমাকে ঐ মাসিকের পাতে নিয়মিত পরিবেশনের কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তার ফল হল এই যে, প্রায় একমাত্র আমিই হলুম তার ভোজের জোগানদার। একটু সময় পেলেই মনটা 'কী লিখি' 'কী লিখি' করতে থাকে।"(২৮)

উপন্যাসের মূল ভাববস্তু হল অহিংসা ধর্মের সঙ্গে শক্তি পূজার হিংস্রতার বিরোধ। 'রাজর্ষি' উপন্যাসে শক্তিপূজায় প্রচলিত বলিদানের মতো পাশবিক বৃত্তির পরিবর্তে অহিংস ধর্মের জয়ের মতো নীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে। খাতায় কলমে রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকে 'করুণা', 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'রাজর্ষি' রচনা করেছিলেন। তিনটি উপন্যাসই বঙ্কিমের রোমান্স রসের প্রভাবযুক্ত। এই শতকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস লিখে হাত পাকিয়েছেন,

কিন্তু চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছেন বিশ শতকের গোড়ায় 'চোখের বালি'তে (১৯০৩)। কিন্তু প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার বাসনা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে পারি।

অতএব উনিশ শতকের উপন্যাস নামক অভিনব সাহিত্য প্রকরণটিকে প্যারীচাঁদ মিত্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। এই সময়কার লেখকগণের আন্তরিক সদিচ্ছা বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সমৃদ্ধি এনে দেয়, যে সদিচ্ছাকে আমরা বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা বলে দাবী করতে পারি। কেননা, বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের উন্নয়ন করার আন্তরিক প্রয়াস বাঙালীর সাহিত্য সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধি এনে দিয়েছে।

পূর্বে 'উনিশ শতকের নাট্যসাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা' নামক অধ্যায়ে জাতীয় প্রেরণায় বাংলা নাটকের আলোচনায় বাঙালীর জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে আলোকপাত করা হয়েছিল। আমরা উল্লেখ করেছি, শিক্ষিত সচেতন বাঙালী, দেশীয় কৃষক, দেশীয় সিপাহী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বা ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার বৈষম্যের প্রতি ক্রমশ অসন্তোষের বৃত্তান্ত। দেশের কৃষক, সেনা ও শিক্ষিত এবং সচেতন ব্যক্তির মনে শাসকের প্রতি অসন্তোষ সমকালীন বাংলা সাহিত্যকে প্রভাবিত করেছিল।

এই সময় সরাসরি শাসক বিরোধী কোন গ্রন্থ রচনা নিষিদ্ধ ছিল। আমরা জানি— দীনবন্ধু মিত্র ''নীলকর বিষধর দংশন কাতর প্রজানিকরক্ষেমঙ্করেণ কেনচিৎ পথিকেনাভি প্রণীত'' ছদ্মনামে 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকটি প্রকাশ করেন। 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করার জন্য পাদ্রী লং সাহেবের কারাবাস ও অর্থদণ্ড হয়েছিল। অর্থাৎ সরাসরি শাসক বিরোধী বক্তব্য প্রকাশে সমকালীন লেখক সরকারী বিধিনিষেধ মেনে চলতেন। আবার শাসকের জাতীয় স্বার্থের প্রতিকূল নীতির বিরুদ্ধে কবি ও লেখক সমকালীন পাঠককে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করতে পিছিয়ে থাকেন নি। উপন্যাসে হয়ত প্রত্যক্ষ শাসক বিরোধী বক্তব্য নেই। তবে স্বাধীনতা হরণকারী বিদেশী শাসকের পরোক্ষে সমালোচনা রয়েছে। আমরা লক্ষ করব, বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখ লেখকের রচনায় এই জাতীয় মনোভাব বেশ সক্রিয়। তাঁদের রচনায় জাতিকে দেশানুরাগে দীক্ষিত করার মহৎ উদ্যোগ রয়েছে। এই সময়ে সচেতন বাঙালী স্বদেশীয় আচার সংস্কৃতির প্রতি ক্রমশ আস্থাবান হন। তাঁরা বিদেশীয় আচার সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণকারী হয়ে থাকতে চাইলেন না। কেননা, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির এমন একটি ক্ষমতা আছে যা জীবনের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে পারে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (১৮৪৩) ভারতীয় সংস্কৃতির গৌরবময় দিক তুলে ধরা হয়। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্ম কথা' বিষয়ে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন;—

"ডফ্ সাহেব তাঁর তেত্রিশ বৎসর খ্রিষ্টধর্ম প্রচার কার্যের (১৮৩০-১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের) মধ্যে দুইবার য়ুরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করে অর্থসংগ্রহের চেষ্টা করেন। ...১৭৫৬ শকে (১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দে) প্রথমবার স্বদেশে ফিরে যান এবং সেখানে ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) India and India's Missions (ভারত ও ভারতের ধর্মসম্প্রদায় সকল) প্রবন্ধে হিন্দুধর্ম এবং তৎসম্বন্ধে কৃতজ্ঞতার পাশ কাটিয়ে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তীব্র আক্রমণ ও কটূক্তি বর্ষণ করতে কুণ্ঠিত হন নি।

এই ঘটনায় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে খুবই আঘাত লেগেছিল। তাঁর হৃদয়ে ডফ্ সাহেব কর্তৃক ব্রাহ্মসমাজের প্রতি নিন্দাবাদের প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। কিন্তু সে সময়ে না ছিল এমন কোনও কাগজ যাতে তিনি আপনার মনোভাব সকল ব্যক্ত করতে পারতেন, আর না ছিল এমন কোনও বন্ধু বান্ধব যাদের সঙ্গে তিনি এবিষয়ে পরামর্শ করতে পারতেন। ১৭৬১ শকে (১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে) তত্ত্ববোধিনী সভা সবেমাত্র স্থাপিত হয়েছিল। পরে যখন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্মিলনের ফলে তত্ত্ববোধিনী সভা সুপ্রতিষ্ঠিত হল এবং সেই সঙ্গে অন্তত ছোটখাটো একটি দল বেঁধে গেল, তখন দেবেন্দ্রনাথ একখানি মাসিকপত্র প্রকাশের প্রস্তাবে সাহসী হলেন। এই পত্রিকার নাম তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। ১৭৬৫ শকের ১লা ভাদ্র ইহার শুভ জন্মদিবস।"(২৯)

আমরা জানলাম, ভারতীয় ধর্ম, দর্শন অপমানের প্রতিবাদের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশের বৃত্তান্ত। 'হিন্দুমেলা'-ও (১৮৬৭) জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির গৌরব প্রচার মূলক একটি সংগঠন। এই মেলায় কৃষি, চিত্র, শিল্প, ভাস্কর্য, খেলাধূলা, ব্যায়াম প্রভৃতির আয়োজন ও দেশীয় জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হত। বাঙালী লেখক সমকালের এই জাতীয় মনোভাবে সিক্ত ছিলেন। তাঁরা স্বজাতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির মধ্যে জাতীয় গৌরবকথা খুঁজে তা প্রচার করার চেষ্টা করতেন। আপামর বাঙালীর আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার পক্ষে যা যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল।

আমরা স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি গৌরবমূলক যে সব উপন্যাসের পরিচয় পেয়েছি সেগুলিকে জাতীয় প্রেরণামূলক উপন্যাস বলে অভিহিত করব। জাতীয় প্রেরণামূলক উপন্যাসের দু'টি ভাগ করা যেতে পারে। যথা;—ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ভারতীয় দর্শন বা তত্ত্বের অবতারণামূলক উপন্যাস।

উনিশ শতকে ঔপন্যাসিক স্বদেশীয় ইতিহাসের গৌরবময় দিকগুলি উদ্ঘাটন করে সমকালের পাঠককে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছিলেন। প্রথমে ঐতিহাসিক বা কল্পনা মিশ্রিত ইতিহাসমূলক

উপন্যাসে জাতীয়তাবাদের আবেদন বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' ও 'রাজসিংহ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কেননা, 'মৃণালিনী' উপন্যাসে হেমচন্দ্র -মৃণালিনী ও পশুপতি-মনোরমার দু'টি রোমাঞ্চকর প্রেমকাহিনী থাকলেও বাংলার প্রকৃত ইতিহাসের বিষয়টি বড় হয়ে উঠেছে। ইফ্তিকার উদ্দিন বিন বখ্তিয়ার খিলজি সহ ১৭ জন সেনাবহিনীর নিকট লক্ষ্মণসেনের পরাজয়ের একটি কাহিনী রয়েছে। প্রচলিত এই ঐতিহাসিক কাহিনীকে লেখক এড়িয়ে বাস্তবসম্মত একটি কাহিনী নির্বাচন করেন। আর 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই স্বীকার করেন যে;— "আমি পূর্বে কখনও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখি নাই। 'দুর্গেশনন্দিনী' বা 'চন্দ্রশেখর' বা 'সীতারাম'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না। এই প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিলাম।"(৩০) বঙ্কিমচন্দ্র অসত্য, অধর্ম, পরনিন্দা বা স্বার্থ বিষয়ক রচনার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি মনে করতেন— এসবকে সাহিত্যের বিষয় করলে মহৎ সাহিত্যও সৃষ্টি হবে না, আবার সমাজকেও বিপথে চালিত করা হবে। সেজন্য তিনি 'বিবিধপ্রবন্ধ'-এর 'দ্বিতীয় খণ্ড'-এ 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' নামক প্রবন্ধে বলেছিলেন;—"যাহা অসত্য, ধর্ম্ম বিরুদ্ধ; পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, ...তাহা একেবারে পরিহার্য্য।"(৩১) দেশের বা সমাজের ক্ষতি হবে এমন সব বিষয়কে তিনি সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়েছেন। 'মৃণালিনী' (১৮৬৯) ও 'রাজসিংহ' (১৮৮২, ৪র্থ সংস্করণ ১৮৯৩) উপন্যাস দু'টির বিষয়বস্তু অনেক ক্ষেত্রে কল্পনা প্রবণ বলে মনে হতে পারে; কিন্তু সাহিত্যের বাস্তবতা বা মূল ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করে নি। আপাত কল্পনা বলে মনে হওয়া বিষয়গুলি মিথ্যা, পরনিন্দা, ধর্ম বিরুদ্ধ বা স্বার্থ সাধন জাতীয় নয়। বরং বলা যায়, ওই সব বিষয়গুলি জাতি ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হয়েছে।

'মৃণালিনী' বঙ্কিমচন্দ্রের দেশানুরাগমূলক উপন্যাস। দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় শৌর্যবীর্য ও আত্মত্যাগের অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। মাধবাচার্যের স্বাজাত্যপ্রীতির উত্তপ্ত ভাষণ ও একনিষ্ঠতা যেন সেদিন পরাধীন জাতিকে পথ দেখিয়েছে। যথা;— "তুমি দেবকার্য্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে ?"(৩২) — নায়ক দেশমাতৃকার মহৎ কাজে বিমুখ হতে চাইলে মাধবাচার্য বলেন;—"নরাধম! তোমার জননী কেন তোমায় দশ মাস দশ দিন গর্ভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল?"(৩৩) কিংবা "তুমি কাপুরুষ যদি না হও, তবে তুমি কি প্রকারে শত্রু শাসন হইতে অবসর পাইতে চাও? এই কি তোমার বীরগর্ব্ব? এই কি তোমার শিক্ষা? রাজবংশে জন্মিয়া কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুখ হইতে চাহিতেছ ?"(৩৪)

বাংলার বিকৃত ইতিহাসের সাহিত্যিক প্রতিবাদ 'মৃণালিনী'। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র মেনে নিতে পারেন নি ১৭ জন অশ্বারোহী বাংলাকে পরাজিত করেছিল। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন,—ছলনা ও যথেষ্ট কৌশলের দ্বারা লক্ষ্মণ সেন সিংহাসনচ্যুত হয়েছেন। লেখক বলেছেন;—

"ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটকার বখ্তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল। ষষ্ঠি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজ্উদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে?[৩৫]

ঐতিহাসিক মিনহাজ উদ্দীনের লেখা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই সন্দেহ পোষণ করেছেন।১৭ জন অশ্বারোহী কর্তৃক বাঙালীর পরাজয়ের কলঙ্ক যে অতিরঞ্জিত সেকথা উপন্যাসের বক্তব্যে স্পষ্ট। বঙ্গভূমির অদৃষ্ট খুব একটা ভাল নয় লেখক এবিষয়ে লিখেছেন;—"বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্য্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইভ সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।"[৩৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুধুমাত্র দেশের ইতিহাস ও পরাধীনতার গ্লানির কথা শুনিয়ে নীরব থাকেন নি, তিনি প্রসঙ্গত লোকশিক্ষা বা নৈতিকতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। মৃণালিনী, হেমচন্দ্রের বিবাহিতা স্ত্রী। কিন্তু সে বিয়ে ছিল গোপন। হেমচন্দ্রের সংকেতের আংটি দেখে মৃণালিনী বাগানের পিছনে যায় দেখা করতে। এখানেই মৃণালিনী অপহৃত হয়। মণিমালিনী, মৃণালিনীর বিবাহের সংবাদ জানত না, সেজন্য সখি মণিমালিনী বলেছে;—"তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?"[৩৭] মণিমালিনীর ধারণা ছিল— সম্মান, সতীত্ব, লজ্জা নামক বিষয়গুলি বর্জন করে মৃণালিনী পুরুষের সঙ্গে মিলিত হত। এখানে অবিবাহিতা মেয়ের পুরুষের প্রতি অবৈধ আসক্তির সামাজিক বিধিনিষেধের কথা স্পষ্ট।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে মনোরমা- পশুপতি উপাখ্যান স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নিষ্কাম প্রেম ও ভক্তির সার্থক দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্বামী আদর্শচ্যুত, পথভ্রষ্ট হলেও স্ত্রীর নিকট দেবতা। স্বামীর দেবত্বকে স্বীকার করে নিয়ে স্ত্রীও যে মানুষ, তারও ভালমন্দবোধের সমান মূল্য রয়েছে, এখানে মনোরমা-পশুপতি উপাখ্যানে তার পরিচয় মেলে। মনোরমা বিধবা পরিচয়ে স্বামী পশুপতির আহ্বানে সাড়া দেয় নি। এখানে মনোরমার ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠেছে। আবার মনোরমা সেই পশুপতির মৃত্যুতে সহমরণে গমন করেছে। এ যেন একাধারে উগ্র আধুনিকা ও সংকীর্ণ সমাজের প্রতি প্রয়োজনীয় নৈতিক পথ প্রদর্শন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের সমকালের মুঘল ইতিহাসকে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী হিসাবে গ্রহণ করেন। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে দেশবাসী সর্বাধিক নির্যাতিত হয়েছিল। ইতিহাসের মুঘল যুগের সময়ের কাহিনী দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকে পরাধীন বাঙালীর জাতীয়তাবোধ জাগরণের চেষ্টা করেন। ভারতবাসীর 'বাহু'তে শক্তি নেই, তাই তারা যুগ যুগ ধরে বিদেশীর অর্থাৎ শক, হুণ, পাঠান, মোগল, ইংরেজের কাছে পরাজিত। এরকম একটি ভ্রান্ত ধারণা ঊনবিংশ শতকের অনেক ভারতবাসীর মনে বিরাজ করত। কিন্তু 'রাজসিংহ'-

এর গ্রন্থকার বঙ্কিম এজাতীয় ভ্রান্ত ধারণা উড়িয়ে দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই।"[৩৮] লেখক জাতির গৌরবময় ইতিহাস না থাকার অন্যতম কারণ নির্ণয় করে বলেন;—"মুসলমান ইতিহাস লেখকেরা অত্যন্ত স্বজাতি-পক্ষপাতি; হিন্দুদ্বেষক। হিন্দুদিগের গৌরবের কথা প্রায় লুকাইয়া থাকেন— বিশেষতঃ মুসলমানদিগের চির শত্রু রাজপুতদিগের কথা।"[৩৯] স্বদেশবাসীর বাহুবলের বিস্মৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র-রাজসিংহ উপন্যাসে স্মরণ করেছেন।

'রাজসিংহ' উপন্যাসে দেশহিতৈষী, বীর, ধর্ম্মাত্মা রাজসিংহের জয় এবং 'নিষ্ঠুর' 'কপটচারী' 'ক্রূর', 'দাম্ভিক', 'আত্মমাত্রহিতৈষী' এবং প্রজা পীড়ক ঔরঙ্গজেবের চরম অপমান দেখানো হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বে দেশীয় সংস্কৃতি, ধর্ম জীবন সবই সঙ্কটাপন্ন। দেশে রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয়েছিল—'জেজেয়া'কর দিতে হবে, গোহত্যা করতে হবে, দেবালয় ভাঙ্গতে হবে। বাহুবলের সাহায্যে সেদিন দেশবাসী বিপর্যস্ত দশা থেকে মুক্তির উদ্যোগ করেছিল।

উপন্যাসের সূচনাতে দেশ ও জাতির শত্রু ঔরঙ্গজেবের চিত্রে লাথি মেরে মনের আশ সামান্য হলেও মিটিয়েছে রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চল কুমারী। 'ধর্ম্মাত্মা' রাজসিংহ ঔরঙ্গজেবের অন্যায় ও নিষ্ঠুর আদেশ মেনে নেন নি। সম্রাটের বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রাজসিংহ বিচলিত না হয়ে কৌশলে বাহুবলের সাহায্যে শত্রু ঔরঙ্গজেবকে উচিত শিক্ষা দিয়েছিলেন। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দুঃখ করে বলেন;—"এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না।"[৪০] উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে লেখেন;— "আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্থ করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাস কিছুই জানি না।"[৪১] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাজসিংহের গৌরবময় ইতিহাস প্রচার করে জাতির আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। তিনি স্বদেশীয় গৌরবময় ইতিহাস উপন্যাসের আকারে প্রচার করে পাঠককে জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে সচেতন করার চেষ্টা করেন। বাঙালীকে জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত করার পক্ষে যা কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

রাজসিংহ উপন্যাসে সমাজশিক্ষা বা লোকশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 'রাজসিংহ' প্রকাশ সম্বন্ধে 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ লিখেছেন—রাজসিংহ বঙ্গদর্শনে কিছুটা প্রকাশ হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্রকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে বলেন;—"আমার সৃষ্ট চরিত্রগুলিতে এখনকার ছেলেপুলে মাটি হইতেছে। তাই আর ডাকাত মাণিকলালকে আঁকিতে ইচ্ছা করে না।"[৪২] সেদিন চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে শ্রীশমজুমদারও বলেছিলেন;—"মাণিকলালের মত দুএকটা ডাকাতের চিত্র দেশের সম্মুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।"[৪৩] শ্রীশচন্দ্র বলেন এরকম কথোপকথনের কিছুদিন পর পুনরায়

রাজসিংহ প্রকাশ হতে লাগল। খুন, ডাকাতি প্রভৃতি অবশ্যই অনৈতিক, সেজন্য প্রথম থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' প্রকাশে সংকোচ বোধ করেছিলেন। কোন এক বন্ধু তাঁর মনের ওই কথাটি বলে দেওয়ায় 'রাজসিংহ'-এর প্রকাশ বন্ধ করে দেন। কিন্তু শ্রীশচন্দ্র, চন্দ্রশেখর প্রমুখের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলেন যে, রাজসিংহ প্রকাশ পেলে দেশের 'ছেলেপুলে'র পক্ষে উপকার হতে পারে। ফলে আর অপেক্ষা না করে রাজসিংহের প্রকাশ করেন। 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ'-এ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার এরকম বক্তব্যই প্রকাশ করতে চেয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে বিভিন্ন চরিত্র অঙ্কন করে 'উপসংহার'-এ 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে বলেছেন;—"অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ।"(৪৪) উপন্যাসে যাঁরা ন্যায় পরায়ণ, ধার্মিক তাঁদের পরিণতি শুভ হয়েছে এবং যারা অধার্মিক অন্যায়কারী তাদের পরিণতি হয়েছে অশুভ। মবারক বীর, কিন্তু তার চরিত্র নিষ্কলুষ থাকেনি। চরিত্রটি বিবেকদংশনে আহত। জেব উন্নিসা ঔরঙ্গজেবের কন্যা; সে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, নিষ্ঠুর ও অহংকারী। উপন্যাসের পরিণতিতে সে ভালবাসার নীড় গড়তে চেয়েছে কিন্তু পায়নি। ঔরঙ্গজেবের প্রেয়সী উদিপুরী বেগম আত্ম অহংকারী ও নিষ্ঠুর। কাহিনী শেষে তার অহংকার ধুলিলুণ্ঠিত। রাজসিংহ উপন্যাসে সত্য, ধর্ম, নৈতিকতা বা লোকশিক্ষার মতো বিষয়গুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে প্রকাশ করে সামাজিক কল্যাণের উদ্দেশ্যকে সফল করার সচেতন প্রয়াস দেখা যায়। আর তাই তিনি গ্রন্থশেষে আপামর পাঠক ও সমালোচকদের বলতে চেয়েছেন, অহেতুক হীন উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়;—

> "গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দ্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে।"(৪৫)

উনিশ শতকে আর এক স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৭-১৯০৯)। রমেশচন্দ্র দত্তের বাংলা সাহিত্যচর্চার পিছনে দু'টি উদ্দেশ্য চোখে পড়ার মতো। বাঙালীর আত্মচেতনার উদ্বোধন ঘটানো ও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি দান। এখানে বাঙালীর জাতীয়তাবাদী চেতনার উদ্বোধনে তাঁর ভূমিকার বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

রমেশচন্দ্র দত্ত ভারতের গৌরবময় ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মত প্রাচীন ঐতিহ্যকে শ্রদ্ধা

করতেন। এবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত কিছু গ্রন্থ হল;—

১। A History of Civilisation in Ancient India. 1-3, Cal. 1889–1890

২। Maha Bharata. : London–1899

৩। Ramayana : London–1900

৪। Lays of Ancient India : London–1894

৫। The Literature of Bengal : Ar Cy Dae. Cal.–1877

৬। ঋগ্বেদ সংহিতা, ১৮৮৫।

৭। হিন্দুশাস্ত্র (১৮৯৩-১৮৯৭) প্রভৃতি ।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুরাগ বিষয়ে তিনি 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র ভূমিকায় বলেছিলেন;— "...জগতের আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব্ব কাব্য রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? এই অসহ্য চিন্তায় ব্যথিত হইয়া আমি এই গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি।"[(৪৬)] প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ যে আরো সুদূরপ্রসারী— তা লেখকের স্বীকৃতি থেকেই জানা যাবে। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর অনুরাগকে পাঠকের জাতীয় চেতনা জাগরণের কাজে ব্যবহার করতে যত্নবান ছিলেন। তিনি বলেছেন;—

> "নব্য পাঠক! ইলিয়দ ও ইনিয়দ পাঠ করিয়াছ, দান্তে ও সেক্সপীয়র, গেতে ও হিউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ বোধ হয়? হৃদয় কোন্ কথায় অধিকতর আলোড়িত, প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয় ? ভীষ্মাচার্য্যের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ব্ব পাতিব্রত্য-কথা হিন্দু মাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে,"[(৪৭)]

লেখক দেশের গৌরবময় ইতিহাস ও সংস্কৃতি প্রচারে মুগ্ধ ও গর্বিত হতেন। তাঁর এই মানসিক তৃপ্তি দেশকে ভালবাসারই নামান্তর। তিনি বিশ্বাস করতেন, দেশীয় গৌরবকথায় পাঠক অনুপ্রাণিত হবে। তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য যে অন্য কিছু নয়, তা তিনি গোপন রাখেন নি। প্রকাশ্যে তিনি স্বীকার করেছেন;—

"পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।"[(৪৮)]

রমেশচন্দ্র 'বঙ্গ বিজেতা' (১৮৭৪), 'মাধবী কঙ্কণ' (১৮৭৭), 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' (১৮৭৮) ও

'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯) নামে চারখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখেন। উপন্যাসগুলির আবেদন পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করে। এবার আমরা উপন্যাসগুলিতে লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের স্বদেশ ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করব ।

বঙ্গবিজেতা (১৮৭৫)ঃ

উপন্যাসের মূল সমস্যার কথা লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত স্বয়ং একটি স্থানে প্রকাশ করেন;—

"১৫৮০ খৃষ্টাব্দে টোডরমল্ল সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হইয়া বঙ্গদেশে প্রেরিত হইলেন। কি প্রকারে এই নিঃশঙ্ক বীরপুরুষ তৃতীয়বার বঙ্গদেশ জয় করিয়া দুই বৎসরকাল বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশ শাসন করেন, তাহা এই আখ্যায়িকায় বিবৃত হইবে। এই আখ্যায়িকায় ১৫৮০ খৃষ্টাব্দের কথা লিখিত হইবে, সুতরাং সেই সময়ে হিন্দু ও মুসলমান, জমীদার ও প্রজা, পাঠান ও মোগলদিগের মধ্যে কি প্রকার সম্বন্ধ ছিল, সংক্ষেপে বর্ণিত হইল।"[(৪৯)]

ঔপন্যাসিকের স্বীকারোক্তি থেকেই স্পষ্ট— উপন্যাসের মূল বিষয় ঐতিহাসিক।

কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত উপন্যাসে শুধুই ইতিহাসকে বিবৃত করবেন,— তা হতে পারে না। 'বঙ্গবিজেতা' মনোযোগ দিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে, উপন্যাসটি কানায় কানায় জাতীয় গৌরব কথা, দেশানুরাগের কথা ও লোকশিক্ষার কথায় পরিপূর্ণ।

জাতীয় গৌরব কথা ঃ

উপন্যাসের সূচনায় জানা যায়, বাংলায় হিন্দুরাজত্বের পতন হয় ১২০৪ খ্রীষ্টাব্দে। বাংলায় মুঘলরাজের পূর্বে পাঠান রাজত্বে রাজকীয় কার্যে হিন্দুসম্প্রদায়ের অনেকেই অংশ নিত। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন এইসব বাঙালী হিন্দুবীরের সহযোগিতায় টোডরমল্ল বাংলাকে তৃতীয়বার মুঘলসাম্রাজ্য ভূক্ত করেন। উপন্যাসের চরিত্র সমরসিংহ সেকালের বাঙালী বীরের প্রতিনিধি। পাঠান রাজ দাউদ খাঁ সমরসিংহের বীরত্ব প্রসঙ্গে বলেন;— "প্রথম ক্ষত্রিয়কুলচূড়ামণি রাজা টোডরমল্ল, দ্বিতীয় বঙ্গীয় জমীদার রাজা সমরসিংহ।"[(৫০)] সমর সিংহ যুদ্ধকালে বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছেন। অর্থাৎ বাংলা তৃতীয়বার মুঘল শাসন ভূক্ত হবার মূলে দেশীয় হিন্দুবীরের অবদানের কথা বলা হয়েছে।

উপন্যাসটিতে দেশীয় বীরকুলের সশ্রদ্ধ প্রশংসা ধ্বনিত হয়। ইন্দ্রনাথের মনে হয়েছে, টোডরমল্ল হিন্দুবীরকুলে শ্রেষ্ঠ পুরুষ। তার ভাষায়;—"আপনার ন্যায় গৌরবান্বিত নাম ভারতবর্ষের হিন্দুদিগের মধ্যে

কাহারও নাই, আপনার ন্যায় গৌরবের কার্য্য কেহ সাধন করে নাই।"[৫১] এদিকে টোডরমল্লের মনে হয়েছে;—

> "প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতায় যেরূপ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া পর্ব্বতকন্দরে ও মরুভূমিতে বাস করিয়া বৎসর বৎসর আকবরের সৈন্যের সহিত যুদ্ধ দান করিতেছেন তাহাতে আকবর শাহ্ স্বয়ং বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়াছেন।"[৫২]

'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত দেশীয় বীরের গৌরবগাঁথা গেয়ে পাঠককে যেন বলতে চেয়েছেন আমাদের দেশ অতীত ঐতিহ্যে পূর্ণ।

দেশানুরাগ ঃ

বাঙালী দীর্ঘদিন পরাধীন ছিল (১২০৪-১৯৪৭, ১৯৭১)। আলোচ্য 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে পাঠান জাতির হাত থেকে মুঘল জাতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কাহিনী আছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে,— হিন্দুবীর টোডরমল্ল পাঠান জাতির হাত থেকে মুঘল জাতির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটিয়ে আদৌ কোন মহৎ কাজ করেছেন কি না। দেশীয় প্রজা সাধারণ তো আর স্বাধীন হতে পারল না। রাজা টোডরমল্ল, এদেশের জায়গীরদার ও জমিদারদের নিকট দেওয়ানজী সতীশচন্দ্রের মুখ দিয়ে বলান;—

> "আকবরশাহ পরম বন্ধু; হিন্দুদিগের উপর অন্যায় কর সমূহ উঠাইয়া দিয়াছেন; হিন্দুদিগের শাস্ত্র আলোচনা করিতেছেন; হিন্দু রমণী বিবাহ করিয়াছেন; হিন্দুদিগের আচারব্যবহার কোন কোন অংশে অবলম্বন করিয়াছেন; বঙ্গদেশে হিন্দু সেনাপতি ও শাসনকর্ত্তা প্রেরণ করিয়াছেন;"[৫৩]

এরকম উদার ও মহৎ চরিত্রের অধিকারী সম্রাটের অধীন হওয়া বঙ্গবাসীর জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধিকে বরণ করার নামান্তর।

লোকশিক্ষা ঃ

রমেশচন্দ্র দত্ত বিলাসী পাঠকের জন্য কলম ধরেন নি। পাঠকের আত্মবিকাশ ঘটাতে তিনি লোকশিক্ষা বা নীতিশিক্ষার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। স্বয়ং লেখক নগেন্দ্রনাথ চরিত্র প্রসঙ্গে বলেন—"...কিন্তু যদি একজন ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতে পারি, একজন তৃষ্ণার্ত্তকে স্নেহবারি দিয়া তুষ্ট করিতে পারি, একজন অনাথিনীর নয়নজল মোচন করিতে পারি, তবে একার্য্য ক্ষেত্রে আমরা বৃথা জন্মধারণ করি নাই।"[৫৪] এখানে রমেশচন্দ্র দত্ত পাঠককে মানবিক অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছেন। 'পাপিষ্ঠে' নামক সপ্তম পরিচ্ছেদে লেখক বাহ্যসম্পদ অর্থ, বিষয়, বা প্রতিপত্তির প্রতি আমাদের চঞ্চল মনকে শান্ত করার জন্য বলেন;—

"পাঠক যদি আমাদের মত দরিদ্র লোক হয়েন, যদি ঈর্ষাপরবশ হইয়া কখন "বিষয়ী" লোকের বিষয়ের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকেন, কখন যদি সতৃষ্ণ নয়নে রাস্তা হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া বাবুর বৈঠকখানার ঝাড়লণ্ঠনের প্রতি নয়নপাত করিয়া থাকেন, যদি কখন অর্থের আবাসস্থানকে সুখের আবাসস্থান মনে করিয়া থাকেন, তবে আসুন একবার লক্ষপতি সতীশচন্দ্রের অবস্থা দেখিয়া মন শান্ত করি,— লোভ দূর করি।"(৫৫)

সতীশচন্দ্রের বিষয়ই যে সতীশচন্দ্রের সমস্ত সর্বনাশ ডেকে এনেছে লেখক তার বর্ণনা দিয়ে পাঠককে বাহ্যসুখের জন্য লোভী হতে বারণ করেন।

এছাড়া উপন্যাসের শেষে গঠনমূলক মানসিকতার জয় হয়েছে। প্রজাদরদী সুশাসক আকবর বাংলার অধিপতি হয়েছেন, ইন্দ্রনাথ তথা সুরেন্দ্রনাথের মতো প্রজাদরদী মানুষ 'জমীদার' হয়েছেন। আর বিমলা তার রূপযৌবনের চর্চা ত্যাগ করে পরোপকার ও ঈশ্বরে ভক্তিমতি হয়েছে। উপন্যাসের শেষে গঠনমূলক মনোভাব পাঠককে একটি ধর্মপ্রাণ, সুশৃঙ্খল রাষ্ট্র ও সমাজের কথা মনে করিয়ে দেয়।

'মাধবীকঙ্কন' (১৮৭৭)ঃ

উপন্যাসের মূল সমস্যা নরেন্দ্র-হেমলতা-শ্রীশচন্দ্রের ত্রিকোণ প্রেম। কিন্তু উপন্যাসের শেষে এই ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যাতেই পাঠক আবদ্ধ থাকে না, পাঠকের মন লেখকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে নীতিশিক্ষা এবং দেশীয় গৌরবকথায় আকৃষ্ট হয়।

নীতিশিক্ষাঃ

'মাধবীকঙ্কন' উপন্যাসে নারী ও পুরুষের ধর্ম নির্দেশিত হয়েছে। নারীর ধর্ম যে 'পতিব্রতা', অনেক দোলাচল বৃত্তির পর হেমলতা সেকথা বুঝেছে। লেখকের ভাষায়;—"পতিসেবায় ধর্ম্মপরায়ণা হেমের অন্য চিন্তা তিরোহিত হইল, পতিভক্তি ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম তিনি জানিতেন না।"(৫৬) এবং আদর্শ পুরুষের ধর্ম্ম দেশসেবা, শত্রুজয় ও পরোপকার সাধন — তার উল্লেখ আছে। হেমলতা নরেন্দ্রের উদ্দেশ্যে বলেছে;—"নরেন্দ্র! আমি চলিলাম, তুমি ধর্ম্ম পরায়ণ, বাল্যকাল হইতেই তোমার ধর্ম্মে আস্থা আছে, ...নরেন্দ্র, তুমি বীরপুরুষ, শত্রুকে জয় কর, দেশের মঙ্গল কর, পদাশ্রিত ক্ষীণের প্রতি দয়া করিও।"(৫৭) উপন্যাসটিতে অবৈধ প্রেমের সমস্যা মুখ্য হলেও লেখক সমাজ শিক্ষার জন্য তার স্বীকৃতি দেন নি। লেখক হেমলতা-নরেন্দ্রের আকর্ষণকে স্বীকৃতি দেন নি। বরং নরেন্দ্রকে কাম, ক্রোধ, লোভ শূন্য জীবন সন্ন্যাস ব্রতে দীক্ষিত করেছেন। তাছাড়া জেলেখার সঙ্গে নরেন্দ্রের অবৈধ প্রেম শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি পায় নি।

দেশীয় গৌরবকথা ঃ

নায়ক নরেন্দ্র 'চিতোরের' চারণ কবির রাজপুত মাহাত্ম্য শুনে স্বদেশের কথা মনে হয়েছে। তার ভাষায়;— "স্বদেশও মহাবল পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দ্দশা কেন?"[৫৮] বলা বাহুল্য এরকম মনোভাব বঙ্গবাসীকে জাতীয় জীবনের বিষয়ে আত্মসমীক্ষা করতে প্রেরণা দেয়। লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙালীর বীরত্বের কথা বলবেন না, এ হতে পারে না। তিনি নরেন্দ্রের পিতা বীরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রসঙ্গে বীরত্বের জয়গাঁথা গেয়েছেন। এর্ফান নামক এক কর্মচারী বলেন—"এই রাজসভায় অনেক পরাক্রান্ত পাঠান ও মোগল যোদ্ধা আছেন, কিন্তু বীরেন্দ্র অপেক্ষা অধিক সাহসী পুরুষ এ গোলাম এ পর্য্যন্ত দেখে নাই।"[৫৯] রাজপুত ও বীরত্ব আগুন এবং উত্তাপের মতো সম্পর্কযুক্ত। রাজপুত বীর গজপতিসিংহ মুঘল স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রসঙ্গে বলেন;— "যতদিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না।"[৬০] বীরত্বের বিষয়টি রাজপুত রমণীদের কাছেও খুব আদরণীয় ছিল। 'যোধপুর' নামক পরিচ্ছেদে যোধপুর রাজ্ঞীর বীরাঙ্গনা রূপ সেকথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। রাজা যশবন্ত সিংহের সাময়িক যুদ্ধ বিরতিকে রাজ্ঞী তিরস্কার করেছে। ফলে রাজা যশোবন্ত সিংহ পুনরায় নূতন উদ্যোগে যুদ্ধ যাত্রায় অগ্রসর হন।

স্বাধীনতা জাতির পরশমণি। এই তত্ত্বটি প্রচার করতে রমেশচন্দ্র দত্ত 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' ও 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' নামক দু'খানি উপন্যাস লেখেন। লেখক যেন বলতে চেয়েছেন—স্বাধীনতা নামক অমূল্যরত্নটি কোন জাতি লাভ করলে নতুন করে জাতীয় জীবনে সূর্য উঠে আর যদি হারিয়ে যায়, তাহলে জাতীয় জীবনে নেমে আসে ঘোর অন্ধকার। উনিশ শতকের পরাধীন বাঙালীর জাতীয় জীবনে উপন্যাস দু'টি স্বাধীনতা নামক অমূল্যরত্নটির প্রতি আকৃষ্ট হবার বার্তা নিয়ে হাজির হয়েছে বলে মন্তব্য করলে অতিশয়োক্তি হবে না।

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত (১৮৭৮) ঃ

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এ নানা প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে নায়ক শিবজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের স্বাধীন হবার বিষয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক শিবজী, প্রতিনায়ক আরংজীব। শিবজী ব্রাহ্মণ, গোবৎসাদি, দেশের কৃষক ও হিন্দু দেবালয়ের পবিত্রতা রক্ষাকারী, দেশকে স্বাধীন করার স্বপ্নে বিভোর। স্বাধীনতা হরণকারীর সঙ্গে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করার পরামর্শ দিয়ে শিবজী বলেন;—

> "আমাদিগের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি হরণ করিয়াছে, হৃদয়ের শোণিতস্বরূপ বল, মান, দেশগৌরব ও ধর্ম্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সত্যসম্বন্ধ ? তাহাদিগের নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবনস্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি; স্বধর্ম্ম ও জাতি গৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি চতুরতা, সে উপায় কি নিন্দনীয় ? জীবন রক্ষার্থ পলায়ণপটু মৃগের শীঘ্রগতি কি বিদ্রোহ ?"[৬১]

শিবজী তাঁর মহৎ উদ্দেশ্যের কথা যশোবন্ত সিংহকে বলেন;—"মুসলমান-শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরবসাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্ম্মের গৌরববৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষা করণ, ইহা ভিন্ন শিবজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই।"(৬২) শিবজীর এই উদ্দেশ্য যে কোন স্বদেশ প্রেমিক ব্যক্তিকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করবে। প্রতিনায়ক আরংজীব দয়ামায়াশূন্য, কাব্যরসে বিরক্ত, হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসংস্কৃতি বিদ্বেষী। উদারচেতা দানেশমন্দকে আরংজীব বলেন;—"আকবরশাহ বুদ্ধিমান ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাফের ও মুসলমানকে সমান চক্ষে দেখিয়া তিনি কি ধর্ম্মসঙ্গত আচরণ করিয়াছিলেন ?"(৬৩) কিংবা "দানেশমন্দ্! আমি তোমার ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞ নহি! কবিতায় যাহা লিখে তাহা বিশ্বাস করি না।"(৬৪) এরকম একজন খলনায়কের বিরুদ্ধে শিবজী যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। মৃত্যুশয্যায় দাদাজী কানাইদেব শিবজীকে বলেন;—"বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ, তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই।"(৬৫) রাজা জয়সিংহ শিবজীর অদম্য উৎসাহ, মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে বলেন;—"...অচিরে দেশে দেশে হিন্দুর গৌরব-নাম, আপনার গৌরব-নাম প্রতিধ্বনিত হইবে।"(৬৬) অনুরূপভাবে যশোবন্ত সিংহ শিবজীর মহৎ উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানিয়ে বলেন;—"অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র।"(৬৭) —এরকম একটি স্বাধীনতা সংগ্রামের উপন্যাস পাঠ করলে উনিশ শতকের পরাধীন বাঙালীর মনে স্বাধীনতার কথা মনে হতে বাধ্য। বিশেষত ধর্ম ও সংস্কৃতির বিপন্নতার বিষয়টি সমকালে বিদেশী ইংরেজ রাজত্বেও প্রাসঙ্গিক ছিল। নববাবু সম্প্রদায়ের বিকৃত জীবনাচরণ আমাদের সেকথাই মনে করিয়ে দেয়। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' পাঠ করলে দেশীয় ধর্ম, সংস্কৃতি, স্বাধীনতার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়।

সমকালে অনেক বাঙালী পরানুকরণে অভ্যস্ত, তারা মনে করত বাঙালীর গর্ব করার মতো কোন কিছু নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্র দত্ত বাঙালীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন, এদেশেও ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও ধর্মের স্বর্ণোজ্জ্বল ইতিহাস ছিল। ভারতের মানুষও ইংরেজ বা ফরাসী জাতির মত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' শিবজীর নেতৃত্বে মহারাষ্ট্র জাতির স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবকথা মূলক উপন্যাস। প্রসঙ্গত শিবজীর বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা হল;—"...মহারাষ্ট্রদিগের ভাগ্যনক্ষত্র উন্নতশীল, দিল্লীর সিংহাসন ত্বরায় শূন্য! বন্ধুগণ! অগ্রসর হও, পৃথুরায়ের সিংহাসন আমরা অধিকার করিব।"(৬৮) —এখানে শিবজী সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার মহৎ কর্মে অনুপ্রাণিত হবার জন্য আহ্বান করেন। উপন্যাসটির এই জাতীয় অকৃত্রিম আহ্বান উনিশ শতকে যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল।

'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' (১৮৭৯) ঃ

রাজপুত জাতিতে ক্ষত্রিয়। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাই তাঁদের ধর্ম। ইতিহাসে তাঁদের শৌর্য-বীর্য বীরত্ব সুবিদিত। লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত এরকম একটি জাতির পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার মর্মান্তিক কাহিনী 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় চিত্রিত করেছেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ যাবতীয় সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে মুঘল সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। কারণ একটাই, রাজপুত জাতির স্বাধীনতার পরশমণিটি সযত্নে রক্ষা করা। 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা'য় মহারাণা প্রতাপ সিংহের হার না মানা স্বাধীনচেতা মানসিকতা এবং পরবর্তী উত্তরাধিকারীর পরাধীনতাকে স্বীকার করার মতো ট্র্যাজিক কাহিনীর মধ্যে আমরা ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্তের জাতীয়ভাবনার প্রচার করার মনোভাব লক্ষ করি। তিনি এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে যেন স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা, একতা, একনিষ্ঠতার মত অনেকগুলি প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন।

স্বাধীনতার প্রতি আকাঙ্ক্ষা ঃ

উনিশ শতকের বাঙালী পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ। লেখক বাঙালীর এই পরাধীনতার সময়ে প্রতাপ সিংহের মত একজন স্বদেশী স্বাধীনচেতা বীরের উপাখ্যান পাঠকের নিকট তুলে ধরেন। শত কষ্ট হলেও স্বাধীনতা নামক অমূল্য রত্নটির সুরক্ষা উপন্যাসটির মূল আবেদন। সেসময়ের সচেতন বাঙালী এর থেকে প্রেরণা পাবে না এমন কথা বলা ঠিক হবে না। কেননা, সাহিত্য রসিক সচেতন বাঙালী উপন্যাস পাঠ করে বেদনা অনুভব করতে বাধ্য। উপন্যাসের ট্র্যাজিক পরিণতি পাঠ করে পাঠকের সমকালের পরাধীনতার কথা মনে হবে। অতএব 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'র কাহিনী উনিশ শতকের বাঙালীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে পরোক্ষে জাগিয়ে তোলায় মহৎ প্রেরণা দিয়েছিল — এমন মন্তব্য করা চলে।

একতা ঃ

স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা করলেই যে তা মিলবে এমন নয়। তার জন্য চাই দৃঢ় সংঘবদ্ধতা। মহারাণা প্রতাপ সিংহকে সহযোগিতা করার জন্য 'চন্দাওয়ৎকুলেশ্বর সালুম্ব্রাধিপতি' দেবগড়ের 'সাঙ্গাওৎকুলেশ্বর', বেদনোরের 'মৈর্ত্তকুলেশ্বরগণ', কৈলওয়ারের 'জগাওয়ৎকুল' এছাড়া 'ঝালাকুল', 'চোহানকুল', 'প্রমরকুল' প্রমুখ রাজপুতবীর ও বীর রাজপুতকুল বিদেশী শত্রু মুঘলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন। এই উপন্যাসে একতার আরো পরিচয় পাওয়া যায়, তেজসিংহ ও দুর্জ্জয়সিংহের ব্যক্তিগত শত্রুতা সাময়িকভাবে ভুলে জাতীয় সংকটের মোকাবিলা করা। তেজ সিংহ শত্রু দুর্জ্জয়সিংহকে বরাহের আক্রমণ থেকে প্রাণ রক্ষা করেন। তেজসিংহ বলেন; —"দুর্জ্জয়সিংহের জীবন রক্ষা করা রাজপুতের বিশেষ কর্ত্তব্য, কেননা, তিনি যোদ্ধা, মেওয়ারের এই বিপদকালে

তিনি স্বজাতির উপকার করিতে পারেন।"(৬৯) তেজসিংহ স্নেহ করে প্রাণ রক্ষা করতে যান নি। দুর্জ্জয়সিংহ বীর, তাঁর বীরত্ব প্রতাপসিংহের কাজে আসবে। আরো স্পষ্ট করে বলা যায়, দুর্জ্জয়সিংহ তেজসিংহের শত্রু হলেও জাতিকে বিদেশী শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য দুর্জ্জয় সিংহের বীরত্ব বিশেষ প্রয়োজন। তেজসিংহের কাছে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে জাতীয় স্বার্থ অনেক বড়। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা'য় লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত রাজপুতের সংঘবদ্ধতার পরিচয় দিয়ে সমকালের জাতীয় স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

একনিষ্ঠতা ঃ

স্বাধীনতা রক্ষা বা অর্জনের জন্য চাই নিষ্ঠাশক্তি। প্রতাপসিংহের এবিষয়ে অসম্ভব নিষ্ঠা ছিল। তিনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করেছিলেন। এই নিষ্ঠা শক্তির পরিচয় তেজসিংহ, দুর্জ্জয়সিংহ, চারণদেবী, মন্ত্রী ভামাশাহ প্রমুখ চরিত্রের ছিল। রাণা প্রতাপসিংহ যখন সর্বস্বান্ত, স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য নতুন উদ্যমে যখন যুদ্ধ করা একান্ত জরুরি, ঠিক তখন মন্ত্রী ভামাশাহ তাঁর বংশানুক্রমিক সঞ্চিত ধন স্বদেশের জন্য উৎসর্গ করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়;—"মহারাণা! এ দাস প্রভুকে ধন দিতেছে না, মেওয়ার রক্ষার্থ মেওয়ারকে দিতেছে, ...মেওয়ারের জন্য আপনারা শোণিত দিতেছেন, আমি তুচ্ছ ধন দিতে কুণ্ঠিত হইব?(৭০) এ ধরণের মহৎ ত্যাগ বা স্বাধীনতার প্রতি নিষ্ঠতার প্রসঙ্গ সমকালের বাঙালী পাঠককে যে সুগভীর ভাবাবে এ বিষয়ে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না।

আমরা লক্ষ করব, জাতির সমস্ত প্রকার দুর্বলতা, সংকীর্ণতা প্রভৃতি মোচনের জন্য ভারতীয় দর্শনের অবতারণার ইতিবৃত্ত। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জাতির মুক্তির জন্য ভারতীয় পুরাণ থেকে তত্ত্বের অবতারণা করেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল জাতির পরিপূর্ণ উন্নতির জন্য ভারতীয় দর্শন বেশ কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবে। তাঁর 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'-এ ভারতীয় দর্শন — জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের উপন্যাসরূপ। এবার বাঙালী জীবনে এই উপন্যাস তিনটির দার্শনিক তত্ত্বের ভূমিকা আলোচনা করা হবে।

'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ঃ

'আনন্দমঠ' বাংলা সাহিত্যের একটি বিখ্যাত উপন্যাস। এখানে ১১৭৬-এর মন্বন্তর, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, এদেশে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার মতো কিছু ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'কে ঐতিহাসিক উপন্যাসের স্বীকৃতি দিতে চান নি। তাঁর ভাষায়;—"আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কি না ...ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভান করি নাই।"(৭১) অর্থাৎ লেখকের মন ঐতিহাসিক রস সৃষ্টির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। প্রশ্ন জাগতে পারে, তিনি পাঠকমহলে কি বার্তা পৌছোতে চেয়েছিলেন?

দেশমাতৃকা বিপন্না। ভবানন্দ বলেন;—"দেশের রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, কুল গেল, এখন ত প্রাণ পর্য্যন্তও যায়।"(৭২) দেশের অরাজকতা দূরীকরণের জন্য 'সন্তানদল' সংগঠিত হয়েছে। উদ্দেশ্য অরাজকতা সৃষ্টিকারী শাসকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য তাঁদের যাবতীয় উদ্যোগ। আনন্দমঠের 'সন্তানদল' দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের যে মহৎ উদ্যোগ নিয়েছেন, তার জন্য চাই একাগ্রতা। একাগ্রতা বা নিষ্ঠার অভাব 'সন্তানদলে'র সদস্যদের ছিল না। ভবানন্দ বলেন;—'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।"(৭৩) যদি কোন সার্থক আদর্শমন্ত্র পাওয়া না যায় তাহলে এই একাগ্রতা বা নিষ্ঠা কিন্তু দীর্ঘদিন স্থায়ী নাও হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশ সেবার জন্য প্রথমে একাগ্রতার আদর্শ ব্যক্ত করেন। উপন্যাসের সূচনাতেই তিনি 'ভক্তি'র কথা বলেন। এ ভক্তি ঈশ্বরের প্রতি নয়, স্বদেশের প্রতি ভক্তি। দেশমাতৃকার প্রতি এই ভক্তি গভীর তাৎপর্য বহন করে। এদেশের মানুষ ঈশ্বরকে যে স্বার্থগন্ধশূন্য ভক্তি করেন দেশের মুক্তির জন্য চাই প্রথমে সেই জাতীয় ভক্তি। আত্মবিসর্জনের চেয়ে ভক্তির শক্তি অনেক বেশী। প্রাণ বিসর্জন মানে একটা শক্তির ইতি কিন্তু ভক্তির সক্রিয়তার শেষ নেই। 'আনন্দমঠ'-এর 'উপক্রমণিকা'য় প্রাণ ত্যাগ বা আত্মবিসর্জনের চেয়ে ভক্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে। দেশসেবার জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুটি কি? আনন্দমঠে এ প্রশ্নের উত্তর — 'ভক্তি'।

দেশ সেবার জন্য আর একটি প্রয়োজনীয় আদর্শ হল কর্ম। এ কর্ম সকাম নয়, নিষ্কাম কর্ম। নিষ্কাম কর্ম হল নিস্বার্থভাবে কাজ করে যাওয়া, সেখানে ফলের আশা থাকবে না। সব কিছুই ঈশ্বরে সমর্পণ করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এ 'গীতা'র নিষ্কাম তত্ত্বকে আদর্শ হিসাবে প্রচার করেছেন। কেননা — দেশকে মা ভেবে দেশের অনিষ্টকারীকে তাড়াতে হবে। এ কাজ খুব সহজ নয়। এর জন্য চাই — ইন্দ্রিয় দমন, পরিবার পরিজনের প্রতি আসক্তি ত্যাগ প্রভৃতি সমস্ত প্রকার কামনা বাসনা বিসর্জন। এরকম সংকল্পবদ্ধ হলে জাতীয় মুক্তি আসতে বাধ্য। উপন্যাসে শান্তি, কল্যাণী ও মহেন্দ্র এই অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অন্যদিকে জীবানন্দ ও ভবানন্দ মাঝপথে ব্যর্থ হলেও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা নিষ্কামকে অনুসরণ করেছেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের দ্বারা সমকালের পাঠককে নিষ্কাম ভাবে দেশসেবার আবেদন জানিয়েছেন।

জাতীয় মুক্তির জন্য জ্ঞান একটি মূল্যবান উপাদান। জ্ঞানের দু'টি অংশ — অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান ও বহির্বিষয়ক জ্ঞান। সমকালে এদেশে একটি বর্তমান ছিল। কিন্তু জাতীয় মুক্তির জন্য চাই অন্তর্বিষয়ক ও বহির্বিষয়ক জ্ঞান। অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান ভারতবর্ষীয় অধ্যাত্ম জ্ঞান ও বহির্বিষয়ক জ্ঞান হল পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের জ্ঞান। জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পাশ্চাত্য জ্ঞান জরুরি। এবং বলা হয়েছে এই জ্ঞান লাভের জন্য এদেশে ইংরেজ রাজত্ব জরুরি। আসলে ইংরেজ রাজা হলে ইংরেজ সংস্পর্শে থেকে ইংরেজের কাছ থেকে বিজ্ঞান শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ তৈরী

হবে। সেজন্যই লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এবং উপন্যাসের দেবতুল্য চরিত্র 'মহাপুরুষ' —ইংরেজকে রাজা করার প্রশ্নে সমর্থন করেছেন। এতে স্বদেশ সাময়িকভাবে পরাধীন হলেও জাতীয় মুক্তির জন্য একটি সুদূরপ্রসারী ইতিবাচক ভাবনা রয়েছে। উপন্যাসে মহাপুরুষ বলেছেন;—"ইংরেজ বহির্ব্বিষয়ক জ্ঞানে সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব।"[৭৪] উল্লেখ করা হয়েছে ইংরেজের এই রাজত্বলাভ সাময়িক। তিনি বলেছেন;—"ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না।...যত দিন তা না হয়, ...তত দিন ইংরেজরাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"[৭৫] 'আনন্দমঠ' রচনাকালে অনেক বাঙালী তথা ভারতবাসীও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের চর্চা ও অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানের সাধনা, সনাতন ধর্ম্মের প্রচারে মনোযোগী ছিলেন। অতএব 'আনন্দমঠ' উপন্যাসেই যেন ইংরেজ রাজত্বের সমাপ্তি ঘণ্টা ধ্বনিত হয়েছে — সে দিনের পাঠকের এই বিষয়টি বুঝতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি।

অতএব 'আনন্দমঠ'-এর আবেদন ঐতিহাসিক রসে সীমাবদ্ধ নয় দেশসেবার আদর্শ প্রচারের ভাবনায় প্রসারিত। লেখকের সে আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়নি। পরাধীন ভারতের মুক্তির জন্য 'আনন্দমঠ' কতখানি ভূমিকা নিয়েছিল, তার সামান্য পরিচয় পাওয়া যাবে 'আনন্দমঠ'-এ 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিটি ভারতের স্বাধীনতা হরণকারী বৃটিশ রাজত্বের শক্ত ভিতকে নাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে।

দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) :

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দেবীচৌধুরাণী'তে সামাজিক ও ঐতিহাসিক উভয় প্রকার পটভূমি রয়েছে। কিন্তু 'দেবীচৌধুরাণী'কে লেখক ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিতে চান নি। তাঁর ভাষায়;—"পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক 'আনন্দমঠ'কে বা 'দেবীচৌধুরাণী'কে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' বিবেচনা না করিলে বাধিত হইব।"[৭৬] তাহলে বলতেই হয়, উপন্যাসটির পরিকল্পনায় লেখকের অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল।

'দেবীচৌধুরাণী'তে অসংখ্য সামাজিক বা পারিবারিক প্রসঙ্গ আছে। প্রফুল্ল সামাজিক বয়কটের কারণে স্বামী সংসার থেকে বর্জিত। আর সেই প্রফুল্ল পরবর্তীকালে দেবী চৌধুরাণী হয়েও স্বামী ও সংসার ত্যাগ করতে পারে নি। উদ্দেশ্যপ্রবণ লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক তথা পারিবারিক কথার মধ্যে তাঁর মূল বক্তব্যকে কৌশলে ব্যক্ত করেছিলেন। সংসারত্যাগী নয়, বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন এই সংসারে থেকেও গীতার নিষ্কাম তত্ত্বের অনুশীলন সম্ভব। আসলে তিনি সামাজিক কথার খোলসে ইতিহাসের পটভূমিতে নিষ্কাম তত্ত্বেরই অবতারণা করে পাঠকের জীবনের মান উন্নত করতে সচেষ্ট ছিলেন। উপন্যাসের প্রধান সমস্যা জমিদার ও তার কর্মচারীদের নিষ্ঠুর অত্যাচার দমনের প্রয়াস। ভবানী পাঠকের ভাষায়;—"এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের

পালন করি।"[৭৭] একাজ মহৎ ও শ্রদ্ধেয় কিন্তু অত্যাচারীর হাত থেকে দেশকে রক্ষা করা কঠিন কাজ। তাই দেশসেবার পথাদর্শ সাধারণ মানের হতে পারে না। এর জন্য চাই বহু পরীক্ষিত পথাদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষিত একটি আদর্শ খুঁজে পেয়েছেন ভারতীয় পুরাণ গ্রন্থে। ঈশ্বর সর্বভূতে থাকেন। সর্বভূতে সেবা করাই ধার্মিক ব্যক্তির কাজ। দেশের মানুষও সর্বভূতেরই অন্তর্ভুক্ত। অতএব দেশের সুখ শান্তি হরণকারীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা অন্যায় নয়। এরকম বীজমন্ত্র নিয়ে দেশসেবায় রত হলে সাফল্য আসবেই। সমকালীন পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের এই দর্শন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দর্শন বাঙালী পাঠককে তার কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে সচেতন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

'দেবীচৌধুরাণী' উপন্যাসে পতিভক্তি, পিতৃভক্তি, নারীর আদর্শ প্রভৃতি সামাজিক নীতি আদর্শের বিষয়েও আলোকপাত রয়েছে। এই আদর্শ একান্ত ভারতীয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সব নীতি ও আদর্শের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। আমরা উপন্যাসেই পতিভক্তি, পিতৃভক্তি ও নারীর আদর্শ বিষয়ে নীতি-উপদেশের পরিচয় পাই।

পতিভক্তি ঃ

ভারতীয় দর্শনে স্বামী সুগভীর শ্রদ্ধার পাত্র। তাতে সংসার শান্তির ধাম হয়ে উঠে। এ বিষয়ে প্রফুল্লকে দৃষ্টান্ত করে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বলেন;—

> "ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃদয় পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ; স্বামী আরও পরিষ্কার রূপে সান্ত। ...তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ হিন্দুর সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।"[৭৮]

তাই প্রফুল্ল দেবীচৌধুরাণী হয়েও পতিকে ভুলতে পারে নি। স্বামী ব্রজেশ্বরকে বলেছে—"তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার অর্চ্চনা শিখিয়াছিলাম — শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ — তুমিই একমাত্র আমার দেবতা।" [৭৯] এখানে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভারতীয় 'পতিপরমগুরু' নামক নীতিকথাকে প্রফুল্লচরিত্রের দ্বারা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

পিতৃভক্তি ঃ

উপন্যাসে পিতৃভক্তির সার্থক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। পিতার আদেশে অন্যায় কারী সাহেবের নিকট ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গে ব্রজেশ্বর বলে;—"সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা আমরা কখনও লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে জোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।" [৮০] এদেশে পিতার সম্মুখে বলবান যুবক পুত্ররাও সামান্য নাবালক। এই প্রসঙ্গে লেখক বলেন;—"ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ

বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মুর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।"[৮১] প্রথমা স্ত্রী প্রফুল্লের প্রতি অবিচার করেন ব্রজের পিতা। কিন্তু ব্রজ কোনদিনও স্ত্রীর পক্ষ হয়ে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করে নি। আসলে ব্রজ ভারতীয় শাস্ত্রে পিতৃভক্তির বিষয়ে গভীর বিশ্বাসী ছিল। সে জানত;—

পিতাস্বর্গঃ পিতাধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।

পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতা।।"[৮২]

—এ যেন উনিশ শতকের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বিশ্বাসী সন্তানদের প্রতি আত্মশোধনের জন্য আন্তরিক আবেদন।

নারীর কর্তব্য ঃ

সংসারে শান্তির বাতাবরণ সৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সংসারে প্রতিটি সদস্যের মুখে হাসি ফোটাতে নারীর তুলনা নেই। সর্বাগ্রে স্বামীকে প্রসন্ন করা নারীর অন্যতম ধর্ম। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "গৃহিণী ব্যঞ্জনহস্তে ভোজন—পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারী ধর্ম্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম্ম লোপ করিতেছে? ...হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?"[৮৩]

কিংবা প্রফুল্লের ঘোমটা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সে কালের মেয়েরা এ কালের মেয়েদের মত নহে—ধিক্ এ কাল।"[৮৪] বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয় নারীর এসব রীতি নীতি, আদর্শকে ও গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু উনিশ শতকে পাশচাত্য শিক্ষায় অনেক নারীপুরুষ এইসব পুরোনো ধ্যান ধারণাকে নিছক গুরুত্বহীন মনে করতেন। সেজন্যই ঔপন্যাসিক আধুনিক নরনারীর প্রতি, আধুনিক কালের প্রতি অনেকটা অসন্তুষ্ট। তাঁর কাছে একালের নারীর সার্থক আদর্শ 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল। প্রফুল্ল নিজেকে সংসারে সবার মধ্যে বিলিয়ে দেবার ক্ষমতা নিয়ে বলেছে;—

> "কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম: ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর, স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন ? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য ?" [৮৫]

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের মাধ্যমে বাংলা তথা দেশের ঘরে ঘরে প্রফুল্লের মতো সর্বংসহা নারী কামনা করেছেন, যাতে প্রতিটি গৃহ হয়ে উঠে শান্তির পবিত্র আশ্রম।

'সীতারাম' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ উপন্যাস। বঙ্কিমচন্দ্র এ গ্রন্থের উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গে বলেছেন;—"সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি । এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।"(৮৬) লেখকের প্রত্যক্ষ স্বীকারোক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়;— 'সীতারাম'-এর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে। অনুসন্ধান করলে 'সীতারাম' উপন্যাসে ভারতীয় দর্শন, জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির প্রতি দরদের পরিচয় পাওয়া যায়।

ভারতীয় দর্শনের অবতারণা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন, ভারতীয় দর্শন সমকালের জরাগ্রস্ত জীবনে মুক্তি আনতে পারে। বলা চলে সীতারাম ভারতীয় দর্শনের উপন্যাস রূপ। উপন্যাসটির পরিণতি বিষাদময়। সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, যে মহৎ আদর্শ ভারতীয় দর্শনে আছে তাকে সঠিক অনুসরণ না করার ফল উপন্যাসে অত্যন্ত বেদনাদায়ক হয়েছে। বলা যায় — উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্র কাম, ক্রোধ, অহংকার প্রভৃতির দ্বারা চালিত হওয়ায় উপন্যাসের পরিণতি মর্মান্তিক হয়েছে।

শ্রী, সীতারামের পত্নী। স্বামীর মঙ্গলের জন্য স্বামীর থেকে সে দূরত্ব বজায় রেখেছে। সে গীতার অনাসক্ত ধর্মের আদর্শে নিজেকে গড়ে তুলেছে। হিন্দুকুলরক্ষক সীতারাম তার প্রতি ক্রমশ আসক্ত হলে সে নিজ দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে। সে স্বামী সীতারামকে বোঝাতে চেয়েছে;— "ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন। ঈশ্বরে প্রীতিই জীবের সুখ বা ধর্ম্ম। তাই সর্ব্বভূতকে ভালবাসিবে। ...তবে যে, কেহ ভালবাসিলে আমরা সুখী হই, সে কেবল মায়ার বিক্ষেপ।"(৮৭) কিংবা "আমি তোমার সহধর্ম্মিনী — আমার সঙ্গে ধর্ম্মাচরণ ভিন্ন অধর্ম্মাচরণ করিও না। ধর্ম্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম্ম। ইন্দ্রিয়তৃপ্তি পশুবৃত্তি। পশুবৃত্তির জন্য বিবাহের ব্যবস্থা দেবতা করেন নাই । পশুদিগের বিবাহ নাই। কেবল ধর্ম্মার্থেই বিবাহ।"(৮৮) কিন্তু রাজা সীতারাম কোন মতেই বুঝবার পাত্র নন। রাজ্যের সর্বনাশ হতে দেখে জয়ন্তী শ্রী'কে স্ত্রীর কর্তব্য পালন করতে বলেছেন;—"রাজধানীতে যাও। রাজপুরীমধ্যে মহিষী হইয়া বাস কর। সেখানে রাজার প্রধানমন্ত্রী হইয়া তাহাকে সধর্ম্মে রাখ। এ তোমারই কাজ।"(৮৯) শ্রী তার কর্তব্য পালন করতে পারেনি । সে রাজার প্রতি ক্রমশ আসক্ত হয়ে পড়েছিল। তাই শ্রী বলেছে;—"পলায়ণ ভিন্ন ত আর উপায় দেখি না। ..রাজাকে রাত্রিদিন দেখিতে দেখিতে অনেক সময় মনে হয়, আমি গৃহিণী, উহার ধর্ম্মপত্নী।"(৯০) অর্থাৎ শ্রী তার সমস্ত আদর্শ ভুলে সীতারামের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজ্যবাসীর অমঙ্গল সাধন করেছে।

জয়ন্তী সন্ন্যাসিনী। তাঁর সুখদুঃখ ভালমন্দ সবই শ্রীকৃষ্ণের চরণে সমর্পিত। এককথায় তিনি অনাসক্ত।

মনের গোপনে কোন এক স্থানে এরই জন্য ছিল তাঁর অহংকার। জয়ন্তী নিরহংকার মনে ঈশ্বরকে সবকিছু সমর্পন করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্র 'লজ্জা'র প্রসঙ্গে জয়ন্তীর অহংকারকে নিপুণভাবে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। বিবেকদংশনগ্রস্ত জয়ন্তী বলেছেন;—"...মনে করিয়াছিলাম, বুঝি এপৃথিবীর সকল সুখদুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, কিন্তু হে দর্পহারী! আমার দর্প চূর্ণ হইয়াছে, আমায় আজ রক্ষা কর।"(৯১)

অবাঞ্ছিত কাম, ক্রোধ, প্রভৃতিকে পরিহার করার কথা ভারতীয় দর্শনে বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে এই বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি 'সীতারাম' উপন্যাসেও সীতারাম ও গঙ্গারামের ইন্দ্রিয় অসংযমের চিত্র অঙ্কন করে জাতীয় বিপর্যয় দেখিয়েছেন। সীতারাম তাঁর স্ত্রী শ্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে সমস্ত কর্তব্যকর্ম ত্যাগ করলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। পরিণামে সম্ভাবনাময় বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। গঙ্গারাম রাজার বিশ্বস্ত কর্মচারী। প্রভুপত্নী রমা দেবীর প্রতি মোহগ্রস্ত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে, যার পরিণাম — সীতারামের সর্বনাশের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের সোনালী ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়।

জনমানসের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ঃ উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালীর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা উপন্যাসে ধরা পড়েছে। 'সীতারাম' উপন্যাসে গঙ্গারামের মৃত্যুদণ্ডের প্রসঙ্গে চন্দ্র চূড়ের মন্ত্রণায় জনমানসের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যার ফল প্রজা, বণিক, নাগরিক সবার স্বপ্নের স্বাধীন 'মহম্মদপুর' নগরের প্রতিষ্ঠা হয়।

স্বদেশের আচর সংস্কৃতির প্রতি দরদ ঃ

'সীতারাম'-এ দেশীয় আচার সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে। এদেশে শরণাগতকে রক্ষা করা কর্তব্য কর্ম। বিপদগ্রস্ত গঙ্গারামকে উদ্ধার করতে গিয়ে সীতারাম বলেছে;—"এ আমার ভ্রাতার অপেক্ষা, পুত্রের অপেক্ষাও আত্মীয়; কেন না, আমার শরণাগত। হিন্দু শাস্ত্রের বিধি এই যে, সর্ব্বস্ব দিয়া, প্রাণ দিয়া শরণাগতকে রক্ষা করিবে।"(৯২)

উপন্যাসে ললিত গিরির মতো দেশীয় প্রাচীন ভাস্কর্য শিল্পের সূক্ষ্ম শিল্পকর্মের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র গর্বিত। শুধু তাই নয়, এদেশের সম্পদ রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষৎ, বেদ-বেদান্ত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, সাংখ্য, পতঞ্জল, বৈশেষিক, পাণিনি প্রভৃতি কাব্য, দর্শন, নাটক ব্যাকরণ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।"(৯৩)

'সীতারাম'-এ ভারতীয় দর্শনের — স্বামী ও স্ত্রী পারস্পরিক কর্তব্য, দেশের প্রতি দায়বদ্ধতা, ইন্দ্রিয় সংযমতা, ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান প্রভৃতি তত্ত্বকথায় পূর্ণ। উক্ত দেশীয় দর্শন সঠিকভাবে অনুসরণ না করায়

উপন্যাসে বিষাদময় পরিণতির সৃষ্টি হয়েছে।

মানুষ সামাজিক জীব। সামাজিক রীতি নীতি সংকীর্ণ হলে সুস্থভাবে বাঁচা অসম্ভব। উনিশ শতকের সামাজিক উপন্যাসে সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য ঔপন্যাসিক সচেষ্ট ছিলেন। আমরা উনিশ শতকের উপন্যাসে সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য লেখক তথা ঔপন্যাসিকের ভাবনার অনুসন্ধান করব। এই সময়ে সমাজ বিষয়ক উপন্যাসে সমাজের নানান বিষয়ের পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের অবতারণা ছিল। অর্থাৎ ঔপন্যাসিক তাঁর সামাজিক উপন্যাসকে ভালমন্দের নক্সা চিত্রে পরিণত করেছিলেন। মন্দ বিষয় ত্যাগ করে ভাল বিষয়টি গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে লেখক দেশীয় সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দিতেন। এই সময়ের সচেতন বাঙালী সমাজের মঙ্গলের জন্য স্ত্রীশিক্ষাহীনতা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি সমাজের কুসংস্কারকে বর্জন করার পক্ষপাতী ছিলেন। সমকালীন ঔপন্যাসিকও সচেতন বাঙালীর প্রগতিশীল উক্ত একাধিক ভাবনার অংশীদার ছিলেন। তাঁদের লেখায় বাঙালী সমাজকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করার জন্য ইন্দ্রিয় সংযমতা অবলম্বন, যৌথ পরিবারের প্রতি সমর্থন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রোধ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নীতি উপদেশ ছিল। যে নীতি উপদেশ সমকালীন পাঠককে আত্মসচেতন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছিল। উনিশ শতকের বিখ্যাত কিছু সামাজিক উপন্যাসের আলোচনা করে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা হবে।

এই শতকের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাসের সংখ্যা খুব কম। আমরা সেজন্যই ক্ষেত্রবিশেষে 'চন্দ্রশেখর'-এর মতো রোমান্সমূলক উপন্যাস বা 'দেবীচৌধুরাণী'র মতো তত্ত্বমূলক উপন্যাসের সামাজিক অংশে সমাজগঠন সম্বন্ধে লেখকের মনোভাবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করব।

সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনের জন্য চাই উপযুক্ত পরীক্ষিত নীতি আদর্শ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাসে পরীক্ষিত নীতি আদর্শের উপস্থাপনা করেছেন।

'বিষবৃক্ষ' সামাজিক নীতি উপদেশমূলক উপন্যাস। আমরা জানি, বিষ জীবননাশক, সতর্কতার সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। সমাজেও কিছু ভয়ঙ্কর বিষ আছে, যা জীবনকে অসহ্য যন্ত্রণাময় করে তোলে। লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সে বিষ হল;—

"যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে

উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকাম ক্রোধাদির অস্পৃশ্য। জ্ঞানী ব্যক্তিরাও ঘটনাধীনে সেই সকল রিপুকর্ত্তৃক বিচলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু মনুষ্যে মনুষ্যে প্রভেদ এই যে, কেহ আপন উচ্ছলিত মনোবৃত্তি সকল সংযত করিতে পারেন এবং সংযত করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি মহাত্মা; কেহ বা আপন চিত্ত সংযত করে না, তাহারই জন্য বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হয়। চিত্ত সংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি।"[৯৪]

অর্থাৎ কাম-ক্রোধ-লোভ-লালসা প্রভৃতি রিপুকে সংযমের দ্বারা দমন করা উচিত। সংযমতার ক্ষেত্রে কোনরকম আপস করলে জীবন হয়ে উঠে বিষময়। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে সংযমতার অভাবে বিভিন্ন চরিত্রের করুণ পরিণতি লক্ষ করা যায়। উপন্যাসের সূচনায় আমরা দেখি নায়ক নগেন্দ্র দাম্পত্য জীবনে সুখী। সে পরহিতৈষী, দয়াবান প্রভৃতি নানা গুণে গুণী। অনাথিনী কুন্দনন্দিনীর সমস্ত দায়িত্ব নিয়েছে। কুন্দনন্দিনীর বিয়ে দিয়েছে, বিধবা হলে গৃহে ঠাঁইও দিয়েছে। কিন্তু একজন আদর্শ পুরুষের সংযমতার দ্বারা অন্য নারীর সঙ্গে যে দূরত্ব রাখা উচিত ছিল, নগেন্দ্র সে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছে। কুন্দনন্দিনীকে বলেছে;—

"শুন কুন্দ! আমি বহু কষ্টে এত দিন সহ্য করিয়াছিলাম, কিন্তু আর পারিলাম না।...আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আপনি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছি। ইতর হইয়াছি, মদ খাই। আর পারি না। তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি না। শুন, কুন্দ! এখন বিধবা বিবাহ চলিত হইতেছে — আমি তোমাকে বিবাহ করিব।"[৯৫]

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের পক্ষে মত দিয়েছিলেন এদেশের অল্পবয়স্ক বিধবা মেয়েদের মানবিক মূল্য প্রতিষ্ঠার জন্য। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে নগেন্দ্রের কাছে মানবিকতা বড় নয়, বড় হয়ে উঠেছে হাতের কাছে কুন্দনন্দিনীর রূপ যৌবন ভোগাকাঙ্ক্ষা। বিধবা কুন্দনন্দিনীও চিত্ত সংযমের পরীক্ষায় ব্যর্থ। কুন্দের মা নগেন্দ্রের বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে বলেছিল;—'ইহার দেবকান্তরূপ দেখিয়া ভুলিও না।"[৯৬] কিন্তু কুন্দ মায়ের সতর্কতার কথাটি ভুলে নগেন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অনুরাগের মুহূর্তে বলেছে;—

"আচ্ছা, নাম মুখে আনিতে পারি না কেন? এখন ত কেহ নাই—কেহ শুনিতে পারে না। একবার মুখে আনিব? কেহ নাই মনের সাধে নাম করি...আচ্ছা সূর্য্যমুখীর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি আমার সঙ্গে হতো"[৯৭]

বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের সুপথে পরিচালিত করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। চিত্ত সংযমতার অভাবে জীবন অনেক সময় ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে। তাই 'রাগদ্বেষ কাম ক্রোধাদি'র সংযম করা উচিত। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে প্রধান ও গৌণ চরিত্রগুলি রিপুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জীবনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। শেষ পর্যন্ত নগেন্দ্র কৃতকর্মের

জন্য বিবেকদংশনগ্রস্ত হয়েছে, কুন্দনন্দিনী বিষপানে আত্মহত্যা করেছে, সূর্য্যমুখী ব্যথাতুর হয়েছে, দেবেন্দ্র কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, হীরাদাসী হয়েছে বিকৃত মস্তিষ্ক। উপন্যাসের শেষে তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন;—"আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি, ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফলিবে।"(৯৮) বঙ্কিমচন্দ্রের এই সমাপ্তি-বাক্যের সূত্র ধরে আমরা বলতে পারি চিত্ত সংযমতা বজায় রাখার আন্তরিক পরামর্শমূলক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ', যা পালন করলে স্বদেশের প্রতি ঘরে শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করবে।

'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮)-এর আবেদন 'বিষবৃক্ষ'-এর সমজাতীয়। এখানেও চিত্তসংযমতার অভাবে উন্নত ও আদর্শবাদী চরিত্রের অধঃপতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। রোহিনী রূপবতী কিন্তু বিধবা। স্ত্রী ভিন্ন অন্য রূপবতীর প্রতি দূরত্ব রাখা বিবাহিত পুরুষের কর্তব্য। গোবিন্দলাল আদর্শবাদী হয়েও রোহিনীর রূপ যৌবনে ক্রমশ আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। স্ত্রী ভ্রমরের প্রতি কর্তব্য পালনে বিরত হয়ে অসংযমী জীবনকে বেছে নেয়। এদিকে রোহিনীও যৌবনকে বা ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করার জন্য গোবিন্দলালের নিকট ধরা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোকশিক্ষার জন্য 'কৃষ্ণকান্তের উইল' লিখেছেন, একথা কখনো ভোলেন নি। গোবিন্দলাল ও রোহিনীর অসংযমী ও অরুচিকর জীবনচরিত্রের বিষয়ে বলেন;—"এইখানে যবনিকা পতন করিতে ইচ্ছা হয়। যাহা অপবিত্র, অদর্শনীয়, তাহা আমরা দেখাইব না—যাহা নিতান্ত না বলিলে নয়, তাহাই বলিব।"(৯৯) লেখক মনে করেন, এই উপন্যাস মানুষের অসংযমী জীবনাচরণের বিরুদ্ধে কথা বলবে। তাই উপন্যাসে কুরুচিকর চিত্র থাকা ঠিক নয়। উপরোক্ত মন্তব্যের প্রাসঙ্গিকতা সেজন্যই।

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের বিষাদময় পরিসমাপ্তি পাঠককে ভারাক্রান্ত করে কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ বঙ্কিমচন্দ্র বিষাদময়তাকে জয় করার রাস্তা দেখিয়েছেন। উপন্যাসে গোবিন্দলাল তার কৃতকর্মের জন্য যখন বিবেকদংশনগ্রস্ত, অপরাধবোধ যখন তাকে হতাশ করেছে, বিষাক্ত মন যখন বাঁচার কোন অর্থ খুঁজে পায় নি, ঠিক তখনই গোবিন্দলালের জন্মান্তর হয়েছে। সে বলেছে;—"ভগবৎ-পাদপদ্মে মনঃস্থাপন ভিন্ন শান্তি পাইবার আর উপায় নাই। এখন তিনি আমার সম্পত্তি—তিনিই আমার ভ্রমর—ভ্রমরাধিক ভ্রমর।"(১০০) —গোবিন্দলাল সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণের চরণে অর্পণ করে 'গীতা'র আদর্শে বাঁচার পথ খুঁজে পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ চিত্ত সংযমের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শেষে নিরাশাগ্রস্ত মানুষের প্রায়শ্চিত্তের জন্য ঈশ্বরের প্রসঙ্গ এনেছেন।

'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) উপন্যাসের পটভূমি ঐতিহাসিক, কিন্তু সমস্যা সামাজিক। উপন্যাসের মূল কাহিনী চন্দ্রশেখর, শৈবলিনী ও প্রতাপের প্রণয় সমস্যা। কিন্তু লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদন ইতিহাসের পটভূমি উপস্থাপন বা চন্দ্রশেখর শৈবলিনী প্রতাপের ত্রিকোন প্রেম সমস্যাই নয়, পাঠককে তিনি চিত্তসংযমতা, পরোপকারিতা ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন।

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে রূপোন্মাদনা বা চিত্তচঞ্চলতা কাহিনীকে বিষাদময়তা এনে দিয়েছে। চন্দ্রশেখর বিদ্বান, মাতৃ বিয়োগের পর বিয়ের কথা ভেবেছিল। তার এই বিবাহ করার বাসনা জীবনের প্রয়োজনে নয়, জীবিকার প্রয়োজনে। চন্দ্রশেখরের প্রথম ভুল হয়েছিল এখানেই, কিন্তু প্রধান ভুল হল শৈবলিনীকে দেখে মোহগ্রস্ত হওয়ায়। লেখক চন্দ্রশেখরের মনের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন;—

> "চন্দ্রশেখর ভাবিলেন, বিবাহ করিলে কোন কোন দিকে সুবিধা হইতে পারে। ...শৈবলিনীকে দেখিয়া সংযমীর ব্রত ভঙ্গ হইল। ভাবিয়া, চিন্তিয়া, কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, অবশেষে চন্দ্রশেখর আপনি ঘটক হইয়া শৈবলিনীকে বিবাহ করিলেন। সৌন্দর্য্যের মোহে কে না মুগ্ধ হয়?"(১০১)

এখান থেকেই কাহিনীর জটিলতার সূত্রপাত। চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর মানবিক অনুভূতিকে তৃপ্তি দিতে পারে নি। সেজন্য শৈবলিনী বাল্যপ্রেমিক প্রতাপকে সরিয়ে স্বামী চন্দ্রশেখরকে মন দিতে পারে নি। শৈবলিনী প্রতাপের মধ্যে পৌরুষত্বের যে উদ্দামতার আঁচ পেয়েছে চন্দ্রশেখরের নিকট তা খুঁজে পায় নি। শৈবলিনী প্রতাপকে বলেছে;—"তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল?"(১০২) শৈবলিনীর চিত্ত চাঞ্চল্য তার জীবনকে বিষাদময় করে তুলেছে। পাশাপাশি প্রতাপ চরিত্রের আত্মসংযমী ও পরোপকারী মনোভাব লক্ষ করার মতো। চন্দ্রশেখরের সুখের জন্য প্রতাপ নিজ জীবন উৎসর্গ করতে চেয়েছে। কেননা, চন্দ্রশেখরের জন্যই প্রতাপের যা কিছু উন্নতি। শৈবলিনীকে নাগালের মধ্যে পেয়েও প্রতাপ আত্মসংযমীর পরিচয় দিয়েছে। সেজন্য উপন্যাসের শেষে রমানন্দস্বামী প্রতাপ সম্বন্ধে বলেছেন;—

> "ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান নহেন। যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়জয়ী হই।"(১০৩)

এখানে ইন্দ্রিয়জয়, চিত্তসংযম ও পরোপকারের মাহাত্ম্যগীত গেয়ে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র বলার চেষ্টা করেন যে, উক্ত গুণাবলী একজন আদর্শ পুরুষের নিকট খুবই জরুরি। যার ফলে সমাজ ও দেশ উপকৃত হয়।

আমাদের জীবন অনেক সময় নানা সমস্যায় অনন্ত দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে তা থেকে মুক্তির উপায় বলে দিয়েছেন। রমানন্দস্বামী ভারতীয় দর্শনের গূঢ় তত্ত্বকথাকে প্রকাশ করেন এইভাবে;— "সুখ দুঃখতুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই।"(১০৪) ভারতীয় দর্শনে সুখ ও দুঃখকে আলাদা করা হয় নি। কর্মযোগী, আত্মসংযমী, পরোপকারী ব্যক্তি যদি সুখ দুঃখের গণ্ডীতে আবদ্ধ হয় তাহলে তাঁদের নিঃস্বার্থ কর্ম আর বেশীদূর অগ্রসর হবে না। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র, রমানন্দস্বামীর মুখ দিয়ে ভারতীয় দর্শনের একটি দিক উদ্‌ঘাটন করিয়েছেন।

দর্শনটি হল;—"যেই পরোপকারী, সেই সুখী, অন্য কেহ সুখী নহে।"[১০৫] সুখের শীর্ষ চূড়া স্পর্শ করতে হলে পরোপকারী হতে হবে। তাতে এক অপার্থিব আনন্দ আছে। এই অপার্থিব আনন্দ আস্বাদনই সুখ। এই সুখে যিনি সুখী হচ্ছেন তার যেমন আনন্দ আছে তেমনি যার উপকার হচ্ছে তারও আনন্দ। এজাতীয় সুখে সুখী হবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে পাঠককে আবেদন জানিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'রজনী' (১৮৭৭) শিল্প ও নৈতিকতায় সমৃদ্ধ উপন্যাস। এই উপন্যাসে লেখক শিল্পকে তার নিজস্ব পথে চলতে দিয়েও লোকশিক্ষাকে বা নৈতিকতাকে ভোলেন নি। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ধারায় 'রজনী'তেই প্রথম চরিত্রের আত্মকথা প্রকাশের ভঙ্গি দেখা যায়। এতে উপন্যাস সাহিত্যে বৈচিত্র্য এসেছে। উপন্যাসটির মূল সমস্যা প্রণয়ঘটিত। অন্ধ যুবতী রজনীর অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনে প্রেমের সঞ্চার হওয়া উপন্যাসটিকে আকর্ষণীয় করেছে। রজনী ছাড়াও শচীন্দ্র, অমরনাথ ও লবঙ্গলতার জীবন সমস্যা, প্রণয় ঘটিত সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক ভাব উপন্যাসটির আস্বাদ বাড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র এতসব আয়োজন করেও লোকশিক্ষাকে গুরুত্ব সহকারে প্রয়োগ করেছেন। লেখক মনে করেন অসংযমতা বা অশ্লীলতা সুস্থ সমাজজীবনে বা পারিবারিক জীবনের পক্ষে অন্তরায়। অমরনাথ প্রথম জীবনে যৌবনের চঞ্চলতায় রূপবতী লবঙ্গলতার ঘরে প্রবেশ করেছিল। অমরনাথের এই একমাত্র ভুলই সারাজীবন তাকে দগ্ধ করেছে। সুস্বাস্থ্য, বয়স, বিদ্যা, ধনসম্পদ থাকা সত্বেও এই একমাত্র ভুলই সারাটা জীবনকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যেন অমরনাথ চরিত্র অঙ্কন করে পাঠক সাধারণকে এরকম ভুল না করার জন্য সচেতন করেন। অমরনাথের ভাষায়;—"এ সংসারসাগরে, কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব; দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।"[১০৬] অমরনাথের সব সর্বনাশের মূল যে লবঙ্গলতার কক্ষে প্রবেশের কলঙ্ক, তা অমরনাথ নিজেই বলেছে। অমরনাথের আবেদন এবং স্বীকৃতি পাঠককে নীতিবাদী করার জন্য — এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

লবঙ্গলতা বৃদ্ধ রসময় মিত্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। লবঙ্গলতা সংযমতা নিয়ে বৃদ্ধ স্বামীর ঘর করছে। অথচ অমরনাথের মতো সুপুরুষ একদিন তার নাগালের মধ্যে ছিল, কিন্তু সামাজিক নিয়মে আজ সে পরপুরুষ। সেজন্য হৃদয়ের কোন এক গোপনতম জায়গায় অমরনাথ বিরাজ করে। সামাজিক নৈতিকতাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে অমরনাথ লবঙ্গলতার প্রেম পায় নি। লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলেছে;—"তুমি আমার কে ? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে"[১০৭] লবঙ্গলতা এ জন্মে অমরনাথকে ভালোবাসতে পারে নি। কেননা, অমরনাথ পরপুরুষ। সংযমী মন নিয়ে লবঙ্গলতা অমরনাথের থেকে দূরত্ব তৈরী করেছে। সংযমতার কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে লবঙ্গলতা বলে — যে আমার স্বামী না হয়ে আমাকে কামনা করেছিল, সে মহাদেব হলেও আমার হৃদয়ে তার স্থান নেই। কেননা, লবঙ্গলতা ধর্মকে

বড় মনে করে। অমরনাথকে লবঙ্গলতা বলেছে;— "তোমাকে স্নেহ করিলে আমি ধর্ম্মে পতিত হইব।"(১০৮) লবঙ্গলতা ভারতীয় সমাজের পবিত্র ধর্মকে রক্ষা করার জন্য সংযমতার আশ্রয় নিয়েছে। ইন্দ্রিয় সুখ নয়, ইন্দ্রিয়কে সংযম করার বৃহৎ ও মহৎ আদর্শ, যা পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে শান্তির পথকে প্রশস্ত করে। লবঙ্গলতার চরিত্র ত্যাগের এক মহৎ আদর্শ, যা বেদনাবহ হলেও শ্রদ্ধাস্পদ।

লেখক বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবান ছিলেন। অন্ধ রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার মত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তা প্রকাশ পেয়েছে। বিষয়টি অলৌকিক, লেখক প্রকাশ্যে অলৌকিকতার দায় না নিলেও নীরব সমর্থন দেওয়া থেকে পিছিয়ে যান নি। আধুনিক শিক্ষিত শচীন্দ্রের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন;— "আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ।"(১০৯)

বঙ্কিমের 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী' উপন্যাসগুলি আলোচনা করে দেখা গেল লেখক অসংযমী, চিত্তচাঞ্চল্য প্রভৃতি রিপুগুলিকে দমন করার পরামর্শ দিয়েছেন। উপন্যাসের যে চরিত্রগুলি সংযমী, তারা লেখকের সমর্থন পেয়েছে। তাই তাঁর সামাজিক বা সমাজ সম্পর্কিত উপন্যাসে চরিত্রগঠন বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সমাজে অর্ধেক নারী ও অর্ধেক পুরুষ। অতএব নারী পুরুষের যৌথ চরিত্রগঠন বা চরিত্রগঠন বিষয়ে নীতিশিক্ষা তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, চরিত্রবান নারী-পুরুষ দেশের পক্ষে সম্পদ বিশেষ।

বঙ্কিমচন্দ্র নারী চরিত্রের মহৎ গুণাবলীকে শ্রদ্ধা করতেন। যে গুণাবলী পরিবার, সমাজ ও স্বদেশ গঠনে বিশেষ ভূমিকা নিতে পারে। তিনি 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর 'স্ত্রীলোকের রূপ'-এ মেয়েদের রূপচর্চার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে;—

> "রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে।...ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।...আমি শুনিতে চাই যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটি গুণে মহত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি।"(১১০)

তিনি রূপ চর্চার পরিবর্তে নারী চরিত্রের মহৎ গুণাবলীর বিকাশের উপরই জোর দিয়েছেন। মেয়েরা রূপচর্চা নিয়ে ব্যস্ত থাকলে সমাজ সমৃদ্ধ হবে না। নারী পরিণত হবে ভোগের বস্তুতে। তার পরিচয় হবে দাসী কিংবা বারাঙ্গনা, যা সমাজের পক্ষে কলঙ্ক। অতএব লেখক নারীকে তার মহৎ গুণাবলী বিকাশের পরামর্শ দিয়েছেন। 'রজনী' উপন্যাসের লবঙ্গলতা চরিত্রে নারীর মহৎ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। লবঙ্গলতা তার বৃদ্ধস্বামীকে

ভালবাসে, যা তার চরিত্রের সহিষ্ণুতার কথা মনে করিয়ে দেয়। অমরনাথ লবঙ্গলতার হৃদয়ে একটু জায়গা পেতে চেয়েছিল, কিন্তু পায় নি। লবঙ্গলতা বৃদ্ধ স্বামীকেই ভালবাসে, বৃদ্ধ স্বামীকেই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। এটাই ভারতীয় নারীর ধর্ম। এ বিষয়ে লেখকের সার্থক চরিত্র 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল। প্রফুল্ল যশ, মান, সম্পদ, রাজত্ব ও যাবতীয় সুখ-ঐশ্বর্য উপেক্ষা করে সাধারণ গৃহিণী হতে চেয়েছে। প্রফুল্ল বলেছে;—

> "এই ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়। কঠিন ধর্ম্মও এই সংসারধর্ম্ম; ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতক গুলি নিরক্ষর স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারও কোন কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়; সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে।"[১১১]

পুরুষ চরিত্রের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত চিত্ত চাঞ্চল্য দূর করে পরোপকারী হওয়ার উপরেই গুরুত্ব দিয়েছেন। এবিষয়ে 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এ সমর্থন পাওয়া যায়। 'একা "কে গায় ওই"' নামক প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছে— "পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।"[১১২] এই গ্রন্থেরই 'আমার মন' নামক 'পঞ্চম সংখ্যা'য় আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের সমালোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে;— "আমি চিরকাল আপনার রহিলাম— পরের হইলাম না, এই জন্যই পৃথিবীতে আমার সুখ নাই।"[১১৩] পুরুষ চরিত্রের পরহিতৈষী আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে খুবই শ্রদ্ধেয়। এই আদর্শের ঔপন্যাসিক চরিত্র 'কপালকুণ্ডলা'র নবকুমার বা 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রতাপ। নবকুমার সহযাত্রীর অনাহারের দুঃখে কাতর হয়ে, সহযাত্রীর মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। আবার প্রতাপ আত্মবিসর্জন দিয়ে চন্দ্রশেখর ও শৈবালিনীর জীবনে সুখ আনতে চেয়েছিল। বঙ্কিম সাহিত্যের এইসব চরিত্রগুলি পাঠকের শ্রদ্ধা অর্জন করে।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য ভাবধারা মানুষকে যখন ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী করে তুলেছিল তখন বঙ্কিম সাহিত্যের লবঙ্গলতা, প্রফুল্ল, প্রতাপ বা নবকুমারের মত নারী ও পুরুষ চরিত্রগুলি আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী ভাবনার বিপক্ষে কথা বলে।

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯) বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে পরিচিত। এবিষয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় বলেন;— "অবিমিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসের নিদর্শন বঙ্গসাহিত্যে এক রমেশচন্দ্রের উপন্যাসেই পাওয়া যায়।"[১১৪] তিনি 'সংসার কথা' (১৮৮৬) ও 'সমাজ' (১৮৯৪) নামে দু'খানি সামাজিক উপন্যাসও লেখেন। এই দু'খানি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র দত্ত সামাজিক সমস্যাকে তুলে ধরেছেন। এতে লেখকের প্রগতিশীল মনোভাব স্পষ্ট। আমরা জানি, অষ্টাদশ শতক এমনকি

লেখকের সমকালেও সামাজিক কুসংস্কার ব্যক্তি ও সমাজকে অবক্ষয়ের গভীর খাদে নিক্ষেপ করেছিল। কেননা, সামাজিক কুসংস্কার ব্যক্তির মানবিক অধিকারের পরিপন্থী। তাই সচেতন ব্যক্তি মাত্রই সামাজিক এই ব্যাধির বিরুদ্ধে সোচ্চার হবেন। রমেশচন্দ্র দত্ত একজন সচেতন ব্যক্তি। তিনি তাঁর সামাজিক উপন্যাসে সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক কুসংস্কারকে ত্যাগ করার পরামর্শ দিয়েছেন।

'সংসার-কথা' উপন্যাসে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা বিবাহের মতো প্রগতিশীল ভাবনার পরিচয় আছে। শরৎ শিক্ষিত ও সচেতন যুবক, সে মনে করত কুসংস্কারকে বর্জন করা খুব জরুরি। নইলে সমাজের উন্নয়ন অসম্ভব। শরৎ বলেছে;—"...এইরূপ সমাজ হইয়াছে বলিয়াই সংস্কার অবশ্যম্ভাবী, সমাজের ন্যায়-অন্যায়ের বিচার না থাকিলে সে সমাজও থাকে না।"(১১৫) শরৎ নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখেছে, বিধবা বিবাহে কোন পাপ বা অন্যায় নেই। সেজন্য সে আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলেছে;— "...আমি যে কার্য্যটী করিয়াছি তাহা পাপ বলিয়া মনে করি না,"(১১৬) উপন্যাসের শেষে আমরা দেখি, শরৎ-সুধার নতুন দাম্পত্য জীবন সুখে শান্তিতে পরিপূর্ণ। সুধা একসময় বিধবা ছিল বলে তার নতুন দাম্পত্য জীবনে সুখ ও শান্তির অভাব হয় নি। এবিষয়ে শরৎচন্দ্র কোনরকম অভিযোগ আনে নি। লেখক রমেশচন্দ্র দত্ত 'সংসার কথা' উপন্যাসে বিধবার বিয়ের দ্বারা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, বিধবার বিয়ের মধ্যে অন্যায় বা পাপ বলে কিছু নেই। বরং সমকালীন সমাজ যদি বাল্য বিধবার বিয়ের ব্যবস্থা করে তাহলে নারীর মানবিক অধিকারই প্রতিষ্ঠা পাবে।

'সমাজ' উপন্যাসেও লেখক রমেশচন্দ্র দত্তের সমাজ সংস্কারের মনোভাব স্পষ্ট। এই উপন্যাসে জাতপাত বা বর্ণ বৈষম্যকে অবাঞ্ছিত এবং কুসংস্কার হিসাবে দেখান হয়েছে। রমণীকান্ত উপলব্ধি করেছেন, সমাজে বর্ণ বৈষম্য থাকলে প্রকারান্তরে সমাজেরই ক্ষতি হয়। তিনি বর্ণ বৈষম্যহীন এক সমাজের কথা কল্পনা করে আনন্দিত। হেমচন্দ্রকে অগণিত সাধারণ নরনারী দেখিয়ে বলেন;—

> "হেমচন্দ্র! ইহারা আমার আত্মীয় বান্ধব। তুমি আমি যেমন হিন্দু, ইহারাও সেইরূপ হিন্দু, ইহারা আমাদের এক ধর্ম্মাবলম্বী, এক হিন্দুজাতীয়। পুরাকালে সকল হিন্দুদিগের মধ্যে আহার-ব্যবহার ছিল, কি ছার আধুনিক নিয়মে আমরা বিভিন্ন হইয়া জাতীয় দুর্ব্বলতা প্রাপ্ত হইয়াছি! আমাদের মধ্যে অনৈক্য সাধন করা, দুর্ব্বলতা সঞ্চার করা অনেকের অভিপ্রায়, আমরা নিজের চেষ্টায় যদি ঐক্য সাধন করিতে পারি, তবে হিন্দুজাতির গৌরবের কি আর সীমা থাকিবে?"(১১৭)

রমণীকান্ত উদার মন নিয়ে ভেবে দেখেছেন — দেশের 'পণ্ডিতাভিমানী শাস্ত্রজ্ঞগণ' মানুষকে প্রকৃত শাস্ত্রীয় শিক্ষা দেন না। তিনি জাহাজে চড়া, বর্ণনির্বিশেষে বিদ্যালয়ে জ্ঞানার্জন ও আহার বিহার, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ রদ,

স্ত্রীশিক্ষা ও বাল্যবিধবার বিবাহ প্রভৃতি প্রগতিশীল রীতি আচারের প্রবর্তনকে সমর্থন করেন। সেজন্যই রমণীকান্ত ব্রাহ্মণ হয়েও পুত্র দেবীপ্রসাদের সঙ্গে কায়স্থ বংশের কন্যা সুশীলার অসবর্ণ বিয়ের উদ্যোগী হন। রমেশচন্দ্র দত্ত সমাজের প্রগতিশীল বিষয়গুলিকে উপন্যাসে প্রচার করে পাঠককে সংকীর্ণতামুক্ত করার একটি গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন।

উনিশ শতকের একজন বিখ্যাত সামাজিক ঔপন্যাসিক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (১৮৪৩-১৮৯১)। তিনি খাঁটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করার জন্য কলম ধরেন। এখানে তাঁর সার্থক উপন্যাস তথা বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'র (১৮৭৪) আলোচনা করা হবে। 'স্বর্ণলতা'র লেখক নীতিবোধকে অস্বীকার করেন নি। বরং বলা যায় যৌথ পরিবার, ন্যায় ও সদাচার এবং ধর্মের জয়গানমূলক উপন্যাস 'স্বর্ণলতা'। সমাজে ভাল ও মন্দ উভয় প্রকার মানুষ থাকে। কেউ পরোপকারী আবার কেউ বা চরম স্বার্থপর। প্রমদা, গুরু শশাঙ্ক প্রমুখ খল চরিত্র। প্রমদা স্বামী শশিভূষণ ও দেবর বিধুভূষণের যৌথ পরিবার ভেঙ্গে দিয়েছে। ছোট জা সরলার উপর অমানুষিক নির্যাতন করেছে। গুরুশশাঙ্ক অনেক অর্থের বিনিময়ে অভিভাবকহীনা স্বর্ণলতার জোর করে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। পাশাপাশি সরলা, গোপাল ও স্বর্ণলতার দাদা প্রমুখ চরিত্রে সহিষ্ণুতা ও পরোপকারী মনোভাব ফুটে উঠেছে। সরলা, বড় জা প্রমদার অপমান মুখ বুজে সহ্য করেছে। স্বর্ণলতার দাদা দরিদ্র গোপালকে বন্ধু ভেবেছে ও গোপালের পড়াশুনার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেছে। অন্যদিকে গোপালের সহজ, সরল, নির্লোভ ও দায়িত্বপরায়ণ চরিত্র আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে। উপন্যাসের ভাল ও মন্দ চরিত্রগুলি সম্বন্ধে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—

> "যখন উপন্যাসটির উপসংহার হইল তখন দেখা গেল যে, সকল অপরাধীর দণ্ড হইয়াছে ও সকল সাধুপুরুষ সাংসারিক সচ্ছলতা ও মানসিক শান্তি লাভ করিয়াছে। উপন্যাসখানি শেষ করিয়া আমাদের যে মনোভাব হয়, তাহা রূপকথা-পাঠের পর শিশুসুলভ তৃপ্তির সহিত তুলনীয়।"[(১১৮)]

অর্থাৎ উপন্যাসটি অতি নীতিকথার উপর প্রতিষ্ঠিত। লেখক এখানে বিতর্কিত সামাজিক সমস্যাকে উপন্যাসের কাহিনী করেন নি।

অতএব বলা যায় — উনিশ শতকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক সামাজিক বিষয়কে নিয়ে উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে সমকালীন সমাজকে সুপথে চালিত করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। যে নীতি উপদেশগুলি সামাজিক মানুষের সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধ জীবন লাভের পরীক্ষিত পথাদর্শ।

এবারে কথাসাহিত্যের অন্য আর একটি শাখা ছোটগল্পের আলোচনা করা হবে। ছোটগল্প সম্বন্ধে প্রচলিত 'Peculiar Product in nineteenth century' নামক বিশেষ মতটিকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সমর্থন করতেন। তাঁর ভাষায়;—

> "এ উনিশ শতকের এক সম্পূর্ণ নিজস্ব সামগ্রী — যা ইতঃপূর্বে —অন্তত এই রূপে — বিদ্যমান ছিল না। এ নভেলও নয়, রোমান্স্‌ও নয়, এ কবিতার মতো ঐক্যভাবাশ্রয়ী — অথচ কল্পনামুখ্য নয়, জীবন-নির্ভর। আবার সেই জীবনের সমগ্রিকতার প্রতিচ্ছবিও এতে নেই—এতে খণ্ডতার ব্যবহার। সুতরাং এ বস্তু স্পষ্টই 'অভিনব'— এ হল একটি Peculiar Product।"(১১৯)

আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও উনিশ শতকেই ছোটগল্পের সূচনা হয়। বাংলা ভাষায় উনিশ শতকে রবীন্দ্রনাথের হাতেই ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত— 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'গিন্নি', 'রামাকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্পই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। এবিষয়ে অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের পুত্তলিকা' গ্রন্থে লিখেছেন;—

> "উদ্দেশ্য সচেতন শিল্পবুদ্ধি, অভিনব সাহিত্য বাহনের উপর নিশ্চিত অধিকার ও তার ব্যবহার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা প্রথম দেখা গেল হিতবাদীর যুগে (১৮৯১ খ্রীঃ)। এ কারণে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দটিকে রবীন্দ্রগল্প তথা বাংলা ছোটগল্পের সূচনা মুহূর্ত রূপে ধরাই সঙ্গত।"(১২০)

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দকে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক সূচনাকাল ধরা হলেও উনিশ শতকে রবীন্দ্র সমসাময়িক কালে বা তার পূর্বে বাংলা ছোটগল্পের একটি পূর্বাভাষ পর্ব ছিল। অর্থাৎ এই শতকে বাংলা ছোটগল্পের সূচনার একটি পূর্বাভাষ লক্ষ করা যায়। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র কোন ছোটগল্প লেখেন নি বা সচেতনভাবে লেখার চেষ্টাও করেন নি। আমরা তবুও তাঁর কয়েকটি রচনায় গল্পের পূর্বাভাষ লক্ষ করেছি। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম সার্থক উপন্যাস রচনার দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্যের দ্বার উন্মোচন করেন। ছোটগল্প কথাসাহিত্যের একটি শাখা, যা ঠিক উপন্যাসের পরে আবির্ভূত। 'ইন্দিরা' (১৯৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয়' (১৮৭৪) ও 'রাধারাণী' (১৮৮৬) উপন্যাস হলেও আকৃতিতে অনেকটা ছোট। এগুলি উপন্যাস হলেও অন্তত আকৃতির দিক থেকে বাঙালী পাঠক ছোটগল্পের আস্বাদ পায়। অনেকে পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী'কে ছোটগল্প বলতে চেয়েছেন। এবিষয়ে ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন;—

"প্রথম সার্থকনামা বাংলা ছোটগল্পও আবির্ভূত হয়েছিল 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাতেই। গল্পটির নাম 'মধুমতী', প্রকাশ কাল ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস ['বঙ্গদর্শন', ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা]। গল্পের নীচে লেখকের নাম লিখিত আছে শ্রীপূঃ-ইনি ছিলেন বঙ্কিম-সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'মধুমতী' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থকনামা ছোটগল্প, কিন্তু তা স্রষ্টার অবচেতন মনের রচনা।"(১২১)

অর্থাৎ ভূদেব চৌধুরী বাংলা ছোটগল্পের প্রথম লেখকের বিরল সম্মান পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তবুও বঙ্কিমচন্দ্র বা পূর্ণচন্দ্র বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের অবিস্মরণীয় শিল্পী নন। পরবর্তীকালে অনেক গল্প লেখা হলেও উনিশ শতকেই গল্প লিখে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্বর্ণকুমারী দেবী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যেহেতু এই দু'জন বাংলা ছোটগল্প সাহিত্যের প্রথম দিকের অবিস্মরণীয় শিল্পী, সেজন্য উনিশ শতকে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ ও স্বর্ণকুমারীদেবীর গল্প আলোচনা করা হবে।

প্রথমে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের গল্পের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় ছোটগল্প লেখেননি, তিনি গল্প লিখেছেন। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন;—

"ত্রৈলোক্যনাথের চারটি গল্প-সংকলনই গল্পমালা। গল্পের মধ্যে গল্প, অথবা এক গল্পের টানে অপরাপর গল্প। ত্রৈলোক্যনাথ গল্প রচনায় কোনো আধুনিক আদর্শ অনুসরণ করেন নি।...উদ্ভট, আজগবি, অলৌকিক ও রূপকথা-উপাদানে পরিপূর্ণ তাঁর গল্প। অথচ তা একেবারে বাস্তব বর্জিত নয়। ত্রৈলোক্যনাথের মানবতাবাদের — যুক্তিধর্মিতা, পরার্থপরতা, দেশহিতৈষিতা ও মানবমুখিতার পরিচয় তাঁর গল্পে ছড়ানো আছে। সমাজ সংস্কারকের সচেতনতা ও মানবপ্রেমিকের সীমাহীন দরদ তাঁর গল্পে উপস্থিত।"(১২২)

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় স্বীকার করেন ত্রৈলোক্যনাথ আজগবি, অলৌকিক ও রূপকথাধর্মী গল্প লিখলেও তাঁর লেখায় মানবতা, পরার্থপরতা ও দেশহিতৈষণা প্রভৃতি গুণ সমৃদ্ধ। ডঃ সুকুমার সেনও ত্রৈলোক্যনাথের কর্মনিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের কথা স্বীকার করেন। এবিষয়ে তাঁর উদ্ধার করা তথ্য এইরকম —

"ত্রৈলোক্যবাবু স্বাবলম্বনপ্রিয়, স্বাধীনচেতা, অধ্যবসায়শীল এবং উদ্যোগী পুরুষ।...অতি সামান্য অবস্থা হইতে ইনি আত্মোন্নতি এবং দেশের উন্নতি করিয়া ধন্য হইয়াছেন, ...আর আহ্লাদের কথা, —এত কাজের ভিড়েও ত্রৈলোক্যবাবু স্বজাতীয় সাহিত্য সেবায় বিরত নহে।"(১২৩)

এখানে ব্যক্তি ত্রৈলোক্যনাথের কর্মজীবনে নিষ্ঠার কথা জানা গেল। ভূদেব চৌধুরী ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য চর্চার আলোচনায় প্রমথনাথ বিশীর রচনার উল্লেখ করেন —

"ত্রৈলোক্যনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন আমৃত্যু দেশের দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণের পরে পূর্বতন ভাবে প্রতিজ্ঞা রক্ষার উপায় ছিল না, তখন প্রতিজ্ঞা রক্ষার নিমিত্ত তিনি সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিয়োগ করিলেন।"(১২৪)

অতএব আমরা প্রত্যাশা করতে পারি, লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচিত গল্পে স্বদেশের মানুষের চেতনা বিকাশের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

উনিশ শতকে রচিত ত্রৈলোক্যনাথের গল্প গ্রন্থ 'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭)। গল্পগুলি আজগবি, অলৌকিক ও রূপকথাধর্মী মনে হবে। কিন্তু গল্পের অন্তরালে লোকশিক্ষা, নৈতিকতা প্রভৃতি ইতিবাচক গুণাবলী লক্ষ করা যায়।

'ভূত ও মানুষ' গল্প গ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প 'বীরবালা' (১৮৯৩)। গল্পের প্রথমেই লেখক বলেন;— "পাঠক, গল্পটি বুঝিয়া পড়িবেন।" গল্পের সূচনাতেই লেখক ত্রৈলোক্যনাথ পাঠকের মনে একটি কৌতূহল সৃষ্টি করেছেন। আবার গল্পের শেষে লেখক বলেন;— "এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।"(১২৫) আমরা 'বীরবালা' গল্পের সূচনা বাক্য ও সমাপ্তি বাক্য দু'টি একটু বিশ্লেষণ করলে দেখব, লেখক ত্রৈলোক্যনাথ কেবল রূপকথার গল্পের জন্যই এরকম মন্তব্য করেন নি। গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্র বীরবালা। দেবীসিংহ স্বপ্নে দেখে বীরবালা নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও স্বামীর মঙ্গল কামনায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অসাধ্য সাধন ঘটিয়ে বীরবালা স্বামীকে মুক্ত করে ও স্বামীর সংসার শান্তিতে ভরে দেয়। বীরবালার রূপে ও গুণে সকলেই মুগ্ধ। লেখকের ভাষায়;—

"বীরবালার রূপে, বীরবালার গুণে, দেবীসিংহের পিতামহী ও আত্মীয়-স্বজন প্রতিবাসীগণ মুগ্ধ হইলেন। পৌষপার্বণের সময় গৃহে কুটুম্বেরা সমাগত হইয়াছেন। পিতামহী কত চাউল কুটিলেন, কত ডাউল বাটিলেন, কত নারিকেল কুরিলেন। নানাবিধ পিষ্টক করিয়া কুটুম্বদিগকে আহার করিতে দিলেন। এই বীরবালার গল্পটি যাঁহারা মনযোগ দিয়া পাঠ করেন, চিরদিন তাঁহাদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করে, তাঁহাদের গৃহ ধনধান্যে পরিপূর্ণ হয়।"(১২৬)

গল্পটি রূপক ধর্মী। দেবীসিংহের গৃহে বীরবালার মতো স্ত্রীর আগমনে আনন্দ উৎসবের সূচনা হয়েছে। এরকম আনন্দ উৎসব বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে সম্ভব, যদি বীরবালার মত গুণবতীর আবির্ভাব হয়। লেখক কামনা করেছেন, যাঁরা 'বীরবালা' মনযোগ দিয়ে পাঠ করবেন, তাঁদের ঘরে পৌষপার্বণের আনন্দ বিরাজ করবে। আসলে গল্পটি মন দিয়ে পড়লে বীরবালার গুণে পাঠককে আকৃষ্ট হতে হয়। চরিত্রটি সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের

এরকম আকর্ষণ সৃষ্টি হলে বাংলায়ও বীরবালার মতো গুণবতী নারীর আবির্ভাব সম্ভব হবে। আর তাহলে শুধু রাজস্থানের দেবীসিংহের পরিবারে নয়, বাংলার ঘরে ঘরে শান্তি ও আনন্দ বিরাজ করবে।

'বীরবালা' গল্পে পাঠকের নীতিবোধ ও মানবিকতার বিকাশের জন্য ব্যঙ্গ লক্ষ করা যায়। ধর্মদত্ত প্রসঙ্গে অমাবস্যা বাবাজী বলে;—"ধর্মদত্ত! দিন দিন তুই অতি মূর্খ ও অতি নির্বোধ হইতেছিস! শাস্ত্রে আছে,—

> "চাচা, আপনা বাঁচা।" —তাই প্রতিবাসী গৃহে ডাকাত পড়িলে সেকালের লোকে আপনার ঘরে দোহারা তেহারা খিল ও হুরকো দিয়া বসিয়া থাকিত, কেহ বাহির হইত না। আজকালের ছেলেরা সব হইল কি? পরের জন্য প্রাণসমর্পণ। পাঁচ বছরের একটা মেয়ে বাঁচাইতে জলে ঝাঁপ! এ সকলই কলির মাহাত্ম্য।"(১২৭)

যাঁরা পরহিতৈষী, তাদের মুর্খ ও নির্বোধ বলা হয়েছে। আসলে পরোক্ষে লেখক ত্রৈলোক্যনাথ আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী স্বার্থপর ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করেন। এই অমাবস্যা বাবাজী বলে, কন্যা সন্তান বংশের কলঙ্ক বা অভিশাপ। এরকম জঘন্য ও মর্মান্তিক মনোভাবকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। সদ্য জন্মানো কমলার উদ্দেশ্যে বাবাজী বলে;—

> "কমলা তুমি হও দূর। যাও শীঘ্র যমপুর।
> খাও গুড় কাটো সূত। তোমায় চাই না-চাই পূত।"(১২৮)

—এরকম জঘন্য লিঙ্গ বৈষম্যের প্রসঙ্গ পাঠকের মানবিকতাকে জাগিয়ে তোলে।

'ভূত ও মানুষ' (১৮৯৭) গল্পগ্রন্থের আর একটি বিখ্যাত গল্প 'নয়নচাঁদের ব্যবসা'। গল্পটিতে ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে পরোক্ষে ব্যঙ্গ প্রকাশিত হয়েছে। ধর্মীয় সচেতনতার অভাবে আমাদের ধর্মভীরু সমাজে, এক শ্রেণীর লোক আছে যারা কৌশলে আপন স্বার্থসিদ্ধ করে। গল্পের কথক নয়নচাঁদ, সমাজের ধর্মীয় সচেতনতার অভাবকে কাজে লাগিয়ে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়। বুজরুকির দ্বারা আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ গল্পটির বিষয়। নয়নচাঁদ নিজের বুজরুকির কথা গৌরবের সঙ্গে বলেছে;—

> "একবার আমার বড়ই দুর্ব্বৎসর পড়িয়াছিল। খাওয়া কোনও দিন হয় কোনও দিন হয় না। ভাগ্যক্রমে এমন সময় কলিকাতায় বসন্তের হিড়িকটি পড়িল। পরে যিনি যা করুন, কিন্তু ফিকিরটি আমি প্রথম বাহির করি। জলা হইতে দিব্য একটু এঁটেল মাটী লইয়া আসিলাম। তাই দিয়া চমৎকার একটা শীতলা গড়িলাম। শীতলা গড়া কিছুমাত্র কঠিন নয়। গোল করিয়া মাটির একটি চাবড়া করিলেই হইল। তাহার উপর উত্তমরূপে সিন্দুর মাখাইলাম, টানা টানা লম্বা লম্বা দুইটি চক্ষু করিলাম, পুরাতন রাঙতা দিয়া শীতলাটি ছোট বড় বসন্তে ছাইয়া ফেলিলাম। শীতলাটি হাতে করিয়া গিন্নীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায়

চলিলাম ...আমার অভিপ্রায় যে, মরসুম্ থাকিতে থাকিতে দু পয়সা রোজগার করিয়া পুনরায় ইহার বক্‌সির কাছে ফিরিয়া আসি।...বলিব কি ভাই আর রোজগারের কথা। ধামা ধামা চা'ল আর গণ্ডা গণ্ডা পয়সা ধামায় যেন পয়সা বৃষ্টি হইতে লাগিল।"(১২৯)

নয়নচাঁদ আরো বলে;— "...কলেজের সেই যারা এম.এ. পাশ দিয়াছে, সভা করিয়া তাহারা আমার শীতলার বক্তৃতা করিল।"(১৩০) এইসব বক্তব্যে সমাজে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীর মনেও যে ধর্মীয় কুসংস্কার স্পষ্ট, তা লেখক ব্যঙ্গের মধ্যে তুলে ধরেছেন। বিশেষত সর্বোচ্চ শিক্ষিত এম.এ. পাশ করা সচেতন নাগরিকের মনে লালিত ধর্মীয় কুসংস্কার অত্যন্ত বেদনাবহ। লেখক ত্রৈলোক্যনাথ পরোক্ষে তথাকথিত পুঁথিগত শিক্ষিত শ্রেণীকে ব্যঙ্গ করেন।

'নয়নচাঁদের ব্যবসা'য় জানা গেল, নয়নচাঁদ ধর্মভীরু সমাজে বুজরুকির দ্বারা প্রচুর অর্থসম্পত্তির অধিকারী হয়েছে। এই গল্পে লেখক ত্রৈলোক্যনাথ সমাজের ধর্মীয় চেতনাহীনতার দিকটি উদ্‌ঘাটন করেন। এরকম একটি গল্প পাঠককে ধর্মীয় বুজরুকি থেকে সচেতন করবে—সেকথা বলাই বাহুল্য।

এবারে বাংলা কথাসাহিত্যের মহিলা কথাশিল্পী স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) উনিশ শতকের ছোটগল্প বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উনিশ শতকের শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকশিখা ঠাকুর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে আলোকিত করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখিকা হয়ে উঠার বিষয়ে লিখেছেন;—

"দেবেন্দ্রনাথের কন্যারা প্রথমে ঘরে পড়িয়া পরে নব-প্রতিষ্ঠিত বেথুন স্কুলে ভর্তি হইতেন কিন্তু অল্প বয়সে বিবাহ হইত বলিয়া তাঁরা স্কুলে বেশিদিন পড়িতে পাইতেন না। প্রথম ব্যতিক্রম ঘটিল চতুর্থ কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবীর (১৮৫৫-১৯৩২) বেলায়। তখন দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ সিভিলিয়ান হইয়াছেন। মেজোদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও তেসেজে বা "ফুল" দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাবে পরিবারে স্ত্রী স্বাধীনতা বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি ছেলেরা সকাল-সন্ধ্যা গৃহশিক্ষকদের কাছে উচ্চতর পাঠ লইতেন। তাঁহাদের কাছে স্বর্ণকুমারীও পড়িতেন। কাদম্বরীদেবীর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ সখ্য হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও লেখাপড়ার বিষয়ে তাঁহার কিছু আড়াআড়ি হইয়াছিল। এই সূত্রে স্বর্ণকুমারীর লেখিকারূপে আবির্ভাব সম্ভাবিত হইয়াছিল।।"(১৩১)

শুধু বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের লেখিকারূপেই নয়, বাংলার নারীর দুর্দশা মোচনের জন্য স্বর্ণকুমারী দেবী 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পমেলা', 'বিধবা শিল্পাশ্রম' এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। এছাড়া থিয়োসফি সোসাইটির সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। আমরা লক্ষ করব, এই স্বর্ণকুমারীদেবী কংগ্রেসের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধিবেশনে

(১৮৮৯ ও ১৮৯০) যোগদান করেছিলেন। অতএব সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, নারী জাতির দুর্দশা মোচনে একনিষ্ঠতা, ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহ ও রাজনীতিতে অংশগ্রহণ স্বর্ণকুমারী দেবীর আধুনিক মানসিকতার পরিচয়।

স্বর্ণকুমারী দেবী স্বদেশীয় নারীর দুরবস্থায় যথেষ্ট মর্মাহত ছিলেন। তিনি নারী সমাজের মঙ্গলের জন্য 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পমেলা', 'বিধবা শিল্পাশ্রম'এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তাঁর লেখা গল্পে স্বদেশের নারী সমাজের যন্ত্রণা, অধিকারহীনতা ও কখনো কখনো নারীর ব্যক্তিত্ব প্রস্ফুটিত। প্রসঙ্গত ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন;—

> "...স্বর্ণকুমারীর সকল সার্থক সৃষ্টিই শিল্পীর এই নারী ধর্মের দ্বারা বিভান্বিত।...নারীর অনুভব ও চেতনা নিয়ে সমাজ পরিবার ও জীবনকে দেখতে পারার এই ব্যক্তিত্বপৃষ্ট আন্তরিকতাবশে স্বর্ণকুমারীর গল্প বাংলা কথাসাহিত্যে এক নূতন স্বাদুতার সঞ্চার করেছিল।"(১৩২)

উনিশ শতকে স্বর্ণকুমারী দেবী যখন সাহিত্য চর্চা করেছিলেন, তখন মাতৃভাষায় মহিলা কথাশিল্পীর বাহুল্য ছিল না। স্বর্ণকুমারী দেবী যেন দেশীয় নারী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। অন্যান্য লেখকের থেকে তাঁর লেখায় একটু ভিন্ন স্বাদ পাওয়া যেতে পারে। অর্থাৎ নারী হয়ে নারীর অন্তর্লোকের দ্বার উন্মোচন তাঁর লেখায় পাওয়া যায়। স্বর্ণকুমারীর রচনার ভিন্নতা এখানেই। আমরা স্বর্ণকুমরী দেবীর কয়েকটি গল্প বিশ্লেষণ করে দেখব, স্বজাতির আত্মচেতনার উন্মোচনের যুগে তাঁর লেখা কোন ইতিবাচক বার্তা শোনায় কিনা।

স্বর্ণকুমারীর একটি বিখ্যাত গল্প 'কেন?' (১২৯৮)। সংসারে স্বামীর ভালোবাসা পাওয়ার সুগভীর আবেদন প্রকাশিত হয়েছে 'কেন?' গল্পে। গল্পটিতে আমরা লক্ষ করব, পুরুষ তার ভোগময় জীবনকে চরিতার্থ করতে গিয়ে গৃহে স্ত্রীকে নিপীড়ন করছে। এবিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন;—

> "সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসে সুখ? ...স্বামী যে ভালবাসেন না পোড়া প্রাণে তাহাও সয়, কিন্তু তাঁহার এই অদর্শন সহে না। নিয়মিত সময়ে তাঁহার যে দিন দেখা না পাই, সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, মনে হয় স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পাদুকাঘাত করেন ত ইহার তুলনায় তাহাও সুখ।"(১৩৩)

'কেন?' পাঠ করলে পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর প্রকৃত অবস্থান জানা যায়। অবশ্য গল্পের শেষে স্বামী স্ত্রীর মিলন দৃশ্য পাঠককে তৃপ্তি এনে দেয়। কিন্তু সে মিলনেও পুরুষ শাসিত সমাজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। স্ত্রী, স্বামীর হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ জানতে চেয়েছে। অথচ স্বামী তা অস্বীকার করেছে। স্বামী অনুরোধের সুরে যেন নির্দেশ দিয়েছে কারণটি না জানার জন্য। স্বামীর পরিবর্তনের কারণ জানার অধিকার স্ত্রী পায়নি। এতে নারীর প্রতি

বৈষম্যই প্রতিষ্ঠিত।

'কেন?' গল্প যদিও মিলনান্ত তবুও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের আগাগোড়া স্বেচ্ছাচার প্রতিষ্ঠিত। লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবীর এই গল্পটি সংসারে পুরুষের স্বেচ্ছাচারের পরিবর্তে নারীকে তার মর্যাদা দেওয়ার আন্তরিক আবেদন ধ্বনিত হয়।

স্বর্ণকুমারী দেবীর আরেকটি বিখ্যাত গল্প 'ক্ষত্রিয়-রমণী' (১২৯৩)। 'ক্ষত্রিয়-রমণী' গল্পে লেখিকা স্বর্ণকুমারী দেবী নারীর ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। সেজন্য তিনি স্বদেশের রাজপুত নারীর ইতিহাস থেকে কাহিনী নির্বাচন করেন। আমরা লক্ষ করি, মেবারের যুবরাজ ও তাঁর পারিষদ রাজপুত রমণীর বীরত্বে বিস্মিত। মেবারের যুবরাজ মৃগয়ায় নানা অস্ত্রে সজ্জিত হয়েও একটি শূকর শিকার করতে পারছিলেন না। অথচ রাজপুত যুবতী অনায়াসে একটি ভুট্টাগাছের আঘাতে শূকরকে আহত করে। গল্পের ভাষায়;—

"যুবতী নির্ভয় চিত্তে অমনি আক্রমণোদ্যত শূকরের মস্তকে সেই ভুট্টাদণ্ড দ্বারা সবলে আঘাত করিলেন, সে আঘাতে শূকর যেন বজ্রাহত হইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল,—সেই সময় যুবরাজের অশ্বও নিকটে আসিয়া পড়িল, ... রমণী হাসিতে হাসিতে শূকরের কান ধরিয়া তাঁহার নিকট টানিয়া আনিল, যুবরাজ তাহাকে অস্ত্রবিদ্ধ করিলেন, আর সকলে অবাক হইয়া রমণীর পানে চাহিয়া রহিল।"[১৩৪]

অপ্রতিরোধ্য শূকরকে আহত করাই নয়, এই রাজপুত রমণীর পাখি তাড়ানো ঢিল যুবরাজের ঘোড়াকে লাগলে ঘোড়া আহত হয়। যুবরাজ রাজপুত যুবতীকে ভয় দেখাতে গেলে নিজেই ঘোড়া থেকে পড়ে যান। এই গল্পে ক্ষত্রিয় রমণীর শুধু সাহস ও বীরত্বের পরিচয়ই নয়, সঙ্গে কর্তব্য বোধ বা সেবা পরায়ণ মনোভাবও স্পষ্ট। যা ক্ষত্রিয় রমণী চরিত্রটির মানবিক গুণের পরিচয় বহন করে। ঢিলের আঘাতে ঘোড়া আহত হলে ক্ষত্রিয় রমণী অন্যায় স্বীকার করে। ক্ষত্রিয় রমণী বলে;— "আমাকে মার্জ্জনা করুন—আমি পাখীর দৌরাত্ম্য হইতে ক্ষেত্র রক্ষা করিবার জন্য ঢিল ছুঁড়িতেছিলাম—দৈবক্রমে অশ্বের পায়ে আসিয়া পড়িয়াছে,"[১৩৫] শুধু মার্জনা প্রার্থনাই নয়, আহত ঘোড়াকে সুস্থ করার জন্য ঔষধ দিয়েছে। স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন;— "যুবতী একটু সরল হাসি হাসিয়া, সঙ্গের আনীত ঔষধ বাহির করিয়া অশ্বের ঊরুদেশে লেপন করিতে লাগিল,"[১৩৬]

শেষ পর্যন্ত মেবারের যুবরাজ ক্ষত্রিয় রমণীকে বিবাহের প্রস্তাব দেন। লেখিকা বলেন;—

"পরদিনই যুবতীর সহিত যুবরাজের বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ শিকার করিতে আসিয়া বধূ সঙ্গে গৃহে গমন করিলেন। এই মহিষীর গর্ভেই পরে বীর শ্রেষ্ঠ হামীর — যিনি ১২ বৎসর বয়সে শত্রু জয় করিয়া মিবার রাজপুতকূল উজ্জ্বল করেন — তাঁহার জন্ম হয়।"[১৩৭]

অর্থাৎ মায়ের শৌর্য-বীর্যের যথার্থ উত্তরাধিকারী বীর পুত্র হাম্মীর। লেখিকা যেন পরোক্ষে বলতে চেয়েছেন বীর হাম্মীর মায়ের মতোই শৌর্য ও বীর্যবান। হাম্মীরের মত সন্তান জন্ম দেওয়ার পিছনে যেন শৌর্য-বীর্যবান মায়ের অনেকটা অবদান রয়েছে।

স্বর্ণকুমারীদেবী স্বদেশের নারী সমাজের উন্নয়নের জন্য সারা জীবন কাজ করে গেছেন। তিনি 'সখি সমিতি', 'মহিলা শিল্পমেলা', বিধবা শিল্পাশ্রম' প্রভৃতি সভা-সমিতি বা সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। যেগুলির প্রধান উদ্দেশ্য স্বদেশ ও নারী সমাজের উন্নতি বা মঙ্গল করা। নারী সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ও স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী স্বর্ণকুমারীদেবী তাঁর 'ক্ষত্রিয়-রমণী' গল্পে নারীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ করেন। সমকালের পাঠককে যা নারীর মানবিক মর্যাদা সম্বন্ধে সচেতন করেছিল।

এবার বাংলা ছোটগল্পের প্রথম যথার্থ শিল্পী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উনিশ শতকের গল্প বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উনিশ শতকে বাংলা ছোটগল্প সার্থক শিল্পরূপ পেয়েছিল রবীন্দ্রনাথের হাতে। 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৮৯১) 'দেনাপাওনা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'গিন্নি', 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা', 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোটগল্প। কবি ও গল্পকার রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প সম্বন্ধে ধারণা ছিল—

"ছোটোপ্রাণ, ছোটোব্যথা, ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল,
সহস্র বিস্মৃতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু-চারটি অশ্রু জল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা,
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি' মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।" (১৩৮)

এই বৃহৎ জগৎ সংসারে একটি খণ্ড মুহূর্তের শিল্পরূপ ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, জীবনের ছোটোখাটো সুখ দুঃখ কথা ছোটগল্পের সামগ্রী। তাতে বর্ণনা, তত্ত্ব ও উপদেশের অবকাশ নেই। আবার সমগ্র গল্পটি পাঠ করে পাঠকের মনে অতৃপ্তির ব্যঞ্জনা বিরাজ করবে। রবীন্দ্রনাথের 'গল্পগুচ্ছ'-এ এই জাতীয় শিল্পরূপ বাংলা সাহিত্যে অভিনব। যার সূচনা উনিশ শতকে হিতবাদী পত্রিকায় প্রকাশিত ৬টি গল্পে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় অসংখ্য ছোটগল্প রচনা করেন। অবশ্য আমরা এখানে শুধু উনিশ শতকের গল্প আলোচনা করব। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গল্পে বাঙালীর নিজস্বতা ও নারীর মানবিক মূল্যায়নের মতো কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাব।

'বর্ষাযাপন' কবিতায় ছোটগল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রমনের অকৃত্রিম অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। কবি লিখেছেন;—

"বর্ষার সমান সুরে অন্তর বাহির পুরে
সংগীতের মুষলধারায়,
পরানের বহুদূর কূলে কূলে ভরপুর,
বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়!
তখন সে পুঁথি ফেলি, দুয়ারে আসন মেলি
বসি গিয়ে আপনার মনে,
কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই
দীর্ঘদিন কাটিবে কেমনে।
মাথাটি করিয়া নীচু বসে বসে রচি কিছু
বহুযত্নে সারাদিন ধরে—
ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত
গল্প লিখি একেকটি করে।" (১৩৯)

সবসময় বিদেশী কাব্য-সাহিত্য মনকে তৃপ্তি দিতে পারে না। সেজন্য জাতির নিজস্ব জীবন প্রবাহ বা নিজস্ব পরিকাঠামোকে মাতৃভাষার সাহিত্যে দর্শন করতে মন পেয়ে বসে। তাই কবি এখানে বলেন — বর্ষার দিনে বিদেশী সাহিত্য পাঠ করে অন্তর তৃপ্তি লাভ করে নি। সে স্বাদ মিটেছে বাংলা ছোটগল্প লিখে। তাহলে আমাদের মনে হতে পারে যে, কবি স্বদেশে বর্ষার পটভূমিতে মাতৃভাষায় ছোটগল্প লিখতে গিয়ে নিশ্চয়ই স্বদেশীয় ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কবির মনকে যা তৃপ্ত করেছে। প্রশ্ন জাগতে পারে—তাহলে সেই স্বদেশীয় বিষয়টি কি? আমাদের মনে হয়েছে — বাংলার প্রকৃতি, পল্লীবাংলার চিত্র ও বাঙালীর নিজস্ব সুখ দুঃখই হল স্বদেশীয় বিষয়।

ছোটগল্পের প্রথম সূচনা হয় বিদেশী সাহিত্যে। অবশ্য অনতিবিলম্বে বাংলা সাহিত্যেও উনিশ শতকেই ছোটগল্প রচিত হয়। কিন্তু দেশীয় ভাষায় গল্প লিখলেই নিজস্ব গল্প হয় না। গল্পকে বাঙালীর সমাজে নিজস্ব করে তুলতে হলে গল্পে বাঙালীর হৃদ-স্পন্দন প্রয়োজন। সেজন্য বাঙালীর সুখ দুঃখ, বাঙালীর জীবন প্রবাহ, বাঙালীর সংস্কৃতি, পল্লীবাংলার চিত্র ও বাংলার প্রকৃতিকে গল্পে ফুটিয়ে তুলতে হবে। রবীন্দ্রনাথ এই বিষয়টি প্রথম থেকেই গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর চোখে দেখা অভিজ্ঞতাকে বাংলা গল্পে পরিণত করেছেন। এবিষয়ে যাঁরা সন্দেহ করেন, তাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

> "অসংখ্য ছোট ছোট লিরিক লিখেছি, বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোনো কবি এত লেখেন নি। কিন্তু আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুছ গীতিধর্মী। এক সময় ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে; দেখেছি বাংলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা।...আমি বলবো, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি; মর্মে অনুভব করেছি; সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা লিখেছি তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা; আমার নিজের দেখা। তাকে গীতিধর্মী বললে ভুল করবে। ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোট ছোট গল্পগুলো লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"(১৪০)

কিংবা তিনি 'ছিন্নপত্র'-এ আরো লিখেছেন;—

> "সেদিন কবি যে পল্লীচিত্র দেখেছিল, নিঃসন্দেহে তার মধ্যে রাষ্ট্রিক ইতিহাসের ঘাত-প্রতিঘাত ছিল কিন্তু তাঁর সৃষ্টিতে মানব জীবনের সেই সুখ দুঃখের ইতিহাস; যা সকল ইতিহাসকে অতিক্রম করে বার বার চলে এসেছে কৃষি ক্ষেত্রে, পল্লীপ্রাঙ্গণে আপন প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ নিয়ে। কখনো বা মোগল রাজত্বে, কখনো বা ইংরেজ রাজত্বে তার অতি সরল মানবত্ব প্রকাশ নিত্য চলেছে, সেইটেই প্রতিবিম্বিত হয়েছিল গল্পগুচ্ছে, কোনো সামন্ততন্ত্র নয়, কোনো রাষ্ট্রতন্ত্র নয়।"(১৪১)

আমরা 'ছিন্নপত্র'-এ গল্পগুচ্ছের বাস্তবতার কথা জানলাম, যা একান্ত বাঙালীর নিজস্ব সুখ দুঃখ, বাংলার প্রকৃতি, পল্লীবাংলার চিত্রে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথে এই বাস্তবতার দাবী অযৌক্তিক কিছু নয়। এই বাস্তবতা কবি বর্ষার দিনে বিদেশী কাব্যে খুঁজে পান নি। আর তাই বাস্তবতায় সমৃদ্ধ সাহিত্য লিখতে গিয়ে বাংলা ছোটগল্প তাঁর হাতে শিল্প সমৃদ্ধ হয়। আমরা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণ করে বিষয়টি স্পষ্ট করার চেষ্টা করব।

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের গল্পে বাঙালীর সুখ দুঃখের পরিচয় নেওয়া যাক্। 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) রবীন্দ্র গল্প সাহিত্যের বিখ্যাত গল্প। গল্পটিতে বাঙালীর সুখ দুঃখের পরিচয় ছোটগল্পের স্বল্প পরিসরে ফুটেছে। 'দেনাপাওনা'য় বাঙালী সমাজের পণপ্রথার জঘন্য দিক শিল্পরূপ পেয়েছে। রামসুন্দর তার অতি আদরের মেয়ে নিরুপমাকে রায়বাহাদুরের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। পুরো পণ দিতে না পারায় রামসুন্দর অনেক অপমানিত হয়। শুধু তাই নয়, নিরুপমা শ্বশুরবাড়িতে অবহেলার পাত্রী হয়ে উঠে। পণপ্রথার এই সমস্যা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। বাঙালী ঘরের এরকম একটি ঘৃণ্য প্রথাকে রবীন্দ্রনাথ 'দেনাপাওনা' গল্পে শিল্পরূপ দেন। আর যাই হোক 'দেনাপাওনা' গল্পটির এজাতীয় সমস্যা কোনমতেই অবাস্তব বা অতিরঞ্জিত নয়।

পল্লীবাংলার মানুষের মন সহজ ও সরল। তারা বিলাত বা কলকাতার নাগরিকের মতো কৃত্রিমভাবে

ভাবের আদান প্রদান করে না। তারা রাগ, শোক, স্নেহ, প্রেম খোলাখুলি প্রকাশ করে। 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পে দুখিরাম রুই ও ছিদাম রুই এর মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও তাদের স্ত্রীর মধ্যে বচসা লেগেই থাকত। লেখক রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

> "দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছিল। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানাবিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে।"[১৪২]

অশিক্ষিত সাধারণ পরিবারে এরকম কলহ সচরাচর হয়ে থাকে। এ পল্লীবাংলারই চিত্র।

গ্রাম বাংলায় জাতপাত, আচার-আচরণ, শুচি-অশুচিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। 'অনধিকার প্রবেশ' (১৩০১) গল্পে গ্রাম বাংলার সামাজিক শুচি-অশুচির দিকটি তুলে ধরা হয়েছে। জয়কালী তার সমস্ত নিষ্ঠা দিয়ে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করেন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

> "অনাচারী ব্যক্তি পরমাত্মীয় হইলেও দেবালয়ের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পাইত না। জয়কালীর একটি যবনকরপক, কুক্কুটমাংস-লোলুপ ভগিনীপতি আত্মীয়সন্দর্শন উপলক্ষে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, জয়কালী তাহাতে ত্বরিত ও তীব্র আপত্তি প্রকাশ করাতে সহোদরা ভগিনীর সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ সম্ভাবনা ঘটিয়েছিল।"[১৪৩]

পল্লীবাংলার সমাজের চিত্রই এরকম। অবশ্য এই মন্দিরে আর্ত শূকর প্রবেশ করলে জয়কালী তাকে আশ্রয় দেন। রবীন্দ্রনাথ বলেন;—"এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।"[১৪৪] এখানে সমাজে প্রচলিত শুচিতা-অশুচিতা বা জাতপাতের অমানবিকতাকে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেন।

রবীন্দ্রনাথ জমিদারী পরিদর্শনের জন্য পূর্ববঙ্গে দীর্ঘদিন কাটিয়েছিলেন। পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশ নদীমাতৃক। এই সময়ের কোন কোন গল্পে পল্লীবাংলার নদী বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। 'সমাপ্তি' গল্পে বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি চিত্র ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

> "মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্র মাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল এবং এই দুরন্ত বালিকা নদী—দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মতো অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।"[১৪৫]

মৃণ্ময়ীর শান্ত শিশুর মতো ঘুমানোর কারণ প্রকৃতির বিশেষ রূপ। যে রূপ নদীমাতৃক পল্লী বাংলাতেই সচরাচর দেখা যায়। ভাদ্র মাসে মুষলধারে বৃষ্টি, নদীর জলে ঢেউ পল্লীপ্রকৃতির খুবই পরিচিত দৃশ্য।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথ বাংলা গল্পে শুধু বাঙালীর নিজস্ব সুখ দুঃখের গল্পই লিখেছেন তা নয়। তিনি বাংলা গল্পকে আরও সমৃদ্ধ করতে গিয়ে বৃহত্তর মানবের সুখ দুঃখের কথা বলেন। অন্যভাবে বলা যায়, যে অনুভূতি পৃথিবীর খণ্ডিত দেশ-কাল-সীমার অপেক্ষা রাখেনা, তাকে রবীন্দ্রনাথ শিল্পরূপ দিতেন। 'পোষ্টমাষ্টার' গল্পের নায়ক গ্রামের বালিকা রতনের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত করেন, সেই দার্শনিক মনোভাব যে কোন দেশ-কাল-সীমার উর্ধ্বে। পোষ্টমাষ্টার বলেছিল—এই পৃথিবীতে কে কার। এই দার্শনিক ভাবনার গল্পরূপ 'পোষ্টমাষ্টার' পৃথিবীর যে কোন সহৃদয় ব্যক্তির মনে স্থায়ী ছাপ রাখে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বর্ষাযাপন কবিতায় বলেছেন;—

"জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,
অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,
অজ্ঞাত জীবনগুলা, অখ্যাত কীর্তির ধুলা,
কত ভাব, কত ভয় ভুল—
সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি
ঝর ঝর বরষার মতো—
ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দতার শুনি অবিরত।
সেই-সব হেলাফেলা, নিমিষের লীলাখেলা
চারি দিকে করি স্তূপাকার,
তাই দিয়ে করি সৃষ্টি একটি বিস্মৃতিবৃষ্টি
জীবনের শ্রাবণনিশার।"[১৪৬]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ জগতের অজ্ঞাত অখ্যাত ছোটোখাটো জীবন ও ভাবের শিল্পরূপ দিয়ে বাংলা ছোটগল্পকে বিশ্বসাহিত্যের উপযুক্ত করে তোলেন।

ঠাকুর পরিবারে নারী স্বাধীনতা স্বীকৃত ছিল। রবীন্দ্রনাথও নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। নারী স্বাধীনতার বিষয়ে তাঁর লেখনী ছিল মুখর। তিনি সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মতো বাংলা ছোটগল্পেও এদেশের পুরুষ প্রধান সমাজের বর্বর দিক ফুটিয়ে তোলেন। তাঁর স্বীকৃত প্রথম গল্প 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) থেকে শুরু করে শেষ

জীবন পর্যন্ত 'তিনসঙ্গী' (১৩৪৭)-র গল্পগুলি ধারাবাহিক আলোচনা করলে বাঙালী নারীর উত্তরণের একটি চিত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। এখানে আমরা উনিশ শতকে রচিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বাঙালী নারীর সামাজিক অবস্থান বিষয়ে আলোচনা করব।

সমকালের পুরুষ প্রধান সমাজে নারীর সমান অধিকার স্বীকৃত ছিল না। এই অধিকার হীনতা সভ্য সমাজে একেবারে ঘৃণ্য। রবীন্দ্রনাথ নারীর প্রতি অন্যায়, অবিচার, নিপীড়নকে শিল্পরূপ দিয়ে পাঠকের চেতনার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করেন। বিষয়টিকে স্পষ্ট করার জন্য কয়েকটি গল্পের আলোচনা করা হয়েছে। 'দেনাপাওনা' (১৮৯১) গল্পে সমাজে প্রচলিত পণপ্রথার নির্মম চিত্র রবীন্দ্রনাথ অঙ্কন করেন। সমাজের এই অবাঞ্ছিত প্রথাটির জন্য নিরুপমার মতো একটি নববধূকে প্রাণ হারাতে হয়েছিল।

লিঙ্গ বৈষম্যের বিখ্যাত একটি গল্প 'শাস্তি' (১৩০০)। ভাইয়ের অন্যায়ের দায় ছিদাম তার স্ত্রীকে নিতে বলেছে। এবিষয়ে সে রামলোচনকে বলেছে;— "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"[১৪৭] একথা অত্যন্ত নির্মম। সত্যিই ভাইয়ের ফাঁসি হলে ভাই পাওয়া যাবে না। অথচ স্ত্রীর ফাঁসি হলে সহজেই স্ত্রী আরো পাওয়া যাবে। বক্তব্যে নারীর চরম অধিকার হীনতার প্রকাশ পায়। কেননা, সমাজে পুরুষ চাইলেই বহু বিবাহ করতে পারে। এখানে সমাজের বহু বিবাহের জঘন্যতার দিকটি উদ্ঘাটিত। যে বহু বিবাহ নারীকে তার মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। আমরা দেখলাম 'দেনাপাওনা' ও 'শাস্তি' গল্পটি নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আবেদন মূলক গল্প।

'মানভঞ্জন' (১৩০২) পুরুষের অবহেলা ও নিপীড়নে জর্জরিত নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার গল্প। 'মানভঞ্জন', ইতিপূর্বে রচিত 'দেনাপাওনা' ও 'শাস্তি' গল্পের মত স্বামী বা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের অন্যায় সহ্য করার গল্প নয়। 'মানভঞ্জন'-এ নায়িকা গিরিবালা স্বামীর অবহেলার প্রতিশোধ নিয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল গোপীনাথ গৃহে স্ত্রী ছেড়ে 'গান্ধর্ব থিয়েটার'-এর নায়িকার প্রতি আসক্ত। দিনের পর দিন অবহেলিত গিরিবালা নিজেই প্রধান নায়িকার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং স্বামীসহ অসংখ্য দর্শকের সামনে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে।

'মানভঞ্জন' গল্পে রবীন্দ্রনাথ নায়িকা গিরিবালার যোগ্যতা প্রমাণমূলক একটি কাহিনী চয়ন করেন পাঠককে সচেতন করার জন্য, একথা বুঝতে আমাদের কোন অসুবিধা হয় না।

আমরা বলতে পারি, উনিশ শতকেই — রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন, বাংলা ছোটগল্পকে বাঙালীর নিজস্ব ছোটগল্পে রূপান্তরিত করেন এবং বাঙালী সমাজের নারীর প্রতি সংকীর্ণ মানসিকতা বর্জন করার আহ্বান জানান।

অতএব বলা যায়; উনিশ শতকের বাংলা কথাসাহিত্যকে স্বদেশ ভাবনা বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। আমরা বলতে পারি — এই স্বদেশ ভাবনা কখনো উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের নতুন প্রকরণ উপন্যাস ও ছোটোগল্পের সার্থক শিল্পরূপদানের ভাবনার দ্বারা স্বদেশীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করেছে; আবার কখনো উপন্যাস ও ছোটোগল্পের কাহিনীতে লোকশিক্ষা ভাবনার দ্বারা স্বদেশবাসীকে সচেতন করতে সাহায্য করেছে। যাকে স্বদেশভাবনা বলে অভিহিত করলে অতিশয়োক্তি হয় না।

উল্লেখপঞ্জী

১। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১।

২। Preface, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, সম্পাদক — ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯শে নভেম্বর ১৯৭১, মণ্ডল বুক হাউস, পৃ: ৩।

৩। ভূমিকা, প্যারীচাঁদ রচনাবলী, সম্পাদক— ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯শে নভেম্বর ১৯৭১, মণ্ডল বুক হাউস, পৃ: ৩।

৪। প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, বিজয় বসন্ত — হরিনাথ মজুমদার, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭১ শক, প্রাপ্তিস্থান-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংখ্যা-২৩৩৩০৫, ক্যাটালগ্ নং-৮৯১.৪৪৩৬, হ.ম/বি, পৃ:

৫। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৩৫

৬। ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক — প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, কলি-১২, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃঃ ২৬৮।

৭। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: আটাশ।

৮। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: আটাশ।

৯। উপন্যাস পরিচয়, বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক - অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১৩১৮, ৪র্থ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯৫, পৃ: ১৯৪-১৯৫।

১০। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৩৬।

১১। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ত্রিশ।

১২। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৬৯।

১৩। মৃণালিনী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১৬৫।

১৪। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২০২।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩।

১৬। সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৪৭।

১৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৭।

১৮। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১৯৪।

১৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৬৪।

২০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৯।

২২। স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ২।

২৩। ভূমিকা, স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ।৵ ।

২৪। স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ৪।

২৫। ভূমিকা, স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ—আশ্বিন ১৪০০, পৃ: ৵৹।

২৬। সূচনা, বউঠাকুরাণীর হাট, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৬০৩।

২৭। প্রাগুক্ত, ৬০৩।

২৮। সূচনা, রাজর্ষি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৭০১।

২৯। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, ২০০২ সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২০, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ঃ ২০০২, পৃ: ৭৬।

৩০। বিজ্ঞাপন, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: চল্লিশ।

৩১। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগেরে প্রতি নিবেদন, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৩৭।

৩২। মৃণালিনী, বঙ্কিম রচনাবলী ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ১১৮।

৩৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৮।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৫।

৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৬।

৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২০।

৩৮। বিজ্ঞাপন, রাজসিংহ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: উনচল্লিশ।

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: উনচল্লিশ।

৪০। প্রাগুক্ত, পৃ: উনচল্লিশ।

৪১। রাজসিংহ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৩৭।

৪২। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: আটত্রিশ।

৪৩। প্রাগুক্ত, পৃ: আটত্রিশ-উনচল্লিশ।

৪৪। উপসংহার, গ্রন্থকারের নিবেদন, রাজসিংহ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৭৯।

৪৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৯।

৪৬। রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ঊনত্রিশ।

৪৭। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ২০২।

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২-২০৩।

৪৯। বঙ্গবিজেতা, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ২।

৫০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭।

৫১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭।

৫২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮।

৫৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০।

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩।

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৯।

৫৬। মাধবী কঙ্কণ, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ১৫০।

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৪৮।

৫৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৫।

৫৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯৫।

৬০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

৬১। মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস) — রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ১৬৬।

৬২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৫।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২২৬।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৭২।

৬৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮৭।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৬৭।

৬৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৩।

৬৯। রাজপুত জীবন সন্ধ্যা, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস) — রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ২৫৫।

৭০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১১।

৭১। বিজ্ঞাপন, দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: বিয়াল্লিশ।

৭২। আনন্দমঠ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৯১।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯০।

৭৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪৩।

৭৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪৩।

৭৬। বিজ্ঞাপন, দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: চুয়াল্লিশ।

৭৭। দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৬৭১।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬৬।

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৯৭।

৮০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭০৭।

৮১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫১।

৮২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৬৮।

৮৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫১।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৫৩।

৮৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭১৬।

৮৬। বিজ্ঞাপন, সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ছেচল্লিশ।

৮৭। সীতারাম, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৭৬৮।

৮৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৬৮।

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭৮।

৯০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭৮।

৯১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৮৩।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭২৪।

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৩৬।

৯৪। বিষবৃক্ষ, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২২১।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০৩।

৯৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৮২।

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ২০২।

৯৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪৮।

৯৯। কৃষ্ণকান্তের উইল, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৪৭০।

১০০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৮৫।

১০১। চন্দ্রশেখর, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩০২।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৩।

১০৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৬৭।

১০৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৭।

১০৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩২৭।

১০৬। রজনী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৯৫।

১০৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৩।

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৪।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪২৫।

১১০। কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৬৫।

১১১। দেবীচৌধুরাণী, বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৭১৬।

১১২। একা "কে গায় ওই", বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৪৬।

১১৩। আমার মন, বঙ্কিম রচনাবলী ২য় খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ মাঘ ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৪।

১১৪। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ৪৮।

১১৫। সংসার কথা, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ৪৪৬।

১১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৪৬।

১১৭। সমাজ, রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০, পৃ: ৫১৮।

১১৮। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ: ১৩৬।

১১৯। সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৪০৫, পৃ: ১৯৭।

১২০। কালের পুত্তলিকা বংলা ছোটগল্পের একশ বছর ঃ ১৮৯১-১৯৯০ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ: ২৩।

১২১। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬২, চতুর্থ প্রকাশ ঃ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৯, পৃ: ৪৮।

১২২। কালের পুত্তলিকা বংলা ছোটগল্পের একশ বছর ঃ ১৮৯১-১৯৯০ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ: ১২৮-১২৯।

১২৩। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ৪৭৪।

১২৪। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬২, চতুর্থ প্রকাশ ঃ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৯, পৃ: ৬৫।

১২৫। বীরবালা, ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), সম্পাদনা — সুদেব মুখোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন ১৪১০, পৃ: ৫৮৪।

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৮৪।

১২৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৩।

১২৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৭৪।

১২৯। নয়নচাঁদের ব্যবসা, ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), সম্পাদনা—সুদেব মুখোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন ১৪১০, পৃ: ৫৮৭-৫৮৯।

১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০১।

১৩১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৪০১ দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ কার্তিক ১৪০৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯, পৃ: ২১৮।

১৩২। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার — শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা - ৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬২, চতুর্থ প্রকাশ ঃ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৯, পৃ: ৭২।

১৩৩। কেন, স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প, সম্পাদক : ড. সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, ১১-এ, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ ১৪১১, মে ২০০৪, পৃ: ৭২-৭৩।

১৩৪। ক্ষত্রিয় রমণী, স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প, সম্পাদক : ড. সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, ১১-এ, ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র লেন, কলকাতা - ৯, প্রথম প্রকাশ : জৈষ্ঠ ১৪১১, মে ২০০৪, পৃ: ৮২।

১৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩।

১৩৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৩।

১৩৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৬।

১৩৮। বর্ষাযাপন, রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫-২৬।

১৩৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫।

১৪০। কালের পুত্তলিকা বংলা ছোটগল্পের একশ বছর ঃ ১৮৯১-১৯৯০ — অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯, পৃ: ২৫।

১৪১। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫-২৬।

১৪২। শাস্তি, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৭৭।

১৪৩। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১০ম খণ্ড — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ পৌষ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৯০।

১৪৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৯২।

১৪৫। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৯১।

১৪৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৬।

১৪৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৭৯।

অষ্টম অধ্যায়

উনিশ শতকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় স্বদেশ ভাবনা

উনিশ শতকের একাধিক সাহিত্য প্রকরণের মধ্যে স্বদেশভাবনার আলোচনায় প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় রচনার গুরুত্ব অপরিসীম। সমগ্র উনিশ শতক জুড়ে প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় সাহিত্য রচিত হয়েছিল। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলি আলোচিত হওয়ায় এখানে মূলত উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের প্রবন্ধ আলোচিত হচ্ছে।

সচেতন বাঙালী উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আপামর বাঙালীকে দুর্বলতা, ভীরুতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা, সামাজিক ব্যভিচার প্রভৃতি বর্জন করার সুপরামর্শ, অর্থ-রাজনৈতিক অচেতনতা দূর করার প্রয়োজনীয় উপদেশ ও জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এই নীতি-উপদেশ বা পরামর্শ সরাসরি প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় রচনাকে প্রভাবিত করেছে। নক্‌শা সাহিত্যের মতো শুধুই তীক্ষ্ণ সমালোচনা বা ব্যঙ্গ নয়, কিংবা সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মত ইঙ্গিতে বা পরোক্ষে প্রেরণা নয়, সরাসরি যুক্তি ও মননের দ্বারা প্রয়োজনীয় গ্রহণ-বর্জন করে জাতিকে সংগঠিত তথা সমৃদ্ধ করার আন্তরিক প্রয়াস এই সময়ের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় লক্ষ করা যায়।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রাবন্ধিক হিসাবে বিশেষ কৃতিত্বের ছাপ রেখেছেন — রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-১২৯৪ বঙ্গাব্দ), ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য (১৮৪০-১৯৩২), যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ (১৮৪৫-১৯০৪), দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪০-১৯২৬), কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪), স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩—১৯০২), রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪—১৯১৯), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৭—১৯৩৭), কালীপ্রসন্ন ঘোষ (১৮৪১—১৯১০), অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১৮৪৮—১৯১৭), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রমুখ। উল্লিখিত প্রাবন্ধিকগণ জাতির উত্তরণের জন্য কখনো প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচন করেছেন দেশীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির মূল স্বরূপ, কখনো আত্মবিশ্বাসকে জাগিয়ে তোলার জন্য গৌরবময় দেশীয় ইতিকথা ও পুরাতত্ত্ব, কখনো জাতীয় জীবনে স্থায়ী সমৃদ্ধি আনবার জন্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রয়োজনীয়তা, কখনো মানব মনকে সমৃদ্ধ করতে দর্শনের মতো সূক্ষ্ম চেতনার অবতারণা, কখনো বা জাতীয় জীবনের

মানোন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চেতনার প্রচার করেছেন। আবার কখনো বা সমগ্র দেশকে জননী রূপে কল্পনা করে জননীর নগ্নতা, কলঙ্ক দূর করার মত অনুপ্রেরণা উনিশ শতকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনাগুলি ছন্দহারা একটি জাতিকে মানুষের মতো করে বাঁচার পরামর্শ দিয়েছে। আমরা এই অধ্যায়ে উনিশ শতকের বিখ্যাত কয়েকজন প্রাবন্ধিকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনা ধারাবাহিক আলোচনা করব।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৩৪-১২৯৪ বঙ্গাব্দ)। বাঙালীকে সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত ছিল না। সেজন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাজাত্যবোধ, সম্প্রীতিবোধের মতো একাধিক মহৎ গুণাবলী অর্জনের জন্য রঙ্গলালের লেখনী ছিল মুখর।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে আখ্যানকাব্যের কবি হিসাবেই পরিচিত। কিন্তু সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও তাঁর পদচারণা চোখে পড়ার মতো। রঙ্গলালের প্রবন্ধ ও সমজাতীয় রচনায় সরাসরি স্বাজাত্যবোধ, সম্প্রীতিবোধ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি গঠনমূলক বা ইতিবাচক বিষয় ব্যক্ত হয়েছে। সেদিনের বাঙালী পাঠককে যা সচেতন ও সংগঠিত করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

প্রথমে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাদেশিক সম্প্রীতি বিষয়ক রচনার বিষয়ে আলোচনা করা হচ্ছে। রঙ্গলাল কর্মসূত্রে অনেক দিন উড়িষ্যায় বসবাস করেছিলেন। উড়িষ্যায় দীর্ঘদিন থাকার ফলে, সেখানকার সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞ হন। তিনি জানতেন, জাত্যাভিমানী কিছু ইংরেজ যেমন ভারতীয়দের ঘৃণা করত, সেরকম কিছু জাত্যাভিমানী বাঙালী উড়িয়াদের অবজ্ঞার চোখে দেখে। কিন্তু এরকম জাত্যাভিমান ভারতীয়দের একতার পরিপন্থী। সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের জন্য তুচ্ছ প্রাদেশিকতাকে বিসর্জন দেবার মতো উদার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় বহন করে রঙ্গলালের 'উৎকলবর্ণন', 'কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্তবাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা', 'দীনকৃষ্ণদাস' ও 'উপেন্দ্র ভঞ্জ' নামক প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনা। এইসব রচনায় রঙ্গলাল অনেক বাঙালীর ভ্রান্ত ধারণার অবসানের জন্য উড়িয়াদের সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে অলোকপাত করেছেন।

উৎকল বর্ণন (১৮৬৩) ঃ

'উৎকল বর্ণন' তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে উৎকল দেশের প্রাচীনত্ব নির্ণীত হয়েছে। উড়িয়ারা কোন আগন্তুক বা বর্বর জাতি নয়। প্রাবন্ধিকের ভাষায়;—

"প্রকৃত আর্য জাতির যে সকল শাখা ভারতবর্ষ মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে, উৎকল দেশীয়েরা তাহারই এক শাখা।...শূরসেন প্রদেশীয়, সারস্বত প্রদেশীয়, কান্যকুব্জ প্রদেশীয়, মগধ প্রদেশীয় এবং বঙ্গ তথা উৎকল প্রদেশীয় হিন্দুদিগের মধ্যে আচার ব্যবহার ভাষা-শরীর এবং প্রকৃতির যে কিছু উৎকর্ষাপকর্ষ থাকুক, তাহারা সকলেই এক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা ফল পুষ্পাদি স্বরূপমাত্র।"(১)

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উড়িষ্যার ভূপ্রকৃতি, নদনদী, উৎপাদিত দ্রব্য লবণ, কৃষি, ফলমূল প্রভৃতির পরিচয় আছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আছে উড়িষ্যার পার্বত্য অঞ্চলের পরিচয়মূলক আখ্যান। এখানকার খনিজ সম্পদ, কৃষি, বন্যসম্পদ, জীবজন্তু, বন্যঔষধ, ফল, ফুল, পাখী প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রাবন্ধিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'উৎকল বর্ণন'-এ সংক্ষিপ্ত পরিসরে অথচ নানামুখী বর্ণনার দ্বারা উড়িষ্যা সম্পর্কে বাঙালী পাঠককে জাত্যাভিমান পরিহার করার আবেদন জানান। রঙ্গলাল সরাসরি পাঠককে উদ্দেশ্য করে বলেন;— "এইক্ষণে প্রার্থনা করি, পাঠক মহাশয়েরা উড়িয়াদেশের কথা বলিয়া এই প্রস্তাবকে অবহেলা না করেন, শৈলগহ্বরে মাণিক্য থাকে এমত নহে, বল্মীক-স্তূপেও তাহা কখনও কখনও প্রাপ্ত হইতে পারে।"(২)

কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা (১৮৬৬)ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা"-র অধিকাংশ স্থানে বাংলা ভাষার সঙ্গে উড়িয়া ভাষার তুলনামূলক আলোচনা করেন। রঙ্গলাল বাঙালী পাঠক ও উড়িয়া শ্রোতাদের বোঝানোর চেষ্টা করেন;—

"উৎকল ভাষা এবং বঙ্গভাষার মধ্যে তাদৃশ বিভিন্নতা নাই, একথা সকলেই অবগত আছেন। সকল ভাষারই ভিত্তি এবং পত্তন স্বরূপ বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্ব্বনাম এবং ক্রিয়া, — এই চতুর্বিধ ভাষামূল উৎকল এবং বঙ্গভাষায় প্রায় একই প্রকার, কেবল ভিন্ন ভিন্ন বিভক্তিগত প্রত্যয় সকল একপ্রকার না হইবাতে প্রভেদ বোধ হইয়া থাকে।"(৩)

কিংবা "বস্তুতঃ কলিকাতার বাঙ্গলা এবং চট্টগ্রামের বাঙ্গলার মধ্যে যত প্রভেদ দেখা যায়, তাহা বঙ্গদেশীয় সাধুভাষা এবং উৎকলীয় সাধুভাষার মধ্যে দ্রষ্টব্য নহে।"(৪) এছাড়া এই বক্তৃতায় উড়িয়াদের শিক্ষা ও উড়িয়া ভাষা সমৃদ্ধির জন্য সৎপরামর্শ আছে। পরিশেষে বক্তব্যটির মূল ব্যঞ্জনা অনুসন্ধান করলে পাওয়া যায়,— উড়িয়াবাসীর জাতিগত প্রাচীন কৌলীন্যের মতো উড়িয়া ভাষার পুরোনো কৌলীন্য ও ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল সম্ভাবনার কথা। যাকে অবজ্ঞা বা উপহাস করা কোন মতেই উচিত নয়।

'দীনকৃষ্ণদাস' ও 'উপেন্দ্রভঞ্জ' ঃ

দীনকৃষ্ণদাস ও উপেন্দ্রভঞ্জ উড়িয়া ভাষার বিখ্যাত কবি। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িয়া ভাষা ও সাহিত্য চর্চার দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কবিদ্বয়ের জীবনী ও কাব্য সমালোচনা করেন। কবিদ্বয়ের জীবনী প্রকাশ ও কাব্য সমালোচনার দ্বারা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন, উড়িষ্যাবাসীও বাঙালীর মতো সাহিত্য ও সংস্কৃতি বোধে সমৃদ্ধ জাতি।

এবার রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার বিষয়ে আলোচনা করা হবে। এবিষয়ে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন'।'শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন' প্রবন্ধটি হেয়ার বার্ষিক উৎসব সমিতির বিচারকমণ্ডলী — রামগোপাল ঘোষ, আচার্য্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর — কর্তৃক নির্বাচিত নৈতিক ও মানসিক বিষয়ক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দেশের সমকালীন অশিক্ষা, দরিদ্রতার মত নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জগৎসভায় জাতির শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারে অত্যন্ত আশাবাদী ছিলেন। তিনি দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে বলেন—"জগতীতলে প্রধান জাতি পদবী আরোহণের আশা কিছু স্বপ্নবৎ অসার নহে, অন্বেষণ করিলেই তাহা প্রাপ্ত হইবে ইতি।"[৫] তিনি গভীরভাবে অনুসন্ধান করে দেখেছেন, বাঙালীর শ্রেষ্ঠ জাতির শিরোপা অর্জনের অন্যতম অন্তরায় দৈহিক দুর্বলতা ও রুগ্নতা। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জাতির এরকম কঠিন সমস্যা থেকে মুক্তির উপায় 'শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন' নামক প্রবন্ধ লিখে সৎপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। প্রবন্ধটি চারটি অংশে বিভক্ত । যথা;—

১। 'দৈহিক বলপ্রাচুর্য্যের প্রয়োজন।'

২। 'প্রাচীন সাময়িক হিন্দুদিগের ব্যায়াম চর্চ্চা।'

৩। 'প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার বিবরণ।'

৪। 'ব্যায়াম চর্চ্চার সদুপায় ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষ দোষোদ্ভাব — তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচলিত করণের আবশ্যকতা।'

১। দৈহিক বল প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় যুক্তিসহকারে দেখিয়েছেন, জীবনকে সর্বাঙ্গসুন্দর রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে মানসিক শক্তি ও শারীরিক শক্তির প্রয়োজন। তাঁর মতে;— "...... দৈহিক এবং মানসিক বলের সামঞ্জস্যই মনুষ্যজাতির সুখ বৃদ্ধির নিদান হইয়াছে,—একের অভাব এবং অন্যের প্রাদুর্ভাব হইলে বিপরীত ফলোৎপত্তির

সম্ভাবনা।"[৬] প্রাবন্ধিক দৈহিক বলের বিষয়ে বলেন;—"অতএব বাঙ্গালী জাতির হিতৈষিগণ বিবেচনা করুন,—যেখানে বাঙ্গালিরা উক্ত সমুদায় পুরুষার্থের প্রতিপাদক বাহুবল বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নিকৃষ্টকল্প, সেখানে তাঁহাদিগের পুনরুদ্ধার কল্পে শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার কতদূর পর্য্যন্ত আবশ্যকতা আছে।"[৭]

২। প্রাচীন সাময়িক হিন্দুদিগের মধ্যে ব্যায়াম চর্চ্চা ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় জানতেন স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তির শ্রদ্ধা এবং পরিপূর্ণ আস্থা আছে। শরীর চর্চার দ্বারা প্রাচীন ভারতবাসী বাহুবল অর্জন করতেন —এরকম প্রমাণ পেলে সাধারণ পাঠক ও শ্রোতা বাহুবল লাভে মনোবল পাবে। তাই প্রাবন্ধিক রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্রোতা ও পাঠক) দেশবাসীকে শরীরচর্চার দ্বারা বলিষ্ঠতা অর্জনের জন্য সচেতন করে দিয়ে বলেন;—

> "তোমরা আর কতদিন ঐশিক এবং মানুষিক বিধির বিপর্য্যয়ে দৈহিক ও মানসিক দৌর্ব্বল্যে কালহরণ করিবে? তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলা কি কিছুই তোমাদিগের তিমিরাবৃত অন্তঃকরণে পতিত হয় না।?"[৮]

৩। প্রাচীন ইয়ুরোপীয় জাতিদিগের ব্যায়াম চর্চ্চার বিবরণ ঃ

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবন্ধের বিষয়কে মনোগ্রাহী করার জন্য সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ইউরোপীয় জাতির পূর্বপুরুষদের ব্যায়াম চর্চার দৃষ্টান্ত দেন। এই প্রসঙ্গে তিনি গ্রীক প্রমুখ জাতির কথা বলেন। তিনি দাবী করেন ইংরেজ, ফরাসী ও জার্মানীর মত আমাদের দেশেও বিদ্যালয়-শিক্ষায় শরীর শিক্ষাকে অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করা উচিত। তাঁর মতে;—

> "আমাদিগের দেশে সেই সকল উপায় অবলম্বিত না হইলে বিদ্যাধ্যাপন প্রণালী কোনরূপেই সংশুদ্ধ বা সম্পূর্ণপদে বাচ্য হইতে পারিবেক না, — বস্তুতঃ তদ্রূপ শিক্ষা বিরহে এতদ্দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন হইবেক না, — বর্ত্তমান শিক্ষা পদ্ধতির দ্বারা এতদ্দেশীয় বালকদিগের মনে কেবল কল্পনা এবং বিভাবনা পরিপূর্ণ হওনেরই সম্ভাবনা, তাহাদিগের দ্বারা ভবিষ্যতে স্বদেশের উৎকর্ষ সম্পাদিতহইবার প্রত্যাশা নাই,"[৯]

৪। ব্যায়াম চর্চ্চার সদুপায় ও বাঙ্গালিদিগের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব হেতু অশেষ দোষোদ্ভাব —তথা রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে তাহা প্রচলিত করণের আবশ্যকতা ঃ

সাবলীল জীবন যাপন করার জন্য সুস্থ শরীর প্রয়োজন। সুস্থ শরীর লাভ তখনই সম্ভব, যখন বাবা-মা তাঁদের সন্তানের দৈহিক ও মানসিক বিকাশের প্রতি যথাযথ নজর দেবেন। এদেশে রুগ্ন ও দুর্বল শিশু জন্মানোর

পিছনে পরোক্ষে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, নারীর পরাধীনতা, অশিক্ষা, দরিদ্রতা প্রভৃতি কারণ রয়েছে। তাই রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন;—"..........যাহাতে সুশিক্ষা প্রণালী প্রচলিত হয়, তৎপক্ষে যত্ন করা দেশহিতৈষি মনুষ্য মাত্রের অতিকর্ত্তব্য হইয়াছে"(১০) তিনি আরো স্পষ্ট করে বলেন;—

> "সুতরাং রাজকীয় বিদ্যালয় প্রভৃতিতে ব্যায়াম শিক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত হইলে কথঞ্চিৎ উপকার দর্শিতে পারে, আমাদিগের বর্ত্তমান শিক্ষিতেরা ব্যায়াম চর্চার অমৃতময় ফলানুভব করিয়া তাঁহাদিগের সন্তানগণকে অতি শৈশব কালাবধি সুশিক্ষার সাহায্যে সুন্দর সবল ও সুস্থ শরীর করিতে পারেন।" (১১)

প্রবন্ধের শেষে পাঠকের প্রতি আবেদন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী হয়েছে, যা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশানুরাগের সার্থক দৃষ্টান্ত হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। তিনি বলেন;—"তোমরা যখন বীরবপু অন্যদেশীয় লোকদিগের সমাজে স্বজাতীয় লোকের শারীরিক লাবণ্য এবং ক্ষুদ্রতা দর্শন করহ, তখন কি তোমাদিগের মনে লজ্জার উদয় হয় না ?"(১২)

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়েও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় দিয়েছেন। আমরা 'বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ' ও 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' নামক রচনা দু'টির আলোচনা করে রঙ্গলালের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে অনুরাগের পরিচয় গ্রহণ করব।

উনিশ শতকে জাতির আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠায় যাঁরা প্রয়াসী, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম। 'বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ' বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা অনুসন্ধানমূলক প্রবন্ধ। প্রাবন্ধিক তাঁর অনুসন্ধানমূলক মানসিকতাকে সাধারণ লেখকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে জাতীয় গৌরব বৃদ্ধির আহ্বান জানান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিকল্পে তিনি বলেন;—

> "বাঙ্গালা ভাষায় লিপি চর্চ্চায় অনুরাগলাভের আকাঙ্ক্ষিগণ যদি অপরাপর সামান্য সামান্য বিষয়ে লেখনী চালনা না করিয়া স্বদেশের যাবতীয় বিষয়ের অনুসন্ধান লইয়া গ্রন্থ লেখেন, তাহা হইলে বিহিত উপকার হইতে পারে। প্রত্যুত, বাঙ্গালী প্রাচীন কবিদিগের জীবনচরিত যে দুষ্প্রাপ্য তাহা আমরা এইক্ষণেও বিশ্বাস করি না — ফলতঃ দুরনুসন্ধেয় সন্দেহ নাই। লেখকেরা অনুসন্ধান করুন— সমস্ত সন্ধান পাইবেন।" (১৩)

প্রবন্ধটিতে বাঙালী ও বাংলা ভাষার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের বিষয়ে কিছু মতামত আছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গৌরবের সঙ্গে বলেন;—"সুন্দরবন যে সময়ে বসতিপূর্ণ ছিল, সে সময়ে ইংলণ্ডেও সম্পূর্ণ সভ্যতার উদয় হয় নাই।"(১৪) কিংবা "বাঙ্গালাদেশ যে নিতান্ত আধুনিক নহে, ইহার বিশিষ্ট প্রমাণ রামায়ণ, মহাভারতাদি প্রাচীন

গ্রন্থে পাওয়া যায়।"[১৫] তাঁর মতে একদিকে বিদেশী শাসন ও অন্য দিকে দেশীয় পণ্ডিতদের বাংলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা— বাংলা ভাষার উৎকর্ষতা সৃষ্টির পক্ষে প্রতিকূল ভূমিকা নিয়েছিল।

প্রবন্ধটিতে রামমোহনের পূর্বের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কবি, লেখক, গ্রন্থ প্রভৃতি বিষয়ে আকর্ষণীয় নানা তথ্য পাওয়া যায়। প্রবন্ধে কবিকঙ্কন মুকুন্দ, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস ও ভারতচন্দ্রের আবির্ভাবকাল বিষয়ের যথাসম্ভব মীমাংসার চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া প্রথম বাংলা ব্যাকরণ (হালহেডের ব্যাকরণ) রচয়িতা, বাংলায় মুদ্রণযন্ত্রের প্রবর্তন (স্যার চার্লস উলকিন্স বাংলা মুদ্রণযন্ত্রের পরিকল্পনা কর্তা এবং এটি তৈরী করেন পঞ্চানন নামে এক কাঠ মিস্ত্রি), ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা গদ্য চর্চার ইতিহাস (উইলিয়াম কেরী প্রমুখের অবদান), স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ ও বিখ্যাত গ্রন্থকার প্রভৃতি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অনেক সামগ্রী অনুসন্ধানের অভাবে বাঙালীর নাগালের বাইরে ছিল। বলা যায়, প্রাবন্ধিক অনুসন্ধানের আদর্শ তৈরী করতে 'বঙ্গ বিদ্যার আদ্য বিবরণ' রচনা করেন। তাতে কিন্তু বাংলা সাহিত্যের প্রতি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গভীর অনুরাগই ধরা পড়েছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ নিখুঁত যুক্তির সাহায্যে মনের ক্ষোভ, প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ ও স্বজাত্যবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

দেশকালভেদে কবিতা-প্রকৃতির ব্যবধান ঘটে। বাংলা ও ইংরেজী কবিতার মধ্যে পার্থক্য দেশভেদের জন্য। অবশ্য সমসাময়িককালে সমৃদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যে উৎকর্ষতাপূর্ণ কবিতার বাহুল্য ছিল না। সেজন্য মাতৃভাষার কবিতা কুরুচিপূর্ণ ও অশ্লীল—এসব অভিযোগ ঠিক নয়। প্রাবন্ধিক 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ'-এ মাতৃভাষা অপমানের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যাঁরা বাংলা কাব্যকে ইংরেজী কাব্যের তুলনায় নিতান্ত হেয় জ্ঞান করেন, তাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন ইংরেজী সাহিত্যেও অসংখ্য অশ্লীল বা কুরুচিপূর্ণ বিষয় আছে। তিনি মাতৃভাষা সাহিত্যের প্রতি সুগভীর অনুরাগ প্রকাশ করে বলেন;— "আমারদিগের দেশীয়া কবিতাকে আমরা অবশ্যই প্রগাঢ় প্রেমের সহিত আদর করিব।"[১৬]

'বেথুন সোসাইটি'তে পূর্ব বক্তা হরচন্দ্র দত্তের প্রতিবাদ করে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালী কবি ও কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন এবং বাংলা কাব্যের উজ্জ্বল অদূর-ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বলেন। এই বিষয়ে প্রাবন্ধিক রঙ্গলাল বলেন;—"এই প্রবন্ধ বীটন সভায় পঠিত হয়; সুতরাং বক্তৃতার নিয়মে লিখিত হইয়াছে। অপিচ বাঙ্গালা কবিতার প্রতি উক্ত সভার কতিপয় সভ্য অকারণ কটূক্তি করাতে তদুত্তরেই এতৎ প্রবন্ধের

অধিকাংশ লিখিত হইয়াছে,"[১৭] এই প্রবন্ধে বাংলা কাব্যের উন্নতিকল্পে তাঁর উৎসাহমূলক আহ্বান যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। বেথুন সোসাইটিতে তিনি বলেন;—"হে সভাস্থ মহোদয়গণ, হে দেশীয় ভ্রাতৃবর্গ, হে বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা কবিতার বন্ধুবর্গ, আপনারা আর কাল বিলম্ব করিবেন না, বাঙ্গালা কবিতা-হার যাহাতে সভ্যকণ্ঠে স্থান প্রাপ্ত হয়েন, এমত উদ্যোগ করুন, উর্ব্বরা আছে, বীজ আছে, উপায় আছে, কেবল কৃষকের আবশ্যক, অতএব গাত্রোত্থান করুন,"[১৮] এই বক্তব্যে রঙ্গলালের স্বদেশীয় সাহিত্য প্রীতির বিষয়ে কোনো সন্দেহ থাকে না।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস বিষয়ক রচনা 'কলিকাতা কল্পলতা' (ভারতী পত্রিকা, কার্তিক ১৩৬৬)। 'কলিকাতা কল্পলতা' কলকাতার ইতিহাস রচনা ও ইতিহাস সংরক্ষণের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। গ্রন্থটি রচনার উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—"...এই সময়ে আসিয়াখণ্ডের সর্ব্বপ্রধান নগরী এই কলিকাতার শত শত বৎসরের পূরাবৃত্ত সংগ্রহ করা অতি প্রয়োজনীয় বোধ হইতেছে। যেহেতু এই শুশ্রূষনীয় বিষয় এক্ষণে সংগৃহীত না হইলে কিছুকাল পরে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করাও ব্যর্থ হইবে। এখনও অনেক স্থানীয় লোক জীবিত আছেন এবং দুই-একখানি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কিছুকাল পরে এতদুভয় দুর্লভ হইয়া উঠিবে। এইসব বিবেচনা করিয়া "কলিকাতা কল্পলতা" নামে এই অভিনব গ্রন্থের রচনাকার্য্যে হস্তক্ষেপ করা গেল।"[১৯] স্বদেশীয় নগরী কলকাতার ইতিহাস সংরক্ষণের বিষয়ে গ্রন্থকারের গভীর অনুরাগের বিষয়টি উক্ত বক্তব্যে স্পষ্ট হয়েছে।

শুধু ইতিহাসের প্রতি অনুরাগই নয়, 'কলিকাতা কল্পলতা'য় ধরা পড়েছে লেখকের ইতিহাস অনুসন্ধানে যত্নশীল হওয়ার বিশেষ মনোভাব। যথা—কলকাতাকে কেন্দ্র করে ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তার ও নগরীর ক্রমবর্ধমান উৎকর্ষতার তথ্য, কলকাতা যে অর্বাচীন নয়— ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে কবিকঙ্কণের কাব্যে কলকাতার উল্লেখের বিশেষ তথ্য, অন্ধকূপ হত্যার প্রচলিত মতের বিরোধিতা (অন্ধকূপ হত্যায় তিনি নবাবকে দায়ী করেন নি), মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর জন্য হেস্টিংসের ষড়যন্ত্র, মধ্যযুগীয় রাজত্বের তুলনায় ইংরেজ রাজত্বে সুখ, শান্তি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে জোয়ার এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বে শেঠ পরিবার, ঘোষাল পরিবার, বাগবাজারের মিত্র পরিবার, শোভাবাজার রাজপরিবার, মল্লিক পরিবার, ঠাকুর পরিবার প্রভৃতি বিখ্যাত দেশীয় পরিবারের ইতিহাস রয়েছে।

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশীয় নগরীর ইতিহাস সংগ্রহের যে আগ্রহ দেখিয়েছেন, প্রথম দিকের রচিত সে ইতিহাস কিন্তু যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়।

আমরা রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় স্বাজাত্যবোধ, সম্প্রীতিবোধ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, দেশীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ প্রভৃতি ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় পাই। বলা যেতে পারে, এই সব বিষয় রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকৃত্রিম স্বদেশ ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়

ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪) স্বদেশীয় মানুষের অধঃপতন দশা থেকে মুক্তির স্বপ্ন দেখতেন। তিনি ব্যক্তি জীবনে যে দর্শন মেনে চলতেন, যা বিশ্বাস করতেন, যাকে শ্রদ্ধা করতেন—প্রবন্ধে তাকেই তিনি লেখনীর বিষয় করেছেন। এককথায় তাঁর লেখনী বা সাহিত্য চর্চা মানুষের জন্য। তিনি কখনো 'শিক্ষা বিষয়ক প্রস্তাব', (১৮৫৬), 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' ১ম ও ২য় (১৮৫৮-৫৯), 'পুরাবৃত্ত সার' (১৮৫৮), ' ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস' (১৮৬২), 'ক্ষেত্রতত্ত্ব' (১৮৬২), 'রোমের ইতিহাস' (১৮৬৩), 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (১৯০৪)- এর মত উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক রচনার জন্য লেখনী ধারণ করতেন; কখনো বা 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ' রচনার দ্বারা দেশীয় মানুষের সদাচারে জীবন-যাপনের জন্য উপদেশমূলক ও নীতিমূলক গ্রন্থের উদ্দেশ্যে লেখনী চালনা করতেন। তিনি প্রতিটি মানুষের নিজ নিজ ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ববোধকে সচেতন করার প্রতি জোর দেন। স্বদেশীয় শাস্ত্র, দর্শন, আচার প্রভৃতির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় নি, আধুনিক জীবনেও এগুলির যথার্থ প্রয়োগ প্রয়োজন,— ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর প্রবন্ধগুলির দ্বারা সেকথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। তাই বলে রক্ষণশীলের মতো পাশ্চাত্যের নবভাবধারাকে বর্জন করা নয়, বরং প্রয়োজনীয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যুগলবন্দী করে জাতীয় জীবনকে সঞ্জীবনী শক্তি দান করাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি মধুসূদন প্রমুখ ইয়ংবেঙ্গলদের মতো উচ্ছৃঙ্খলতার পথে না গিয়ে স্বদেশীয় মত ও পথের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। তিনি দেশকে জননীরূপে কল্পনা করে নানাবিধ দেশহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন।

এখানে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হবে। তাঁর রচিত বিখ্যাত প্রবন্ধগুলি হল;— 'পারিবারিক প্রবন্ধ' (১৮৮২), 'সামাজিক প্রবন্ধ' (১৮৯২) ও 'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯২)।

পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২) ঃ

উনিশ শতকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউ ভারতীয় সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করলে ভারতের চিরকালীন কিছু নিয়ম, নীতি, আচার ব্যবহারের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। মানুষ অত্যন্ত ব্যক্তিকেন্দ্রিক হতে থাকে, জীবনে অবকাশের সময় কমে যায়। প্রচলিত চিরকালীন নীতি-ধর্মকে মানুষ এড়িয়ে চলতে চায়। এরকম একটি

যুগসন্ধিক্ষণে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ' পাশ্চাত্য ছোঁয়াচে রোগ থেকে দূরে রাখার পথ-নির্দেশিকা। বলা চলে একটি আদর্শ ভারতীয় পরিবার পরিকল্পনার অন্যতম মননশীল ব্যাখ্যা— 'পারিবারিক প্রবন্ধ'।

'পারিবারিক প্রবন্ধ' একটি পরিবারের কর্তা থেকে প্রতিটি সদস্যের আপন আপন কর্তব্যবোধ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নীতি ও উপদেশ কথায় পরিপূর্ণ। লজ্জাশীলতা, কুটুম্বতা, জ্ঞাতিত্ব, অতিথি সেবা, চাকর প্রতিপালন, ভাই-ভগিনী সম্পর্ক, কন্যা-পুত্রের বিবাহ, সন্তানের শিক্ষা, গৃহকার্যের ব্যবস্থা, রোগীর সেবা প্রভৃতি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধকে প্রাবন্ধিক এই গ্রন্থের দ্বারা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

'লজ্জাশীলতা' নামক অংশে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন;— "পাশব ধর্ম্মের প্রতি মনুষ্যের যে ঘৃণা, তাহাই লজ্জার মূল কারণ। যে মনুষ্য সমাজ যত দিব্যভাবাসম্পন্ন এবং সুশীল ও সভ্য হইবার জন্য যত্নশীল, সেই সমাজের মধ্যে লজ্জার তত আধিক্য দৃষ্ট হইয়া থাকে।"[২০] তিনি ইউরোপের সমাজের সঙ্গে ভারতের সমাজের তুলনা করে বলেন;—"আমাদের শাস্ত্রকারেরা এইরূপ পশুধর্ম্মের অন্তর্গূঢ় ব্রহ্মভাবের আবিষ্কৃতি করিয়া পাশব কার্য্যগুলির পাশবত্ব মোচন করিয়া গিয়াছেন। ইউরোপখণ্ডে এরূপ হয় নাই।"[২১] প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় স্বদেশীয় সমাজে লজ্জার অস্তিত্বকে গৌরবের সঙ্গে প্রকাশ করেন।

সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) ঃ

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটি যে উদ্দেশ্যমূলক তা প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'গ্রন্থের আভাস' নামক অংশে ব্যাখ্যা করেন। তিনি স্পষ্টতই বলেন — এই গ্রন্থটি কোন রাজনৈতিক আন্দোলনকে সহযোগিতা করার জন্য নয়, স্বজাতীয় ইংরেজী শিক্ষিত বা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি শ্রেণীর শিক্ষা দানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থটি রচিত। 'সামাজিক প্রবন্ধ'-এ স্বদেশীয় ধর্ম, সমাজ, পরিবার, আচার, ব্যবহার, প্রভৃতির স্পষ্ট স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং সামাজিক মানুষের কর্তব্যবোধের ইঙ্গিত রয়েছে।

'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সমাজে জাতীয় ভাব অর্জনের বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লিখিত জাতীয় ভাব অর্জন করা যে অবাস্তব বিষয় নয়, সে বিষয়ে যুক্তি প্রদান করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজে ইউরোপীয়দের আগমন হওয়াতে যে সুফল ও কুফল হয়েছে তার সমালোচনা রয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে ইংরেজের সঙ্গে মেলামেশা করায় ভারতীয় সমাজের কুফলের দিকটি সমালোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে ইংরেজ আগমনে ভবিষ্যতে কিরূপ ফলের সম্ভাবনা আছে, তার অনুমান করা হয়েছে। পরিশেষে ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতীয় সমাজের সত্ত্বা ও জাতীয় প্রকৃতি রক্ষা করার জন্য কি কি কর্তব্য তার যুক্তিধর্মী মননশীল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, প্রাবন্ধিক স্বদেশীয় সমাজের নিজস্ব রূপটির প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন। স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে সমকালীন সমাজে স্থায়ী করার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত হয়েছে। সেজন্যই তিনি এরকম উদ্দেশ্যমূলক একটি সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। স্বদেশীয় ধর্ম, আচার, ব্যবহার প্রভৃতির সপক্ষে মত লক্ষ করার মতো। আলোচ্য বিষয়গুলি আধুনিক যুগেও সমান তাৎপর্যপূর্ণ, প্রাবন্ধিক ঘুরেফিরে যুক্তি দিয়ে সে কথাই বোঝানোর চেষ্টা করেন। প্রসঙ্গত ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে—আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক শিক্ষা প্রভৃতি ভারতীয় শাস্ত্র ও শিক্ষার কাছে এখনো অসম্পূর্ণ। তাঁর ভাষায়;— "বিজ্ঞানের অতদূর উন্নতি হইতে অনেক বিলম্ব আছে।"(২২)

অতএব ভারতীয় সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে কিছু করণীয় আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেই কর্তব্য কর্মগুলি ষষ্ঠ অধ্যায়ে ব্যক্ত করেছেন। তিনি অনুমান করেন, যুগাবতার আবির্ভূত হয়ে সমকালের অনাচার দূর করবেন। কেননা ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তিরা কেবল অনুকরণ করেই ক্ষান্ত। ইংরেজের মহৎ গুণ গ্রহণ করতে তাঁরা অক্ষম। তাছাড়া স্বদেশীয়দের মধ্যে নিন্দাবাদ, ঘৃণা, কুৎসা রচনার মতো মানসিকতার বিলোপ না হলে উন্নয়ন সম্ভব নয়। প্রাবন্ধিক মনে করেন—ভারতীয়দের কলহপরায়ণতা, বিদ্যাহীনতা প্রভৃতির কারণ ধর্মজ্ঞানহীনতা। অতএব দেশীয় সমাজকে, দেশীয় ধর্মের মূল বিষয়কে গ্রহণ করতে হবে। তিনি আরো বলেন যে, পরিবারে শান্তি স্থাপনের জন্য, সমাজকে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার জন্য ভারতীয় আচার সংস্কৃতির অনুসরণ আবশ্যক। পরিশেষে তিনি বলেন—মুক্তির উপায় একমাত্র ধর্মকে অবলম্বন করা। কেননা ধর্মভাবের উদয় হলে মানুষ আত্মসংযমী হয়। এবং জাতি ধন, বল ও বিদ্যা প্রভৃতি সম্পদে শ্রেষ্ঠ হিসাবে পরিচিতি পায়। তাই ভূদেব মুখোপাধ্যায় মনে করেন ভারতীয় সমাজের উন্নয়নের জন্য ভারতীয় ধর্মকে অবলম্বন করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

'আচার প্রবন্ধ' (১৮৯২) ঃ

ভূদেব মুখোপাধ্যায় সদাচারকে ধর্ম বলেছেন। এ ধর্ম সম্পূর্ণ দেশীয় ধর্ম। তিনি বলেন— ইংরেজ জাতি পৃথিবীতে সবদিক দিয়ে উন্নত, এই ইংরেজের চেয়েও আমরা শ্রেষ্ঠ হতে পারি। তা হতে পারে একমাত্র সদাচারের ফলে। তাঁর ভাষায়;—"সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"(২৩) কিন্তু এই আচারধর্ম পালন করার ক্ষেত্রে কতগুলি প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন;—শাস্ত্রীয় বিধি বা আচার সম্বন্ধে মানুষের অবজ্ঞা, শাস্ত্রীয় বিধির প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা, বিজাতীয়দের অনুকরণের প্রবল ইচ্ছা। এইসব প্রতিবন্ধকতা থেকে মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

তাছাড়া মানব জীবনে সাফল্যের শীর্ষচূড়া স্পর্শ করতে হলে স্বেচ্ছাচারিতা বা পশুধর্ম এবং আলস্যভাব

বা জড়ধর্ম ত্যাগ করা উচিত। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলেন;—"পশুভাবের নূন্যতাসাধন আমাদিগের শাস্ত্রের একটি মুখ্য উদ্দেশ্য"[২৪] কিংবা "মনুষ্যে যে 'জড়ধর্ম্ম' আছে তাহার অতি সুস্পষ্ট লক্ষণ তাঁহার আলস্য। শাস্ত্রাচার আলস্য নাশ করে।"[২৫] সেজন্য প্রাবন্ধিক বলেন; — শাস্ত্রাচার অবলম্বন করার অর্থ প্রকৃত ধর্মাবলম্বন করা। তাঁর ভাষায়;—"ধর্ম্মই শাস্ত্রাচারের মূল।"[২৬] তিনি যুক্তিসহকারে বলেন শাস্ত্রাচার অবলম্বন করলে আয়ু দৃঢ় ও বৃদ্ধি হয়, ধনলাভের পথ সুগম হয়, যশ লাভ হয়, সর্বোপরি পুণ্যবান হওয়া যায়।

অতএব, শাস্ত্রাচার অবলম্বন করার প্রেরণা দিয়ে দেশীয় সমাজকে পতন দশা থেকে মুক্ত করার বাসনায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় বাংলা ভাষায় 'আচার' নামক প্রবন্ধটি রচনা করেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'পারিবারিক প্রবন্ধ', সামাজিক প্রবন্ধ' ও 'আচার প্রবন্ধ'-এর আলোচনা শেষে বলা যায়— স্বদেশীয় পরিবার, সমাজ ও আচার-সংস্কৃতির বিপন্নতার দিনে প্রবন্ধগুলি সঞ্জীবনী শক্তির মতো কাজ করার যোগ্যতা রাখে; যা লেখক তথা প্রাবন্ধিক ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশ ভাবনার পরিচয় বহন করে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? — এই বিষয়টি বঙ্কিমচন্দ্রকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল। 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন;—"এ জীবন লইয়া কি করিব"।[২৭] বঙ্কিমচন্দ্রের এই জীবন-জিজ্ঞাসা তাঁকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর সাহিত্যে এর পরিচয় আছে। বঙ্কিম রচনাসমগ্র অধ্যয়ন করলে মনে হবে—দেশাচারে বিশ্বাসী, ধর্মজ্ঞানহীন, আস্থাহীন, অনুকরণপ্রিয়, দেশাত্মবোধহীন, জাতীয় গৌরববোধহীন বাঙালীকে সচেতন ও সমৃদ্ধ করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য। তিনি মনে করতেন, লোকহিতই ধর্ম এবং দেশপ্রেম শ্রেষ্ঠ ধর্ম। আর এই শ্রেষ্ঠ ধর্ম নিহিত রয়েছে দেশের মানুষের উন্নতি করার সক্রিয়তার মধ্যে। অর্থাৎ স্বজাতির উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা ধরা পড়েছে তাঁর রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনায়—নীতি ও উপদেশ, প্রত্যক্ষ দেশভাবনা, অতীত তথ্য ও তত্ত্বের দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রচার ও বাস্তব জীবনকে সমৃদ্ধ করার প্রেরণার মত বিষয়গুলি আমাদের মনকে আকৃষ্ট করে।

বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় গ্রন্থ রচনা করেন। যথা;—'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'সাম্য', 'কৃষ্ণচরিত্র', ধর্ম্মতত্ত্ব', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা', 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম'। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় রচনার আলোচনা করে স্বদেশ ভাবনার পরিচয় উদ্ঘাটন করা হবে।

লোকরহস্য (১৮৭৪)ঃ

'লোকরহস্য' পাঠ করলে লেখক বঙ্কিমচন্দ্রের রঙ্গ-রসিক মনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই রঙ্গব্যঙ্গ বাণের লক্ষ্য — সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বিজ্ঞাপনে বলেছেন;—"সামাজিক যে সকল দোষ, তাহাতে রহস্য লেখকের অধিকার সম্পূর্ণ। ...এ গ্রন্থে শ্রেণী বিশেষ বা সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই।"(২৮) আসলে সামাজিক যে দোষ ত্রুটিগুলি রয়েছে তাকে ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করে লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সমাজের মানুষগুলিকে নীতিবোধ ও সুস্থ চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। লেখকের এই আন্তরিক আবেদন গ্রন্থটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে। গ্রন্থটির কয়েকটি রচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা হচ্ছে।

১। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল ঃ

এই রচনাটিতে উনিশ শতকে বাঙালীর বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা, সভা-সমিতির সভ্যদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, বাবু সাজার প্রতি কটাক্ষ প্রভৃতি বিষয়ে ব্যঙ্গ ও রসিকতা আছে। ব্যাঘ্রাচার্য্য মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন;—

> "সভাপতি মহাশয়! বাঘিনীগণ এবং ভদ্র ব্যাঘ্রগণ! মনুষ্য একপ্রকার দ্বিপদ জন্তু। ...মনুষ্যেরা ছাগ, মেষ, গবাদিও পালন করে। ... ইহা ভিন্ন হস্তী, উষ্ট্র, গর্দ্দভ, কুক্কুর, বিড়াল, এমন কি, পক্ষী পর্য্যন্ত তাহাদের কাছে সেবা প্রাপ্ত হয়। অতএব মনুষ্য জাতিকে সকল পশুর ভৃত্য বলিলেও বলা যায়।"(২৯)

এই বক্তব্যে বাগাড়ম্বরপ্রিয়তা ও জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন অন্তঃসারশূন্য বাবু সমাজের সভা-সমিতির কথা যা মনে করিয়ে দেয়।

২। ইংরাজ স্তোত্র ঃ

ধন-মান-যশ প্রত্যাশী ইংরেজগুণে মুগ্ধ ইংরেজ-স্তাবক সম্প্রদায়কে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গ-বাণে বিদ্ধ করেছেন। 'ইংরাজ স্তোত্র'-এ ২৮টি ইংরাজ-স্তুতি রয়েছে। এর একটি যেমন;— "হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন—আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।"(৩০)

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এজাতীয় স্তুতি আত্মপ্রত্যয়শীল জাতিকে আহত করে।

৩। রামায়ণ সমালোচনা ঃ

ইউরোপীয় সংস্কৃতির স্তাবকের মুখে রামায়ণের ব্যঙ্গাত্মক সমালোচনা 'রামায়ণ সমালোচনা'। কোন গূঢ় বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হলে যে অধ্যবসায় ও সাধনার প্রয়োজন তার অধিকারী না হয়ে কোন সমালোচনা যে কিরূপ হাস্যকর বিষয় হয় 'রামায়ণ সমালোচনা' তার সার্থক দৃষ্টান্ত

৪। বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর ঃ

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর দেশীয় সাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা ও অনীহার বেদনাতুর রচনা 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর'।

৫। NEW YEAR'S DAY :

বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতিকে অনুকরণ করে রামবাবু ইংরেজী নতুন বছরে শ্যামবাবুকে 'হা ডু ডু' বলে সম্ভাষণ জানালে স্ত্রী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়। স্ত্রী ভেবেছিল এই বয়সে তার স্বামী 'হা ডু ডু' খেলে বিপদ ডেকে আনবে। রামবাবু স্ত্রীকে বিষয়টি বোঝাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে বলে — "মাঃ পাড়াগেঁয়ের হাতে পড়ে প্রাণটা গেল! ওগো হাঁ ডু ডু ডু নয়; হা ডু ডু অর্থাৎ How do ye do উচ্চারণ করিতে হয়, হা ডু ডু'।"[১] আমাদের দেশীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভুলে ইউরোপীয় সংস্কৃতিকে অনুকরণ করার ব্যঙ্গধর্মী রচনা 'NEW YEAR'S DAY'।

৬। হনুমদ্বাবুসংবাদ ঃ

দেশীয় ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি উদাসীন ইংরেজী ভাষা ও সংস্কৃতিতে মুগ্ধ বাবু সম্প্রদায়ের প্রতি ব্যঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণপ্রিয় বাবুদের স্বদেশীয় স্বাধীনতা অর্জনের অলীক স্বপ্নকে ব্যঙ্গকরা হয়েছে।

৭। বাবু ঃ

উনিশ শতকে ইংরেজী সভ্যতার আলোকরশ্মিতে মুগ্ধ একটি সম্প্রদায়, যারা অনুকরণ প্রিয়, মাতৃভাষা-বিরোধী পরভাষাপ্রেমী, আহার-নিদ্রা কুশলী, নেশাখোর, বেশ্যাগৃহে গমনপ্রিয় প্রভৃতি অসভ্য দোষে দুষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্র এইসব মেরুদণ্ডহীন, সুখ-স্বপ্ন বিলাসী ব্যক্তিদের 'বাবু' বলে চিহ্নিত করেছেন

কমলাকান্ত (১২৯২ বঙ্গাব্দ) ঃ

'কমলাকান্ত' গ্রন্থটির তিনটি অংশ 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। শ্রীভীষ্মদেব খোশনবীস 'কমলাকান্তের দপ্তর' সম্বন্ধে বলেন:— "...কখন কখন আমাকে পড়িয়া শুনাইত—শুনিলে আমার নিদ্রা আসিত। ...এই দপ্তরটিতে অনিদ্রার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ আছে—যিনি পড়িবেন,

তাঁহারই নিদ্রা আসিবে।"(৩২) বঙ্কিমচন্দ্র এরকম বিরোধাভাসমূলক বক্তব্য দিয়ে কমলাকান্তের সূচনা করেন। গ্রন্থটি পাঠ করলে দেশ, জাতি, সম্বন্ধে অজ্ঞানতার নিদ্রা ভঙ্গ হবে—একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। বলা যায় 'কমলাকান্ত' নীতিবোধ, কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে তোলার রসসমৃদ্ধ রচনা।

কমলাকান্ত সমাজের আর দশটি মানুষের থেকে আলাদা। সেজন্য তাকে পাগল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে তথাকথিত পাগল বলতে চান নি; তাঁকে সত্যদ্রষ্টা, পথপ্রদর্শক, নীতি ও কর্তব্যসচেতন মনীষী হিসাবে চিত্রিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, তাঁর সৃষ্ট চরিত্রটিকে মানুষ ঠিক মূল্যায়ন করবে। কেননা 'কমলাকান্ত'-এর মূল কথা পরিহাস, রসিকতা বা রঙ্গব্যঙ্গই নয়, এর আবেদন অনেক গভীরে। বলা যায়—দেশবাসীকে নীতি ও দায়িত্ববোধে উদ্দীপ্ত করা ও ঘুমন্ত জাতিকে কৌশলে জাগানোর সদিচ্ছা 'কমলাকান্ত'-এর আবেদনে প্রকাশ পেয়েছে। 'কমলাকান্ত'-এর কয়েকটি রচনা থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

১। একা "কে গায় ওই ?" ঃ

সঙ্গীত আনন্দের উৎস। সংসার সঙ্গীতও আনন্দেপূর্ণ। কিন্তু ঈশ্বর-প্রেমে ও মানব-প্রেমে একটি মহানন্দ আছে। এই আনন্দ জীবনের পরশমণি। এখানে কমলাকান্তের গূঢ় রহস্যালাপের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র পরহিত ব্রতের নীতিকথাকেই তুলে ধরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—"পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না। পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।"(৩৩) বলা বাহুল্য — এই নীতি কথা মানুষকে আত্মসর্বস্ব থেকে বিরত হওয়ার আহ্বান জানায়।

২। বিড়াল ঃ

প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় সমান অধিকারের অস্তিত্ব নেই। দরিদ্রতা — ধনী শ্রেণীর নির্দয়তা ও কৃপণতার ফল। সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ধনীকে তার অর্জিত ধন সাধ্যানুসারে দরিদ্রের কাজে লাগাতে হবে। 'বিড়াল' রচনাটিতে কতগুলি প্রসঙ্গ আছে; যা পাঠককে গভীরভাবে ভাবাতে বাধ্য করে । যথা;— "চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? "(৩৪) কিংবা, "তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ — দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বুঝে না।"(৩৫) বলাবাহুল্য — এই সব একাধিক প্রশ্ন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সাম্যবাদী মনের প্রতিবাদ। রচনাটি মানবিকতার তত্ত্বে সমৃদ্ধ, যা অনুভূতিপ্রবণ মানুষের নিকট যথেষ্ট মর্মস্পর্শী।

৩। ফুলের বিবাহ ঃ

এ পৃথিবীতে জীবন-যৌবন-ধন-মান কোন কিছুই স্থায়ী নয়। 'ফুলের বিবাহ' রচনাটিতে এরকমই একটি দার্শনিক নীতিকথা ব্যক্ত হয়েছে।

৪। স্ত্রীলোকের রূপ ঃ—

কমলাকান্ত ভারতীয় নারীর চিরন্তন গুণাবলী চর্চার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, নারীর রূপ চর্চা সমাজের পক্ষে অমঙ্গলকর। রূপ চর্চায় কোন ইতিবাচক দিক নেই,—এতে নারী মহিমান্বিত না হয়ে বরং ভোগ্য বা দাসীতে রূপান্তরিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "রূপ রূপ করিয়া স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে। ...ইহাতেই মনুষ্য সমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব। ... আমি শুনিতে চায় যে, নারীজাতির রূপাপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে, লক্ষগুণে, কোটীগুণে মহত্ত্বের গুণ আছে। আমি শুনিতে চায় যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি।"[৩৬]

তাই কমলাকান্ত বঙ্গদেশের নারীদের রূপচর্চার পরিবর্তে সেবা, শুশ্রূষা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ প্রভৃতি গুণের অধিকারী হয়ে দেশ ও সমাজ গঠনে সহায়ক হবার আহ্বান করেন।

৫। আমার মন ঃ

পাশ্চাত্য সভ্যতা এদেশের মানুষগুলিকে ধন, মান, যশ, ইন্দ্রিয় তৃপ্তির মতো বাহ্যসুখমুখী ও আত্মকেন্দ্রিক করে তুলেছে। এই বাহ্যসুখমুখিনতা এবং আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে পরার্থপরতার নৈতিক মন্ত্রে দীক্ষিত করার জন্য 'আমার মন' রচিত হয়। কেননা, কমলাকান্ত বলেছেন;—"আমি অনেক অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল নাই।"[৩৭]

৬। আমার দুর্গোৎসব ঃ

এখানে বঙ্গমায়ের পরাধীনতার বিষয়টি প্রকাশিত হয়েছে। তবে বলা হয়েছে, এখন বঙ্গভূমি নিঃস্ব হলেও একদিন বাঙালী তাকে ঐশ্বর্যময়ী করে তুলবে। এর জন্য প্রয়োজন সচেতনতা। 'আমার দুর্গোৎসব' রচনাটিতে বাঙালীকে সচেতন করার উত্তেজনাপূর্ণ বক্তব্য রয়েছে। বিষন্নতার সঙ্গে বলা হয়েছে—"মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"[৩৮] বঙ্গমায়ের পরাধীনতার জন্য দায়ী অলসতা, অধর্ম, ভ্রাতৃবিরোধ, ইন্দ্রিয়াসক্তির মতো বিষয়কে ত্যাগ করার কথা বলা হয়েছে। রচনাটিতে প্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রেম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ।

৭। একটি গীত ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাটিতে গভীর মর্মবেদনা ধ্বনিত হয়েছে। এ বেদনা দেশমাতৃকার পরাধীনতার জন্য এক সুসন্তানের অন্তর্বেদনা। ১২০৩ সালের যেদিন থেকে যবন এদেশের স্বাধীনতা হরণ করেছিল সেদিন

থেকেই বাঙালীর সমস্ত সুখ কালগ্রাসে পরিণত হয়েছে। আজ দেশজননীর ঐশ্বর্য লুপ্ত, শুধু রয়েছে স্মৃতিটুকু। আর সেজন্যই স্বদেশপ্রাণ সন্তানের বক্তব্য বাঙালীর সুখের কথায় কোন অধিকার নেই।

৮। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব ঃ

আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অনুগ্রহ আদায়ের দ্বারা বেঁচে থাকার মতো পৌরুষহীনতাকে লক্ষ করে 'বাঙালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধটি রচিত হয়। একটি অংশে কালো ভ্রমর বলেছে;— "দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমি শুধু ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করি না — মধু সংগ্রহ করি আর হুল ফুটাই"(৩৯) কালো ভ্রমরের এই বক্তব্যের দ্বারা সমকালীন বাঙালীর ব্যক্তিত্বহীনতার ছবি স্পষ্ট হয়েছে।

৯। কমলাকান্তের জোবানবন্দী ঃ

একদিকে মানবিকতা, দরদ ও সহানুভূতি আর একদিকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকতার প্রতি বিদ্রূপমূলক বিষয় রহস্যময়তার দ্বারা পরিবেশিত হয়েছে। বিষয়টি কমলাকান্তের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট করা যেতে পারে। কমলাকান্ত বলেন;—"গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্করভোগ্যা। সেকেন্দর হইতে রণজিৎ সিংহ পর্য্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of conquest যদি একটা right হয়, তবে Right of theft, কি একাটা right নয়? অতএব, হে প্রসন্ন নামে গোপকন্যে! তুমি আইন মতে কার্য্য কর। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্ত্তী হও। চোরকে গরু ছাড়িয়া দাও।"(৪০)

অতএব 'কমলাকান্ত' গ্রন্থটি মানবিকতা বোধ, দেশপ্রেমের ভাবনা, নেতিবাচক বাঙালী মনোভাবের সমালোচনা প্রভৃতি নানামুখী ভাবনায় সমৃদ্ধ। যার মূল লক্ষ বাঙালীর চেতনার বিকাশ ঘটানো। এবং যাকে বাঙালীর স্বদেশ ভাবনা বললে অতিশয়োক্তি হয় না।

মুচিরামগুড়ের জীবনাচরিত (১৮৮০) ঃ

অযোগ্য ব্যক্তির উচ্চপদ প্রাপ্তি 'মুচিরামগুড়ের জীবনাচরিত' এর বিষয়। ভাগ্যের সহায়তায় অনেকসময় বড় হওয়া যায়, মুচিরাম তার দৃষ্টান্ত। এই রচনাটি একটি সামাজিক দলিল বিশেষ, যা নির্বাচকদের ভুলের ফলে ভাগ্যহত যোগ্য ব্যক্তির নির্বাচিত না হওয়ার বিষন্নতাকে মনে করিয়ে দেয়। এখানে পদপ্রাপ্ত অযোগ্য ব্যক্তির পদাধিকারকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে।

বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসংগ্রহ (১৮৭৫) ঃ

আধুনিক বিজ্ঞানকে এড়িয়ে বাঙালী জাতিকে সব্যসাচী করা যাবে না,—তা যুগচিন্তা নায়ক বঙ্কিমচন্দ্র বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি একাধিক রচনায় দৃপ্ত কণ্ঠে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে বরণ করার আহ্বান জানান।

'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা' নামক প্রবন্ধে লেখকের বিজ্ঞানানুশীলনের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এই প্রবন্ধটিকে লেখকের বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগের মুখপত্র হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এতে একদিকে বিজ্ঞানকে বরণ করার প্রেরণা যেমন ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার জন্য গৌরববোধ এবং সমকালের বিজ্ঞান-চেতনাহীনতার জন্য আক্ষেপ ধ্বনিত হয়েছে। বাঙালী জীবনে বিজ্ঞান-চেতনাহীনতা প্রসঙ্গে চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হতাশার সুরে বলেন;—

> "হা অদৃষ্ট! বিজ্ঞান অবহেলার এই ফল। বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, বিজ্ঞান তাহাকে ভজিবে। কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে, বিজ্ঞান তাহার কঠোর শত্রু। ...যে বিজ্ঞান স্বদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া আমাদের প্রভু হইয়াছে।"[৪১]

প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে বাঙালী জীবনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানকে সাদরে বরণ করার আন্তরিক আবেদন ধ্বনিত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানী নন্, লেখক। তাঁর আর একটি বড় পরিচয়— তিনি দেশপ্রেমিক। দেশবাসীর বিজ্ঞান-চেতনাহীনতা তাঁকে ব্যথিত করেছে। জাতিকে সমৃদ্ধ করতে হলে বিজ্ঞান চেতনা জরুরি। বঙ্কিমচন্দ্র বিজ্ঞানচেতনার লক্ষে হক্সলী, টিণ্ডল, প্রকটর, লকিয়র, লায়েল প্রমুখ বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের নব আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব 'বিজ্ঞান রহস্য' নামক প্রবন্ধ গ্রন্থের বিষয় করেন। 'বিজ্ঞান রহস্য' বা 'বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সংগ্রহ' এর প্রবন্ধগুলি যথাক্রমে;—'আশ্চর্য্য সৌরোৎপাত', 'আকাশে কত তারা আছে?', 'ধূলা', 'গগন পর্য্যটন', 'চঞ্চল জগৎ', 'কত কাল মনুষ্য', 'জৈবনিক', 'পরিণাম-রহস্য', 'চন্দ্রালোক'।

উক্ত প্রবন্ধের বিষয়গুলি বাঙালী কোন দিন যে ভাবেনি, তা নয়। বাঙালী সমাজ যতটুকু জেনেছে— তার সবটাই প্রায় ভুলে ভরা। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর ভুল শুধরে দিয়ে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য 'বিজ্ঞানরহস্য' প্রবন্ধ গ্রন্থের অবতারণা করেন। বিজ্ঞাপনে প্রাবন্ধিক গ্রন্থের উদ্দেশ্যের বিষয়ে বলেন;—

> "এই সকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্সলী, টিণ্ডল, প্রক্টর, লকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। ...লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন।"[৪২]

প্রাবন্ধিকের স্বীকৃতি থেকে স্পষ্ট —'বিজ্ঞানরহস্য' বাঙালীর বিজ্ঞানচেতনা জাগ্রত করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত।

বিবিধ প্রবন্ধ (১৮৮৭-১৮৯২)ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের বিবিধ প্রবন্ধ দু-খণ্ডে বিভক্ত। প্রবন্ধ সংখ্যা ১৬+২২=৩৮টি। গ্রন্থটির নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে প্রাবন্ধিক বিবিধ বিষয়ের প্রবন্ধকে স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল জাতির আত্ম-উন্মোচন ঘটানো। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি সমাজ, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে জাতিকে প্রয়োজনীয় নীতি-উপদেশ দিয়েছেন। আবার কখনো আত্ম-বিস্মৃত জাতির ইতিহাস উদ্ধার করে আত্মবিশ্বাসে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। এখানেই শেষ নয়— ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।

'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর রচনাগুলিকে এখানে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হল। যথা;—

ক) নব-শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি পথ নির্দেশিকা।

খ) সামাজিক পথ নির্দেশিকা জাতীয়

গ) আর্থ-রাজনৈতিক ভাবনা

ঘ) ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক

ঙ) ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক

ক) নব-শিক্ষিত শ্রেণীর প্রতি পথ নির্দেশিকা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র জাতির দুরবস্থা দূরীকরণ কার্যে উনিশ শতকের সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীকে সবসময় উৎসাহ দিতেন। 'বিবিধপ্রবন্ধ' গ্রন্থে 'লোকশিক্ষা', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রভৃতি কয়েকটি রচনায় নব-শিক্ষিতের প্রতি পথনির্দেশিকার পরিচয় পাওয়া যাবে।

১। লোকশিক্ষা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, জাতীয় জীবনের মান উন্নয়নের পিছনে লোকশিক্ষার বিরাট অবদান থাকে। সমসাময়িক কালে লোকশিক্ষার মান লোপ পাওয়ায় জাতীয় জীবনের মান তলানিতে ঠেকেছিল। তিনি এর জন্য আধুনিক আত্মকেন্দ্রিক শিক্ষাকে অভিযুক্ত করেন। বলেন;—

> "অল্প ইংরেজিতে শিক্ষিত স্বধর্ম্মভ্রষ্ট, কদাচার, দুরাশয়, অসার, অনালাপ্য, বঙ্গীয় যুবকের দোষে লোকশিক্ষার আকর কথকতা লোপ পাইল। ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্দ্ধিত হইতেছে না।" (৪৩)

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লোকশিক্ষার পূর্ব-প্রক্রিয়া লুপ্ত হওয়ায় হতাশ হয়েছেন। কিন্তু নিরাশ হন নি। তিনি বাংলার সুশিক্ষিত লোকেদের উপর সে দায়িত্ব অর্পণ করে বলেন;—"সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে

ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্ব্বত্রে প্রচারিত হওয়া আবশ্যক।" (৪৪) এভাবে শিক্ষিত ব্যক্তির নৈতিক চেতনার উন্নতি ঘটলে লোকশিক্ষা নবরূপে প্রবর্তন হতে পারে এবং জাতীয় জীবনের মান ক্রমশ উর্ধ্বমুখী হবে।

২। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ঃ

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বাঙালী ও বাঙালীর সাহিত্য বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার নতুন লেখকদের প্রতি ১২ (বার)টি উপদেশ দিয়েছেন। তার মধ্যে —টাকা ও যশের জন্য লিখতে বারণ করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মানুষের বা দেশের মঙ্গলের জন্য, সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য, ন্যায় ও সত্যের জন্য প্রভৃতি বিষয়ে লেখার উপদেশ দিয়েছেন। নব্যলেখকের প্রতি তাঁর উপদেশের দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়;—

> "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।" (৪৫)

এই বক্তব্যে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে মানুষের প্রয়োজনের সামগ্রী রূপে গণ্য করেন। অর্থাৎ সাহিত্য মানুষের প্রয়োজনে বা দেশের প্রয়োজনে অতিপ্রয়োজনীয় একটি সামগ্রী; কিংবা সৌন্দর্যরস সৃষ্টির প্রয়োজনে সাহিত্য একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ। বঙ্কিমচন্দ্র মহৎ উদ্দেশ্যে বাংলার নব্য-লেখকদের মহৎ উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। এর ব্যতিক্রম হলে বাংলা সাহিত্য ও বাঙালীর অপূরণীয় ক্ষতি হবে। এবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এরকম;—"বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের দ্বারা রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।"(৪৬)

অতএব বলা যায়, 'বাঙ্গালার নব্যলেখকদিগের প্রতি নিবেদন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র নব্যলেখকদের প্রতি নানা নীতি-উপদেশ দিয়ে দেশের মঙ্গল ও বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির পরিকল্পনা করেন।

৩। বাঙ্গালা ভাষা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙালীকে উপদেশ দিয়েছেন; শিক্ষিত বাঙালীর সার বাঙালী লেখক,—তাঁদেরও উপদেশ দিয়েছেন; এবার বাঙালীর আদরের ধন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতি কেমন হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক প্রবন্ধে উপদেশ দিয়েছেন। তিনি একাধিক যুক্তিপূর্ণ মতামত দিয়ে শেষে বলেন—প্রকাশিত বক্তব্যকে স্পষ্ট করা জরুরি। ভাষাকে সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন হলে অশ্লীল ভাষা, ভিন্ন ইংরেজী,

ফার্সি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য যে ভাষারই শব্দ হোক না কেন — প্রয়োজনে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। রচনাকে সৌন্দর্যে ভূষিত করা প্রয়োজন। কেন না, সুন্দর রচনা মনোগ্রাহী হয়। সহজ ভাষায় লেখার দিকে নজর দেওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা ভাষার এরকম রীতির প্রতি সুগভীর আশাবাদী। তাঁর ভাষায়;—"ইহাই আমাদের বিবেচনায় বাঙ্গালা রচনার উৎকৃষ্ট রীতি। ...এই রীতি অবলম্বন করিলে, আমাদিগের বিবেচনায় ভাষা শক্তিশালিনী, শব্দৈশ্বর্য্যে পুষ্টা এবং সাহিত্যালঙ্কারে বিভূষিতা হইবে।"[৪৭]

খ) সামাজিক পথ নির্দেশিকা জাতীয় রচনা ঃ

দেশীয় সমাজে প্রচলিত কিছু আচার সংস্কার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তিসিদ্ধ পথ-নির্দেশিকা বেশ কিছু প্রবন্ধের বিষয়।

১। অনুকরণ ঃ

বাঙালীর অতিরিক্ত অনুকরণপ্রিয়তা বিষয়ে উনিশ শতকের অনেক যুগচিন্তা নায়ক আশঙ্কিত ছিলেন। চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্রও অনুকরণকারীর দু'টি শ্রেণী করেছেন;— প্রতিভাশালীর অনুকরণ ও প্রতিভাহীনের অনুকরণ।

বঙ্কিমচন্দ্র একমুখী আক্রমণাত্মক সমলোচনা না করে বলেন — প্রতিভাশালীর অনুকরণ সবসময় দোষের নয়। তাঁর ভাষায়;—"যে শিশু প্রথম লিখিতে শিখে, তাহাকে প্রথমে গুরুর হস্তাক্ষরের অনুকরণ করিতে হয়—পরিণামে তাহার হস্তাক্ষর স্বতন্ত্র হয়, এবং প্রতিভা থাকিলে সে গুরুর অপেক্ষা ভাল লিখিয়াও থাকে।"[৪৮] প্রাবন্ধিক বিশ্বাস করতেন সুপ্ত প্রতিভাশালী বাঙালী জাতি অনুকরণ করতে করতে একদিন স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আসবেই। সঙ্গে সাবধানী বাণী শুনিয়ে বলেন—শুধু অনুকরণে মজে থাকলে সর্বনাশ হতে বাধ্য। অতএব বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় স্বার্থে অনুকরণ নামক সামাজিক ব্যাধিকে নিষিদ্ধ না করে সমকালের রুগ্ন জাতির প্রয়োজনে অনুকরণকে স্বাগত জানান।

২। প্রাচীনা ও নবীনা ঃ

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সংস্পর্শে দেশীয় সমাজে যে আধুনিকতা প্রবেশ করে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে নির্বিচারে সমর্থন করেন নি। যাঁরা আধুনিক নারী-শিক্ষার সমর্থক, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করেন;— "যাঁহারা স্ত্রী শিক্ষায় ব্যতিব্যস্ত, তাঁহাদিগের আমরা জিজ্ঞাসা করি, যে, আপনারা বালিকাদিগের হৃদয় হইতে প্রাচীন ধর্ম্ম বন্ধন বিযুক্ত করিতেছেন, তাহার পরিবর্ত্তে কি সংস্থাপন করিতেছেন?"[৪৯] অনেক রুচিহীন আধুনিকতার চেয়ে তিনি অনেক প্রাচীন আচারকে সমর্থন করেন। সমকালের আধুনিক নারীর প্রকৃত পরিচয় এবং জাতীয় স্বার্থে তাদের গতিবিধি কতখানি অনুকূল — প্রবন্ধের বক্তব্যে তা তুলে ধরা হয়েছে।

তিনি যুক্তিসহকারে প্রমাণ করেন — আধুনিক নারীগণ প্রাচীন নারীর তুলনায় অলস ও ধর্মহীন। এতে সমাজে নানারকম অসঙ্গতি দেখা দিয়েছে। যথা;—আধুনিকারা রুগ্ন, গৃহকার্যে অপটু তাদের সন্তান-সন্ততি দুর্বল। এইসব ধর্মজ্ঞানহীন আধুনিকারা পতিব্রতা, অতিথি সেবা, দানশীলতা প্রভৃতি দেশীয় আচার প্রথায় নিরুৎসাহী। যে ধর্মপ্রাণতা বা ধর্মমনস্কতা জাতির বৈশিষ্ট্য —তা এদের জন্য ক্রমশ বিপন্ন প্রায়।

৩। বহুবিবাহ ঃ

'বহুবিবাহ' নিবারণ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সুচিন্তিত মত ও পথের সীমাবদ্ধতাকে বিষয় করে 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি রচিত হয়। বঙ্কিমের মতে — বহুবিবাহ নিবারণ করতে বিদ্যাসাগর শাস্ত্রীয়যুক্তি নামক যে অস্ত্রটি ব্যবহার করেছেন, এককথায় সে কৌশল অসম্পূর্ণ। বিদাসাগরের বহুবিবাহ নিবারণের মতো সাধু উদ্দেশ্য বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করলেও সমাজ সংস্কারের পদ্ধতিকে মেনে নেন নি। অর্থাৎ শুধুমাত্র শাস্ত্রীয় যুক্তির দ্বারা স্বজাতীর জন্য মহৎ কোন কাজ সম্পন্ন করা যাবে না। পরোক্ষে সে কথাই বলা হয়েছে।

৪। রামধনপোদ ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী চরিত্রের তেজহীনতার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে বাঙালীর অপরিকল্পিত পরিবার ব্যবস্থার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। বাল্যবিবাহ, পরিবারের আয়ের অসংকুলান, একাধিক সন্তান-সন্ততি জন্ম দেওয়ার প্রবণতা প্রভৃতি বিষয় বাঙালীকে ক্রমশ তেজহীন করে তুলেছে। বাঙালীর অধঃপাতে যাওয়ার ইতিকথা 'রামধনপোদ' প্রবন্ধের মূল বক্তব্য।-বঙ্কিমচন্দ্র রামধনপোদের মতো অসচেতন ব্যক্তিদের সুপরিবার গঠনের কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে হতাশার সঙ্গে বলেন;—"...এমন নির্ব্বোধ জাতি আর কোন দেশে নাই।"[৫০]

প্রবন্ধের শেষ বক্তব্যে শোনা যায়,— বাঙালী পরিবারের পরিকল্পনাহীনতাই জাতিকে ক্রমশ দুর্বল ও কূপমণ্ডুপ করে তুলেছে।

গ) আর্থ-রাজনৈতিক ভাবনা ঃ

দেশের অর্থনীতি-রাজনীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সুচিন্তিত ভাবনা ব্যক্ত হয়েছে 'ভারত কলঙ্ক', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি', 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রভৃতি প্রবন্ধে।

১। ভারতকলঙ্ক ঃ

ভারতবাসী দুর্বল জাতি; সেই জন্য দীর্ঘদিন পরাধীন। —এ কলঙ্কের তীব্র বিরোধিতা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি বলেন, অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। পারমার্থিক বিষয়কে এঁরা

যতখানি গুরুত্ব দিয়েছে, বহির্জীবনের অন্তর্গত রাজনৈতিক বিষয়কে সামান্যতম গুরুত্ব দেয় নি। আসলে দেশের জাতীয় চরিত্র রাজনৈতিক বিক্রমকে সর্বাগ্রে স্থান দেয় নি।

তবে প্রাবন্ধিক আশার কথাও শুনিয়েছেন। নতুন যুগের নতুন শিক্ষা ভারতবাসীকে ক্রমশ রাজনৈতিক সচেতন করে তুলেছে। জাতির 'স্বাতন্ত্র্যতা' অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও জাতি হিতৈষণা বা দেশপ্রেমের মনোভাব রাজনৈতিক চেতনালাভের ক্ষেত্রে দুটি মৌলিক গুণ।

২। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র 'ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে সাধারণ ভারতবাসীর রাজনৈতিক উদাসীনতার কথা বলেছেন। কিন্তু আলোচ্য প্রবন্ধে তিনি বলেন—প্রাচীন ভারতে প্রশাসকের নিকট রাজনীতি অত্যন্ত আদরণীয় ছিল। প্রবন্ধের প্রথমেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "মহাভারতের সভাপর্ব্বে দেবর্ষি নারদ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্নচ্ছলে কতকগুলি রাজনৈতিক উপদেশ দিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজনীতি কত দূর উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছিল, উহা তাহার পরিচয়। মুসলমানদিগের অপেক্ষা হিন্দুরা যে রাজনীতিতে বিজ্ঞতর ছিলেন, উহা পাঠ করিলে সংশয় থাকে না। প্রাচীন রোমক এবং আধুনিক ইউরোপীয়গণ ভিন্ন আর কোন জাতি তাদৃশ উন্নতি লাভ করিতে পারে নাই।"[৫১]

বঙ্কিমচন্দ্র 'মহাভারত'-এর 'নারদবাক্য' থেকে তথ্য সংগ্রহ করে 'প্রচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি' প্রবন্ধটি রচনা করেন। প্রবন্ধটিতে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি প্রশংসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেকালের সুশাসন ব্যবস্থার জন্য প্রাবন্ধিক পরোক্ষে গৌরববোধ করেন।

৩। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, শাসক স্বদেশীয় হলেই দেশের অধিকাংশ মানুষ সুখী হবে এমন নয়। সুপ্রশাসক বিজাতীয় হলেও দেশের অধিকাংশ মানুষ সুখী হতে পারে। প্রাচীন ভারতে শাসক স্বজাতীয় বা দেশীয় ছিল কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ সুখী ছিল না। অন্যদিকে উনিশ শতকের আধুনিক পরাধীন ভারতবর্ষে দেশীয় উচ্চজাত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্প্রদায়ের মানুষ পূর্বের সুযোগ সুবিধা হারিয়েছেন। দেশের পরাধীনতার পরেও বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে শিক্ষা লাভের সুযোগ এসেছে এবং প্রাচীন ভারতের বর্ণবৈষম্যের দুঃষহ প্রকোপ এখন তত ভয়াবহ নয়। অতএব বিদেশী ইংরেজের নিকট দেশের পরাধীনতা শুধুই বেদনাদায়ক একঘেয়েমীর ইতিহাস নয়। বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়ার পরেও বর্ণ নির্বিশেষে দেশে শিক্ষা লাভের সুযোগ তৈরী হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন।

৪। বঙ্গদেশের কৃষক ঃ

বঙ্গদেশ পরাণ মণ্ডলদের দেশ। পরাণ মণ্ডল বাংলার অগণিত কৃষক শ্রেণীর প্রতিনিধি মূলক চরিত্র — কৃষি যাঁদের একমাত্র জীবিকা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থ লালসার অন্যতম প্রকল্প 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' ধীরে ধীরে বাংলার কৃষক শ্রেণীকে সর্বহারা করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন—এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের শতকরা দু-একজন মানুষের মঙ্গল হয়েছিল। 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটিতে বাংলার অধিকাংশ মানুষের উপর অর্থনৈতিক শোষণ ও নিষ্পেষণের চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ) ধর্ম্ম ও দর্শন বিষয়ক ঃ

ধর্মের প্রকৃত রূপের পরিচয় এবং জীবনপথ চলার প্রকৃত দর্শন কিরকম হওয়া উচিত 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধে তার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা;—

১। ধর্ম্ম ও সাহিত্য ঃ

সাহিত্য ও ধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে অনেক উঁচুতে স্থান দিয়েছেন। ধর্মের প্রতি সমাজের সাধারণ মানুষের অনাগ্রহের জন্য প্রচলিত বিকৃত ধর্মীয় রূপকে দায়ী করেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—ধর্ম জীবনের উন্নতি সাধনের উপায় ও পরিপূর্ণ আনন্দলাভের প্রয়োজনীয় বস্তু। ধর্মের অনিবার্য ফল হল ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি, মানুষের প্রতি গভীর ভালবাসা এবং আপন হৃদয়ে প্রশান্তি প্রাপ্তি। সাহিত্যে এগুলির আংশিক প্রকাশ থাকে। পরিশেষে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে ধর্মীয় বিষয়ে আগ্রহী হবার আবেদন জানান।

২। চিত্তশুদ্ধি ঃ

'ধর্ম্ম ও সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মকে জীবনের পরশমণির মতো শ্রেষ্ঠ অলংকার রূপে ব্যাখ্যা করেন। 'চিত্তশুদ্ধি' প্রবন্ধে চিত্তশুদ্ধির দ্বারা ধর্মকে লাভ করার কথা বলেছেন। চিত্তশুদ্ধির স্তরগুলি হল;—ইন্দ্রিয় সংযম, মানুষের প্রতি ভালবাসা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি। কারো জীবনে ইন্দ্রিয়সংযম, ঈশ্বরে ভক্তি ও মানুষের প্রতি ভালবাসা থাকলে তাঁর চিত্তশুদ্ধি হয়েছে বলতে হবে। প্রসঙ্গত বলা যায়—বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ যে আদর্শের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেন 'চিত্তশুদ্ধি' তার ক্ষুদ্রতম সংস্করণ।

৩। গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি ঃ

এই প্রবন্ধে হিন্দু সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও উপসম্প্রদায়ের গোঁড়ামী ও প্রচলিত কিছু ভ্রান্ত মত এবং পথের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়;—"...একজনই সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, এবং

সংহারকর্ত্তা। হিন্দুধর্ম্মে এক ঈশ্বর ভিন্ন তিন ঈশ্বর নাই।"[৫২] তিনি লিখেছেন, হিন্দুধর্মে সর্বত্র সমদর্শী হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর তাই জাত-পাত ভুলে বিধর্মী কছিমদ্দী সেখের বাড়িতে মুরগীর মাংস খাওয়ার মধ্যে কোনরকম অপরাধ দেখতে পান নি। আলোচ্য প্রবন্ধটি প্রবন্ধটি আগাগোড়া নীতিকথায় পূর্ণ।

ঙ) ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস বিষয়ক রচনাগুলি দেশানুরাগের ফসল। বাঙালীর কোন ইতিহাস ছিল না —এটি একটি কলঙ্ক। বঙ্কিমচন্দ্র এই জাতীয় কলঙ্ক মোচনের জন্য প্রত্যেক সচেতন বাঙালীকে আহ্বান জানান। 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর 'বিজ্ঞাপন'-এ বঙ্কিমচন্দ্র বলেন;—

> "বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রিত হইল, তাহার দর বড় বেশী নয়। এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম, বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া, একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। ...যে দরিদ্র, সে সোনা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না? বাঙ্গালিতে বাঙ্গালার ইতিহাস যে যাহাই লিখুক না কেন, —সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি।"[৫৩]

'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে।

১। বাঙ্গালার ইতিহাস ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, ভারতীয়দের ইতিহাসে অনীহা দীর্ঘকালের। কেননা, এঁরা অত্যন্ত দৈবানুগ্রহ। এঁদের ধারণা ইহজগতে সবকিছুর পিছনে মানুষ নয়, দেবতার হাত রয়েছে। সেজন্য তাঁরা মানুষের ইতিহাস রচনায় আগ্রহী নয়; যতটা আগ্রহী পুরাণ বা দেবতার ইতিহাস রচনায়। বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় জীবনে ইতিহাসের গুরুত্বকে অস্বীকার করেন নি। তিনি বাঙালীর ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। যথা;—

এক । প্রাচীন বাঙালীর উপনিবেশ স্থাপন।

দুই । বাঙালীর বিশাল সাম্রাজ্য ছিল।

তিন । ১৭ জন সেনার দ্বারা তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের কাহিনী মিথ্যা।

চার । পাঠান যুগে বাঙালীর সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছিল। কেননা, তখনও বাঙালী পূর্ণ পরাধীন হয় নি।

পাঁচ । মুঘলদের দ্বারাই বাঙালীর পূর্ণ পরাধীনতা প্রাপ্তি।

এইসব তথ্যের দ্বারা ইতিহাসহীন বাঙালীর প্রাচীন গৌরব যেমন ব্যক্ত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে জাতির ইতিহাস বিষয়ে অনুসন্ধান ও তার উদ্‌ঘাটনের মানসিকতা দেখা যায়।

২। বাঙ্গালার কলঙ্ক ঃ

বাঙালী দুর্বল;—বঙ্কিমচন্দ্র স্বজাতির প্রতি এরকম অভিযোগের প্রতিবাদ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন;—

> "যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বর ও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন।"[৫৪]

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র নানা তথ্যের দ্বারা জাতির বীরত্বের প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বাংলার ইতিহাসের নানা তথ্য উদ্ধার করে বলেন — দিগ্বিজয়ী গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডার এই বঙালীদের সমীহ করেছিলেন ও বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী মুসলমান শাসকগণ কোনদিন সমগ্র বাংলাকে পদানত করতে পারে নি। আরো অনেক তথ্যের উল্লেখ করে বঙ্কিম বাঙালীকে রাজপুত জাতির সঙ্গে তুলনা করেন।

৩। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা ঃ

বঙ্কিমচন্দ্রের স্থির বিশ্বাস ছিল, বাঙালীর ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাস গৌরবের। তাই তিনি সেই ইতিহাস অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষিত বাঙালীকে আহ্বান করেন। শুধু তাই নয়, কিভাবে এবং কি কি বিষয়ে গবেষণা করতে হবে তারও একটি প্রাথমিক খসড়া দেন। আসলে স্বজাতির ইতিহাস না থাকায় বঙ্কিমচন্দ্র অপমানবোধ করতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, জাতির মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে ইতিহাসের একটি বড় ভূমিকা থাকে। সেজন্য বঙ্কিমচন্দ্র বলেন;— "বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়, —হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? ...বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না।"[৫৫] এখানে স্বজাতির ইতিহাসের জন্য অকৃত্রিম মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৪। বাঙ্গালীর উৎপত্তি ঃ

বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' বিষয়ে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও গবেষণার দ্বারা শেষে একটি যুক্তিসিদ্ধ মত দান করেন। তাঁর মতে, —কোল বংশীয় অনার্য, দ্রাবিঢ় বংশীয় অনার্য এবং আর্য বংশের মিশ্রণে বাঙালীজাতির উৎপত্তি। তিনি সমীক্ষা করে সমকালের বাঙালীর চারটি অংশের নির্দেশ করেন, যথা;—বিশুদ্ধ আর্য, অনার্য হিন্দু, আর্য অনার্য এবং মুসলমানধর্মে দীক্ষিত একটি জনগোষ্ঠী।

আমরা 'বাঙ্গালীর উৎপত্তি' প্রবন্ধে জানতে পারি— বাঙালী মানে দু-চারজন আর্য বংশীয় ব্রাহ্মণ নয়, বাঙালী জাতি একটি মিশ্রিত জাতি।

অতএব 'বিবিধ প্রবন্ধ' আলোচনা শেষে বলা যায়, নবশিক্ষিত বাঙালীকে সঠিক পথ-নির্দেশ, সাধারণ বাঙালীকে সামাজিক পথ-নির্দেশ, দেশীয় মানুষের নিকট আর্থ-রাজনৈতিক ভাবনার প্রচার, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে ভাবনার প্রচার এবং দেশীয় ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে লেখকের মনোভাবে সুগভীর স্বদেশ ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। কেননা 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর একমাত্র উদ্দেশ্য দেশবাসীর মঙ্গল সাধন। কখনো তা বাঙালীকে সঠিক পথনির্দেশের দ্বারা ব্যক্ত হয়েছে, কখনো দেশীয় আচার-সংস্কৃতি-ইতিহাস প্রচারের দ্বারা চেতনার বিকাশ ও আত্মবিশ্বাস জাগরণের প্রতি নজর দেওয়া হয়েছে — যা স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

সাম্য (১৮৭৯) ঃ

এদেশের সাধারণ নরনারীর অধিকারের অন্যায় বৈষম্যে বঙ্কিমচন্দ্র গভীরভাবে ব্যথিত ছিলেন। 'সাম্য' প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের এই গভীর বেদনার শিল্পরূপ; এটি বৈষম্য সমাধানের আকাঙ্ক্ষায় রচিত।

ভারতবর্ষ এমনিতেই পরাধীন। তার উপর বৈষম্য নামক অপ্রাকৃতিক একাধিক কারণের জন্য সমাজের অধিকাংশ মানুষ নির্যাতিত। এরা হলেন এদেশের কৃষক সম্প্রদায় ও এদেশের নারী সম্প্রদায়।

কৃষি প্রধান এই দেশে প্রায় সবাই কৃষক। এইসব কৃষকদের নানান দুর্দশার মধ্য দিয়ে জীবনযাপন করতে হয়; তার প্রতীকী চরিত্র পরাণ মণ্ডল। অনেক ক্ষেত্রে 'জমীদার', নায়েব, গোমস্তা, ইজারাদার, পত্তনিদার, মহাজন প্রভৃতি পরগাছা শোষক শ্রেণীর লোভে দেশের কৃষকের যে দুর্দশা ঘটে — সেই চিত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে অঙ্কন করেছেন।

পরিশেষে প্রজা-হিতৈষী স্বদেশ প্রেমিক জমিদারের নিকট বঙ্কিমচন্দ্র আবেদন করেন—তাঁরা যেন এই অত্যাচারের ইতি টানতে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর ভাষায়;—"এই কলঙ্ক অপনীত করা, জমীদারদিগের হাত। ...জমীদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ।"[৫৬] বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন—"সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা।"[৫৭] অর্থাৎ বাংলার অত্যাচারিত কৃষক সম্প্রদায় জমিদারী অরাজকতার হাত থেকে যেন রক্ষা পায় — 'সাম্য' গ্রন্থ রচনার এটি একটি অন্যতম উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষের নারী সমাজ দীর্ঘদিন ধরে অপমানিত, অবহেলিত, নির্যাতিত। বঙ্কিমচন্দ্র স্ত্রী-পুরুষ বৈষম্যের বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেন;— "স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকা ন্যায়সঙ্গত, ইহা আমরা স্বীকার করি না।"[৫৮] বঙ্কিমচন্দ্র বলেন — পুরুষের মতো নারীরও শিক্ষার অধিকার, পুনর্বার বিবাহের অধিকার, সম্পত্তির অধিকার প্রভৃতি থাকা উচিত।

দেশীয় নারী সম্প্রদায়ের প্রতি এরূপ অন্যায় বৈষম্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন শিক্ষিত শ্রেণীকে

এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেন। কেননা তিনি জানতেন, দেশের অর্ধেক অধিবাসী-নারী জাতির উন্নতি না হলে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়।

'সাম্য' গ্রন্থটি দেশের কৃষক সম্প্রদায় ও নারী সম্প্রদায়ের সমর্থনে, তাদের অধিকার আদায়ের উদ্দেশ্যে শিক্ষিত সচেতন পাঠক, নাগরিকের নিকট আন্তরিক আবেদন — যাকে জাতীয় দুরবস্থা মোচনের একটি দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপ বলা যায়।

কৃষ্ণচরিত্র (১৮৮৫, ১৮৯২)ঃ

জাতির জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের সুচিন্তিত পরামর্শের অন্যতম গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র'। গ্রন্থটি রচনার পিছনে লেখকের মূলত দু'টি উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে। প্রথমতঃ শ্রীকৃষ্ণ এদেশের মানুষের নিকট ঈশ্বররূপে কল্পিত কিন্তু লোকসমাজে তাঁর চরিত্র বড় কলঙ্কিত। সাধারণ মানুষ জানে — শ্রীকৃষ্ণ বাল্যে চোর (ননীচোর), যৌবনে ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং পরিণত বয়সে ছলচাতুরী দ্বারা অন্যকে প্রবঞ্চনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণের প্রচলিত কলঙ্কের কথা মানতে পারেন নি। তাঁর মতে কোন দেশের ঈশ্বরের চরিত্র এরকম হলে —তা জাতীয় কলঙ্কেরই তুল্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, প্রচলিত কৃষ্ণচরিত্র পরিকল্পনা আসলে তৃতীয় শ্রেণীর কবিকল্পনা অথবা প্রক্ষিপ্ত রচনা কিংবা তাতে কোন গূঢ় আধ্যাত্মিক তাৎপর্য আছে। তিনি বলেন;—

> "জানিয়াছি ঈদৃশ সর্ব্বগুণান্বিত, সর্ব্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই। কোন দেশীয় ইতিহাসেও না, কোন দেশীয় কাব্যেও না। কি প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের একটি উদ্দেশ্য।"[৫৯]

দ্বিতীয়তঃ, বাঙালী ইতিহাস চেতনাহীন। আদর্শ জীবনযাপনের জন্য বাঙালীর নিকট ইতিহাসের কোন দৃষ্টান্ত নেই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র পরিকল্পনা করেন জাতীয় মুক্তির জন্য চাই সার্থক দৃষ্টান্ত। বঙ্কিমচন্দ্র অলোচ্য গ্রন্থে জাতীয় জীবনের সামনে দৃষ্টান্ত হিসাবে শ্রীকৃষ্ণের আদর্শ জীবনযাপনের চিত্র তুলে ধরেছেন। এবং বলেছেন — "কেন না, "অনুশীলন ধর্ম্মে" যাহা তত্ত্ব মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রে তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্ম্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। ...কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ;"[৬০]

বলা যায়— ঈশ্বররূপে কল্পিত শ্রীকৃষ্ণের প্রচলিত কলঙ্কের অবসান ঘটানো ও ইতিহাসহীন বাঙালীর আদর্শ চরিত্রের প্রয়োজন মেটানো 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রণয়নের উদ্দেশ্য।

অনুরূপ আরেকটি গ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'। বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন, স্বদেশের পরিপূর্ণ মুক্তির জন্য গীতার আদর্শ অনুসরণ প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন মেটানোর জন্য তিনি 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র অনুবাদ প্রকাশ করেন।

এবিষয়ে তিনি বলেন;—

"এখন আমাদিগের "শিক্ষিত" সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্ত্য চিন্তা প্রণালীর অনুবর্ত্তী, প্রচীন ভারতবর্ষীয়া চিন্তা-প্রণালী তাঁহাদিগের নিকট অপরিচিত; কেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল তাঁহাদিগের হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাঁহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিতে হয়, পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্ত্য প্রথা অবলম্বন করিয়া পাশ্চাত্ত্যভাবের সাহায্যে গীতার মর্ম্ম তাঁহাদিগকে বুঝান, আমার এই টীকার উদ্দেশ্য।"(৬১)

এসব বক্তব্যের সাহায্যে খুব সহজেই বোঝা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে স্বদেশীয় দর্শনে অনুরাগী হওয়ার আহ্বান জানান।

এই প্রসঙ্গে 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর উল্লেখ করা খুবই জরুরি। 'ধর্ম্মতত্ত্ব' একটি দার্শনিক গ্রন্থ। গ্রন্থের নামকরণ থেকে বোঝা যায়, 'ধর্ম্মতত্ত্ব' জাতিকে ধর্মবিষয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। তবে মনে রাখা উচিত— সমকালে প্রচলিত সংকীর্ণতা, আচার সর্বস্বতা প্রভৃতিকে ফিরিয়ে আনার জন্য 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর মতো গ্রন্থের অবতারণা নয়। আমরা লক্ষ করব, 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের বাঙালীকে একটি সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার একটি দর্শন প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থটি গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের ভঙ্গিতে রচিত। গুরু ও শিষ্যের নানা গুরুগম্ভীর আলোচনার দ্বারা দর্শনটি প্রকাশ পেয়েছে। যেমন ধর্ম বিষয়ে বলা হয়েছে;—

"শিষ্য। তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম্ম, ও তাহার অভাবই অধর্ম্ম।"(৬২)

কিংবা, মানুষের ধর্ম বিষয়ে গুরু বলেছেন;—

"গুরু। মানুষের ধর্ম্ম কি? শিষ্য। এক কথায় কি বলিব? গুরু। মনুষ্যত্ব বল না কেন?"(৬৩)

গুরুশিষ্যের কথোপকথনে স্বদেশ প্রেমের প্রসঙ্গটিও এসেছে;—

"শিষ্য। ...আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম, স্বজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম। যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ব্বলোকে প্রীতি এক, তখন বলা যাইতে পারে যে, ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্ম্ম।"(৬৪)

'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এর উপসংহারে চুম্বকাকারে মানুষের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যবোধের পরিচয় আছে।

শিষ্য বলেছেন;—

"৫।...ঈশ্বরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন। সেই অবস্থাই ভক্তি।

৬। ঈশ্বর সর্ব্বভূতে আছেন; এই জন্য সর্ব্বভূতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ। সর্ব্বভূতে প্রীতি ব্যতীত ঈশ্বরে ভক্তি নাই, মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম্ম নাই।

৭। আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, পশুপ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া স্বদেশপ্রীতিকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলা উচিত।"(৬৫)

—এখানে বঙ্কিমচন্দ্র খুব সংক্ষেপে ভারতীয় দর্শনের নিগূঢ়তম তত্ত্বকথাকে যুগোপযোগী করে ব্যক্ত করেন। এই তত্ত্বকথা যে প্রচলিত আচার সর্বস্ব নয়, তা সহজেই বোঝা যায়। এখানে ধর্ম বলতে প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে একাধিকবার স্বদেশ প্রীতিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই 'ধর্ম্মতত্ত্ব'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত পরিচয় নিহিত আছে; সে বঙ্কিমচন্দ্র হলেন—ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতির একান্ত অনুরক্ত বঙ্কিম ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক এক বঙ্কিম।

রাজনারায়ণ বসু

উনিশ শতকে 'ভাঙ্গাগড়ার' যুগে রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯) এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি রামমোহন, ডিরোজিও, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ যুগচিন্তা-নায়কের দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে প্রভাবিত হয়েছিলেন। এখানে উল্লেখ্য রাজনারায়ণের পিতা নন্দকিশোর বসু রাজা রামমোহনের পারিষদ ছিলেন। হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের ফলে রাজনারায়ণ ডিরোজিও-এর ভাবধারায় আসক্ত হন। এবং দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের পর ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করায় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সংস্পর্শ পান। অতএব উনিশ শতকের বিখ্যাত যুগচিন্তা-নায়কের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবনা তাঁকে প্রভাবিত করবে —একথা বলাই বাহুল্য।

রাজনারায়ণ বসু জীবনের অধিকাংশ সময় শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেছিলেন। কিছুদিনের জন্য তিনি সংস্কৃত কলেজেও শিক্ষকতা করেছিলেন। অবশ্য প্রথম জীবনে তত্ত্ববোধিনী সভায় ছয় মাসের জন্য উপনিষদের ইংরেজী অনুবাদক ও পরে বেশ কিছু সময় ব্রাহ্ম-সমাজের সাধারণ কর্মে নিযুক্ত হন। রাজনারায়ণ বসু উল্লিখিত পেশাগত কর্মের পাশে স্বদেশ-সমাজ-সংস্কৃতির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি তাঁর 'আত্মচরিত' গ্রন্থে ১৮৫১-১৮৬৬ পর্যন্ত কিছু কাজের তালিকা দেন। মেদিনীপুর জেলা স্কুলের উন্নতি সাধন, মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতি সাধন, জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা সংস্থাপন, সুরাপান নিবারণ সভা সংস্থাপন, বালিকা বিদ্যালয়

সংস্থাপন প্রভৃতি রাজনারায়ণের জীবনের অন্যতম কাজ। রাজনারায়ণ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;— "রাজনারায়ণবাবু দিবারাত্র কার্য করিতেন। ভাঙ্গাগড়ার এক বিশেষ যুগে তিনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন। সকল প্রকার দেশের কার্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।"[৬৬] রাজনারায়ণ বসু বাংলায় একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন।

এখানে রাজনারায়ণের কয়েকটি গ্রন্থ অবলম্বনে ভাঙ্গাগড়ার যুগে তাঁর গঠনমূলক চিন্তার পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করা হবে। রবীন্দ্রনাথ রাজনারায়ণের বাংলা ভাষা চর্চা প্রসঙ্গে বলেন;—

> "রাজনারায়ণবাবুর বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতি আশ্চর্যের বিষয়। তিনি ডিরোজিয়োর শিষ্য, ইংরেজি ভাষায় সুপণ্ডিত ওই ভাষাতেই চিরদিন ভাব প্রকাশে অভ্যস্ত। অথচ তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবায় আত্মশক্তি নিয়োগ করেন।"[৬৭]

রাজনারায়ণ বসু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা', 'সে কাল ও এ কাল' 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' 'আত্মচরিত', 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' প্রভৃতি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেন। আমরা লক্ষ করব, রাজনারায়ণ বসু উল্লিখিত গ্রন্থে জাতিকে আত্মসচেতন করে তোলার প্রতি নজর দেন। আসলে তিনি সমকালের দিক্‌ভ্রান্ত বাঙালীর আত্মবিশ্বাস জাগাতে চেয়েছিলেন। বাঙালীকে যা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করার প্রেরণা দেয়। এই মহৎ ও বৃহৎ কাজের জন্য রাজনারায়ণ বসু সমকালের চেতনাহীন, আত্মবিশ্বাসহীন, দুর্বল বাঙালীকে উৎসাহ দেন, যাতে বাঙালী জীবনের উন্নয়নের জন্য প্রকৃত মত ও পথের সন্ধান পায়। রাজনারায়ণের বিখ্যাত কয়েকটি রচনা আলোচনা করে বিষয়টি স্পষ্ট করা হচ্ছে। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে প্রথমে বলা যায় 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'র (১৭৯৪ শকাব্দ) কথা। 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'য় স্বজাতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গৌরব করা হয়েছে। রাজনারায়ণ 'আত্মচরিত' গ্রন্থে 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' গ্রন্থের বিষয়ে বলেন;—

> "একদিন কালীনাথ দত্ত ও নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আমার কলিকাতার বাসায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার কথোপকথনের সময় বলিলেন যে, খ্রীষ্টীয়ধর্ম এত উৎকৃষ্ট যে উহার পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। আমি বলিলাম যে হিন্দুধর্মের পক্ষে অনেক কথা বলা যাইতে পারে। দেখিতে চাও তো দেখাইতে পারি। ইহাতেই হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার উৎপত্তি হয়।"[৬৮]

আসলে রাজনারায়ণ ধর্মমতে ব্রাহ্ম হলেও হিন্দু স্বদেশবাসী থেকে নিজেকে ভিন্ন মনে করতেন না। এ বিষয়ে তিনি বলেন;—"হিন্দুধর্মের প্রতি আমার চিরকালই শ্রদ্ধা আছে। আমি আপনাকে হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মকে হিন্দুধর্মের সমুন্নত আকারমাত্র মনে করি।"[৬৯]

'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা'য় রাজনারায়ণ বসু দেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম বিশ্বাসে আস্থা প্রকাশ করেন।

লেখক সতর্কতা অবলম্বন করে গ্রন্থটি রচনা করেন। কেননা, এখানে অন্যান্য ধর্মের চেয়ে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখানো হয়েছে। গ্রন্থটির বক্তব্য সামান্য এদিক ওদিক হলেই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হত। কিন্তু 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' সাম্প্রদায়িকতার অপরাধে দণ্ডিত না হয়ে বরং মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের একটি তালিকা দেন। তিনি বলেন — হিন্দুধর্ম কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধর্ম নয়, হিন্দু ধর্মের প্রশস্ততার পরিচয় পাওয়া যায়, হিন্দু ধর্ম ব্রহ্মের অবতার স্বীকার করে না, হিন্দুধর্ম কোন পেয়গম্বর স্বীকার করেনা, হিন্দু ধর্মে ঈশ্বরকে হৃদয়ের ধন মনে করে উপাসনা করার কথা বলা আছে, হিন্দু ধর্মে যোগের দ্বারা উপাসনা করার বিধি আছে, হিন্দু ধর্মে নিষ্কাম উপাসনা করার কথা বলা আছে, হিন্দু ধর্মে সর্বভূতে দয়া করার উপদেশ আছে, এছাড়াও বলা হয়েছে পরকালের বিষয়ে হিন্দু ধর্ম শ্রেষ্ঠ, হিন্দু ধর্মের ঔদার্যগুণ সর্বাধিক, হিন্দু ধর্মে জীবনের প্রত্যেক কাজ ঈশ্বরকে স্মরণ করার উপদেশ আছে, হিন্দু ধর্মের সবকাজ অনুশাসন অনুসারে হয়, হিন্দু ধর্ম অতিপ্রাচীন, হিন্দুর ব্রহ্মজ্ঞান ও বহ্মোপাসনা গৌরব করার মতো। অথচ এমন একটি ধর্মীয় জ্ঞানে সমৃদ্ধ দেশে ভিন্ন ধর্মের মাত্রারিক্ত প্রচার লেখক রাজনারায়ণকে আহত করেছিল। এবিষয়ে তিনি বলেন;— "ইদানীন্তন কোন কোন জাতি আসিয়া ধর্ম্মের কথা বলে, ধর্ম্মোপদেশ দেয়, সে যেন জেঠার নিকট জেঠামি করা।"[৭০] এই বক্তব্যে গ্রন্থকারের সুগভীর দেশপ্রেম প্রকাশিত হয়। আমরা বলতে পারি — লেখক রাজনারায়ণের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে স্বদেশীয় ঐতিহ্যবাহী ধর্মের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে। 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' লেখকের স্বদেশ ভাবনার ফসল। সেজন্য তিনি গ্রন্থের সূচনায় হিন্দু ধর্মের অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন। যারা বলেন— হিন্দু ধর্ম পৌত্তলিক প্রধান ধর্ম, হিন্দু ধর্ম অদ্বৈতবাদী ধর্ম, হিন্দু ধর্ম সন্ন্যাস ধর্মের কথা বলে, হিন্দু ধর্ম কঠোর তপস্যার ধর্ম, হিন্দু ধর্ম ঈশ্বরকে পিতামাতা বলে মনে করে না, হিন্দু ধর্ম নীরস ধর্ম, হিন্দু ধর্মে ত্যাগের কথা নেই, হিন্দু ধর্মে উপকার করার কথা নেই, হিন্দু ধর্ম জাতিভেদের কথা বলে — এরকম একাধিক প্রচলিত ধারণাকে রাজনারায়ণ তথ্য ও প্রমাণের দ্বারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেন। রাজনারায়ণ বলতে চেয়েছেন, এই ঐতিহ্যবাহী ধর্মের দেশ নতুন করে জেগে উঠবে। লেখকের ভাষায়;— "আমার এই রূপ আশা হইতেছে, পূর্ব্বে যেমন হিন্দুজাতি বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা জন্য বিখ্যাত হইয়াছিল, তেমনি পুনরায় সে বিদ্যা বুদ্ধি সভ্যতা ধর্ম্ম জন্য সমস্ত পৃথিবীতে বিখ্যাত হইবে।"[৭১] গ্রন্থশেষে রাজনারায়ণের এরকম মন্তব্য এক সুগভীর তাৎপর্য বহন করে। সমস্ত গ্রন্থটিতে লেখক স্বদেশীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছেন। তিনি দেশীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে বাঙালীকে সমৃদ্ধ জাতি হিসাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেন। একে আমরা উনিশ শতকের বাঙালীর আত্মজাগরণের যুগে স্বদেশ ভাবনা বলে দাবী করতে পারি।

রাজনারায়ণের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'সে কাল আর এ কাল' (১৭৯৬ শকাব্দ)। লেখক 'সে কাল আর এ কাল' বলতে বুঝিয়েছেন;—"ইংরাজী আমলের প্রথম হইতে হিন্দুকালেজ সংস্থাপন পর্য্যন্ত যে

সময় তাহা "সে কাল" এবং তাহার পরের কাল "এ কাল" শব্দে নির্দ্ধারণ করিলাম।"(৭২) লক্ষ করা যাবে এই 'সে কাল আর এ কাল' রচনার পিছনে লেখক রাজনারায়ণ বসুর উদ্দেশ্য ছিল। লেখক গ্রন্থের প্রথমেই বলেন;— "অদ্যকার বক্তৃতা কেবল আমোদজনক হইবে এমন নহে, ইহাতে উপকারও লাভ হইতে পারিবে। কৌতুকচ্ছলে কতকগুলি হিতকর বাক্য বলা আমার অদ্যকার বক্তৃতার প্রধান উদ্দেশ্য।"(৭৩) আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থের বিষয়বস্তু কি? এবিষয়ে রাজনারায়ণ বসু 'প্রথম বারের বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন;—"অক্ষয়বাবু প্রস্তাব করিলেন যে, সে কালের সঙ্গে এ কাল তুলনা করিয়া যদি কেহ একজন প্রবন্ধ লিখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। আমি ঐ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ইংরাজী শিক্ষার ইষ্ট বিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে, তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, ...পূর্ব্বে মনে মনে এইরূপ ইচ্ছা থাকাতে সহসা অক্ষয়বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।"(৭৪) গ্রন্থকার 'সে কাল আর এ কাল' গ্রন্থে দুই যুগের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা স্বদেশীয় পাঠককে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেন। লেখক একালে অনেক পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। কিন্তু এই পরিবর্তনকে দেশের প্রকৃত উন্নতি বলতে নারাজ। তাঁর ভাষায়;—"কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত উন্নতি হইতেছে, কোন্ কোন্ বিষয়ে প্রকৃত অবনতি হইতেছে, তাহা বিচার করা আমাদিগের কর্ত্তব্য।"(৭৫) লেখক 'সে কাল' ও 'এ কাল' এর ভালমন্দ দিকগুলি নিরপেক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেন। তিনি রাখঢাক না করে বলেন — একালে মাতৃভাষার চর্চা, স্বাদেশিকতা বা জাতীয়তাবোধের উন্নতি চোখে পড়ার মতো। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা, নীতিশিক্ষার অভাব, শিল্প ও বাণিজ্যের মতো জীবিকার অভাব, অনুকরণপ্রিয়তা ও পিতৃভক্তিহীন, পানাসক্ত, 'অসরল', প্রতারক, স্বার্থপর, অকৃতজ্ঞ, বিলাসপ্রিয়ের মতো চরিত্র দোষ, আধুনিক নারীর একাধিক দোষের মধ্যে গৃহকার্যে নিপুণতার অভাব, শারীরিক পরিশ্রমে অনিচ্ছুক, দয়ামায়া ও পতি ভক্তির ক্ষেত্রে শিথিলতা; এছাড়া দেশীয় মানুষ রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার, ধর্মীয় বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রভৃতি বিষয়ে একালের মানুষের অবনতি হয়েছে। লেখক রাজনারায়ণ বসু এইসব অবনতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করলেও বাঙালীকে হতাশ হতে বারণ করেছেন। তিনি বলেন;—

> "কিন্তু আমাদিগের নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। আশা অবলম্বন করিয়া থাকিতেই হইবে, যে হেতু আশাই সকল উন্নতির মূল। ...এই বাঙ্গালী জাতি এক্ষণে সকলের নিকট ঘৃণিত; কিন্তু হয়ত এই বাঙ্গালী জাতি যাহা করিবে, ভারতবর্ষের আর কোন জাতি তাহা করিতে সমর্থ হইবে না। হয়ত এই দুর্ব্বল বাঙ্গালী জাতি ভবিষ্যতে পৃথিবীর মধ্যে এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। ঈশ্বর সেই দিন শীঘ্র আনয়ন করুন।"(৭৬)

রাজনারায়ণ বসুর এই নীতি-উপদেশ ও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা সবই বাঙালীর উন্নতির জন্য। তিনি দুই যুগের ভালমন্দ দিকগুলি সম্বন্ধে পাঠককে সচেতন করে জাতির উন্নতির জন্য প্রকৃত মত ও পথের সন্ধান দেন।

রাজনারায়ণ বসুর এজাতীয় গ্রন্থকে আমরা উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনামূলক গ্রন্থ বলে অভিহিত করতে পারি।

রাজনারায়ণ বসুর স্বদেশ ভাবনার বিষয়ে আর একটি রচনা 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা' (১৮৭৮)। এই রচনায় বিদ্যাপতির সময় থেকে উনিশ শতকের দুই বিস্ময়কর প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত ধারাবাহিক আলোচনা আছে। রাজনারায়ণ বসু হোমার, প্লেটো, শেক্সপিয়ার প্রমুখ বিখ্যাত গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করেও পরিপূর্ণ তৃপ্তি পান নি। তিনি তাঁর মনের একটি অতৃপ্তির কথা বলেছেন;—

> "এক আশা অপূর্ণ থাকে, এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে; সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জন-পূজ্য বিশাল খ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃসৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা; সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্য ক্ষরিত অমৃত রস পান করিবার তৃষ্ণা। হা জগদীশ্বর! আমাদিগের সে আশা কবে পূর্ণ করিবে? সে তৃষ্ণা কবে নিবৃত্ত করিবে? এমন দিন কখন আগমন করিবে, যখন আমাদিগের আত্মভাষা-রচিত কাব্যের যশঃসৌরভে আকৃষ্ট হইয়া অন্য দেশীয় লোকে সেই ভাষা অধ্যয়ন করিবে।"(৭৭)

এই বক্তব্যে স্বদেশীয় ভাষার প্রতি রাজনারায়ণের সুগভীর অনুরাগ ব্যক্ত হয়েছে। লেখক এই রচনায় একাধিক নীতি-উপদেশ দিয়েছেন, যা মাতৃভাষার উন্নয়নের ভাবনার কথাই মনে করিয়ে দেয়। তিনি বলেছেন;—"স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে?"(৭৮) কিংবা "জাতীয় ভাষার উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।"(৭৯) এবং বাংলা গ্রন্থকার সম্বন্ধে তিনি বলেন;— "তাঁহারা হীন অনুকরণ রীতি পরিত্যাগ করুন। শিশু সন্তান যদি চিরকালই মাতার হাত ধরিয়া চলে, তবে সে কি কখন হাঁটিতে শিখিতে পারে? সেইরূপ বাঙ্গালা গ্রন্থকারেরা যদি চিরকাল ইংরাজদিগের হাত ধরিয়া চলেন, তাহা হইলে কি তাঁহারা কখন মহৎ গ্রন্থকার হইতে পারিবেন?"(৮০) উল্লিখিত নীতি-উপদেশ সমকালীন বাঙালীকে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগী হওয়ার প্রেরণা দেয়। যা লেখকের অকৃত্রিম স্বদেশ ভাবনা বলা যেতে পারে। কেননা, দেশীয় ভাষার উন্নতি স্বদেশের গৌরবেরই বিষয়।

অতএব রাজনারায়ণের দেশীয় সভ্যতা সংস্কৃতির প্রতি দরদ তাঁর মনের সুগভীর দেশানুরাগকেই প্রকাশ করেছে — এমন দাবী করা যায়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের প্রত্যেকটি প্রকরণে রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১) সাফল্য বিস্ময়কর। সারা জীবন ধরে কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতির মতো তিনি অসংখ্য প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করেছেন। বালক বয়স

থেকে আশি বছর পর্যন্ত রাবীন্দ্রনাথের লেখনী ছিল সচল। তিনি আজীবন অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধগ্রন্থের নাম করা যেতে পারে। যথা;— 'পঞ্চভূত' (১৮৯৭), 'আত্মশক্তি' (১৯০৫), 'ভারতবর্ষ' (১৯০৬), 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭), 'সাহিত্য' (১৯০৭), 'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭), 'রাজাপ্রজা' (১৮০০), 'স্বদেশ' (১৯০৮), 'ধর্ম' (১৯০৯), 'শান্তিনিকেতন' (১৯০৯-১৬), 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬), 'কালান্তর' (১৯৩৭), 'সভ্যতার সংকট' (১৯৪১) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ বিংশ শতকে রচিত ও প্রকাশিত হয়। অবশ্য উনিশ শতকে রচিত ও প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ আছে। এখানে উনিশ শতকে রচিত প্রবন্ধে স্বদেশভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু অগ্রন্থিত প্রবন্ধ এবং 'আলোচনা' ও 'সমালোচনা' প্রবন্ধ গ্রন্থের আলোচনা করব। উনিশ শতকে রচিত অনেক প্রবন্ধ রয়েছে যেগুলি কোন গ্রন্থভুক্ত হয় নি। এবিষয়ে 'বিশ্বভারতী' থেকে প্রকাশিত 'রবীন্দ্র রচনাবলী'র সপ্তদশ খণ্ডে 'প্রকাশকের নিবেদনে' বলা হয়েছে;—

> "অগ্রন্থিত রচনাগুলি প্রকাশ করিবার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী ঊনত্রিংশ এবং ত্রিংশ খণ্ড (বর্তমান সপ্তদশ খণ্ড) সংকলিত হইল। এই খণ্ডে ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বা সাময়িক পত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের অগ্রন্থিত রচনাসমূহ পাওয়া যাইবে।" (৮১)

আমরা প্রথমে সপ্তদশ খণ্ডের অগ্রন্থিত প্রবন্ধগুলির উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার একটি পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উনিশ শতকেই সাহিত্য, সংস্কৃতির মতো জীবনের প্রয়োজনীয় অন্যান্য ক্ষেত্রে সুচিন্তিত ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যে যুক্তির দ্বারা মতামত প্রতিষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকেই বাঙালীর আত্মচেতনা বিকাশের জন্য যুক্তি দ্বারা কিছু নীতি উপদেশ দিয়েছেন। আমরা লক্ষ করব, উনিশ শতকেই রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ, শিক্ষা বাঙালী জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতনতা আনার চেষ্টা করেছেন। বলাবাহুল্য — লেখকের এই মনোভাব বাঙালী জীবনকে সমৃদ্ধ করতে যথেষ্ট অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে।

রবীন্দ্রনাথ কবি তথা সাহিত্যিক। সেজন্য প্রথমে আমরা সাহিত্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ধারণার পরিচয় নেব। তিনি বাঙালী জীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। 'সাহিত্যের উদ্দেশ্য' নামক (ভারতী ও বালক, বৈশাখ ১২৯৪) প্রবন্ধে সাহিত্য বিষয়ে বাঙালী পাঠককে সচেতন করার চেষ্টা করেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;— "গোটাকতক সন্দেশ খাইলে যে রসনার তৃপ্তি ও উদরের

পূর্তি-সাধন হয় ইহা প্রমাণ করা সহজ, ...কিন্তু সমুদ্রতীরে থাকিলে যে এক বিশাল আনন্দ অলক্ষ্যে শরীর-মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া স্বাস্থ্যবিধান করে তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করা যায় না। ...সাহিত্যের প্রভাবে আমরা হৃদয়ের দ্বারা হৃদয়ের যোগ অনুভব করি, হৃদয়ের প্রবাহ রক্ষা হয়, হৃদয়ের সহিত হৃদয় খেলাইতে থাকে, হৃদয়ের জীবন ও স্বাস্থ্য-সঞ্চার হয়। যুক্তি শৃঙ্খলের দ্বারা মানবের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ঐক্যবন্ধন হয়, কিন্তু হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধিবার তেমন কৃত্রিম উপায় নাই। সাহিত্য স্বত উৎসারিত হইয়া সেই যোগসাধন করে। ...আনন্দই তাহার আদি অন্ত মধ্য। আনন্দই তাহার কারণ, এবং আনন্দই তাহার উদ্দেশ্য।"[৮২] এখানে একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ মানবতাকেই সাহিত্যের উদ্দেশ্য বলেছেন। বলা চলে যে, মানবতার পরিচয়ের জন্য মানুষ শ্রেষ্ঠ জীব হিসাবে গর্ব করে। অবশ্য অনেকে আছেন যারা সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিলোপ ঘটবে বলে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ এরকম ধারণার বিরোধিতা করেছেন। 'সাহিত্য ও সভ্যতা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন;—

> "অনেক পণ্ডিত ভবিষ্যদ্‌বাণী প্রচার করেন যে, সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের বিনাশ হইবে। তা যদি হয় তবে সভ্যতারও বিনাশ হইবে। কেবল পাকা রাস্তাই যে মানুষের পক্ষে আবশ্যক তাহা নয়, শ্যামল ক্ষেত্র তাহা অপেক্ষা অধিক আবশ্যক; প্রকৃতির বুকের উপরে পাথর ভাঙিয়া আগাগোড়া সমস্তটাই যদি পাকা রাস্তা করা যায়, কাঁচা কিছুই না থাকে, তবে সভ্যতার অতিশয় বৃদ্ধি হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই অতিবৃদ্ধিতেই তাহার বিনাশ। লন্ডন শহর অত্যন্ত সভ্য ইহা কে না বলিবে, কিন্তু লন্ডন-রূপী সভ্যতা যদি দৈত্যশিশুর মতো বাড়িতে বাড়িতে সমস্ত দ্বীপটাকে তাহার ইষ্টককঙ্কালের দ্বারা চাপিয়া বসে তবে সেখানে মানব কেমন করিয়া টিকে। মানব তো কোনো পণ্ডিত-বিশেষের দ্বারা নির্মিত কল-বিশেষ নহে।"[৮৩]

বরং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের মতে;—

> "যেমন বদ্ধ গৃহে থাকিলে মুক্ত বায়ুর আবশ্যক অধিক, তেমনি সভ্যতার সহস্র বন্ধনের অবস্থাতেই বিশুদ্ধ সাহিত্যের আবশ্যকতা অধিক হয়। সভ্যতার শাসন-নিয়ম, সভ্যতার কৃত্রিম-শৃঙ্খল যতই আঁট হয়—হৃদয়ে হৃদয়ে স্বাধীন মিলন, প্রকৃতির অনন্ত ক্ষেত্রের মধ্যে কিছুকালের জন্য রুদ্ধ হৃদয়ের ছুটি, ততই নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে। সাহিত্যই সেই মিলনের স্থান, সেই খেলার গৃহ, সেই শান্তিনিকেতন।"[৮৪]

এখানে জীবনে সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। 'সাহিত্যের গৌরব' (সাধনা, ১৩০১, শ্রাবণ) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের গৌরব করতে গিয়ে বলেন;—"কিন্তু যথার্থ সাহিত্য যেমন যথার্থ জাতীয় ঐক্যের ফল

তেমনি জাতীয় ঐক্য সাধনের প্রধানতম উপায় সাহিত্য।"(৮৫) এবং বাংলা সাহিত্যের গৌরব করতে গিয়ে তিনি আরো বলেন;—

> "যাঁহারা বাংলার সদ্যোজাত সাহিত্যের শিয়রে জাগরণপূর্বক নিস্তব্ধ রজনীর প্রহর গণিতেছেন তাঁহারা কোনো উৎসাহ কোনো পুরস্কার না পাইতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের অন্তরে এক সুমহৎ আশা জাগ্রত দেবতার ন্যায় সর্বদা বরাভয় দান করিতেছেন, তাঁহারা একান্ত বিশ্বাস করিতেছেন যে, এই শিশু অমর হইবে এবং জন্মভূমিকে যদি কেহ অমরতা দান করিতে পারে তো সে এই সাহিত্য পারিবে।"(৮৬)

এখানে রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের দ্বারা দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধির কথা শুনিয়েছেন। জাতীয় সাহিত্যকে ভালোবাসা জাতীয় ঐক্যের নামান্তর। উনিশ শতকের আত্মসচেতন বাঙালী জাতির অধঃপতনে গভীর আহত এবং তা থেকে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করেছিলেন। এই সময়ে সাহিত্যকে ভালবাসার দ্বারা জাতীয় জীবনে উন্নয়নের কথা রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্যের গৌরব' নামক প্রবন্ধে শুনিয়েছেন।

বাঙালী সমাজে যথার্থ কবির অভাবে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত। তিনি 'বাঙালী কবি নয়' (ভারতী, ভাদ্র, ১২৮৭) নামক প্রবন্ধে বাঙালী সমাজে প্রকৃত কবির অভাবের কথা বলেন। তিনি বলেন —

> "সাধারণ কথায় বলিতে হইলে বলা যায়, কবির সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে; সজনি, প্রিয়তমা, প্রণয়, বিরহ, মিলন লইয়া অনেক কবিতা রচিত হইয়া থাকে, তাহাতে নূতন খুব কম থাকে এবং গাঢ়তা আরও অল্প। আধুনিক বঙ্গ কবিতায় মনুষ্যের নানাবিধ মনোবৃত্তির ক্রীড়া দেখা যায় না। বিরোধী মনোবৃত্তির সংগ্রাম দেখা যায় না। মহান ভাব তো নাইই। হৃদয়ের কতকগুলি ভাসা ভাসা ভাব লইয়া কবিতা। সামান্য নাড়া পাইলেই যে জল-বুদ্‌বুদ্‌গুলি হৃদয়ের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠে তাহা লইয়াই তাঁহাদের কারবার। যে-সকল ভাব হৃদয়ের তলদেশে দিবানিশি গুপ্ত থাকে, নিদারুণ ঝটিকা উঠিলেই তবে যাহা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সহস্র ফেনিল মস্তক লইয়া তীরের পর্বত চূর্ণ করিতে ছুটিয়া আসে সে-সকল আধুনিক বঙ্গকবিদের কবিতার বিষয় নহে। তথাপি কী করিয়া বলি বাঙালি কবি?"(৮৭)

এখানে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাঙালী কবিদের সমালোচনা করেন। এই সমালোচনা সাধারণ সাহিত্য সমালোচনা নয়, এতে তাঁর আহত হৃদয়ের কথা ধ্বনিত হয়েছে। আসলে তিনি জানতেন, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবি নিজের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে না। 'বাঙালি কবি নয় কেন?' (ভারতী, আষাঢ়, ১২৮৭) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাঙালী কেন কবি নয় তার যুক্তি সম্মত কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। প্রাবন্ধিক জাতির দুর্দশার মূল কারণ নির্ণয় করে লিখেছেন;—

"আমাদের এ পোড়া দেশে কাজকর্ম নাই, অদৃষ্টের সহিত সংগ্রাম নাই, আলস্য তাহার স্থূল শরীর লইয়া স্থূলতর উপাধানে হেলিয়া হাই তুলিতেছে, ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাস ফুল মোজা, কালাপেড়ে ধুতি, ফিন্‌ফিনে জামা পরিয়া, বুকে চাদর বাঁধিয়া, পান খাইয়া ঠোঁট ও রাত্রি-জাগরণে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া গুড়গুড়ি টানিতেছে, এই তো চারি দিকের অবস্থা! এমন দেশের কবিতায় চরিত্র-বৈচিত্র্যই বা কোথায় থাকিবে, মহান চরিত্র-চিত্রই বা কোথায় থাকিবে, আর বিবিধ মনোবৃত্তির খেলাই বা কীরূপে বর্ণিত হইবে?"[৮৮]

রবীন্দ্রনাথ জাতীয় চরিত্রের এরকম দুরবস্থায় মর্মাহত। তবে তিনি পাঠককে একেবারে হতাশ করেন নি। প্রবন্ধের শেষে তিনি জানিয়েছেন;—"সম্প্রতি বাহির হইতে একটা নূতন স্রোত আসিয়া এই স্থির জলের মধ্যে একটা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে। ইহা হইতে শুভ্র ফল প্রত্যাশা করিতেছি, ইতস্তত তাহার চিহ্নও দেখা দিতেছে।"[৮৯] —এখানে পাশ্চাত্যের প্রভাবে উনিশ শতকের বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের উন্নতির কথা ব্যক্ত হয়েছে।

'আলস্য ও সাহিত্য' (ভারতী ও বালক, ১২৯৪ শ্রাবণ) সাহিত্য বিষয়ে বাঙালী পাঠককে সচেতন করার উদ্দেশ্যে রচিত। 'আলস্য ও সাহিত্য'-এ রবীন্দ্রনাথ বাঙালী পাঠককে সচেতন করে বলেন;—

"অবসরের মধ্যেই সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ সাহিত্যের বিকাশ, কিন্তু তাই বলিয়া আলস্যের মধ্যে নহে। ...সুকুমার বিকশিত পুষ্প যেমন সমগ্র কঠিন ও বৃহৎ বৃক্ষের নিয়ত শ্রমশীল জীবনের লক্ষণ তেমনি সাহিত্যও মানবসমাজের জীবন স্বাস্থ্য ও উদ্যমেরই পরিচয় দেয়,"[৯০]

সাহিত্যকে যারা কর্মহীনের বিষয় মনে করে, এই প্রবন্ধে তাদের মতের প্রতিবাদ করা হয়েছে।

এছাড়া ধর্ম ও দর্শন ('আকার ও নিরাকার উপাসনা', 'ধর্ম ও ধর্ম নীতির অভিব্যক্তি', 'নব্যন্যায়তত্ত্ব' প্রভৃতি প্রবন্ধ), বিজ্ঞান ('সামুদ্রিক জীব', 'বৈজ্ঞানিক সংবাদ', 'জীবনের শক্তি', 'মানব শরীর', 'রোগশত্রু ও দেহরক্ষক সৈন্য', 'অভ্যাস জনিত পরিবর্তন' প্রভৃতি প্রবন্ধ) শিল্প ('মন্দির পথবর্তিনী', 'মন্দিরাভিমুখে') সংগীত ('সংগীত ও ভাব', 'সংগীতের উৎপত্তি ও উপযোগিতা') ও বিবিধ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনেক প্রবন্ধ বাঙালীকে আত্মসচেতন করার পক্ষে যথেষ্ট কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। উল্লিখিত ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত বিষয়ের প্রবন্ধের মধ্যে সংগীত বিষয়ক প্রবন্ধ 'সংগীত ও ভাব'-এর আলোচনা করা হচ্ছে। আমরা লক্ষ করব, লেখক রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে সংগীত বিষয়ে বাঙালীকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছেন।

'সংগীত ও ভাব'-এ রবীন্দ্রনাথ বলেন;— "সংগীত মনোভাব-প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম উপায় মাত্র।"[৯১]

অথচ সংগীত বলতে বাঙালী রাগরাগিণীকেই প্রাধান্য দেয়। লেখক প্রশ্ন করেন;—"রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য কী ছিল?" [৯২] উত্তরে স্বয়ং লেখকই বলেন;—"রাগরাগিণীর উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা মাত্র। কিন্তু এখন তাহা কী হইয়া দাঁড়াইয়াছে? এখন রাগরাগিণী উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।"[৯৩] দেশীয় সংগীতকে সমৃদ্ধ করতে রবীন্দ্রনাথ একটি যুক্তিগ্রাহ্য পরামর্শ দেন—"যে সাহিত্যে অলংকারশাস্ত্রের রাজত্ব, সে সাহিত্যে কবিতাকে গঙ্গাযাত্রা করা হইয়াছে। ...আমার ইচ্ছা যে, কবিতার সহচর সংগীতকেও শাস্ত্রের লৌহকারা হইতে মুক্ত করিয়া উভয়ের মধ্যে বিবাহ দেওয়া হউক।"[৯৪] লেখক মনে করেন, রাগরাগিণী থেকে মুক্ত হয়ে সঙ্গীতকে কবিতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা উচিত। তাতে সংগীত যথেষ্ট সমৃদ্ধ হবে। উপসংহারে তিনি আরো বলেন;—

> "সংগীতবেত্তাদিগের প্রতি আমার এই নিবেদন যে, কী কী সুর কিরূপে বিন্যাস করিলে কী কী ভাব প্রকাশ করে, আর কেনই বা তাহা প্রকাশ করে, তাহার বিজ্ঞান অনুসন্ধান করুন। মূলতান ইমন-কল্যাণ কেদারা প্রভৃতিতে কী কী সুর বাদী আর কী কী সুর বিসম্বাদী তাহার প্রতি মনোযোগ না করিয়া, দুঃখ সুখ রোষ বা বিস্ময়ের রাগিণীতে কী কী সুর বাদী ও কী কী সুর বিসম্বাদী তাহাই আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হউন। মূলতান কেদারা প্রভৃতি তো মানুষের রচিত কৃত্রিম রাগরাগিণী, কিন্তু আমাদের সুখদুঃখের রাগরাগিণী কৃত্রিম নহে। আমাদের স্বাভাবিক কথাবার্তার মধ্যে সেই-সকল রাগরাগিণী প্রচ্ছন্ন থাকে। কতকগুলা অর্থশূন্য নাম পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাবের নাম অনুসারে আমাদের রাগ-রাগিণীর বিভিন্ন নামকরণ করা হউক। আমাদের সংগীতবিদ্যালয়ে সুর-অভ্যাস ও রাগরাগিণীর শিক্ষার শ্রেণী আছে, সেখানে রাগরাগিণীর ভাব-শিক্ষার ও শ্রেণী স্থাপিত হউক। এখন যেমন সংগীত শুনিলেই সকলে বলেন 'বাঃ, ইহার সুর কী মধুর', এমন দিন কি আসিবে না যেদিন সকলে বলিবেন, 'বাঃ, কী সুন্দর ভাব'।"[৯৫]

অতএব সংগীত বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে বিসর্জন দিয়ে, সংগীতকে ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠতম বাহন করে তোলার প্রতি মনোযোগ দিলে স্বদেশীয় সংগীত সমৃদ্ধ হবে —এরকম মনোভাব প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন। এবার আমরা 'আলোচনা' (১৮৮৫), 'সমালোচনা' (১৮৮৮) ও পরবর্তী শতকে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত অথচ উনিশ শতকে রচিত কয়েকটি প্রবন্ধের আলোচনা করে উনিশ শতকের প্রবন্ধ সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করব।

প্রথমে 'আলোচনা' (১৮৮৫) গ্রন্থে স্বদেশ ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'আলোচনা' প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতি'তে বলেছিলেন;—

> "আলোচনা নাম দিয়া যে ছোটো ছোটো গদ্যপ্রবন্ধ বাহির করিয়াছিলাম তাহার গোড়ার দিকেই প্রকৃতির প্রতিশোধ-এর ভিতরকার ভাবটির একটি তত্ত্বব্যাখ্যা লিখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। সীমা যে সীমাবদ্ধ

> নহে, তাহা যে অতলস্পর্শ গভীরতাকে এক কণার মধ্যে সংহত করিয়া দেখাইতেছে, ইহা লইয়া আলোচনা হইয়াছে।"(৯৬)

আসলে রবীন্দ্রনাথের সীমা অসীমের তত্ত্বকথা 'আলোচনা' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ জীবনের পূর্ণতা দেখেছেন সীমা ও অসীমের মিলন সাধনের মধ্যে। এই সীমা ও অসীমের তত্ত্ব তাঁর কাব্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করেছে। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন;—"আমার তো মনে হয়, আমার কাব্যরচনার এই একটি মাত্র পালা। সে পালার নাম দেওয়া যাইতে পারে সীমার মধ্যেই অসীমের সহিত মিলন-সাধনের পালা।"(৯৭) একথা অনস্বীকার্য রবীন্দ্রসাহিত্যে নানা তত্ত্ব-রহস্যের অবতারণা রয়েছে। বলার অপেক্ষা রাখে না, রবীন্দ্রসাহিত্য লোকশিক্ষাও দিয়েছে। 'আলোচনা' গ্রন্থকে সেরকম লোকশিক্ষা জাতীয় গ্রন্থ বলে অভিহিত করা যায়। কারণ এদেশে বাস্তবের সীমাকে ছেড়ে অসীমের জন্য নিস্ফল ক্রন্দন নতুন কিছু নয়। 'ডুবদেওয়া' প্রবন্ধের 'ছোটো বড়ো'র বিষয়ে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ সীমার মধ্যে অসীমকে দেখতে পেয়েছেন। তাঁর ভাষায়;—

> "একটি বালুকণাকে আমরা যদি জড়ভাবে দেখিতে পাই, তাহা কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই! তাহাকে কতকগুলি পরমাণুর সমষ্টি বলিলেই কি তাহার সমস্ত নিঃশেষে বলা হইল, তাহার আর কিছুই বাকি রহিল না। তাহা কি অনন্ত জ্ঞানের সমষ্টি নহে, অনন্ত ইতিহাস অর্থাৎ অনন্ত সময়ের সমষ্টি নহে! ...অতএব নিতান্ত জড় ভাবে না দেখিয়া মানসিক ভাবে দেখিলে বালুকণার আকার আয়তন কোথায় অদৃশ্য হইয়া যায়, জানা যায় যে তাহা অসীম।"(৯৮)

রবীন্দ্রনাথ 'ধর্ম' প্রবন্ধে 'জগতের বন্ধন' অংশে বলেন — অসীম জগতের থেকে কেউই বিচ্ছিন্ন নয়। এই প্রবন্ধে অসীম জগতের সঙ্গে ব্যক্তির অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;—

> "বিশ্ব-জগতের মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে যে দৃঢ়সূত্র প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে ইহাই ছিন্ন করিয়া ফেলা মুক্তি, এইরূপ কথা শুনা যায়। কিন্তু ছিন্ন করে কাহার সাধ্য! আমি আর জগৎ কি স্বতন্ত্র?... অতএব আমাদের বুঝা উচিত জগতের বিরোধী হওয়াও যা, নিজের বিরোধী হওয়াও তা, জগতের সহিত আমাদের এতই ঐক্য।"(৯৯)

এই বক্তব্যের দ্বারা প্রাবন্ধিক অসীম জগতের সঙ্গে মানুষের ঐক্য দেখিয়াছেন। যা সীমার মধ্যে অসীমকে অনুভব করার নামান্তর।

আমরা রবীন্দ্রনাথের 'আলোচনা' গ্রন্থে তত্ত্বকথার আড়ালে লোকশিক্ষার পরিচয় পাই। সমকালীন পাঠকের আত্মচেতনা উদ্বোধনের পক্ষে যা সহায়ক। এই আত্মচেতনা বাঙালীর জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করবে,

সেকথা বলাই বাহুল্য। 'ধর্ম' প্রবন্ধে 'সচেতন ধর্ম' অংশে বলা হয়েছে;—"পরার্থপরতাই এ জগতের ধর্ম। এই নিমিত্তই মানুষের সর্বোৎকৃষ্ট ধর্ম পরের জন্য আত্মোৎসর্গ করা।"(১০০) একই রকম নীতিকথা 'আত্মা' প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। 'শ্রেষ্ঠ অধিকার' নামক আলোচনায় বলা হয়েছে;—"আত্মার উপরে শ্রেষ্ঠ অধিকার কাহার জন্মিয়াছে? যে আত্ম-বিসর্জন করিতে পারে।"(১০১) 'আত্মার অমরতা' আলোচনাতেও বলা হয়েছে;—"আত্মবিসর্জনের মধ্যেই আত্মার অমরতার লক্ষণ দেখা যায়। যে আত্মায় তাহা দেখা যায় না সে আত্মার যতই বর্ণ থাকুক ও যতই গন্ধ থাকুক তাহা বন্ধ্যা।"(১০২) আলোচ্য 'আলোচনা' প্রবন্ধগ্রন্থে সীমা-অসীমের রহস্যের পরেও রবীন্দ্রনাথের উল্লিখিত একাধিক নীতি-উপদেশ পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে। এজাতীয় নীতি-উপদেশ পাঠকের চেতনাকে সুপথে চালিত করবে, যা মানব সম্পদ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক।

'সমালোচনা' (১৮৮৮) রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রথম দিকের প্রবন্ধ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল — 'অনাবশ্যক', 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'নীরবকবি ও অশিক্ষিত কবি', 'সংগীত ও কবিতা', 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা', 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি', 'বাউলের গান', 'সমস্যা' প্রভৃতি। 'সমালোচনা'য় সমাজ-সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে লেখক রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম ভাবনা চোখে পড়ে। তাঁর এই দায়িত্ববোধ পাঠককে সচেতন করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। প্রসঙ্গত 'অনাবশ্যক' প্রবন্ধের কথা বলা যায়। এখানে শিক্ষিত শ্রেণীর স্বজাতীয় ইতিহাস বিষয়ে অজ্ঞানতার সমালোচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

> "আমাদের আচার ব্যবহারে কতকগুলি চিরন্তন প্রথা প্রচলিত আছে, সেগুলি ভালোও নয় মন্দও নয়, কেবল দোষের মধ্যে তাহারা অনাবশ্যক — ...মনে করিলে, তুমি কতকগুলি অর্থহীন অনাবশ্যক হাস্যরসোদ্দীপক অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিলে মাত্র, কিন্তু আসলে কী করিলে। সেই অর্থহীন প্রথার মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত সুমহৎ অতীতদেবকে ভাঙিয়া ফেলিলে, একটি জীবন্ত ইতিহাসকে বধ করিলে, তোমার পূর্বপুরুষদিগের একটি স্মরণচিহ্ন ধ্বংস করিয়া ফেলিলে। তোমার কাছে তোমার মায়ের যদি একটি স্মরণচিহ্ন থাকে, বাজারে তাহার দাম নাই বলিয়া তোমার কাছেও যদি তাহার দাম না থাকে তবে তুমি মহাপাতকী।"(১০৩)

'অনাবশ্যক' প্রবন্ধে দেশীয় আচার-সংস্কৃতির মধ্যে যে নিজস্বতা রয়েছে, তাকে একেবারে অনাবশ্যক ভেবে বর্জন করার মনোভাবকে সমালোচনা করা হয়েছে।

'মেঘনাদবধ কাব্য' রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত সমালোচনা মূলক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর সমালোচনা করা হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এবিষয়ে লজ্জিত হন। যাই হোক,

প্রবন্ধের শেষে তরুণ প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মহাকবিদের উদ্দেশ্যে যা বলেছেন, তাতে তাঁর মনের অকৃত্রিম দেশপ্রেম ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। লেখকের ভাষায়;—

"হে বঙ্গ মহাকবিগণ! লড়াই-বর্ণনা তোমাদের ভালো আসিবে না, লড়াই-বর্ণনার তেমন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শ সৃজন করিয়া দাও, বাঙালিদের মানুষ হইতে শিখাও।"(১০৪)

এই সমাপ্তি বাক্যে সমকালীন যুগসংকট প্রকাশ পেয়েছে। আত্মসচেতন প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, উনিশ শতকের বিপন্ন বাঙালীকে সুপথে চালিত করতে হলে চাই মানবিক আদর্শ। এই মানবিক আদর্শ প্রচারে কবির বড় ভূমিকা থাকে। রবীন্দ্রনাথের এজাতীয় ভাবনা দেশীয় মানুষের জীবনের মান উন্নয়নের জন্য, —একথা বলাই বাহুল্য।

'সমালোচনা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্যতম প্রবন্ধ 'বাউলের গান'। এই প্রবন্ধে স্বদেশীয় ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সুগভীর দরদ প্রকাশ পেয়েছে। বাঙালীর নিজস্বতাকে প্রাবন্ধিক সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়;—

"আমাদের মনে হয় যে, বাঙালি জাতির যথার্থ ভাবটি যে কী তাহা আমরা সকলে ঠিক ধরিতে পারি নাই—বাঙালি জাতির প্রাণের মধ্যে ভাবগুলি কিরূপ আকারে অবস্থান করে তাহা আমরা ভালো জানি না। এই নিমিত্ত আধুনিক বাংলা ভাষায় সচরাচর যাহা কিছু লিখিত হইয়া থাকে তাহার মধ্যে যেন একটি খাঁটি বিশেষত্ব দেখিতে পাই না। ...ইহার প্রধান কারণ, এখনো আমরা বাঙালির ঠিক ভাবটি, ঠিক ভাষাটি ধরিতে পারি নাই।"(১০৫)

এই বক্তব্যে কবি তথা লেখক রবীন্দ্রনাথ যেন আত্মসমালোচনা করেছেন। এই আত্মসমালোচনা দেশীয় সাহিত্যকে মনের মতো সমৃদ্ধ করতে না পারার সমালোচনা। সংস্কৃত ভাষা কিংবা ইংরেজী ভাষার মধ্যে যারা বাংলা ভাষার পরিপূর্ণতা খোঁজেন, তাদের সমালোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন;—

"সংস্কৃত ব্যাকরণেও বাংলা নাই, আর ইংরাজি ব্যাকরণেও বাংলা নাই, বাংলা ভাষা বাঙালিদের হৃদয়ের মধ্যে আছে। ছেলে কোলে করিয়া শহরময় ছেলে খুঁজিয়া বেড়ানো যেমন, তোমাদের ব্যবহারও তেমনি দেখিতেছি। তোমরা বাংলা বাংলা করিয়া সর্বত্র খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, সংস্কৃত ইংরাজি সমস্ত ওলট্-পালট্ করিতেছে, কেবল একবার হৃদয়টার মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখ নাই। ...আমাদের ভাব, আমাদের ভাষা আমরা যদি আয়ত্ত করিতে চাই, তবে বাঙালি যেখানে হৃদয়ের কথা বলিয়াছে, সেইখানে সন্ধান করিতে হয়।"(১০৬)

উল্লিখিত বক্তব্যে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পরামর্শ দিয়েছেন। প্রসঙ্গত প্রাবন্ধিক বলেন;—"আমাদের সাহিত্য যদি বাঁচিতে চায়, তবে ভালো করিয়া বাংলা হইতে শিখুক।"(১০৭) এখানে দেশীয় সাহিত্যকে বাঁচানোর জন্য রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর মতে;—"ভাবের ভাষার অনুবাদ চলে না।"(১০৮) এবিষয়ে প্রাবন্ধিক একটি সুপরামর্শ দিয়েছেন;—"বাংলা ভাব ও ভাবের ভাষা যতই সংগ্রহ করা যাইবে ততই যে আমাদের সাহিত্যের উপকার হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"(১০৯) অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে বাঁচাতে বাঙালীর নিজস্ব ভাব ও ভাবের ভাষা সংগ্রহের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

অতএব বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের 'বাউলের গান' দেশীয় ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার একটি পরামর্শমূলক প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সমাজের উন্নয়নের জন্য সমাজ বিষয়ে একাধিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আমরা উনিশ শতকের কিছু প্রবন্ধের আলোচনা করে বাঙালী সমাজের উন্নয়নের জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাবনার পরিচয় গ্রহণ করার চেষ্টা করব। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধগুলি হল — 'পারিবারিক দাসত্ব', 'বাঙালির আশা ও নৈরাশা', 'সমাজ সংস্কার ও কুসংস্কার', 'অকাল কুষ্মাণ্ড', 'হাতে কলমে', 'সমাজে স্ত্রী পুরুষের প্রেমের প্রভাব', 'নব্যবঙ্গের আন্দোলন' প্রভৃতি।

এ বিষয়ে প্রথমে 'পারিবারিক দাসত্ব' (ভারতী, চৈত্র, ১২৮৭) প্রবন্ধের কথা বলা যায়। প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ অকাট্য যুক্তির দ্বারা বলতে চেয়েছেন, প্রচলিত সমাজ বা পরিবার বাঙালীকে দাসত্বের শিক্ষা দেয়। তাঁর ভাষায়;—

> "আমরা যে প্রতি পরিবারে এক-একটি করিয়া দাসের দল সৃষ্টি করিতেছি! আমরা যে আমাদের সন্তানদের— আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতাদের শৈশবকাল হইতে চব্বিশ ঘণ্টা দাসত্ব শিক্ষা দিতেছি! বড়ো হইলে তাহারা যাহাতে এক-একটি উপযুক্ত দাস হইতে পারে, তাহার বিহিত বিধান করিয়া দেওয়া হইতেছে; বড়ো হইলে যাহাতে কথাটি না কহিয়া তাহারা তাহাদের প্রভুদের মার ও গালাগালিগুলি নিঃশেষে হজম করিয়া ফেলিতে পারে, এমন একটি অসাধারণ পরিপাক-শক্তি তাহাদের শরীরে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে! এইরূপে ইহারাও বড়ো হইলে স্বাধীনতা স্বাধীনতা করিয়া একটা তুমুল কোলাহল করিতে থাকিবে, অথচ অধীনতাকে আপনার পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করিয়া তাহাকে দুধ-কলা সেবন করাইবে! প্রাণের মধ্যে অধীনতার আসন ও রসনার উপরে স্বাধীনতার আসন।"(১১০)

আসলে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বাঙালী পরিবারে ভয়ের দ্বারা সন্তানকে শিক্ষা দেওয়ার প্রথাকে আক্রমণ করেন। তিনি লিখেছেন;—

"ছেলেবেলায় যে আমরা শিক্ষা পাই যে, গুরুজনদের ভক্তি করা উচিত, তাহার অর্থ কী ? না গুরুজনদের ভয় করা উচিত।...কেন ভয় করিবে? না তাঁহারা আমাদের অপেক্ষা বলিষ্ঠ তাঁহাদের সঙ্গে আমরা কোন মতে পারিয়া উঠি না। এইজন্যই, যখনি ছেলেরা দশজনে সমবয়স্কদের লইয়া মনের আমোদে খেলা করিতেছে, এবং যখনি গুরুজন বলিয়া উঠিয়াছেন, 'কী তোরা গোলমাল করছিস।' তখনি তাহারা তৎক্ষণাৎ থামিয়া যায়।"(১১১)

বাঙালী সমাজে শিশুদের শিক্ষার সময়ে ভয় দেখানোর কুফল সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোকপাত হয়েছে। যে শিক্ষা একটি শিশুর পক্ষে সুনাগরিক হওয়ার প্রতিবন্ধক। সেই জন্য লেখক প্রচলিত সমাজের সমালোচনা করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

"আমাদের পরিবারের মূলগত ভাবটা কী? না, শাসনকারী ও শাসিতের সম্পর্ক, প্রভু ও অধীনের সম্পর্ক, গুরু ও কনিষ্ঠের সম্পর্ক। ...লোক মুখে শুনা গিয়াছে অনেক স্ত্রী প্রাতঃকালে উঠিয়া স্বামীর পদধূলি গ্রহণ করে। এমন হাস্যজনক কৃত্রিম অভিনয় তো আর দুটি নাই। কিন্তু এ ভাবটি আমাদের পরিবারের ভাব।"(১১২)

রবীন্দ্রনাথ বাঙালী সমাজের সামগ্রিক মঙ্গলের জন্য পরিবারে তথা সমাজে প্রচলিত ভয়ের দ্বারা শিক্ষাদানের রীতির সমালোচনা করেন।

'নিমন্ত্রণ সভা' (ভারতী, আষাঢ়, ১২৮৮) প্রবন্ধে দেশীয় সমাজে নিমন্ত্রণ ব্যবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন;—"দশটা বাঙালিকে একত্রে জড়ো করিবার প্রধান উপায় আহারের লোভ দেখানো, বাঙালিদের অপেক্ষা আরও অনেক ইতর প্রাণীকেও ওই উপায়ে একত্রিত করা যায়।"(১১৩) অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ এদেশে নিমন্ত্রণ মানে ভাল খাবারের বন্দোবস্ত থাকাকে ব্যঙ্গ করেছেন। তিনি সমাজে প্রচলিত নিমন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তন কামনা করেছেন। কেননা প্রচলিত নিমন্ত্রণ ব্যবস্থায় বাঙালীর মানসিক উন্নতির সম্ভাবনা নেই। তাই নতুন নিমন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন;—

"নিমন্ত্রণের অন্যান্য নানা উপকরণের মধ্যে আহার বলিয়া একটা পদার্থ রাখা যায়, কিন্তু সমস্ত নিমন্ত্রণটা যেন আহার না হয়। পরস্পরে মিলিয়া গান-বাজনা, আমোদ-প্রমোদ, কথোপকথনের চর্চা আরও বহুলতররূপে আমাদের সমাজে প্রচলিত হউক।"(১১৪)

'নিমন্ত্রণ সভা'র দ্বারা প্রাবন্ধিক সমাজে প্রচলিত নিমন্ত্রণ ব্যবস্থার পরিবর্তে সুস্থ মানসিক বিনোদন ব্যবস্থা প্রচলনের জন্য আহ্বান জানান।

'সমাজে স্ত্রী পুরুষের প্রেমের প্রভাব' (পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক, ২৪/১১/১৮৮৮) প্রবন্ধে সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্য মূলক আচরণের নিন্দা করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন—নারী পরিবারের মধ্যেই আবদ্ধ। তাঁর ভাষায়;—

"আমাদের দেশে পরিবার আছে, কিন্তু সমাজ নাই তাহার এক প্রধান কারণ স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মধ্যে বদ্ধ, সমাজের মধ্যে ব্যাপ্ত নহে। স্ত্রীলোকের প্রভাব কেবলমাত্র পরিবারের পরিধির মধ্যেই পর্যাপ্ত। পরিবারের বাহিরে আর মানব সমাজ নাই, কেবল পুরুষ সমাজ আছে। ...আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা কেবলমাত্র গৃহিণী, তাহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহাদের সহিত কেবল আমাদের সুবিধার যোগ,"(১১৫)

রবীন্দ্রনাথ সমাজের নারীর প্রতি অবিচারের বিরোধিতা করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন নারীকে এভাবে দাসীতে পরিণত করায় সমাজের অবনতি হচ্ছে। সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের জন্য নারী পুরুষ উভয়ের প্রয়োজন। তাঁর ভাষায়;—"স্ত্রী-পুরুষগত প্রেমের ন্যায় প্রবল শক্তি আর কিছু আছে কিনা সন্দেহ। এই শক্তি ষোল আনা মাত্রায় সমাজের কাজে লাগাইলে মানবসভ্যতা অনেকটা বল পায়।"(১১৬) এই বক্তব্যের মধ্যে প্রাবন্ধিক রবীন্দ্রনাথের স্বদেশীয় সমাজের উন্নয়নের ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

শিক্ষা মানুষের জীবনে একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান। রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা বিষয়ে অনেক দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করেছেনে। তিনি উনিশ শতকে রচিত প্রবন্ধেও এবিষয়ে আলোকপাত করেন। রবীন্দ্রনাথ "ছাত্রদের নীতিশিক্ষা" (সাধনা, মাঘ, ১২৯৯) প্রবন্ধে নীতিশিক্ষা দেবার নতুন নীতির কথা বলেন। তাঁর ভাষায়;—

"নিঃসন্দেহ নীতিশিক্ষা দিবার ইচ্ছা ও চেষ্টা সর্বতোভাবেই প্রশংসনীয়। শুধু আমার বক্তব্য এই যে, কতকগুলি বাঁধিবোল দ্বারা এ কার্য সম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। যাহাকে ইংরাজিতে 'কপি-বুক মোরালিটি বলে, তাহার দ্বারা এ পর্যন্ত কাহারও চরিত্র সংশোধন হইতে দেখা যায় নাই।"(১১৭)

শুষ্ক নীতিশিক্ষার দ্বারা ছাত্রকে সুনাগরিক গড়া সম্ভব নয়। লেখকের মতে;—

"নীতি বচনের বাঁধিবোলের মধ্যে পবিত্রতা ও ন্যায়ের সৌন্দর্য দেখিতে পাওয়া যায় না, যদি পবিত্রতা কতদূর সুন্দর ও অপবিত্রতা কতদূর কুৎসিত ইহা হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করাইতে চাহ তো বরং ভালো নভেল ও কবিতা পড়িতে দাও।"(১১৮)

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের দ্বারা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিকে ধরিয়ে দিয়েছেন। যে ত্রুটি সংশোধন করলে এদেশে মানব সম্পদ বৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

'ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক' (সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৩০২) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অমানবিক দিক উদ্ঘাটন করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন, অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক পাঠদান শিক্ষার্থী নিপীড়নের নামান্তর। যা চেতনার বিকাশ ঘটাতে পারে না। লেখক বলেন;— "ভোজনের মাত্রা পরিপাকশক্তির সীমা ছাড়াইয়া গেলে তাহাতে লাভ নাই বরঞ্চ ক্ষতি, ...মানসিক ভোজন সম্বন্ধেও এই নিয়ম খাটে"[১১৯] রবীন্দ্রনাথ শিক্ষার বিকাশের জন্য পরামর্শ দেন;— "অন্তত এন্ট্রেন্স ক্লাস পর্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয়গুলি যদি বাংলায় অধীত হয় তবে শিশুপীড়ন অনেকটা দূর হইতে পারে। ...আমরা ছাত্রদিগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির এই অন্যায় অপব্যয় নিবারণের উদ্দেশ্যেই এন্ট্রেন্স স্কুলে বাংলা ভাষায় বিষয় শিক্ষা দিতে অনুরোধ করি।"[১২০] এই প্রবন্ধে লেখক স্বদেশীয় শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য সুচিন্তিত মতামত দেন।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে বাঙালীর আত্মউন্মোচনের যে উদ্যোগ দেখা দিয়েছিল, এই শতকের শেষদিকে তার স্বীকৃতি মেলে। এই প্রসঙ্গে আমরা স্বামী বিবেকানন্দ ও আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর আলোচনা করব। কেননা, অধ্যাত্মিকক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের নিকট ভারতের গৌরবকে বিবেকানন্দ স্বীকৃতি এনে দিয়েছেন এবং জগদীশচন্দ্র বিজ্ঞানের অভিনব আবিষ্কারের দ্বারা স্বদেশের গৌরব প্রতিষ্ঠা করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের স্বদেশ ভাবনায় স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) এক উল্লেখযোগ্য নাম। বিবেকানন্দ ছিলেন সন্ন্যাসী। প্রশ্ন জাগতে পারে, বাংলা সাহিত্যের স্বদেশ ভাবনায় একজন সন্ন্যাসীর কি অবদান থাকতে পারে? প্রথমেই মনে হবে, বিবেকানন্দ স্বদেশের সভ্যতা সংস্কৃতির গৌরব দেশ-বিদেশে সাফল্যের সঙ্গে প্রচার করেন। বিবেকানন্দই বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে (১৮৯৩) হিন্দু ধর্মের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করেন। শিকাগো বিশ্বধর্ম সম্মেলনের প্রথম ভাষণে তিনি হিন্দু ধর্মের উদার মনোভাবের কথা প্রকাশ করে বলেন;—

> "I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance. We believe not only in universal toleration, but we accept all religions as true."[১২১]

এছাড়া বিবেকানন্দ বাংলায় অনেকগুলি প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন। যে লেখাগুলিতে তাঁর মনের দেশানুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর বাংলা রচনাগুলির দেশানুরাগকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা; স্বদেশবাসীর জীবন সমৃদ্ধ করার নীতি-উপদেশ ও বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার প্রয়োজনীয় উপদেশ।

বিবেকানন্দ বিলাসী সাহিত্য পছন্দ করতেন না। শিকাগো থেকে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে একটি পত্রে বিবেকানন্দ লিখেছেন;—"দারিদ্র্য আর অজ্ঞতা দেখে আমার ঘুম হয় না; ...গরীবেরা এত গরীব, তারা স্কুল পাঠশালে আসতে পারে না, আর কবিতা-ফবিতা পড়ে তাদের কোনো উপকার নেই।"[১২২] বিবেকানন্দ বিলাসী কাব্য সাহিত্যের থেকে মানুষের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক চাহিদাকে বেশী মূল্য দিতেন। সেই জন্য সাহিত্য চর্চার পক্ষপাতী ছিলেন না—এমন নয়। যদি সাহিত্যের দ্বারা কোনো রকম উপকার করা সম্ভব হয়, তিনি তা থেকে পিছপা হন নি। বলা যায়—বিবেকানন্দের সমস্ত রকম রচনার পিছনে একটি উদ্দেশ্য ছিল। এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধ বা প্রবন্ধ জাতীয় রচনা হল— 'ভাববার কথা', 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত'। এখানে 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এবং 'বর্তমান ভারত' অবলম্বনে বাংলা সাহিত্যে বিবেকানন্দের স্বদেশ ভাবনার আলোচনা করা হচ্ছে।

'ভাববার কথা' স্বামী বিবেকানন্দের একটি অন্যতম রচনা। গ্রন্থটিতে লোকশিক্ষার একাধিক অবতারণা আছে। বাংলা ভাষার বিষয়ে বিবেকানন্দের মূল্যবান উপদেশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গটি অন্যত্র আলোচিত হওয়ায় এখানে অন্যান্য নীতি-উপদেশের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। বিবেকানন্দ স্বজাতির মুক্তির জন্য কতগুলি প্রয়োজনীয় গুণাবলী কামনা করেছেন। তাঁর ভাষায়;—

> "চাই—সেই উদ্যম, সেই স্বাধীনতাপ্রিয়তা, সেই আত্মনির্ভর, সেই অটল ধৈর্য, সেই কার্যকারিতা, সেই একতাবন্ধন, সেই উন্নতিতৃষ্ণা; চাই-সর্বদা-পশ্চাদ্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ স্থগিত করিয়া অনন্ত সম্মুখসম্প্রসারিত দৃষ্টি, আর চাই—আপাদমস্তক শিরায় শিরায় সঞ্চারকারী রজোগুণ।"[১২৩]

সমকালীন জাতীয় জীবনে দুরবস্থা দূরীকরণের জন্য উক্ত বিষয়গুলি একান্ত প্রয়োজন ছিল। বিবেকানন্দ ইহলোকের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন;—"নিম্নস্তরে তমোগুণকে পরাহত করিয়া রজোগুণপ্রবাহ প্রতিবাহিত না করিলে আমাদের ঐহিক কল্যাণ যে সমুৎপাদিত হইবে না ও বহুধা পারলৌকিক কল্যাণের বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহাও নিশ্চিত।"[১২৪] বিবেকানন্দ ইহলোকের সমকালীন চরম দুর্দশা দূরীকরণের জন্য রজোগুণের অধিকারী হওয়ার আহ্বান জানান। লেখকের এজাতীয় নীতি-উপদেশ স্বদেশ ভাবনারই নামান্তর।

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে বৈদিক যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক একটি ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিবেকানন্দ বলেন;—"পৃথিবীর ইতিহাস-আলোচনায় বোধ হয় যে, প্রাকৃতিক নিয়মের বশে ব্রাহ্মাদি চারি জাতি যথাক্রমে বসুন্ধরা ভোগ করিবে।"[১২৫] তিনি বলেন— নতুন যুগে শূদ্রশক্তির বিকাশ ঘটবে। বিবেকানন্দের ভাষায়;—"কালপ্রভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণও শূদ্রের নিম্নাসনে সমানীত হইতেছে এবং শূদ্রজাতিও উচ্চস্থানে উত্তোলিত

হইতেছে।"(১২৬) যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে চার বর্ণের উত্থানপতনে লেখক দুঃখিত নন। বরং তিনি চেয়েছেন— যুগযুগ ধরে নিপীড়িত শূদ্রের মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক্। প্রসঙ্গত স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লেখা একটি পত্রের কথা মনে হয়। বিবেকানন্দ লিখেছিলেন;— " 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'—গুরুদেব বলতেন না? ঐ যে গরীবগুলো পশুর মতো জীবন যাপন করছে, তার কারণ মূর্খতা; পাজী বেটারা চার যুগ ওদের রক্ত চুষে খেয়েছে, আর দু পা দিয়ে দলেছে।"(১২৭) চিঠির এই বক্তব্য চির নিপীড়িত, অত্যাচারিত শূদ্রের প্রতি বিবেকানন্দের সহমর্মিতা প্রকাশ পেয়েছে।

আমরা লক্ষ করব, 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থে প্রাবন্ধিক বিবেকানন্দ স্বদেশের মানব সম্পদ বৃদ্ধির পরিকল্পনায় মগ্ন। এই পরিকল্পনা স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ ভাবনার পরিচয় বহন করে। তাঁর স্বদেশ ভাবনার অকৃত্রিম প্রকাশ 'বর্তমান ভারত' প্রবন্ধের শেষে পাওয়া যায়। ভাষা ও ভাবের উপযুক্ত মেলবন্ধন স্বদেশপ্রেমের আবেদনকে মর্মস্পর্শী করে তুলেছে। তাঁর ভাষায়;—

> " হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ;"(১২৮)

এই বক্তব্য শুধু নীতি-উপদেশই নয়, যেন 'স্বদেশমন্ত্র'। এখানে খুব সংক্ষেপে দেশের মূল সমস্যার উত্থাপন ও তা সমাধোনের পথনির্দেশ আছে। সমকালে ভারতে মূল সমস্যা পরানুকরণ, দুর্বলতা, কাপুরুষতা দূর করার জন্য উপদেশ; দরিদ্র, মূর্খ, চন্ডাল, মুচি, স্বদেশবাসীকে মানবিক মর্যাদা প্রদানের উপদেশ; নারীকে সীতা, সাবিত্রী প্রমুখের আদর্শ গ্রহণ করার উপদেশ; সর্বোপরি স্বদেশের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ মনে করার আহ্বান — 'বর্তমান ভারত'কে অকৃত্রিম দেশানুরাগ মূলক গ্রন্থের মর্যাদা দিয়েছে।

বাংলা ভাষা বিষয়ে বিবেকানন্দ গ্রহণযোগ্য মতামত দিয়েছেন; যা তাঁকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগীদের নিকট অবিস্মরণীয় করে রেখেছে। 'ভাববার কথা' প্রবন্ধের 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক আলোচনায় বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে। বলা যায়, এই ভাবনাগুলি যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। তিনি লিখেছেন;—"ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।"[১২৯] বিবেকানন্দ বাঙালীর উন্নয়ন করতে বাংলা ভাষার গুরুত্ব স্বীকার করেন। বাংলা ভাষা কি করে বাঙালীর উন্নতিতে সহায়ক হতে পারে সে বিষয়ে তিনি উপদেশ দিয়েছেন। তিনি প্রথমেই বলেন;—

> "বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত—যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা—যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের করে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর?"[১৩০]

এখানে বিবেকানন্দ চলিত ভাষার গুরুত্বকে স্বীকার করেন। তাঁর মতে, চলিত ভাষা সকলের বুঝবার পক্ষে উপযোগী। অথচ লেখকেরা চলিত ভাষা ছেড়ে কৃত্রিম একটি ভাষায় লেখেন। তিনি বাঙালী লেখককেও চলিত ভাষা ব্যবহারের জন্য আবেদন করেন। স্থান বিশেষে বৈচিত্র্যময় বাংলা ভাষার সমস্যা সমাধানের বিষয়ে বিবেকানন্দ বলেন;—"প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা।"[১৩১] এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভাষাপ্রীতির মনোভাবকে বিসর্জন দিতে হবে। বিবেকানন্দ এ বিষয়ে লিখেছেন;—"সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।"[১৩২] বাংলা ভাষার উন্নয়নে বিবেকানন্দের এ জাতীয় নীতি-উপদেশ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক ছিল।

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (১৮৫৮-১৯৩৭) উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রথমার্ধে বাঙালীর বিজ্ঞান চর্চায় এক স্মরণীয় নাম। বিজ্ঞান চেতনায় শ্রেষ্ঠ দেশ ইউরোপ ও আমেরিকায় তিনি তাঁর বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণা ও আবিষ্কারের দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। দেশে-বিদেশে জ্ঞানী-গুণী মহলে জগদীশচন্দ্র বসু সম্মানিত হয়েছেন। বাঙালী বিজ্ঞান চর্চায় দেশ-বিদেশে সাফল্য ও স্বীকৃতি পাবে—এই বিষয়টি সচেতন বাঙালীর নিকট গৌরবের বিষয়। আর তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জগদীশচন্দ্র বসুকে বলেন;—

"বিজ্ঞানলক্ষ্মীর প্রিয় পশ্চিমমন্দিরে
দূর সিন্ধু তীরে
হে বন্ধু, গিয়েছ তুমি; জয়মাল্যখানি
সেথা হতে আনি
দীনহীনা জননীর লজ্জানত শিরে
পরায়েছ ধীরে।"(১৩৩)

—এখানে রবীন্দ্রনাথ জগদীশচন্দ্র বসুর বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় গৌরব বোধ করেছেন।

আমরা লক্ষ করব, বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু দেশ-বিদেশের অনেক সম্মান লাভ করার পরেও নিজের দেশ, নিজের ভাষা, নিজের সাহিত্য ও সংস্কৃতি ভুলে যান নি। বিজ্ঞান বিষয়ে পাশ্চাত্যের নিকট সম্মান লাভের পর তিনি মেকি সাহেব হতে পারেন নি। জগদীশচন্দ্র বসুর স্বদেশ, মাতৃভাষা, স্বদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগের ফসল 'অব্যক্ত' (১৩২৮) গ্রন্থটি। যদিও গ্রন্থটি বিশ শতকে প্রকাশিত, তবুও উনিশ শতকের অনেক প্রবন্ধ এতে স্থান পেয়েছে। যথা;—'যুক্তকর' (১৮৯৪), 'আকাশ স্পন্দন ও আকাশ সম্ভব জগৎ' (১৮৯৫), 'গাছের কথা' (১৮৯৪), 'উদ্ভিদের জন্ম ও মৃত্যু', 'মন্ত্রের সাধন', 'অগ্নি পরীক্ষা' (১৮৯৫), 'ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে' (১৮৯৪) নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলি উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছে। স্থূল দৃষ্টিতে আমাদের মনে হয়, জগদীশচন্দ্র বসু এতবড় একজন বিজ্ঞানী হয়েও কেন দরিদ্র মাতৃভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখে তাঁর অমূল্য সময় নষ্ট করেছেন? জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' নামক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ গ্রন্থের ভূমিকার বক্তব্যেই এর উত্তর আছে। তিনি লিখেছেন;—

> "ভিতর ও বাহিরের উত্তেজনায় জীব কখনও কলরব কখনও আর্ত্তনাদ করিয়া থাকে। মানুষ মাতৃক্রোড়ে যে ভাষা শিক্ষা করে সেই ভাষাতেই সে আপনার সুখ-দুঃখ জ্ঞাপন করে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমার বৈজ্ঞানিক ও অন্যান্য কয়েকটি প্রবন্ধ মাতৃভাষাতেই লিখিত হইয়াছিল।"(১৩৪)

এখানে প্রাবন্ধিক জগদীশচন্দ্র বসু মাতৃভাষার গৌরব গান গেয়েছেন। তিনি মাতৃভাষাকে হৃদয়ের অকৃত্রিম অনুভূতি প্রকাশের উপযুক্ত বলে মনে করেন। কোনো ভাষাবিজ্ঞানী যা অস্বীকার করতে পারেন না। এবং তিনি আরো বলেন যে, ১৩২৮ বঙ্গাব্দের প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে 'অব্যক্ত'-এর অনেক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ মাতৃভাষায় লেখা হয়েছে। এই বক্তব্যে আমরা জগদীশচন্দ্র বসুর মাতৃভাষা প্রীতির পরিচয় পাব। তিনি যেন এখানে পরোক্ষে

কয়েকটি উপদেশ দিতে চেয়েছেন। যথা;— বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানমূলক প্রবন্ধ রচনা করা যায়। এখন থেকে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গবেষণার চেষ্টা করলে বাঙালীর উপকারই হবে। কেননা, মাতৃভাষায় অনুভূতি বা ভাব প্রকাশ করা খুবই সহজ।

বাঙালী বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর মাতৃভাষা প্রীতির আরো পরিচয় পাওয়া যায় 'অব্যক্ত' গ্রন্থের 'কথারম্ভ' নামক অংশে। মৌলিক গবেষণা করতে গিয়ে তিনি নানা অবিচারের সম্মুখীন হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন;—"বিদ্যুৎ-তরঙ্গ ও জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং সেই উপলক্ষ্যে বিবিধ মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। এ বিষয়ের আদালত বিদেশে; সেখানে বাদ প্রতিবাদ কেবল ইউরোপীয় ভাষাতেই গৃহীত হইয়া থাকে। এদেশেও প্রিভি-কাউন্সেলের রায় না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় না।

জাতীয় জীবনের পক্ষে ইহা অপেক্ষা অপমান আর কি হইতে পারে? ইহার প্রতিকারের জন্য এদেশে বৈজ্ঞানিক আদালত স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছি। ফল হয় ত এই জীবনে দেখিব না। প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান-মন্দিরের ভবিষ্যৎ বিধাতার হস্তে।"[১৩৫]

এখানে পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর মর্মবেদনা প্রকাশ পেয়েছে। অতএব বলা যায় জগদীশচন্দ্র বসুর মাতৃভাষার প্রতি সুগভীর আন্তরিকতা ছিল। এই অকৃত্রিম আন্তরিকতার ফসল আলোচ্য 'অব্যক্ত' গ্রন্থটি।

দীর্ঘদিনের জরাগ্রস্ত বাঙালী জীবনকে সমৃদ্ধ করতে প্রয়োজন ছিল উপযুক্ত নীতি-আদর্শ। প্রবন্ধ ও প্রবন্ধজাতীয় রচনায় যুক্তির দ্বারা আপামর বাঙালীকে পথাদর্শের অবতারণা আছে। আমরা এই অধ্যায়ে ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সচেতন, সমৃদ্ধ ও পারদর্শী হবার প্রকৃত মত ও পথের পরিচয় পেয়েছি। উনিশ শতকে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধ ও প্রবন্ধজাতীয় রচনায় এই পথাদর্শ বাঙালীকে সচেতন করার প্রেরণা বা উৎসাহ দানের ভাবনায় সমৃদ্ধ। বলা বাহুল্য — প্রাবন্ধিকের এই প্রেরণা বা উৎসাহ দানের প্রচেষ্টা উনিশ শতকের স্বদেশ ভাবনার নামান্তর।

উল্লেখপঞ্জী

১। উৎকল বর্ণন, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৮৭।

২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

৩। কটকস্থ উৎকল ভাষোদ্দীপনী সভায় শ্রীযুক্ত বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১০০।

৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০২।

৫। শরীর-সাধনী বিদ্যাশিক্ষার গুণোৎকীর্ত্তন, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১৩৪।

৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৩।

৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১১৪।

৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২১।

৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৫।

১০। প্রাগুক্ত, পৃ: ১২৬।

১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩০।

১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩৪।

১৩। বঙ্গবিদ্যার আদ্য বিবরণ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৬৩।

১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০।

১৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১।

১৬। বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৭১।

১৭। বিজ্ঞাপন, বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৬৯।

১৮। বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ৮৬।

১৯। কলিকাতা কল্পলতা, রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক — ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১, পৃ: ১।

২০। পারিবারিক প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ: ৪৫৩।

২১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫৫।

২২। সামাজিক প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ: ২৪৬।

২৩। আচার প্রবন্ধ, ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, মিত্র ও ঘোষ, শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলি-১২, দ্বিতীয় পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯, পৃ: ৫০২।

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০৩।

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০৩।

২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০৫।

২৭। ধর্ম্মতত্ত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫৬১।

২৮। বিজ্ঞাপন, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ষোল।

২৯। ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ১-৪।

৩০। ইংরাজ স্তোত্র, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৯।

৩১। New Year's Day, লোকরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪৪।

৩২। কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪৫।

৩৩। একা 'কে গায় ওই ?', কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৪৬।

৩৪। বিড়াল, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৭৭।

৩৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৭৭।

৩৬। স্ত্রীলোকের রূপ, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৬৫।

৩৭। আমার মন, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৫৪।

৩৮। আমার দুর্গোৎসব, কমলাকান্তের দপ্তর, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৭২।

৩৯। বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব, কমলাকান্তের পত্র, কমলাকান্ত, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৮৫।

৪০। কমলাকান্তের জোবানবন্দী, কমলাকান্ত, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৯৫।

৪১। ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৯৫৩।

৪২। বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞানরহস্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ উনিশ।

৪৩। লোকশিক্ষা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৩২৪।

৪৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৫।

৪৫। বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ২৩৭।

৪৬। প্রাগুক্ত, পৃ, ২৩৭।

৪৭। বাঙ্গালা ভাষা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৩২১।

৪৮। অনুকরণ, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ১৭৭।

৪৯। প্রাচীনা ও নবীনা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ২২১।

৫০। রামধনপোদ, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৩২৬।

৫১। প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ২১৪।

৫২। গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ২৩২।

৫৩। বিজ্ঞাপন, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃঃ ৯৫৯।

৫৪। বাঙ্গালার কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৮৭।

৫৫। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ২৯০।

৫৬। সাম্য, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৩৯।

৫৭। প্রাগুক্ত, ৩৩৯।

৫৮। প্রাগুক্ত, ৩৪৫।

৫৯। উপক্রমণিকা, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৩৫৩।

৬০। প্রথমবারের বিজ্ঞাপন, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯৬০।

৬১। ভূমিকা, শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কৃষ্ণচরিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৯৬২।

৬২। ধর্ম্মতত্ব, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১ পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ, পৃ: ৫২৬।

৬৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৩০।

৬৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯৮।

৬৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৬০৭।

৬৬। রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ১৪১০, পৃ: ১৩১।

৬৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১৩২।

৬৮। আত্মচরিত, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ৫৯।

৬৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫৯।

৭০। হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ৪৪৮।

৭১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫০।

৭২। সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ২৮৭।

৭৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৭।

৭৪। প্রথম বারের বিজ্ঞাপন, সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ২৮৬।

৭৫। সে কাল আর এ কাল, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ৩০৫।

৭৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৩৪-৩৩৫।

৭৭। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ২৫২।

৭৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫২।

৭৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৩।

৮০। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫৩।

৮১। প্রকাশকের নিবেদন, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: [৬]

৮২। সাহিত্যের উদ্দেশ্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৪৮-২৪৯।

৮৩। সভ্যতা ও সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫১।

৮৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৫১।

৮৫। সাহিত্যের গৌরব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৭৮।

৮৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৭৮।

৮৭। বাঙালী কবি নয়, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২২৬।

৮৮। বাঙালী কবি নয় কেন, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৪১।

৮৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪১।

৯০। আলস্য ও সাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৫২।

৯১। সংগীত ও ভাব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০, পৃ: ২৮৬।

৯২। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬।

৯৩। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬।

৯৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৬।

৯৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ২৮৯।

৯৬। জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্র রচনাবলী, নবম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ৫০০

৯৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০০।

৯৮। ডুবদেওয়া, আলোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ২১।

৯৯। ধর্ম, আলোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৩০।

১০০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩১।

১০১। আত্মা, আলোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৪৪।

১০২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৫।

১০৩। অনাবশ্যক, সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৫৮-৫৯।

১০৪। মেঘনাদবধ কাব্য, সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ৭০।

১০৫। বাউলের গান, সমালোচনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, পঞ্চদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৯৮ : ১৯১৩ শক, পৃ: ১০৫।

১০৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

১০৭। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১০৯। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৬।

১১০। পারিবারিক দাসত্ব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৭০।

১১১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭২।

১১২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৭৩।

১১৩। নিমন্ত্রণ সভা, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৮৪।

১১৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৮৭।

১১৫। সমাজে স্ত্রী পুরুষের প্রেমের প্রভাব, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৪৬৩।

১১৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৬২।

১১৭। ছাত্রদের নীতিশিক্ষা, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৪২।

১১৮। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৪।

১১৯। ছাত্রবৃত্তির পাঠ্যপুস্তক, রবীন্দ্র রচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১০, পৃ: ৩৪৪।

১২০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩৪৫-৩৪৯।

১২১। Chicago addresses response to welcome at the world's parliament of religions' Chicago, 11th September 1893, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ১০।

১২২। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৮৫৬।

১২৩। ভাববার কথা, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৫০।

১২৪। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫০।

১২৫। বর্তমান ভারত, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ১০১।

১২৬। প্রাগুক্ত, পৃ: ১০৫।

১২৭। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত পত্র, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৮৫৬।

১২৮। বর্তমান ভারত, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ১০৭।

১২৯। বাঙ্গালা ভাষা, ভাববার কথা, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ) নবপত্র প্রকাশন, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, নব প্রকাশন প্রথম প্রকাশ ঃ ১বৈশাখ ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৪০৪, পৃ: ৫১।

১৩০। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

১৩১। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

১৩২। প্রাগুক্ত, পৃ: ৫১।

১৩৩। জগদীশচন্দ্র বসু, কল্পনা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৫তম রবীন্দ্রজন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০, পৃ: ১৩২।

১৩৪। কথারম্ভ, অব্যক্ত, বাউলমন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ১৩২৮, ৫ম মুদ্রণ ১৪০০, পৃ: ৩।

১৩৫। প্রাগুক্ত, পৃ: ৩।

উপসংহার

উনিশ শতক বাঙালীর নিকট এক গৌরবময় অধ্যায়। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা বাঙালীকে আত্মজাগরণের মন্ত্রে দীক্ষিত করে। এর ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে শুরু হয় বাঙালীর আত্মজাগরণের পালা। উনিশ শতকের যুগ চিন্তানায়কগণ উদার, নিরপেক্ষ ও যুক্তিনির্ভর জীবনদর্শনকে সমগ্র বাঙালীর কাছে তুলে ধরার জন্য উদগ্রীব হন। এই সময় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ যুগ চিন্তানায়কগণ 'আত্মীয়সভা', 'ব্রাহ্মসভা', 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'হিন্দু মেলা', 'ভারত সভা' বিভিন্ন সভা সংগঠন ও 'ব্রাহ্মণসেবধি', 'সংবাদ প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'হিন্দু পেট্রিয়ট', 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল চিন্তাচেতনাকে জনপ্রিয় করার চেষ্টা করেন। জাতীয় জীবনের এরকম পরিবর্তনে বাংলা সাহিত্য নীরব হয়ে থাকে নি। বাংলা সাহিত্য শিল্প হিসাবে রূপে-রসে সমৃদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে সঠিক পথনির্দেশ করার দায়িত্ব পালন করেছে। 'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' বিষয়ক গবেষণাকর্মে বাংলা সাহিত্যের সেই মহৎ দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা আলোচনা করা হয়েছে। সাহিত্যিকগণ বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ভাবে জাতিকে অনুপ্রেরণা বা উৎসাহ দিয়ে জাতীয় জীবনকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার মন্ত্র শুনিয়েছেন।

উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্য তার সংকীর্ণ পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে পড়ে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। পরিবর্তন আসে বিষয়ে-রূপে-রীতিতে। এই সময়ের বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের যোগ্যতা লাভ করার পথে অগ্রসর হয়েছে। ফলে আধুনিক গীতিকবিতা, সাহিত্যিক মহাকাব্য, নাটক, প্রবন্ধ ও কথাসাহিত্য একাধিক নতুন প্রকরণে বিশুদ্ধ সাহিত্য রসের আবেদনে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়।

'উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' নামক আমার গবেষণাকর্মটিকে মোট আটটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ে বাঙালীর আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে উনিশ শতকের সাহিত্যের ভূমিকার আলোচনা করা হয়। অবশ্য প্রথম অধ্যায় 'প্রাক্ উনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনা ও স্বদেশ ভাবনা'য় বাংলা সাহিত্যের আলোচনা করা হয়নি। তবে এখানে উনিশ শতকের উদার ও নিরপেক্ষ ভাবধারার প্রাক্ ইতিহাস আছে। 'প্রাক্ উনিশ শতকীয় সমাজ ভাবনা ও স্বদেশ ভাবনা'য় বাঙালীর চরম অধঃপতনের স্বরূপ আলোচনা করা হয়েছে। আমরা লক্ষ করেছি, এই সময় বাঙালী কতগুলি অর্থহীন আচার-আচরণ, রীতি-নীতিকে ধর্ম বা পূণ্য অর্জনের পথ বলে মেনে নিয়েছে। এছাড়া উনিশ শতকে যাঁরা উদার, যুক্তিবাদী ও নিরপেক্ষ মন নিয়ে জাতিকে সমৃদ্ধ করতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন — তাঁদের আবির্ভাবের সূত্র প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' অংশে ধর্ম সংস্কার, সমাজ সংস্কার, শিক্ষাসংস্কার প্রভৃতি সংস্কারমূলক আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ করা যায়। এই সময়ের প্রতিটি রচনায় প্রাক্ উনিশ শতকের সংকীর্ণ ধর্মীয়চেতনা বা সংকীর্ণ সমাজচেতনাকে সংস্কার করার প্রবণতা যুগ চিন্তানায়কগণের মধ্যে বিশেষভাবে সক্রিয় ছিল। রামমোহন ধর্ম, সমাজ প্রভৃতি সংস্কার করার জন্য বাংলা গদ্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি স্বদেশের সবরকম দুরবস্থা থেকে মুক্তির জন্য নতুন দর্শনের সৃষ্টি করে বলেন মানুষের জীবন শাস্ত্র ও বুদ্ধি উভয়েরই দ্বারা চালিত হওয়া উচিত। তাঁর 'বেদান্তগ্রন্থ' বা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের সম্বাদ' জাতীয় রচনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। বিদ্যাসাগর শিক্ষা প্রচার ও সমাজ সংস্কারকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলা গদ্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়ে তাঁর রচনা 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' বা 'বর্ণপরিচয়' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অক্ষয়কুমার দত্ত বাঙালীকে সংকীর্ণতা মুক্ত ও সমৃদ্ধ করার জন্য এবং শিক্ষার উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য লেখনী ধারণ করতেন। তাঁর 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' বা 'চারুপাঠ' প্রভৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মীয় শৃঙ্খলা আনার জন্য ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। এ বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান', বা 'ব্রাহ্মধর্মের মত ও বিশ্বাস' উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে কয়েকজন সংস্কারপন্থী ব্যক্তির রঙ্গব্যঙ্গমূলক সাহিত্যের দ্বারা বাঙালীর জীবনকে সুপথে চালনা করার মনোভাব। এখানে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও হুতোম প্যাঁচা ওরফে কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্সা ও নক্সা জাতীয় রচনার আলোচনা করা হয়েছে। ভবানীচরণের 'নব বাবু বিলাস', 'নব বিবি বিলাস' ও 'কলিকাতা কমলালয়'-এ মূলত সমকালের কলকাতার নাগরিক শ্রেণীর বিকৃত জীবনাচরণকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে সন্তানকে শিক্ষিত করার সমকালীন ছবি তুলে ধরেন। মদ্য পানের কুফল দেখিয়ে 'মদ খাওয়া বড় দায় জাত থাকার কি উপায়' রচনা করেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা'-য় সমকালীন কলকাতার বিকৃত জীবনাচরণকে তীক্ষ্ণ ও তীব্র ব্যঙ্গবাণে বিদ্ধ করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় — 'উনিশ শতকের নাট্য সাহিত্যে (নাটক ও প্রহসন) স্বদেশ ভাবনা' আলোচনায় আমরা চারটি বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছি, যথা — বাংলা নাটকের উদ্ভব পর্ব, সমাজ সংস্কারে বাংলা নাটক ও প্রহসনের ভূমিকা, জাতীয়তাবাদ প্রচারে বাংলা নাটকের ভূমিকা ও বাঙালীর একান্ত নিজস্ব নাটক রচনার উদ্যোগ। এ বিষয়ে জি.সি. গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার, রামনারায়ণ তর্করত্ন, মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র প্রমুখের আন্তরিক সদিচ্ছায় বাংলা নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ হয়। সমকালের সমাজ সংস্কার ও সমাজের বিকৃত রূপের

সমাধানে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব'; উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা বিবাহ'; মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'; দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'; গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'হারানিধি' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনের আলোচনা করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদের প্রচারে বাংলা নাটকের ভূমিকা প্রাতঃস্মরণীয়। আমরা জানি — বাংলা নাটকের শক্তির কথা মাথায় রেখে বৃটিশ সরকার এদেশে নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন প্রবর্তন করে। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরুবিক্রম', 'সরোজিনী' প্রভৃতি নাটক জাতীয়তাবাদের প্রচারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এছাড়া মনোমোহন বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ বাংলা নাটককে বাঙালীর রুচির নাটকে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেন। এই বিশেষ প্রবণতাকে বাঙালীর নিজস্ব নাটকের সন্ধানে অংশে আলোচিত হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ে — 'উনিশ শতকের মহাকাব্য ও আখ্যানকাব্যে স্বদেশ ভাবনা' অংশে বলা হয়েছে, উনিশ শতকে সাহিত্যিক মহাকাব্য বা আখ্যানকাব্য রচনার উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বাংলা কাব্যসাহিত্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য রচিত। বলা যায় তাঁর বাংলা কাব্যচর্চার পেছনে উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। যথা - বাংলা কাব্যকে উৎকর্ষতা দান, পরাধীন জাতির মনে দেশানুরাগ জাগানো, পাঠকের মনে মানবিক অনুভূতিকে সতেজ করা ও বিশুদ্ধ কাব্যরস সৃষ্টি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতা সৃষ্টির জন্য মধুসূদন দত্ত বাংলায় কাব্যসাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর যেন আবির্ভাব হয়েছিল বাংলা কাব্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার জন্যই। এছাড়া এজাতীয় কাব্যের দ্বারা কবিগণ পাঠককে নীতিশিক্ষা ও জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত করার কাজটি সম্পাদন করেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য' ও নবীনচন্দ্র সেনের 'ত্রয়ীকাব্য' এই বিশেষ উদ্দেশে রচিত। অর্থাৎ এই অধ্যায়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীকে সচেতন করারও উদ্যোগ ছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে আধুনিক গীতিকবির কাব্যের মধ্যে স্বদেশ ভাবনার অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই অধ্যায়টিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গীতিকবিতার উদ্ভব পর্বে স্বদেশ ভাবনার আলোচনায় মূলত কবি ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় স্বদেশ ভাবনাকে আলোচনা করা হয়। জাতীয়তাবাদের যুগে গীতিকবিতা রচনায় হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন বাঙালীকে নানাভাবে সচেতন করার চেষ্টা করেন। গীতিকবিতার আস্বাদ নামক পর্বে মধুসূদন দত্তের গীতিকবিতায় স্বদেশ ভাবনার আলোচনা আছে। মধুসূদন দত্ত যে পাশ্চাত্য শিক্ষালাভ করে সাহেব হয়েও বাংলা তথা ভারতবর্ষের সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করতেন তার প্রকাশ ঘটেছে। এবং বিশুদ্ধ গীতিকবিতার আলোচনায় স্থান পেয়েছে বিহারীলাল চক্রবর্তী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। এঁদের মনোভাবে স্বদেশ ভাবনা

যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। বিহারীলাল বিশুদ্ধ গীতিকাব্যধারার প্রবর্তন করলেও তাঁর কবিতায় দেশানুরাগ রয়েছে, আর রবীন্দ্রনাথ স্বদেশের সমস্ত রকমের দুর্বলতা, ভীরুতা, দরিদ্রতা সর্বপরি জীবনের মানোন্নয়নের জন্য মুক্তিমন্ত্র তাঁর গীতিকবিতায় ধ্বনিত করেছেন, সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাতেও দেশানুরাগের সন্ধান পাওয়া যায়। অতএব উনিশ শতকে গীতিকবিগণ স্বদেশ ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালী পাঠককে প্রভাবিত করতে উদ্যোগী হয়েছেন — এমন দাবী করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে 'উনিশ শতকের কথাসাহিত্যে (উপন্যাস ও ছোটগল্প) স্বদেশ ভাবনা'-র আলোচনায় কথাসাহিত্যের উদ্ভব, কথাসাহিত্যের দ্বারা সমকালের বাঙালী জীবনের মানোন্নয়নে উৎসাহ ও জাতীয়তাবোধের প্রচার বিষয়ে আলোচনা আছে। উনিশ শতকে লক্ষ করি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ বাংলা উপন্যাসকে শিল্পরূপ দানের জন্য আন্তরিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের প্রথম দু'টি উপন্যাস লিখতে গিয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন, ঔপন্যাসিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি নানারকম নীতি-আদর্শ প্রচার করেন। রমেশচন্দ্র তো মাতৃভাষায় সাহিত্যকে উন্নত করা ও পাঠকের মনে জাতীয়তাবোধ জাগরণের উদ্দেশে কলম ধরেছেন, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সমকালের রোমান্স রসে বিভোর বাঙালী পাঠকের কাছে বাস্তবসম্মত উপন্যাস জোগান দেওয়ার জন্য কলম ধরেন। এছাড়া কথাসাহিত্যের অন্য শাখা ছোটগল্পের সার্থক শিল্পরূপ দান ও ছোটগল্পের দ্বারা লোকশিক্ষা প্রদানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখের এক বড় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কথাসাহিত্যিকের উপন্যাস ও গল্পে বাঙালী জীবনের উত্তরণের প্রেরণা লক্ষ করি যাকে আমরা স্বদেশ ভাবনা বলে দাবী করেছি।

অষ্টম অধ্যায়ে 'উনিশ শতকের প্রবন্ধ ও প্রবন্ধ জাতীয় সাহিত্যে স্বদেশ ভাবনা' অংশে যুক্তির উপর নির্ভর করে বাঙালী জীবনের মানোন্নয়নের প্রেরণা লক্ষ করার মতো। এখানে রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নানা যুক্তির দ্বারা প্রচলিত অবাঞ্ছিত জীবনাচরণকে পরিহার করে আরো উন্নত সমৃদ্ধ জীবনলাভের প্রেরণা দিয়েছেন। এই প্রেরণা বা উৎসাহ উনিশ শতকে রচিত 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'আলোচনা', 'সমালোচনা', 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রভৃতি রচনায় লক্ষ করি।

প্রতিটি অধ্যায়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনকে আরো সমৃদ্ধ ও উন্নত করতে বাংলা সাহিত্যের মহৎ প্রেরণাকে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র উনিশ শতকে কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, কথাসাহিত্যিকগণ অবক্ষয়িত জাতীয় জীবনকে উত্তরণের পথে এগিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের এই মহৎ কর্তব্য বাঙালী জীবনের মানকে

উন্নত করেছে। উনিশ শতকের গোড়ায় (১৮১৫) বাঙালীর জীবনে উন্নতির লক্ষ্যে রামমোহন রায় বুদ্ধি ও শাস্ত্রকে অনুসরণ করার যে দর্শন বাংলা সাহিত্যের দ্বারা সূচনা করেছিলেন, সমগ্র শতক জুড়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বর গুপ্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ বাঙালী জীবনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্য বাংলা সাহিত্যের দ্বারা নানাভাবে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ দিয়েছিলেন। আর তাই ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মধুসূদন প্রসঙ্গে বলেছিলেন — "আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না — এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালি জাতির গৌরব হইবে।" ঋষি বঙ্কিমের এই প্রত্যাশা অপূর্ণ থাকে নি। এই শতকের শেষে বাঙালী বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি বিষয়ে বিশ্ববাসীর মন জয় করেছে। তাই রাজনীতি সচেতন পরবর্তী শতকের গোড়ায় বাঙালী বৃটিশ শাসকের বঙ্গভঙ্গের ষড়যন্ত্রকে তীব্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে রদ করে দেয়। শুধু তাই নয় বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র বসু, ধর্মে স্বামী বিবেকানন্দ ও সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো বিশ্ববরেণ্য বাঙালীর পরিচয় পাই। অতএব পরবর্তী শতকের গোড়ায় বাঙালীর পরিপূর্ণ আত্মচেতনার বিকাশে ও উনিশ শতকেই বিশ্ববরেণ্য বাঙালীর আবির্ভাবে সমগ্র উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে — সেকথা বলাই বাহুল্য।

গ্রন্থপঞ্জী

আকর গ্রন্থ

১। রামমোহন গ্রন্থাবলী, প্রথম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৬৪।

২। রামমোহন গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০।

৩। রামমোহন গ্রন্থাবলী, তৃতীয় খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫০, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০।

৪। রামমোহন গ্রন্থাবলী, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৯, তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০।

৫। রামমোহন গ্রন্থাবলী, পঞ্চম খণ্ড, সম্পাদক ঃ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৩৫৮, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৩৮০।

৬। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ১ম খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২।

৭। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ২য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২।

৮। বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড, বিদ্যাসাগর স্মারক জাতীয় সমিতি, সভাপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, সদস্য-শ্রীযতীন্দ্রচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীমণীন্দ্র রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীদীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ আগষ্ট ১৯৭২।

৯। বিদ্যাসাগর রচনাবলী—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সম্পাদনা—সুবোধ চক্রবর্ত্তী, প্রথম সংস্করণ ঃ শুভ মহালয়া ১৩৯৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ শুভ রাসপূর্ণিমা ১৪০৬, কামিনী প্রকাশালয়, ৫, নবীনচন্দ্র পাল লেন, কলকাতা-৯।

১০। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা নং-১—নব বাবু বিলাস, নব বিবি বিলাস, কলিকাতা কমলালয় —ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা সম্পাদনা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, উপদেষ্টা—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। নব সংস্করণ—সেপ্টেম্বর ১৯৭৯, সুবর্ণরেখা, কলিকাতা-৯।

১১। জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপদেশ, শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক লিখিত, ১ম মুদ্রণ ঃ ১৮১৫ শক -১০০০, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৮৪৬ শক-৫০০।

১২। ব্রহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১ম প্রকাশ, ১ম প্রকরণ ঃ শ্রাবণ ১৭৮৩ শক, দ্বিতীয় প্রকরণ ঃ বৈশাখ ১৭৮৮ শক, মাসিক ব্রহ্ম সমাজের উপদেশ, আষাঢ় ১৭৯০ শক।

১৩। চারুপাঠ — অক্ষয়কুমার দত্ত, ১৭৭৫ শকাব্দ, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

১৪। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার — অক্ষয়কুমার দত্ত, তথ্য সংগ্রহ ঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

১৫। বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার — ২য় খণ্ড, অক্ষয়কুমার দত্ত, পঞ্চমবার মুদ্রিত, কলিকাতা, নতুন সংস্কৃত যন্ত্র, সংবৎ ১৯৩০।

১৬। প্যারীচাঁদ রচনাবলী (সম্পূর্ণ) সম্পাদনা—ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ —১২ অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, ২৯ নভেম্বর ১৯৭১ সাল, মণ্ডল বুক হাউস, কলিকাতা-৯।

১৭। হারানো দিনের নাটক—সম্পাদনা ঃ পিনাকেশ সরকার, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, সাহিত্য সংসদ, প্রকাশক ঃ দেবজ্যোতি দত্ত, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা-৯।

১৮। হুতোম প্যাঁচার নক্শা ও অন্যান্য সমাজচিত্র—কালীপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাস নূতন সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫৫, পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৬৩, চতুর্থ মুদ্রণ—বৈশাখ ১৪০১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৯। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ (সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী) সম্পাদক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরিবেশক ঃ দে বুক ষ্টোর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দ, তৃতীয় কলেজ স্টীট সংস্করণ ঃ বইমেলা, ১৯৯৫।

২০। ঈশ্বর গুপ্ত রচনাবলী, (১ম খণ্ড)—সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ১৩৮১ বঙ্গাব্দ, দত্ত, চৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট কলিকাতা।

২১। রঙ্গলাল রচনাবলী, (এক খণ্ডে সম্পূর্ণ) সম্পাদক—ডঃ শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্ত ও শ্রীহরিবন্ধু মুখটি, দত্তচৌধুরী অ্যাণ্ড সন্স, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা আশ্বিন ১৩৮১।

২২। মধুসূদন রচনাবলী (ইংরেজি সহ সমগ্র রচনা এক খণ্ডে), সম্পাদক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫, সংশোধিত চতুর্থ সংস্করণ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ২০০৪।

২৩। দীনবন্ধু রচনাসংগ্রহ, পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, সভপতি-শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ সেন, প্রধান সম্পাদক-শ্রীগোপাল হালদার, স্বাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৮জুন, ১৯৭৩।

২৪। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নাটক সমগ্র, ১ম খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২।

২৫। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক — শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ ঃ ১৩৬০, ২য় সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬৮।

২৬। হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, সম্পাদক — শ্রীসজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১ম সংস্করণ আষাঢ়, ১৩৬০।

২৭। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, আমার জীবন, ১ম খণ্ড,—নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬।

২৮। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড,—নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬।

২৯। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, কবিতাবলী ১মভাগ—নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক—সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩০। নবীনচন্দ্র রচনাবলী, ৫ম খণ্ড,—নবীনচন্দ্র সেন, সম্পাদক — সজনীকান্ত দাস, প্রথম সংস্করণ ঃ ফাল্গুন ১৩৬৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা-৬।

৩১। বিহারীলাল কাব্য সংগ্রহ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৩৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৪২।

৩২। বিজয় বসন্ত—হরিনাথ মজুমদার, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৭১ শক, প্রাপ্তিস্থান-বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সংখ্যা-২৩৩৩০৫, ক্যাটালগ্ নং-৮৯১.৪৪৩৬, হ.ম/বি।

৩৩। ভূদেব রচনাসম্ভার — ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক — প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ, কলি-১২, ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ, ভাদ্র ১৩৬৯।

৩৪। রাজনারায়ণ বসু নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদক—বারিদবরণ ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ১লা বৈশাখ, ১৪০২, দে বুক্স ষ্টোর, পৃ: ৩০৫।

৩৫। স্বর্ণলতা, সম্পাদক— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় মুদ্রণ-আশ্বিন ১৪০০।

৩৬। বঙ্কিম রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক-যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৬০, ষোড়শ মুদ্রণ ১৪০১, সাহিত্য সংসদ।

৩৭। বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড,সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রথম প্রকাশ—দোলপূর্ণিমা, ১৩৬১, পঞ্চদশ মুদ্রণ ঃ মাঘ, ১৪১১, সাহিত্য সংসদ।

৩৮। গিরিশ রচনাবলী, ১ম খণ্ড, সম্পাদক—ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য, সাহিত্য সংসদ, ৩২ এ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ অক্টোবর ১৯৯১।

৩৯। গিরিশ রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, সম্পাদক— ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৯২, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৯১, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগষ্ট ১৯৯২।

৪০। গিরিশ রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড, সম্পাদক— ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য সাহিত্য সংসদ, ৩২-এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৪, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬।

৪১। রমেশ রচনাবলী (সমগ্র উপন্যাস)—রমেশচন্দ্র দত্ত, সম্পাদক—যোগেশচন্দ্র বাগল, সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা-৯, প্রথম মুদ্রণ ঃ জানুয়ারী ১৯৬০, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ১৯৯০।

৪২। স্বর্ণকুমারী দেবীর গল্প, সম্পাদক - ডঃ সমরেশ মজুমদার, রত্নাবলী, ১১-এ, ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ, জৈষ্ঠ ১৪১১/মে ২০০৪।

৪৩। ত্রৈলোক্যনাথ রচনাবলী (অখণ্ড সংস্করণ), সম্পাদনা—সুদেব মুখোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম সংস্করণ ঃ আশ্বিন ১৪১০।

৪৪। রবীন্দ্র রচনাবলী, ১ম খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০।

৪৫। রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০।

৪৬। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩য় খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ চৈত্র ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০।

৪৭। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৪র্থ খণ্ড—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে সুলভ সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০।

৪৮। রবীন্দ্ররচনাবলী, ৫ম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী,১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০।

৪৯। রবীন্দ্র রচনাবলী, ৯ম খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, ১২৫তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৩৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪০২, বৈশাখ ১৪০৯, পৌষ ১৪১০।

৫০। রবীন্দ্ররচনাবলী, সপ্তদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০।

৫১। রবীন্দ্ররচনাবলী, অষ্টাদশ খণ্ড, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী; প্রথম প্রকাশ ঃ মাঘ ১৪০৭, পুনর্মুদ্রণ ঃ পৌষ ১৪১০।

৫২। কবি সত্যেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, বাক্-সাহিত্য প্রাঃ লিঃ ৩৩ কলেজ রোড, কলি, ১ম প্রাঃ, ভাদ্র, ১৩৭৮, সেপ্টেম্বর ১৯৭১।

৫৩। বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র (অখণ্ড বাংলা সংস্করণ), প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ, ১৩৯১, একবিংশ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন, ১৪০৪, নবপত্র প্রকাশন।

৫৪। অব্যক্ত, বাউলমন প্রকাশন, ১ম প্রকাশ ১৩২৮, ৫ম মুদ্রণ ১৪০০।

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক ঃ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৮৫, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২। বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড (আধুনিকযুগ), শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, তৃতীয় সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৩৮৮, (আগষ্ট, ১৯৮১) বাণী মুদ্রণ।

৩। বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন (নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত), ডঃ অতুল সুর, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৯২ বঙ্গাব্দ, ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, ২০০১ খ্রিষ্টাব্দ, সাহিত্যলোক।

৪। বাঙলা ও বাঙালীর সমাজ ও সংস্কৃতি, ডঃ অতুল সুর, First Published : 1990, B. S. 1397, Reprinted : 1991, B.S. 1398 জ্যোৎস্নালোক ।

৫। বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন — আহমদ শরীফ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৯৩, প্রকাশক মহিউদ্দিন আহমেদ, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, রেড ক্রোস বিল্ডিং, ১১৪, মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, পো: ২৬১১, ঢাকা।

৬। বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) — নীহাররঞ্জন রায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬, পুনর্মুদ্রণ : ১৩৫৯, সংযোজিত সাক্ষরতা সংস্করণ ১৩৮৭, প্রথম দে'জ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০০, পঞ্চম সংস্করণ : ফাল্গুন ১৪১২।

৭। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৪০, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৭৫, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ ১ বৈশাখ ১৩৯৮, পঞ্চম মুদ্রণ ঃ ফাল্গুন ১৪০৭, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ আষাঢ় ১৪১০, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯।

৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৫০, সপ্তম সংস্করণ ঃ ১৩৮৬, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ ১৪০৩।

৯। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ৫ম খণ্ড—ডঃ সুকুমার সেন, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫৮, ৪র্থ সংস্করণ ঃ ১৯৭৬, প্রথম আনন্দ সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ মে ২০০২, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ আগস্ট ২০০৫, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলি-৯।

১০। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : ১৯৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৯৮৫।

১১। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৬ষ্ঠ খণ্ড (প্রথম পর্ব), অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, ১ম সংস্করণ ঃ ১৯৮৯।

১২। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৮ম খণ্ড (বঙ্কিম পর্ব) — অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৯৮, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

১৩। বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মডার্ণ বুক এজেন্সী, নতুন সংস্করণ ঃ ১৯৯৫।

১৪। বাংলা নাটকের ইতিহাস—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ—প্রকাশক ঃ শ্রীসুরজিৎচন্দ্র দাস, জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯, লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩, সংশোধিত ও পরিবর্তিতত অষ্টম সংস্মরণ, জুন ১৯৯৯।

১৫ বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং, প্রাঃ লিঃ, কলি-৭৩, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৮২, ষষ্ঠ সংস্করণ, বইমেলা, ২০০৪।

১৬। নাট্যতত্ত্ব ও নাট্যমঞ্চ — ড. অজিতকুমার ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং, কলি-৭৩, প্রথম প্রকাশ : বইমেলা, ১৯৯১, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ আগস্ট ১৯৯৭।

১৭। আধুনিক বাংলা কাব্য, প্রথম পর্ব (শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়) মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩, দশম মুদ্রণ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১।

১৮। রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ —প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, অখণ্ড সংস্করণ, দশম মুদ্রণ ঃ শ্রাবণ ১৪০৭।

১৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা—ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৭-১৯৯৮, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০০-২০০১, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড ।

২০। সাহিত্যে ছোটগল্প—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সংস্করণ ঃ শ্রাবণ ১৪০৫।

২১। কালের পুত্তলিকা বাংলা ছোটগল্পের একশ বছর ঃ ১৮৯১-১৯৯০—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : আশ্বিন ১৪০২, সেপ্টেম্বর ১৯৯৫, প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৮৯।

২২। বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার—শ্রীভূদেব চৌধুরী, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬২, চতুর্থ প্রকাশ ঃ (পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত)১৯৮৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ১৯৯৯।

২৩। চোখের বালি — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, শ্রাবণ ১৪০৫।

২৪। বিদ্যাসাগর — শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দধারা প্রকাশন, প্রথম আনন্দধারা সংস্করণ, ফাল্গুন ১৩৭৬।

২৫। আত্মজীবনী, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক সম্পাদিত, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, প্রকাশ ১৮৯৮, চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৯৬২।

২৬। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, প্রশান্তকুমার পাল সম্পাদিত, ২০০২ সুবর্ণরেখা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২০, প্রথম সুবর্ণরেখা সংস্করণ ঃ ২০০২।

২৭। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত,—যোগীন্দ্রনাথ বসু, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, দে'জ সংস্করণ ঃ কলকাতা পুস্তক মেলা-১৯৮৩, দে'জ দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৯৩ প্রকাশ ঃ ১৮৯৩, দ্বিতীয় ঃ ১৮৯৫, পঞ্চম সংস্করণ ঃ ১৯২৫।

২৮। বঙ্কিম জীবনী—শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদক - অলোক রায় ও অশোক উপাধ্যায়, ১ম প্রকাশ, ১৩১৮, ৪র্থ সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৯৫।

২৯। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (১ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ : মাঘ ১৩৪৬, পঞ্চম সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৬৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩০। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (২য় খণ্ড), সংশোধিত পঞ্চম সংস্করণ : শ্রাবণ ১৩৬২, ষষ্ঠ সংস্করণ : বৈশাখ ১৩৭৭, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩১। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৩য় খণ্ড), প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৫০, চতুর্থ সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৬৮, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩২। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৪র্থ খণ্ড), প্রথম সংস্করণ : আশ্বিন ১৩৫১, তৃতীয় সংস্করণ : চৈত্র ১৩৬১, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩৩। সাহিত্য সাধক চরিতমালা (৫ম খণ্ড), প্রথম সংস্করণ : ভাদ্র ১৩৫৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : ১৩৭০, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৩৪। রাজনারায়ণ বসু — জীবন ও সাহিত্য, শ্রীমতী অশ্রু কোলে, পরিবেশক : জিজ্ঞাসা, কলি, প্রথম প্রকাশ : দোলপূর্ণিমা ১৩ চৈত্র ১৩৮১।

৩৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ এজ প্রথম সংস্করণ ঃ ভাদ্র ১৩৬২, চতুর্থ মুদ্রণ ঃ ভাদ্র, ১৩৯০, আগষ্ট ১৯৮৩

৩৬। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় — বঙ্কিমজীবনী, সম্পাদক — অলোক রায়, অশোক উপাধ্যায়, পুস্তক বিপণি, কলি-৯, প্রথম প্রকাশ ১৩১৮, চতুর্থ সংস্করণ ঃ আষাঢ় ১৩৯৫।

৩৭। কবি শ্রী মধুসূদন — মহিতলাল মজুমদার, বিদ্যোদয় লাইব্রেরী প্রাঃ লিঃ, প্রথম বিদ্যোদয় সংস্করণ (তৃতীয় মুদ্রণ), আগস্ট ১৯৬৫, নবম বিদ্যোদয় সংস্করণ ২০০৪।

৩৮। সংবাদ সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ১ম খণ্ড, সংকলিত ও সম্পাদিত-স্বপন বসু, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৯এপ্রিল ২০০০, প্রকাশক ঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র রোড, কলিকাতা-২০.

NORTH BENGAL UNIVERSITY LIBRARY